অগ্নিপরীক্ষা
দ্বিতীয় খণ্ড
উনিশ-শো আঠারো
আলেক্সেই তলস্তয়

আলেক্সি তল্‌স্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

(তিনখণ্ডে সমাপ্ত)

স্তালিন পুরস্কার

১৯৪৩

আলেক্সি তল্‌স্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

তিন খণ্ডে সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

উনিশ-শো আঠারো

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫॥

আলেক্সি তল্‌স্তয়ের অর্ডিয়েল উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'নাইণ্টিন-এইটিন'
মূল রুশভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ঃ আইভি লিৎভিনোভা
ও তাতিয়ানা লিৎভিনোভা॥

ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশক ঃ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস্
পাবলিশিং হাউস, মস্কো॥

দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ঃ **রথীন্দ্র সরকার॥**

প্রচ্ছদপট ঃ **খালেদ চৌধুরী॥**

প্রকাশক ঃ **সুরেন দত্ত**
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২॥

মুদ্রক ঃ সুখলাল চট্টোপাধ্যায়
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা ১৪॥

পাঁচ টাকা॥

দ্বিতীয় খণ্ড

উনিশ-শো আঠারো

রচনাকাল

১৯২৭

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড

॥ দুই বোন ॥

"বারংবার রক্তস্নানে আমাদের সব মালিন্য
ঘুচেছে; তপ্ত ক্ষারের বাষ্প-কটাহে ডুবে
বিগত হয়েছে যত গ্লানি; সলিল মন্থনে
আমরা হয়েছি অনাবিল—
নিকষিত সোনা এমন আর আছে কারা?"

॥ এক ॥

সব শেষ হয়ে গেছে। রাস্তার যতো আবর্জনা কুড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শীতার্ত বাতাস। সামরিক নির্দেশনামা লেখা টুকরো কাগজ, থিয়েটারের পোস্টার আর রুশ জনগণের 'বিবেকবুদ্ধি ও দেশপ্রেমের' উদ্দেশে প্রচারিত আবেদন-পত্রের ছেঁড়া টুকরো এখন পিতার্সবুর্গের নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত রাস্তার উপর বাতাসে গড়িয়ে বেড়ায়। নানা বর্ণের ছেঁড়া পোস্টারের স্তূপ, সেগুলোর গায়ে এখনও আঠার চিহ্ন—হাওয়ার দমকে উড়ে যায় আর কেমন যেন একটা অশুভ আওয়াজ তোলে খস্ খস্ করে। বাঁধানো ফুটপাতের উপর জমে-থাকা বরফ বাতাসের ঠেলায় সাপের মতো এঁকে বেঁকে যায়।

কিছু দিন আগেও হৈ-হল্লা আর মাতাল কোলাহলে এই রাজধানী কেঁপে উঠেছে, আর এখন এইটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজপথ আর চত্বরগুলো ছেড়ে মানুষের সেই অলস ভীড় এখন কোথায় মিলিয়ে গেছে। উইন্টার প্রাসাদ * খাঁ খাঁ করছে, 'অরোরা' ক্রুজার † থেকে একটা কামানের গোলা এসে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তার ছাদ। অস্থায়ী গবর্নমেণ্টের সদস্যারা, প্রতিপত্তি-শালী ব্যাঙ্কার আর নামজাদা জেনারেলদের দল যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। গর্বোদ্ধত গাড়ী, সুন্দরী নারী, উপরওয়ালা অফিসার, সরকারী কর্মচারী, আর বড়ো বড়ো আদর্শওয়ালা কূটনীতিকের দল—সবাই চলে গেছে রাজধানীর পথ ছেড়ে। সে-পথ এখন নোংরা আর কলুষিত। দোকানঘরগুলোর জানলায় হাতুড়ি মেরে তক্তা আঁটার শব্দ শোনা যায়—রাত হলে আওয়াজটা আরো ঘন ঘন শোনা যেতে থাকে। কয়েকটা দোকানের জানলায় এখনো করুণভাবে শোভা পাচ্ছে পশরার উচ্ছিষ্ট—কোথাও-বা একটুখানি পনীর, কোথাও-বা পচা কেকের টুকরো। কিন্তু সে দৃশ্য দেখে বিগত জীবনকে ফিরে পাবার কামনাই আরো উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে। ভীরু পথচারীরা দেয়ালে গা ঘেঁষে চঞ্চল চোখে লক্ষ্য করে রাস্তার টহলদারী সৈনিকদের—সবল একদল মানুষ সুদৃঢ়-পায়ে পায়চারি করছে, মাথার টুপিতে লাল তারকার চিহ্ন, কাঁধের উপর ঝুলছে রাইফেল, মাটির দিকে সেগুলোর মুখ ফেরানো।

উত্তুরে-বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা এসে বাড়ীগুলোর অন্ধকার জানলা গলে ভিতরে ঢোকে, ঠেলে এগিয়ে যায় নির্জন পরিত্যক্ত অলিন্দের দিকে, অতীত বিলাসের অপচ্ছায়াকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। উনিশ শো সতেরো সালের শেষের এই পিতার্স্বুর্গ—এক ভয়ংকর নগরী।

ভয়াল, গভীর রহস্যময় আর দুর্বোধ্য। সবই শেষ হয়ে গেছে। অতীতকে বরবাদ করে দেয়া হয়েছে একদম। ছেঁড়া কোট গায়ে একটি লোক বালতি আর রঙের তুলি হাতে বাতাস-ঝাপটানো সেই রাস্তাটার ওপর দিয়ে একবার দৌড়ে এগিয়ে আসছে আবার পেছিয়ে চলে যাচ্ছে। পুরনো পাঁচিলের গায়ে সাদা তালির মতো লেগে আছে বিজ্ঞাপনগুলো, তারই উপর সেই লোকটি ক্রমাগত নতুন নতুন আদেশনামা সেঁটে চলেছে। পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি, বৃত্তি, সামরিক তকমা, ভগবান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নিজের খুশিমতো বাঁচার অধিকার পর্যন্ত আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। বরবাদ! লোকটির টুপির কিনারার তলা দিয়ে সাদা পোস্টারগুলোর কুটিল ভয়ংকর দৃষ্টি উঁকি দিচ্ছে কাঁচের জানলাওয়ালা বাড়ীটির দিকে—ঘরের বাসিন্দারা ঠাণ্ডা কামরাগুলোর মধ্যে এখনো

---

* উইন্টার প্রাসাদ—জারের নিকেতন; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

† অরোরা—বাল্টিক সাগরের নৌবাহিনীর ক্রুজার; এই 'অরোরা' জাহাজের কামান থেকেই প্রথম উইন্টার প্রাসাদের উপর আক্রমণ শুরু হয়।

পায়চারি করছে, পরনে তাদের নরম ফেল্টের জুতো আর ফারের কোট। হাত মোচড়াতে মোচড়াতে তারা বারে বারে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করছে—

"এসব কি হচ্ছে! কী হবে বলতে পারো? রাশিয়া যে ধ্বংস হয়ে গেল, সব যে শেষ হয়ে গেল...এ যে মৃত্যু!"

জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখতে পায় রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে আসবাবপত্রবোঝাই একটা লম্বা গাড়ি। ঐ বাড়ীটিতেই বাস করতেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। ঐ জায়গাটিতেই একজন শান্ত্রীকে হরদম দেখা যেত সিধে টান হয়ে দাঁড়িয়ে ধূসর প্রাসাদটির দিকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতে। আজ তারা সেখানে দেখতে পাচ্ছে বাড়ীর দরজাগুলো একেবারে হাঁ, সশস্ত্র সৈনিকেরা ঐ দরজা দিয়ে টেবিল চেয়ার কার্পেট ছবি ইত্যাদি বয়ে নিয়ে আসছে গাড়িটার মধ্যে। ফটকের উপর ঝুলছে লাল শালুর তৈরি একটা পতাকা। আর ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পাতলা একখানি কোট গায়ে পা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, গালের ওপর জুলফি উড়ছে আর পাকাচুলওলা মাথাটা তিনি কেবলই ঝাঁকাচ্ছেন। ওরা তাঁকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিচ্ছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঠান্ডায় কোথায় যাবেন উনি? যেখানে তাঁর খুশি!...আর ইনিই হলেন কিনা মহামন্য রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংগ!

তারপর যখন রাত্রি নেমে আসে... গাঢ় অন্ধকার, একটি বাতিও জ্বলে না। কোনো ঘরের জানলায় একটুখানি আলোও দেখা যায় না। কয়লা নেই, অথচ তবু শোনা যায় স্মল্‌নি প্রাসাদটি * নাকি আলোয় আলোময়। কারখানা এলাকাতেও নাকি আলো জ্বলে। অত্যাচারিত, বুলেটবিদ্ধ নগরীর উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যায় হু-হু করে, ছাদের ফুটোগুলোর মধ্যে দিয়ে শিস্‌ কেটে চলে যায় বাতাস ঃ 'হায়, হায়, হায়!'

অন্ধকারের বুকে বন্দুকের আওয়াজও শোনা যায়। কে গুলি চালায়? কেন? কাকে লক্ষ্য ক'রে? ওইদিকটায় নয় তো? ওই যে যেখানে তুষার-সাদা মেঘের গায়ে দপ্‌দপে আগুনের ছোপ লেগেছে? না, না, ও তো মদের ভাঁটিখানা, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে মাটির তলার কুঠরিতে ভাঙা পিপের মদে ডুবে যাচ্ছে মানুষগুলো...মরুক্‌ গে, পুড়ে মরুক সবই!

হায় রে রাশিয়ার মানুষ, রাশিয়ার জনগণ!

রাশিয়ার মানুষেরা এখন সৈন্যবাহী ট্রেনে গাদাবন্দী হয়ে অন্তহীন স্রোতের মতো ফিরে আসছে—ফিরে আসছে তারা লক্ষ মানুষের প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, ঘরের মুখে,—তাদের গ্রাম, তাদের স্তেপভূমি, তাদের জলা-জংগলের দিকে... দেশের মাটিতে ফিরে আসছে তারা, ঘরের নারীর কাছে... । ভাংগা জানলাওয়ালা রেলের কামরাগুলোয় তারা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,

---

* স্মল্‌নি—লেনিনগ্রাদের একটি অট্টালিকা। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে এই স্মল্‌নিই হয়েছিল মহান্‌ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সদর দপ্তর।

ভিতরে এত ঠাসাঠাসি ভীড় যে ওদের মধ্যে থেকে একটা মরামানুষকে পর্যন্ত টেনে বার করে ফেলে দেবার সুবিধে নেই। বগিগুলোর জোড়ের মুখে, কামরার ছাদে—সর্বত্র মানুষ। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে তারা, চাকার নীচে গড়িয়ে পড়ছে, নীচু পুলে ঠুকে মাথা ফেটে যাচ্ছে অনেকের। হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছে, তাই তারা গুঁজে নিচ্ছে জামার নীচে, বস্তার মধ্যে, তাই বয়ে নিয়ে চলেছে তারা—কে জানে কখন কি কাজে লেগে যাবে : মেশিনগান, রাইফেলের বল্টু, কোন সৈনিকের মৃতদহ থেকে জোগাড় করা এটা-সেটা জিনিস, হাতবোমা, রাইফেল, গ্রামোফোন, রেলগাড়ীর বসবার গদি থেকে কেটে নেওয়া চামড়ার ফালি, ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিস। শুধু একটা জিনিস কেউ নিচ্ছে না,—কাগজের টাকা। ও দিয়ে এখন সিগারেট পাকানোর কাজ পর্যন্ত চলে না।

রাশিয়ার সমতলভূমির উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে ট্রেনগুলো। একেবারে নেহাত হাঁফিয়ে পড়লে তখনই শুধু স্টেশনে বিশ্রাম নিচ্ছে। স্টেশনগুলোতেও ঘরের জানলা ভাঙা, কব্জা থেকে দরজার কবাটগুলো খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। এক একটা স্টেশন আসে আর সেগুলোকে উদ্দেশ করে বর্ষিত হতে থাকে অশ্লীল গালাগালি। ছাইরঙের লম্বা-কোট পরা মানুষগুলো রাইফেলের বল্টু খটখটিয়ে ট্রেনের ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে, স্টেশনমাস্টারটিকে খুঁজে বের করবার জন্য ছুটে যায় ওরা—বিশ্ববুর্জোয়ার এই ক্ষুদে প্রতীকটিকে শেষ করে দিতে হবে। 'কই হে, আরেকটা ইঞ্জিন দাও আমাদের! জীবনে আর তোমার ভক্তি নেই নাকি, কুত্তীর বাচ্চা? ট্রেনটাকে পাস্ করিয়ে দাও!' তারপর ওরা ছুটে যায় ইঞ্জিনের দিকে। সেটার তখন অন্তিম অবস্থা, চালক আর কয়লা-জোগানদার দুজনেই ট্রেন ছেড়ে পালিয়েছে স্তেপ অঞ্চলের দিকে। ওরা তখন চেঁচিয়ে ওঠে : 'কয়লা চাই! কাঠ! দাও না ঐ বেড়া ভেঙে, দরজা জানালাগুলোই না হয় চেলা করে দাও!'

তিনবছর আগে কিন্তু কার বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা, কিসের জন্য লড়ছি সে প্রশ্নই ওঠে নি। খোলা আকাশ, মাটি কেঁপে উঠল : সৈন্যদলে ভর্তি হবে চলো, লড়াই! মানুষ বুঝল সাংঘাতিক সময় এসেছে এবার। পুরনো ধারা পালটে গিয়েছে। রাইফেল তুলে ধরো! যাই ঘটুক না কেন, পুরনো জীবনে আর ফিরে যাওয়া চলবে না কিছুতেই। বহু শতাব্দীর অভাব অভিযোগ তখন একটা চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়াল।

তারপর তিন বছর বাদে মানুষ আবিষ্কার করল যুদ্ধ কাকে বলে : সামনে একটা মেশিনগান আর পেছনে একটা মেশিনগান—গোবরগাদায় গড়াগড়ি দিয়ে আর উকুনের রাজত্বে বাস করে অবশেষে একসময় মৃত্যুবরণ করে নেয়ার পালা। এই হল যুদ্ধ। এবার যেন একটা প্রচণ্ড কম্পনে টলে উঠল মানুষ, মাথা ঘুরে গেল তাদের—বিপ্লব! টাল সামলে উঠে তারা প্রশ্ন করতে লাগল : 'এবার আমাদের কি হবে? আমাদের কি আবার ঠকতে হবে?' আন্দোলনকারীদের কথা তারা শুনল কান দিয়ে : 'ও, এতদিন তাহলে বোকামিই করেছি? এবার তা হলে ঠিক রাস্তা

নেব আমরা! যথেষ্ট লড়েছি এতদিন—এবার বাড়ী ফিরে যেতে হবে, শোধ তুলতে হবে। এবার বুঝেছি বেয়নেট দিয়ে কাদের ভুঁড়ি ফাঁসাতে হবে। জারও আর নেই, ভগবানও নেই আর। এবার শুধু রয়েছি আমরা। বাড়ী ফিরে চলো—জমিজমা ভাগাভাগি করে নিই এবার!'

রাশিয়ার সমতলভূমির উপর দিয়ে লাঙলের মতো চষতে চষতে সৈন্যবোঝাই ট্রেনগুলো রণাঙ্গন থেকে ফিরে চলে, পিছনে রেখে যায় ভাঙাচোরা স্টেশন, ছিন্নভিন্ন কাঠের গুঁড়ি, লুণ্ঠিত শহরের ভগ্নাবশেষ। গ্রাম-জনপদ আর খামারবাড়ী থেকে লোহালক্কড়ের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আসে—করাত চালিয়ে রাইফেলের নল কেটে ফেলে দিচ্ছে ওরা। রাশিয়ার মানুষ এবার পরম নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের মাটিকে আঁকড়ে ধরছে। আগেকার দিনগুলির মতো কুটিরে কুটিরে আবার জ্বলে উঠছে প্রদীপের কম্পিত শিখা, মা-ঠাকুরমাদের আমলের পুরনো তাঁতে সুতো বসিয়েছে ঘরের মেয়েরা। মনে হচ্ছে যেন কালের প্রবাহ বহু অতীতের সেইসব দিনগুলোতেই আবার ফিরে চলেছে। কিন্তু এই বছরেরই শীতকালে বিপ্লব ঘটল দ্বিতীয়বার—অক্টোবর বিপ্লব।

দুর্ভিক্ষপীড়িত পিতার্সবুর্গ শহর এখন গ্রামাঞ্চলের লুণ্ঠনের শিকারে পরিণত হয়েছে, উত্তর মেরু-অঞ্চলের তুহিনশীতল বাতাস তাকে যেন কুরে কুরে গ্রাস করছে। শত্রু-পরিবেষ্টিত, চক্রান্ত-পীড়িত এই শহরে কয়লা আর রুটির যোগান নেই, কারখানার চিমনিগুলো ঠান্ডা, আর গোটা শহরটাই যেন এখন করোটির আবরণহীন উন্মুক্ত একটা মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কেরই বেতার-কেন্দ্র ৎসারকয়ে সেলো—সেখান থেকে অনবরত প্রচারিত হচ্ছে বোমার মতো ভয়ংকর আর জ্বালাময়ী সব আদর্শের কথা।

"কমরেড!"—পাথরের একটা পাদপীঠে হেলান দিয়ে চেঁচাচ্ছে একজন রোগা লোক, মাথার উপর 'ফিনদেশীয় টুপিটা' উল্টো করে বসানো। ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ভেঙে গেছে তার : "পলাতক কমরেডরা! ঐ সাম্রাজ্যবাদী সাপগুলোকে ছেড়ে চলে এসেছেন আপনারা...পিতার্সবুর্গের মজুর আমরা বলছি আপনাদের : আপনারা ঠিকই করেছেন কমরেড! রক্তপিপাসু ঐ বুর্জোয়াগুলোর দালাল আমরা হবো না কোনোমতেই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিপাত যাক!"

"নিপা—া-া-ত ..." কথাটা যেন মন্থরভাবে গড়িয়ে চলে দাড়িগজানো সৈন্যদের জটলার উপর দিয়ে। কাঁধের উপর তাদের রাইফেল, পিঠের উপর জার তৃতীয় আলেকজান্দারের অশ্বারূঢ় মূর্তিটার সামনে ক্লান্ত ভারী পায়ে জড়ো হয়েছে তারা।

জারের মূর্তিটার কালো ব্রোঞ্জের উপর আর বুক-খোলা-জামা গায়ে ওই বক্তাটির দেহের উপর বরফ জমেছে। পা থমকে দাঁড়ানো ব্রোঞ্জের ঘোড়াটার মুখের নীচে দাঁড়িয়ে লোকটি জনতাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছে :

"আমরা কিন্তু রাইফেল সরিয়ে রাখবো না কমরেড! কারণ বিপ্লবের সামনে আজ বিপদ। দুনিয়ার প্রত্যেকটি কোণ থেকে শত্রু আজ আমাদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শত্রুর লুটেরা হাতে আজ জমে উঠেছে সোনার তাল,

ধ্বংসের নানা ভয়ংকর অস্ত্র শানাচ্ছে সেই হাত। আমরা যখন রক্তগংগায় ডুবে যাই ওরা তখন আনন্দে নাচে। কিন্তু আমরা পিছু হটবো না। বিশ্ব সমাজ-বিপ্লবে দৃঢ় বিশ্বাসই হল আমাদের হাতিয়ার। সে বিপ্লব আসছে, ক্রমেই এগিয়ে আসছে..."

বাকী কথাটুকু হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। কোটের কলার-ওল্টানো চওড়া-কাঁধওয়ালা একজন লোক মূর্তিটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল মূর্তি বা বক্তা বা পিঠে বোঝাওয়ালা সৈন্য, কারুর দিকেই তার নজর নেই। কিন্তু হঠাৎ যেন বক্তার একটুকরো কথা এসে তার কানে বাজলো, কিংবা বলা যায় বক্তার কথা ঠিক ততটা নয়, তার বক্তব্যের উন্মত্ত দৃঢ় প্রত্যয়ই যেন টেনে নিল তার সমস্ত মনোযোগ। ব্রোঞ্জের ঘোড়াটির নিচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বক্তা তখন বলছিল:

"এই কথাটা মাথায় রাখবেন আপনারা—আর ছ'টি মাসের মধ্যেই দুনিয়ার সমস্ত জঞ্জালের মূল ঐ টাকা চিরকালের মতো লোপ পেয়ে যাবে। অনাহার, দারিদ্র্য, অপমান কিছুই আর থাকবে না। ... যা কিছু আপনাদের প্রয়োজন নিয়ে নিন সরকারী ধনাগার থেকে। সোনা দিয়ে আমরা এবার পায়খানা গড়ব।..."

ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় বক্তার গলার মধ্যে ঢুকে গেল বরফ। প্রচণ্ড বিরক্তির সংগে ঝুঁকে পড়ে সে কাশতে শুরু করল। কিন্তু কিছুতেই আর থামে না কাশি। যেন ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে তার। সৈন্যরা যে যেমন ছিল কয়েক মিনিট তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লম্বা টুপিগুলো দুলিয়ে তারা আস্তে আস্তে কেটে পড়তে লাগল—কেউ চলল স্টেশনের দিকে, কেউ সিধে শহরের মধ্যে দিয়ে নদীর ওপারে। বক্তা এবার পাথরের উঁচু ভিতটা ধরে ধরে নেমে এল নিচে, ঠাণ্ডা গ্রানাইটে পিছলে যাচ্ছিল তার হাতের আঙুলগুলো। জামার কলার-ওল্টানো সেই লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল:

"এই যে, রুব্‌লেভ!"

ভাসিলি রুব্‌লেভ তখনও কাশতে কাশতে জামার বোতামগুলো পরিয়ে নিচ্ছে। হাতটা আর বের না করেই সে ইভান ইলিচের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো:

"ও, কী চাই তোমার?"

"তোমায় দেখে খুশি হলাম..."

স্টেশনের সামনেটায় তল্পিতল্পা রেখে ছোট ছোট জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সারা গায়ে উকুন-ভরা দাড়িওয়ালা সৈনিকের দল। স্টেশনের সেই বরফ-ঢাকা অস্পষ্ট ছায়ারেখার দিকে চোখ ফিরিয়ে রুবলেভ বলল—"ঐ গর্দভগুলোর মাথায় কিছু ঢোকানো কি চাট্টিখানি কথা? আরশোলার মতো ভড়কে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে ফ্রণ্ট থেকে। ... চাষাগুলো! ওদের এখন একটু ভয় দেখানোর দরকার!"

হাড় পর্যন্ত জমে ওঠা হাতখানা তুলে সে যেন তুষার-ঝরা বাতাসটাকে খামচে ধরতে যায়। একটা অদৃশ্য কিছুর উপর মুঠো পাকিয়ে ঘুষি চালায় সে। তার গোটা শরীর কেঁপে ওঠে একবার, কিন্তু হাতখানা বাড়ানোই থাকে সামনের দিকে।

"রুব্লেভ্, দাদা, তুমি তো আমায় জানো", (তেলেগিন কলারটা নামিয়ে দিয়ে রুব্লেভের পাংশু মুখখানার দিকে ঝুঁকে পড়ল) "দয়া করে সব বুঝিয়ে বলো তো আমায়, ঈশ্বরের দোহাই। আমরা ফাঁসির দড়িতে মাথা গলাতে যাচ্ছি। জার্মানরা তো ইচ্ছে করলেই এক হপ্তার মধ্যে পেত্রোগ্রাদে এসে পড়তে পারে। তুমি তো জানো আমার কোনোকালেই রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না—"

"আগ্রহ ছিল না মানে?"

রুব্লেভের গায়ের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল। ইভান ইলিচের দিকে ফিরে বলল, "তা হলে তোমার আগ্রহটা ছিল কিসে? আজকের দিনে আগ্রহ থাকে না কাদের সে কথা জানো তুমি?" কটমট্ করে ইভান ইলিচের চোখের দিকে চেয়ে রইল সে—"নিরপেক্ষরা হল জনগণের শত্রু!......"

"ঐ কথাটাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম তোমায়। মানুষের মতো সোজা ভাষায় কথা বলতে পারো না?"

ইভান ইলিয়িচেরও শরীরের প্রতি রোমকূপ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রুব্লেভ তার নাকের গহ্বর দিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

"তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ, কমরেড তেলেগিন। যাহোক, এখন তো আমার আলাপ করার সময় নেই—এ কথাটা অন্তত বুঝতে পারো নিশ্চয়ই?"

"দেখ রুব্লেভ, আমি এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে রয়েছি। কর্নিলভ যে দন অঞ্চলে বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন সে খবর রাখো?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"হয় আমি দন চলে যাবো আর নয়তো তোমাদের সঙ্গেই থাকব......"

"হয় আর নয় মানে? কি বলছ তুও?"

"আমি নিজেই একবার যাচাই করে দেখব কোন্ পক্ষ সঠিক। তুমি হলে বিপ্লবের পক্ষে, আর আমি হলাম রাশিয়ার পক্ষে—আর হয়তো আমি বিপ্লবেরও পক্ষে। যুদ্ধে লড়েছিলাম, জানো তো?"

রুব্লেভের কালো চোখে ক্রোধের আগুন স্তিমিত হয়ে আসে। এখন সে-চোখে রয়েছে শুধু নিদ্রাহীন পরিশ্রান্তির ছাপ।

"বেশ তো" বলল সে—"কাল স্মলনিতে এসে আমার খোঁজ কোরো। রাশিয়া! হুঃ"—মাথা নেড়ে হেসে উঠল সে: "তোমার এই রাশিয়া মানুষকে পাগল করে ছেড়ে দেবে। রাশিয়াকে দেখে আমার তো খুন চড়ে যায় মাথায়! কিন্তু, তা সত্ত্বেও, তুমি আমি সবাই প্রাণ দিতে পারি রাশিয়ার জন্য।...বাল্টিক স্টেশনে চলে যাও। তিন হাজার পলাতক সৈন্য এসে দিন পনেরো হল মেঝেতে গড়াচ্ছে সেখানে। ওদের মধ্যে গিয়ে মিটিং ডাকো, সোবিয়েতের হয়ে প্রচার চালাও। ওদের বল: পেত্রোগ্রাদ চায় খাবার, আর আমরা চাই লড়াকু......" (চোখদুটো তার জ্বলতে থাকে আবার) "ওদের বোলো এই কথা যে শুধু গরম চুল্লীর পাশে গড়ালে আর পেটে হাত বুলোলে ওদের আর পার পেতে হবে না। বিপ্লব ওদের অজানতেই ঘাড়টি চেপে ধরবে। ওদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এই কথাগুলো। আর বোলো যে এক-

মাত্র সোবিয়েত ছাড়া আর কেউ রাশিয়া আর বিপ্লবকে বাঁচাতে পারবে না।... বুঝেছ? এই মুহূর্তে বিপ্লবের চেয়ে বড়ো আর দুনিয়ায় কিছুই নেই......"

অন্ধকারে ঠান্ডা হিম সিঁড়ি বেয়ে তেলেগিন পাঁচতলায় উঠল। দরজা হাতড়ে খুঁজে প্রথমে তিনবার টোকা মারল কবাটে, তারপর আর একবার। ভিতর থেকে কে যেন এগিয়ে এল। একটু বাদেই তেলেগিন শুনতে পেল তার স্ত্রীর মৃদু কণ্ঠঃ "কে ওখানে?"

"আমি, দাশা।"

দরজার ওদিকে থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস এল। শিকলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। দরজার তালায় চাবিটা ঘোরাতে গিয়ে নিশ্চয় কোনো অসুবিধেয় পড়েছে দাশা। ওর ফিস্‌ফিস নি শোনা গেল ঃ "হা ভগবান্!" শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলল দাশা, তারপর করিডরের মধ্যে দিয়ে সিধে ঘরে ফিরে গিয়ে বসে পড়ল।

তেলেগিন দরজায় তালা মেরে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল প্রত্যেকটা চাবি আর আগল। গালোশ্ বুটজোড়া খুলে ফেলল পা থেকে। পকেট হাতড়ে দেখল একবার—"নাঃ, দেশলাইটা তো দেখছি না!" টুপি আর কোটটা তখনও ওর পরনে, ঐ অবস্থায়ই সে হাতটা সামনে বাড়িয়ে দাশার পেছন পেছন হেঁটে এল।

"আবার আলো নিবেছে!" বলল তেলেগিন—"কেলেঙ্কারীর একশেষ! তুমি কোথায়, দাশা?"

একটুখানি থেমে দাশা আস্তে আস্তে জবাব দেয় পড়ার ঘর থেকে ঃ

"আলো তো জ্বলেছিল একসময়, কিন্তু আবার নিবে গেছে।"

পড়ার ঘরে ঢুকল তেলেগিন। সারা ফ্ল্যাটটার মধ্যে এইটাই সবচেয়ে গরম ঘর, কিন্তু আজ এখানেও যেন ঠান্ডা ঢুকেছে। চারদিকটা একবার দেখল সে, কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না—এমন কি দাশার নিঃশ্বাসের আওয়াজও পেল না সে। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার, এক কাপ চা না হলে চলছে না, কিন্তু দাশার হাতে কিছুই যে তৈরি নেই সে সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহ।

কোটের কলার নামিয়ে দিয়ে ইভান ইলিয়িচ জানলার দিকে মুখ করে বসে পড়ল সোফার কাছের আরামকেদারায়। বাইরে দেখা গেল তুষার-মলিন অন্ধকারে একটা মিটমিটে আলো দুলছে। ক্রনস্টাট্ থেকে, কিংবা হয়তো আরও কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে সার্চ লাইটের আলো আকাশের গায়ে হাতড়ে ফিরছে।

নিজের মনেই বলল তেলেগিন 'উনোনটা ধরিয়ে না নিলে চলছে না।' দাশাকে বিরক্ত না করে কিভাবে তার কাছ থেকে দেশলাইয়ের খবরটা নেয়া যায় সে কথাই ভাবছিল তেলেগিন।

কিন্তু জিজ্ঞেস করে ওঠা গেল না কিছুতেই। আচ্ছা দাশা ঠিক কী করছে এখন?—কাঁদছে না ঝিমুচ্ছে? বড়ো বেশি নিস্তব্ধ হয়ে আছে যেন সবকিছু। এত বড়ো ফ্ল্যাট বাড়ীটায় যেন কবরখানার নীরবতা। একমাত্র আওয়াজ যা আসছে সে হল মাঝে মাঝে দূর থেকে বন্দুকের গুলির শব্দ। ঝাড়-লণ্ঠনের ছ'টা বাতি

হঠাৎ জ্বলে উঠল। একটা লালচে আলোয় ভরে গেল ঘরখানা। দাশাকে দেখা গেল টেবিলের পাশে বসে আছে। ভেতরে যাই পরুক কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়েছে একখানা কোট। ফেল্ট-বুটের মধ্যে ঢোকানো একখানি পা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্লটিং-প্যাডটার ওপর গাল রেখে টেবিলে মাথাটা পেতে বসে আছে সে। বিড়ম্বনাক্লিস্ট মুখখানা রোগা হয়ে গেছে দাশার, চোখ দুটো একেবারে খোলা—চোখ পর্যন্ত বোজেনি সে! কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর বেয়াড়া ভংগীতে বসে আছে দাশা, একদম আড়ষ্ট হয়ে......

ভারী গলায় বলল তেলেগিন, "দাশা, অমন করে বসে থেকো না।" ওর জন্য এমন একটা করুণা তেলেগিনের মনকে আচ্ছন্ন করল যে সে আর থাকতে পারল না। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময় বাতির সামান্য লাল শিখাগুলোও আবার দপ্‌দপ্‌ করতে করতে নিবে গেল। ক'সেকেন্ড মাত্র জ্বলেছিল।

দাশার পিছনে এসে দাঁড়ায় তেলেগিন। দম বন্ধ করে ওর উপর ঝুঁকে পড়ে। মনে হয় এখন একটি কথাও না বলে শুধু ওর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেওয়াই বোধ হয় সবচেয়ে সহজ কাজ। কিন্তু তেলেগিনের এগিয়ে আসা সত্ত্বেও দাশার কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, তার ঐ নিস্পন্দ দেহটা যে মৃতদেহ নয় তাই বা কে বলবে।

"দাশা, অমনভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?"

একমাস আগে দাশার একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, কিন্তু তিনদিনের বেশি বাঁচেনি ছেলেটি। অকাল প্রসব হয়েছিল, সাংঘাতিক একটা আঘাতের ফলে। 'ফিল্ড অব মার্স' দাশার উপর হঠাৎ চড়াউ হয়েছিল দু'জন অমানুষিক ধরনের লম্বা লোক, বাতাসে তাদের গায়ের চাদর উড়ছিল। ওরা নিশ্চয়ই সেই কুখ্যাত "লাফানে" গুন্ডা যারা পায়ে স্প্রিং বেঁধে ঘুরে বেড়াত। সেই ভয়ানক দিনগুলোতে সারা পেত্রোগ্রাদে আতংক জাগিয়ে তুলেছিল ঐ গুন্ডারা। দাশাকে দেখে প্রথমে তারা শিস্‌ কেটে দন্তবিকাশ করতে থাকে। দাশা মাটিতে পড়ে গেলে ওরা তার কোটটা ছিঁড়ে ফেলে, তারপর লাফাতে লাফাতে চলে যায় লেবিয়াঝি পুলের দিকে। কিছুক্ষণ মাটিতেই পড়েছিল দাশা। এমন সময় বৃষ্টি হতে থাকে তুমুল ধারায়। 'গ্রীষ্ম-উদ্যানের' নগ্ন লাইমগাছগুলো পাগলপারা হয়ে ডাল ঝাপটাতে থাকে। ফন্তান্‌কা নদীর ওপার থেকে যেন একটানা একটা চীৎকার ভেসে আসতে থাকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। অজাত শিশু প্রচন্ডভাবে লাথি ঝট্‌কাতে থাকে পৃথিবীতে প্রবেশলাভ করার দাবি জানিয়ে।

এমন তাড়া দিতে থাকে গর্ভের শিশুটি যে দাশা অবশেষে উঠে পড়ে। ত্রয়েত্‌স্কি পুল পার হয়ে যায়। লোহার রেলিং-এর গায়ে বাতাসে সেঁটে যায় দাশার দেহ, ভিজে পোশাক তার পা জড়িয়ে ধরে। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই, পথচারীও কেউ নজরে পড়ে না। পুলের অনেক নীচে বয়ে চলেছে নেভা নদীর কালো জলের উদ্দাম স্রোত। পুল থেকে নেমে আসতেই দাশা অনুভব করল প্রথম

যন্ত্রণা। বুঝল বাড়ী যাওয়া আর সম্ভব নয় তার পক্ষে, তাই এখন কোনো রকমে একটা গাছের নীচে আশ্রয় নিতে পারলে বাতাসের হাত থেকে অন্তত রক্ষা পাওয়া যায়। ক্রাস্‌নিয়ে জোরি স্ট্রীটে আসতেই একজন পাহারাওলা এসে রুখল তাকে। হাতে রাইফেল। ঝুঁকে পড়ে সে লক্ষ্য করল দাশার মড়ার মতো পাংশু চেহারাটা।

"হতভাগা পশুগুলো মেয়েটির কি হাল করেছে দেখ! তার ওপর আবার পোয়াতি!"

দাশাকে বাড়ী পেঁছে দিল সে, পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে এল সংগে সংগে। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দরজাটায় ঘা দিতেই তেলেগিন এসে আগল খুলল। দরজার ফাঁক দিয়ে তেলেগিন বাইরে যেই মাথাটি বের করেছে সংগে সংগে সৈন্যটি চীৎকার করে বলে উঠল ঃ

"ছি, ছি, এমন কাজ করেছেন? এইভাবে একজন ভদ্রমহিলাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন। রাতবিরেতে! রাস্তাতেই তো প্রসব হয়ে গিয়েছিল আর কি! যতোসব বুর্জোয়া বাবুর দল, শয়তানের ঝাড়!"

সেই রাতেই প্রসব বেদনা শুরু হল। ওদের ফ্ল্যাটটিতে এসে জুটল একটি বাচাল ধাই। একদিন একরাত পুরো লেগে রইল যন্ত্রণা। হবার সময় শিশুটির পেটে জল ঢুকে গিয়ছিল, তাই আধা দমবন্ধ অবস্থাতেই সে ভূমিষ্ঠ হল। চড়-চাপড় দিয়ে, রগড়ে, নাক ফুঁ দিয়ে কতোরকমভাবে চেষ্টা করা হল; অবশেষে মুখটা কুঁচকে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। ধাত্রীটি ছাড়বার পাত্রী নয়, কিন্তু এদিকে আবার শুরু হয়ে গেল কাশি। বিড়ালের বাচ্চার মতো ডুকরে ডুকরে কেবলই কাঁদতে লাগল শিশুটা; করুণ, নিস্তেজ সেই কান্না। মাইও খেতে চায় না। তারপর কান্না থেমে গেল বটে, কিন্তু কাশিটা চলল সমানে। অবশেষে তিনদিনের দিন সকালবেলায় দোলনায় হাত দিতেই দাশা শিউরে উঠে সরিয়ে নিল হাতখানা—ছোট্ট দেহটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি শিশুটিকে কোলে চেপে ধরে ওর মাথার কাপড়টা সরিয়ে দেখল। ছেলেটির ছুঁচলো মাথার উপর ফ্যাকাশে, পাতলা কয়েক-গাছি চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

আতংকে চীৎকার করে উঠল দাশা। বিছানা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ছুটে গেল জানলার দিকে—ভাঙতে হবে ওটা, লাফিয়ে পড়তে হবে নীচে, এ জীবন শেষ করে দিতে চায় সে......।

আর্তকণ্ঠে কেবলই সে চেঁচাতে লাগল : "আমিই মেরেছি ওকে, বাঁচাতে পারি নি! আর সহ্য করতে পারছি না!" ওকে সামলে রাখা তেলেগিনের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল, বিছানায় শুইয়ে দিতে গিয়ে রীতিমত হয়রান হয়ে উঠল সে। ক্ষুদ্র মৃতদেহটিকে যখন ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, দাশা বলল তার স্বামীকে ডেকে :

"ও যখন মারা যায় তখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম। ভাবো তো একটিবার—মাথার চুল একদম খাড়া হয়ে উঠেছিল বেচারির! একাই কষ্টটা সইল ও, একেবারে একা। আর আমি কিনা সে সময় ঘুমিয়ে কাটালাম!"

তেলেগিন এত করে বোঝানো সত্ত্বেও দাশা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারল না একটি কথা—তার ছেলেটা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গেছে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, একা একা।

স্বামীকে জবাব দেয় দাশা, "বেশ তো, এ নিয়ে আর কিছু বলব না কখনো।" তেলেগিনের ওই যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানো কথাগুলো সে আর শুনতে চায় না, স্বামীর ওই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রক্তিম মুখটার দিকে তাকাতে ভালো লাগে না দাশার—কোনো দুঃখবেদনাই সে-মুখের সদাতুষ্ট ভাবটিকে বিচলিত করতে পারবে না।

এই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যেই তেলেগিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা শহর ঘুরে বেড়াতে পারে এটা-সেটা কাজকর্ম, খাবার, জ্বালানিকাঠ ইত্যাদির ধান্দায়, শুধু একজোড়া ছেঁড়া গালোশ্ জুতো পায়ে দিয়ে। দিনে কতবারই তো সে বাড়ীর দিকে ছুটে আসে। সব সময়ই একটা উৎকণ্ঠা আর দরদের ভাব নিয়ে।

কিন্তু ঠিক এই দরদ আর সেবার প্রয়োজনটাই এখন ফুরিয়ে গেছে দাশার কাছে। ইভান ইলিয়িচ যতোই কাজের ভীড় বাড়িয়ে তুলছে, দাশাও যেন ততোই দূরে সরে যাচ্ছে, সে-ব্যবধান ঘুচবার আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে। ঠান্ডা ঘরটায় সে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে, ওইটাই যা স্বস্তি। কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে সে যখন চোখের উপরে হাত বুলিয়ে নেয়, তখন বেশ তাজাই মনে হয় নিজেকে। তারপর কোন এক সময় রান্নাঘরের দিকে চলে যায়, মনে পড়ে ইভান ইলিয়িচ কী যেন করতে বলে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু একেবারে সহজ কাজগুলো করাও এখন তার পক্ষে সাধ্যাতীত। জানলার উপরে ঝিরঝিরিয়ে পড়ে নভেম্বরের বৃষ্টির ছাঁট। পিতার্সবুর্গের উপর দিয়ে সোঁ-সোঁ করে পাগলা হাওয়া বয়ে যায়। আর এই ঠান্ডায়, সমুদ্রের ধারের ওই গোরস্থানে বিশ্রাম করে তার ছেলের ছোট্ট মৃতদেহটি—একটিবার কেঁদে কঁকিয়ে নালিশও জানাতে পারে নি বেচারা!......

ইভান ইলিয়িচ বোঝে যে দাশা এখন মানসিকভাবে অসুস্থ। বিজলী বাতি নিবে গেলেও তার কিছু আসে যায় না, চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে যেমন ছিল তেমনি বসে থাকে, মাথায় শালটা মুড়ি দিয়ে। নিশ্চুপ হয়ে নিজের গভীর বেদনায় সে মগ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনে তো বাঁচতে হবে......বাঁচা যে একান্ত দরকার...। মস্কোতে কাতিয়ার কাছে লিখেছিল তেলেগিন দাশার কথা জানিয়ে, কিন্তু নিশ্চয়ই চিঠিগুলো তার হাতে পড়ে নি, না হলে জবাব আসতো নিশ্চয়ই। হয়তো কাতিয়ার নিজেরই কোনো বিপদ ঘটে থাকবে। যা কঠিন দিনকাল পড়েছে।

দাশার পিছনে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে ইভান ইলিয়িচ একটা দেশলাইয়ের বাক্স মাড়িয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে ব্যাপারটা—যতক্ষণ আলো ছিল না, দাশা নিশ্চয়ই একের পর এক দেশলাই জ্বালিয়ে লড়াই করেছিল অন্ধকারের সাথে, প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল নিঃসঙ্গতা দূর করতে। 'আহা, বেচারী! সারাদিনটা একা একাই কাটিয়েছে!'—ভাবল তেলেগিন।

সাবধানে বাক্সটা তুলে নিল সে। এখনও কয়েকটা কাঠি রয়েছে ভেতরে।

রান্নাঘর থেকে সে টেনে আনল টুকরো কাঠ। সকালবেলায়ই সেগুলো চেলা করে রাখা হয়েছিল। কাপড়-চোপড়-রাখা পুরনো আলমারির শেষ স্মৃতিচিহ্ন ওগুলো—সাবধানে করাত চালিয়ে কাটা। পড়ার ঘরে হাঁটু মুড়ে বসল তেলেগিন। ছোট ইটের উনোনটা থেকে লোহার একটি বাঁকা নল বেরিয়ে সিধে ঘরের মধ্যে চলে গেছে। উনোনটা ধরাবার চেষ্টা করল সে। ভাঙা কাঠের টুকরোগুলো থেকে ভারী চমৎকার ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছিল। চুল্লীর দরজার মুখটা ঘিরে খাঁজকাটা নকশা, এক দমক বাতাস কেঁদে গেল তার অন্ধিসন্ধিগুলোর ভেতর দিয়ে। আস্তে আস্তে একটা গোলাকৃতি আলোর কম্পিত রেখা ফুটে উঠল ছাদের গায়ে।

ঘরে-তৈরি এই উনোনগুলোকে পরে নাম দেওয়া হয়েছিল 'বুর্জোয়া'। কেউ কেউ আবার বলত 'ভোমরা'। এ নামগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। 'সামরিক কমিউনিজমের' যুগে এ-গুলো পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের সেবা করে এসেছে। এর চেয়েও সহজ এক ধরনের চুল্লী ছিল—লোহার তৈরি, চারপেয়ে। রান্নার জন্য খালি একটা মুখ রাখা হত তাতে। কিংবা তেমন প্রয়োজন হলে অনেকে আবার এর সঙ্গে ওভেনেরও বন্দোবস্ত করত, কফির মণ্ড দিয়ে পিঠে তৈরি করার সুবিধে হত তাতে, এমন-কি শুকনো নোনা মাছের 'পাই' পিঠেও ভাজা চলত। কতক-গুলো আবার ছিল একটু বেশি কায়দা-কানুন করা, ফায়ারপ্লেস থেকে টালি খুলে নিয়ে তৈরি করা হত সেগুলো। এই সবগুলো চুল্লীতেই কিন্তু আগুন পোয়ানো আর রান্নার কাজ চলতো একসঙ্গে। বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনের সঙ্গে তাল রেখে ঘরে ঘরে এই চুল্লীগুলোও গেয়ে চলত অনাদিকালের অগ্নি-স্তোত্র।

আগের দিনের মতোই লোকে জ্বলন্ত চুল্লীগুলো ঘিরে গোল হয়ে বসে ঠাণ্ডা হাত-পায়ের আঙুল তাতিয়ে নিত, আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো কখন কেতলির ঢাকনাটা বাষ্পের ধাক্কায় নাচতে শুরু করবে। কী আলাপ-আলোচনা চলত তাদের মধ্যে তা অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ লিখে রেখে যায় নি। ভাঙা আরাম-কেদারা কাছে টেনে নিয়ে, কাঁধে কিংবা হাঁটুতে শাল চাপিয়ে, ফেল্টবুটের মধ্যে পা ঢুকিয়ে, গালে দাড়ির জঙ্গল-গজানো অধ্যাপকের দল তাদের সেরা সেরা বইগুলো লিখতেন। প্রেম আর বিপ্লবের কাব্য রচনা করতেন কবিরা; না খেতে পেয়ে তাদের গায়ের চামড়া স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। চক্রান্তকারীর দল গোল হয়ে বসে জটলা করত একেবারে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে, নতুন নতুন খবর নিয়ে ফিস্‌ফিসানি চলত তাদের মধ্যে। একটার পর একটা খবর আসতো, আগের চেয়েও সাংঘাতিক, আগের চেয়েও চমকপ্রদ। বাড়িভর্তি আসবাবপত্র বিপ্লবের এই কটা বছরে লোহার চিমনি বেয়ে একেবারে ধোঁয়া হয়ে উপে গিয়েছিল।

নিজের চুল্লীটার জন্য ইভান ইলিয়িচের অসীম দরদ। কাদা দিয়ে ফাটল বুজিয়ে চিমনির নিচে পুরনো টিন ঝুলিয়ে দিল যাতে ঝুলকালিগুলো মেঝেয় না পড়ে টিনগুলোর মধ্যে পড়ে। কেতলির জল যখন ফুটতে শুরু করল পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে বেশ খানিকটা চিনি তা থেকে ঢেলে নিল গেলাসের মধ্যে। অন্য পকেট থেকে সে বের করল একখানি লেবু। কেমন করে যে

সেটা তার হাতে এল সে এক তাজ্জব ব্যাপার (নেভ্‌স্কি প্রসপেক্টের একজন পঙ্গু সৈন্য একজোড়া দস্তানার বদলে ঐ জিনিসটি দিয়েছে তাকে)। এক কোয়া লেবুর সঙ্গে মিষ্টি এক গেলাস চা তৈরি করে তেলেগিন এগিয়ে দিল দাশার সামনে।

"এই যে দাশা—একেবারে লেবু দিয়ে তৈরি। আচ্ছা, 'ঘোড়ার ঠুলিটা' জেবলে দিচ্ছি এখ্‌খুনি।"

টিনের কৌটর মধ্যে সূর্যমুখী-বিচির তেলে সল্‌তে ডুবিয়ে যে বাতিটা তৈরি করা হয়েছে তারই নাম হল 'ঘোড়ার ঠুলি'। ইভান ইলিয়িচ সেটা ভেতরে নিয়ে আসতেই একটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে।

দাশা এখন চেয়ারের উপর ভাল হয়ে গুছিয়ে বসে চা খাচ্ছে। হৃষ্টমনে তেলেগিন তার পাশটিতে বসে পড়ে।

"বল তো দেখি আজ কার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার? ভাসিলি রুব্‌লেভ! মনে আছে সেই রুব্‌লেভদের কথা? সেই যে গো, আমার কারখানায় কাজ করতো বাপ আর ছেলে? আমার সঙ্গে ওদের বেজায় দোস্তি ছিল। বাপটার নজর ছিল চোখা, অর্ধেক মন তার পড়ে থাকতো গাঁয়ের দিকে, অর্ধেক কারখানায়। ভারী অদ্ভুত ধরনের লোক! আর ভাসিলি তো সেই তখন থেকেই বলশেভিক। চালাক ছেলে, কিন্তু মাথায় ফোঁড়াওলা ভালুকের মতো একটু যা তিরিক্ষি মেজাজ। ফেব্রুয়ারি মাসে সে-ই তো প্রথম মজুরদের নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। বাড়ী বাড়ী চিলে-কোঠায় উঠে সে পুলিশের লোক খুঁজে বেড়াতো। শুনেছি আধ-ডজন পুলিশকে নাকি সাবাড়ও করছিল নিজের হাতে। অক্টোবর বিপ্লব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও এখন বিরাট লোক হয়ে গেছে। যাই হোক, ওতে আমাতে তো অনেক কথাই হল।......কি, শুনছ না দাশা?"

"শুনছি তো"—জবাব দিল সে।

শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রেখে হাতের তেলোর চিবুক ঠেকিয়ে দাশা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বাতিটার চঞ্চল শিখার দিকে। তার ধূসর চোখের তারায় সারা দুনিয়ার সব কিছুর সম্পর্কে একটা গভীর ঔদাসীন্যের চিহ্ন। মুখটা প্রলম্বিত, গায়ের পাতলা চামড়া কেমন যেন স্বচ্ছ। একসময় স্বাধীন উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে উঁচিয়ে থাকতো যে-নাকটা এখন তা কেমন যেন পাতলা আর শীর্ণ দেখাচ্ছে।

"ইভান", বলল সে (খুব সম্ভব চা আর লেবুর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে)—"দেশলাই খুঁজতে গিয়ে বইয়ের আড়ালে এক বাক্স সিগারেট পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করলে তুমি......"

"সিগারেট! ওঃ দাশা, কতোকালের প্রিয় জিনিস যে ওগুলো আমার!"

ইভান ইলিয়িচ খুশির মাত্রাধিক্য দেখিয়ে ফেলল একটু, অথচ অসময়ে কাজে দেবে বলে সে নিজেই ওই সিগারেটগুলো বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। যাই হোক, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে আড়চোখে চেয়ে দেখল দাশার নিষ্প্রাণ অবয়ব-রেখার দিকে। নাঃ, ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে কোথাও,...অনেক দূরে, দক্ষিণের দিকেই কোথাও—ভাবল সে। "বুঝলে দাশা, ভাসিলি রুব্‌লেভের সঙ্গে তো আমার

অনেক আলাপ হল—ও আমাকে অনেক সাহায্যও করল। আমার বিশ্বেস হয় না বলশেভিকরা অত সহজে হাওয়ায় মিলিয়ে যবে। রুবলেভের মতো মানুষদের মধ্যেই তো ওরা শিকড় গেড়ে রয়েছে। জানিনা কথাটা তোমার কাছে পরিষ্কার হল কিনা। এটা সত্যি কথা যে ওরা কেউই নির্বাচিত হয় নি, যে-কোনো মুহূর্তেই হয়তো ওরা ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে, আর ওদের ক্ষমতাও পেত্রোগ্রাদ, মস্কো আর মফঃস্বলের কয়েকটা বড়ো বড়ো শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ওদের শক্তির মন্ত্রগুপ্তিটা কি জানো?—ওদের ক্ষমতার একটা বিশেষ গুণ রয়েছে যেটা ভারে না কাটলেও ধারেই কাটে। আর ভাসিলি রুবলেভের মতো লোকদের হাতেই ওদের এই ক্ষমতার শক্ত বাঁধুনি। এত বড়ো দেশটার তুলনায় অবশ্য সংখ্যা হিসাবে বেশি নয় ওরা। কিন্তু ওদের রয়েছে একটা জিনিস, সেটা হল বিশ্বাস। পাগলা জানোয়ার লেলিয়ে দিয়ে ওদের ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে পারো, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারো ওদের, কিন্তু তবু ওরা গাইতে থাকবে 'ইণ্টারন্যাশনাল', সমান তেজে, সমান দৃঢ়তার সঙ্গে।......"

একটা নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বজায় রেখে চলে দাশা। ইভান ইলিয়িচ একবার খুঁচিয়ে দেয় আগুনটা। চুল্লীর দরজাটার সামনে বসে বলে :

"জানো কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছি আমি। একটা না একটা পক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে। কখন কি ঘটে সেই অপেক্ষায় শুধু বসে থাকলে তো আর চলবে না, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করাটা রীতিমত লজ্জার ব্যাপার। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ আমি, কোনোরকম ধ্বংসমূলক কাজও করি নি......সাফ কথা হল, আমি কিছু একটা করতে চাই......"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাশা। শক্ত করে বোজা চোখের দুটো পাতার মাঝখান থেকে ধীরে গড়িয়ে পড়ে এক ফোঁটা জল। ইভান ইলিয়িচ জোরে নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

"আগে অবশ্য তোমার ব্যবস্থাটাই আমাদের সেরে নিতে হবে দাশা। বাঁচার মতো জোর আনতে হবে তোমার মনে—সব রকম উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে হবে মন থেকে। এখন যে-ভাবে তুমি বেঁচে আছ ওটা কোনো বাঁচাই নয়। এ হল শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া।"

'ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া' কথাটার উপর অনিচ্ছাকৃত বিরক্তির সঙ্গেই একটু জোর দিয়ে ফেলে ইভান ইলিয়িচ। জবাবে দাশা ছেলেমানুষের মতো ফুঁসিয়ে ওঠে একটু :

"আমি যে তখন মারা যাই নি সে কি আমার দোষ? আর এখন আমি তোমার আপদ এসে জুটেছি। লেবু এনে দিয়েছ আমায়......আমি তো চাই নি তোমার কাছে......"

নাঃ, ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই—ভাবে ইভান ইলিয়িচ।

ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পায়চারি করতে শুরু করে সে। মাঝে মাঝে জানলার সামনে থেমে ধোঁয়াটে কাচটার উপর টোকা দিতে থাকে আঙুলের ডগা

দিয়ে। বাইরে ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে খেয়ে যায় তুষার, গোঁ গোঁ করতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া, প্রচণ্ড বাতাস যেন দুর্দম বেগে কালের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে চলে, যেন সুতীব্র গতিতে আকুল হয়ে ছুটে যেতে চায় ভবিষ্যতের দিকে—নানা অভূতপূর্ব ঘটনার বার্তাবহরূপে।

'ওকে কি তাহলে বাইরে পাঠিয়ে দেব?'—ভাবে ইভান ইলিয়িচ, 'সামারায় ওর বাপের কাছে পাঠালে কেমন হয়? সবই যেন বড়ো কঠিন হয়ে উঠেছে! কিন্তু যাই হোক্, এভাবে দিন কাটালে তো চলবে না আমাদের।'

রুশ্‌চিনকে সঙ্গে নিয়ে দাশার বোন কাতিয়া সামারায় তার বাপের কাছে এসেছে। রশ্‌চিন এখন কাতিয়ার স্বামী। সামারায় ওরা নিশ্চিন্তে শান্তিতে কাটিয়ে দেবে বসন্তকাল পর্যন্ত, খেতে বসে প্রত্যেকটা গ্রাস গিলবার সময় আর হিসেব করে দেখতে হবে না কুলোবে কিনা। বসন্তকালের আগেই অবশ্য বলশেভিকরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ডাঃ দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্ বুলাভিন তো এর মধ্যে তারিখটাও নির্ধারণ করে ফেলেছেন—বরফ যখন গলতে শুরু করবে আর পথঘাট দুর্গম হয়ে উঠবে, ঠিক সেই রকম একটা সময়ে, জার্মানরাও গোটা রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ শুরু করবে। রুশ ফৌজের হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা নাকি রণাঙ্গন অঞ্চলে মিটিং করছে আজকাল, সৈন্যদের কমিটিগুলো নাকি বৃথাই চেষ্টা করছে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, বিশ্বাসঘাতকতা আর পাইকারিহারে দলত্যাগের মধ্যে তাদের নতুন ধরনের বিপ্লবী শৃঙ্খলাবোধ চালু করার।

এই ক'বছরে দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্ যেন বুড়িয়ে গেছেন অনেকটা। যথেষ্ট ধকল গেছে তাঁর উপর দিয়ে, আর ক্রমেই যেন আরো বেশি করে রাজনীতির অনুরক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। মেয়ের আসাতে তিনি খুশিই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রশ্‌চিনকে নিয়ে লেগে গেলেন রাজনীতি শেখাতে। খাবার ঘরটায় তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন সামোভারের পাশে, বড়ো-সড়ো টোল খাওয়া পাত্রটায় এককালে গোটা এক-পুকুর জল ফোটানো চলতো; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি পোক্ত হয়ে উঠেছে ওটা—শুধু এক মুঠো কাঠকয়লা ফেলে দিলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে সামোভারের অনন্ত শোঁসানি। মফঃস্বল শহরের একটানা সঙ্গীত হল এই সামোভারের কল-গুঞ্জন। দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্ নিজেও খানিকটা স্থূল আর ভোঁতা ধরনের হয়ে গেছেন। বাক্স থেকে টেনে বার করা পুরনো গন্ধ-জড়ানো পোশাক তার গায়ে, মাথার পাকা চুলে জট ধরেছে। দুর্গন্ধ সিগারেটের ধোঁয়া টেনে মুখ লাল করে কাশছেন আর হরদম বক্‌বক্ করে চলেছেন দ্‌মিত্রি।

"আমাদের কতকালের এই সাধের দেশটা ছারখার হয়ে গেল......যুদ্ধে হেরে গেলাম......না কর্নেল, আমি তোমাকে খোঁচা দিয়ে বলি নি কথাটা! উনিশ শো পনের সালেই আমাদের শান্তি চুক্তি করে ফেলা উচিত ছিল।......জার্মানদের শাসন আর শিক্ষার কাছে মাথা নত করাই উচিত ছিল আমাদের। তা হলে বরং

কিছু শিখতে পারতাম ওদের কাছ থেকে, আমাদের এ জাতটার কাছে কিছু আশা করা যেত তাহলে। কিন্তু এখন তো সবই শেষ......ওই যে বলে না ডাক্তাররা— 'এ-রকম কেসে ডাক্তারী বিদ্যা অচল'? এখন হয়েছে তাই।...তুমি কি যা-তা বলছ! হাতিয়ার কোথায় যে যুদ্ধসজ্জা করব—তিন-কাঁটাওয়ালা উকন-ঠ্যাঙা দিয়ে? এই বছরেই জার্মানরা গোটা দক্ষিণ আর মধ্য এলাকা দখল করে ফেলবে, আর জাপানীরা দখল করবে সাইবেরিয়া, দেখে নিও। আমাদের মুঝিকরা তখন তাদের বিখ্যাত উকন-ঠ্যাঙা হাতে নিয়ে পালিয়ে দিশা পাবে না, উত্তর মেরুর ঐ তুন্দ্রা অঞ্চলে খেদিয়ে দেওয়া হবে তাদের। তারপর,—শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি, ভক্তিশ্রদ্ধা সব আবার ফিরে আসবে দেশে। তখন আবার আমরা প্রাণভরে বলতে পারব—'রুশদের দেশ'। আর আমি? আমি তখন কী খুশিই যে হব!"

এককালের পুরনো উদারনৈতিক দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্; যে-সব বস্তুকে একসময়ে তিনি পূতপবিত্র জ্ঞান করতেন আজ তাকেই তিনি তিক্ত বিদ্রূপের কশাঘাতে উপহাস করছেন। নিজের বাড়ীটার উপরেও ছাপ পড়েছে তাঁর এই আত্ম-ধিক্কারের। ধুলি-ধুসর জানলাওয়ালা কামরাগুলোতে ঝাঁট পড়ে নি কখনও, কতকাল সাফ হয় নি কে জানে! তাঁর পড়ার ঘরে মেন্দেলিয়েভের* যে ছবিখানা টাঙানো ছিল, সেটার উপর পড়েছে মাকড়সার জালের ঘন পর্দা, টবের মধ্যে গাছগুলো সব শুকিয়ে গেছে, বই, কার্পেট, ছবি ইত্যাদি সোফার নিচের বাক্সটার মধ্যেই পড়ে রয়েছে ঠিক যেমনটি ছিল তিন বছর আগেও—সেই দাশা যখন বেড়াতে এসেছিল বাপের কাছে, ১৯১৪ সালে।

সৈনিক ও শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোবিয়েত যখন সামারায় ক্ষমতা দখল করে সে-সময় বেশির ভাগ ডাক্তারই গররাজী হলেন সেপাই আর ইতর জনতার এই প্রতিনিধিদের হয়ে কাজ করতে। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌কে পৌর হাসপাতালগুলোর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হল। তাঁর নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী যেহেতু বসন্তকালের আগেই জার্মানরা সামারায় এসে পড়বে, তাই তিনি পদটি গ্রহণ করলেন। ওষুধপত্র পাওয়া দুষ্কর, আর দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌ও জোলাপ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ বাতলাতেন না কাউকে। 'সব গণ্ডগোলের মূল হল কোষ্ঠ অপরিষ্কার'—সহকর্মীদের বলতেন তিনি চিড়-ধারা প্যাঁশ্‌নের আড়াল দিয়ে ওদের দিকে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যভরা তির্যক দৃষ্টি হেনে। "যুদ্ধের সময় লোকে কোষ্ঠের যত্ন নিত না। বাবুদের এই হাঁক-ডাকওয়ালা ছন্নছাড়া মেজাজের গোড়ার কারণ যদি খুঁজে বার করতে চান তবে দেখবেন সব কিছুর মূলে রয়েছে কোষ্ঠ-কাঠিন্য। হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, নিয়মিত এবং পাইকারি হারে জোলাপের প্রয়োগই একমাত্র......"

---

*দ্মিত্রি ইভানোভিচ্ মেন্দেলিয়েভ (১৮৩৪-১৯০৭) বিখ্যাত রুশ রসায়নবিৎ, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুপ্রসিদ্ধ। 'পিরিয়ডিক' সূত্র এবং 'পিরিয়ডিক সিস্টেমের' আবিষ্কর্তা।

চায়ের টেবিলে বসে এই সব কথা শুনতে শুনতে রশ্‌চিনের মনে একটা বেদনাময় অনুভূতি জেগে ওঠে। পয়লা নভেম্বর মস্কোর রাস্তায় লড়াই করতে গিয়ে সাংঘাতিক জখম হয়েছিল সে, এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠে নি। সরকারী ক্যাডেট দলের একটি কোম্পানীর অধিনায়ক হিসেবে সে নিকিৎস্কি ফটকের প্রবেশ-পথ রক্ষা করছিল। বলশেভিকদের পক্ষে লড়াই করতে করতে স্ত্রাৎস্‌নাইয়া স্কোয়ারের দিক থেকে এগিয়ে আসছিল সাবলিন। রশ্‌চিন ওকে ভালো করেই চিনত—মস্কোর স্কুলের সেই দেবদূতের মতো ছাত্রটি, চোখ দুটো তার নীল আর কথায় কথায় সে লাল হয়ে উঠত। রশ্‌চিন বিশ্বাস করতে পারে নি মস্কোর একটি বনেদী পরিবারের ছেলে হয়ে সে কেমন করে অমন একটা হিংস্র বলশেভিক কিংবা বামপন্থী সোশালিস্ট-রেভোল্যুশনারিতে (নিজেদের ওরা যে-আখ্যাই দিক না কেন) পরিণত হল! কাঁধে রাইফেল নিয়ে কেমন গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছিল সে ৎভের্‌স্কয় বুলভারের লাইম গাছগুলোর আড়াল দিয়ে—অথচ কবি পুশ্‌কিনের প্রশস্তি-ধন্য এই বুলভারটাতেই সাবলিন নিজে একসময় ব্যাকরণের বই বগলে গুঁজে গম্ভীরচালে হেঁটে বেড়াত। 'রাশিয়া আর তার ফৌজের প্রতি বেইমানি করে দেশটাকে তুলে দিচ্ছ জার্মানদের হাতে। একটা উন্মত্ত পশুকে ছেড়ে দিচ্ছ রাশিয়ার বুকের ওপর।—এর জন্যই তো তুমি লড়াই করছ, মিঃ সাবলিন! তোমার ওই ইতর সাঙ্গপাঙ্গগুলোকে না-হয় ক্ষমা করা যায়, কাদা-ঘোঁটা শুয়োর ওগুলো, কিন্তু তুমি কি বলে......?' রশ্‌চিনের নিজের হাতে ছিল একটা মেশিনগান। মালায়া নিকিৎস্কায়ার এক কোণে চিচ্‌কিন ডেয়ারীর সামনে খোঁড়া হয়েছিল ওদের পরিখা। লম্বা কোট গায়ে সাবলিনের পাতলা দেহটা যখন আর একবার উঁকি দিল গাছের আড়াল থেকে, রশ্‌চিন তাকে বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিল। সাবলিনের হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল, হাঁটু চেপে ধরে সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা গোলা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল রশ্‌চিনের টুপি। জখম হয়ে গেল সে নিজেই।

রাস্তার লড়াই চলছিল সমানে। সপ্তম রাতে মস্কো একেবারে ঘন হলদে কুয়াশায় ডুবে গেল। কামানের গোলার একটানা আওয়াজ সেদিন স্তব্ধ। সরকারী ক্যাডেট দল, ছাত্র আর কর্মচারীরা টুকরো টুকরো দলে ভেঙে গেছে; তারাই মাঝে মাঝে যা-একটু এলোপাথাড়ি গুলি চালায়, কিন্তু ওদের সেই "জন নিরাপত্তা কমিটি" আর তার পরিচালক জেমৎস্‌ভোর ডাক্তার রুদ্‌নেভ, এদের আর কোনো অস্তিত্বই তখন খুঁজে পাওয়া গেল না। বিপ্লবী কমিটির সৈন্যরা তখন মস্কো দখল করে নিয়েছে। পরের দিনই দেখা গেল বেসামরিক পোশাক-পরা যুবকদের দল রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে, কাঁধে তল্পিতল্পা নিয়ে তারা কুর্‌স্ক আর ব্রিয়ান্‌স্ক রেল-স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটা অলক্ষুণে ভাব ফুটে উঠেছে ওদের চোখে মুখে। ওদের পায়ে যদিও সামরিক পট্টি আর ঘোড়সওয়ারের বুট, তবু কেউ রুখছিল না ওদের।

আহত হয়ে রশ্‌চিনও অবশ্য চলে যেত। সামান্য পক্ষাঘাতের ভাব দেখা

দিয়েছে, সেই সঙ্গে সাময়িক দৃষ্টিহীনতা এবং হৃৎপিণ্ডের উপসর্গও আছে। সে অপেক্ষায় আছে কখন প্রধান সদর দপ্তর থেকে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে একদল সৈন্য, আর ভরোবিভয় পাহাড় থেকে ক্রেমলিনের দিকে ছুঁড়তে শুরু করবে গুলি-গোলা। কিন্তু বিপ্লব তো সবে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসছে। কাতিয়া তার স্বামীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল মস্কো ছেড়ে চলে যাবার জন্য, কিছুদিন অন্তত ভুলে থাকা যাক বলশেভিক আর জার্মানদের কথা। পরে না হয় দেখা যাবে।...

ভাদিম পেত্রোভিচ্ মেনে নিল স্ত্রীর কথা। সামারায় এসে একবার আস্তানা গাড়বার পর সে আর ডাক্তারের বাড়ী ছেড়ে মোটে বেরুতেই চায় না। খায়দায় ঘুমায়, কিন্তু ভুলবে কেমন করে? রোজ সকালে উঠে সে 'সামারা সোবিয়েত নিউজ' পত্রিকাটা খুলে বসে, কিন্তু মোড়ক-জড়ানো বাজে কাগজে ছাপা ঐ পত্রিকাখানা দেখে যেন সে দাঁতে দাঁত চেপে থাকে—প্রত্যেকটা লাইন যেন চাবুকের জ্বালা ধরিয়ে দেয় দেহে।......

"কৃষক প্রতিনিধিদের সোবিয়েতসমূহের এই সারা-রুশীয় কংগ্রেস জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সমস্ত কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিকদের নিকট আবেদন জানাইতেছে যেন তাঁহারা নিজ নিজ গভর্নমেণ্টের সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেন।...ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালির সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর নিকট আমাদের আবেদন তাঁহারা যেন সমস্ত দেশের সহিত এখনই ন্যায্য এবং গণতন্ত্র-সম্মত শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজ দেশের রক্তপিপাসু সরকারগুলির উপর শক্তি প্রয়োগ করেন।...সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিপাত যাক্! সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জিন্দাবাদ।"

"ভুলে যেতে হবে, কাতিয়া! নিজেকেই ভুলে যেতে সবার প্রথম! ভুলে যেতে হবে স্মরণাতীত অতীতকে! ভুলতে হবে আমাদের প্রাচীন গৌরবকে!... এই সেদিনও, এক শতাব্দীও হয় নি, সারা ইউরোপের উপর রাশিয়ার মর্জি কায়েম হয়েছিল।...আর আজ আমরা কি-না জার্মানির পায়ের তলায় সঁপে দিচ্ছি আমাদের যা-কিছু সব? শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব! ওঃ, কী একখানা কথা! মূর্খ! একেবারে রাশিয়ান-মার্কা নির্বুদ্ধিতা! মুঝিক্? ঐ গর্দভ মুঝিক্গুলো! কড়ায় গণ্ডায় ওদের শুধতে হবে এই সব বোকামির মাশুল......"

"না দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ"—চায়ের টেবিলে ডাক্তারের অনর্গল বক্তৃতার জবাবে বলে ওঠে রশ্চিন—"রাশিয়ার শক্তি এখনও ফুরিয়ে যায় নি।......আমরা মরি নি এখনও...আপনার ওই জার্মানদের পায়ের নিচে গড়াবো না আমরা নেহাত... এখনও তাকত আছে আমাদের! রাশিয়াকে রক্ষা করব, আমৃত্যু লড়াই করে বাঁচাব দেশকে।......শুধু একটু সময় চাই!"

সামোভারটাকে ঘিরে যারা বসে ছিল তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হল কাতিয়া। ওদের তর্কযুদ্ধের মধ্যে থেকে একটা কথাই ধরতে পারছিল সে—তার আদরের রশ্চিনের মনে সুখ নেই। যেন ধীরে ধীরে একটানা একটা কষ্টভোগ করে যাচ্ছে সে। ছোট

করে চুল-ছাঁটা গোল মাথাটায় রুপোলি ছোপ ধরেছে। কালিপড়া বসা-চোখে তার ঐ শুকনো মলিন মুখখানা পোড়াকাঠের মতো দেখায়। ছেঁড়া অয়েলক্লথটার উপর যখন সে সজোরে ঘুঁষি মেরে বলে 'আমরা এর শোধ তুলব। চরম শাস্তি দেব' তখন কাতিয়ার কিন্তু মনে হয় ও যেন আসলে একটা নিষ্ফল, অক্ষম ক্রোধ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে আর মাঝে মাঝে কারুর উদ্দেশে ধমকানি লাগাচ্ছে : 'দাঁড়াও না, দেখে নেব!' কিন্তু রশ্‌চিন যেমন ভদ্রলোক, ঐরকম একটা দুর্বল আর ভয়ংকর কাহিল মানুষের পক্ষে কার ওপর শোধ নেয়া সম্ভব? নিশ্চয়ই ওই রাশিয়ান সৈন্যগুলোর উপর নয় যারা এই ঠাণ্ডায় রাস্তায় রাস্তায় রুটির টুকরো আর সিগারেট মেগে বেড়াচ্ছে? কাতিয়া ওর স্বামীর পাশে আলগোছে বসে তার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দেয়। স্বামীর জন্য ওর মনটা বড়ো কোমল হয়ে ওঠে, একটা করুণার ভাবে আচ্ছন্ন হয় বুক। মন্দ কাকে বলে সে ধারণাই নেই কাতিয়ার—যখন অন্যের মধ্যে মন্দ খুঁজে পায় তখন সে নিজেকেই দুষতে থাকে।

কী যে সব ঘটে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই কাতিয়ার। ওর কাছে বিপ্লবটা যেন গভীর অন্ধকার এক ঝড়ের রাত্রির মতো রাশিয়ার বুকের ওপর নেমে এসেছে। তবে কয়েকটা শব্দকে ও বেজায় ভয় পায় : 'সোব-ডেপ্‌' (ডেপুটিদের সোবিয়েত) কথাটাকে মনে হয় একটা বিকট হিংস্র কিছু; 'রেভ্‌-কম্‌' (বিপ্লবী কমিটি) কথাটা যেন ভয়ংকর একটা ষাঁড়ের মতো ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে গর্জন করে তেড়ে আসছে বাগানের বেড়া ভেঙে ছোট্ট কাতিয়ার দিকে (এমন একটা ব্যাপার সত্যিই সত্যিই ঘটেছিল ওর ছেলেবেলায়)। খবরের কাগজটার বাদামী পাতাখানা খুলে যখন সে পড়ে ঃ 'ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ লুণ্ঠনের মতলব লইয়া তাহার হিংসা-লোলুপ মিত্রবর্গের সহিত......' ইত্যাদি, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভেসে ওঠে প্যারিসের ছবি,—গ্রীষ্মের সেই নিঃশব্দ নীলাভ কুয়াশায় ঢাকা প্যারিস, ম্যানিলার সৌরভে স্নিগ্ধ সেই বিষণ্ণতার আমেজ, শহরের পয়োপ্রণালীগুলোতে জলের কলকল শব্দ; তার মনে পড়ে সেই অপরিচিত লোকটির কথা যে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে অবশেষে পার্কের একটা বেঞ্চে বসে তাকে বলেছিল তার মৃত্যুর একদিন আগে : "আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই তোমার। আমার অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস্‌ হয়েছে। তা ছাড়া বুড়োও হয়ে পড়েছি। বিরাট এক দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে আমার উপর—তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি! আহা, কি চমৎকার মিষ্টি মুখখানি তোমার!"

নাঃ, ওরা কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে না!—ভাবে কাতিয়া।

শীত প্রায় শেষ হয়ে এল। শহরে নানারকম গুজব। আজ যা শোনা যায় কাল হয়তো শোনা যাবে তার চেয়েও চমকপ্রদ কিছু। ফরাসী আর ইংরেজরা নাকি জার্মানির সঙ্গে গোপনে শান্তি-চুক্তি করেছে, যুক্ত বাহিনী নিয়ে রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়াই ওদের মতলব। কর্নিলভের বীরত্বের কাহিনী ফলাও হয়ে প্রচারিত হয়—কর্নিলভ নাকি মুষ্টিমেয় একদল সৈনিক নিয়ে লালরক্ষীবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের ব্যাটালিয়ন ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে, কসাক-গ্রামগুলো তারা

দখল করছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে কাজে লাগবে না বলে; ওরা নাকি গ্রীষ্মকালে মস্কোর উপর একটা ব্যাপক ধরনের আক্রমণ চালাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

রুশ্‌চিন বলে ঃ "উঃ কাতিয়া! এমন জোর লড়াই চলছে আর এই সময় আমি কিনা পায়ে পা দিয়ে বসে। আর সহ্য হয় না কাতিয়া, সহ্য হয় না!"

চৌঠা ফেব্রুয়ারি এক বিরাট জনতা ডাক্তারের বাড়ীর জানলার পাশ দিয়ে মিছিল করে গেল ফেস্টুন আর পতাকা উড়িয়ে। দারুণ বরফ পড়ছিল। তুষার-ঝড় শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই পেতলের ব্যান্ডগুলো মুখর হয়ে উঠল 'ইন্টার-ন্যাশনাল' গানে। খাবার ঘরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে সশব্দে ঢুকে পড়েন ডাক্তার। কোট টুপি বরফে ঢেকে গেছে।

"জার্মানদের সঙ্গে শান্তি হয়ে গেছে, বুঝেছ হে!"

ডাক্তারের চওড়া চক্‌চকে মুখখানার দিকে নীরবে চেয়ে থাকে রুশ্‌চিন। চেহারাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা ধূর্ত দম্ভের ভাব। তার ঐ অবজ্ঞাভরা গর্বের হাসি দেখে রুশ্‌চিন ঘুরে দাঁড়ায় জানলার দিকে। বাইরে তুষার-ঝড়ে ঢাকা পড়ে গেছে বিরাট এক জনতার ভীড়। হাতে হাত দিয়ে, জটলা বেঁধে চিৎকার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে ওরা। লম্বা কোট গায়ে, ভারী জামা পরা মানুষের দল, নারী ও শিশু সবাই হেঁটে চলেছে এক অন্তহীন মিছিলে—এই হল সত্যিকারের রাশিয়া, নীচুতলার আঁধারঘেরা রাশিয়া......কিন্তু এরা সব এল কোত্থেকে?

রুশ্‌চিনের রুপোলি মাথার পিছনটা চাপা রাগে ফুলে ওঠে, যেন গর্দানের মধ্যে ঢুকে যেতে চায় মাথাটা। কাতিয়া তার কাঁধের উপর নিজের গালটা পেতে দেয়। জানলার বাইরে ওই যে জীবনটা বয়ে চলেছে সেটাকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

বলে ওঠে ঃ "ঐ দেখ ভাদিম, কেমন খুশিতে উপচে পড়ছে ওরা! যুদ্ধ কি তা হলে সত্যি সত্যিই শেষ হল? এমন চমক লাগানো কথা তো আমার বিশ্বেসই হতে চায় না।"

রুশ্‌চিন ওর কাছ থেকে সরে যায়। হাতদুটো পেছনে রেখে মোচড়াতে থাকে মুঠো। চাপা ঠোঁটের ওপর ফুটে ওঠে একটা নিষ্ঠুর রেখা......

"সবুরই করো না একটু!"

সামরিক উর্দির কাপড়ে তৈরি কুঁচকে-যাওয়া জ্যাকেট আর শার্ট-পরা পাঁচ জন লোক বসেছিলেন খিলানওয়ালা ছোট ঘরটিতে। সামনে একখানা টেবিল। অনিদ্রায় চোখে-মুখে কালি পড়ে গেছে। টেবিলের রং-চটা ঢাকনিটার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রুটির টুকরো, সিগারেটের অর্ধাংশ, বাজে কাগজ। সেগুলোর ভীড়ের মধ্যে মাথা জাগিয়ে রয়েছে টেলিফোন আর কাঁচের গেলাসগুলো। মাঝে মাঝেই লম্বা করিডোরের সামনে দরজাটা খুলে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে একেক

দমক কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে খোলা দরজা পেয়ে। কার্তুজের বেল্ট আঁটা চওড়া-কাঁধওয়ালা ফৌজের লোকটি হরদম নিয়ে আসছে গাদা গাদা কাগজ, সই নেবার জন্য।

টেবিলের পঞ্চম ব্যক্তি যিনি চেয়ারম্যান, তিনি বসেছিলেন একটা আরাম-কেদারায়। তাঁর তুলনায় বসবার আসনটি একটু বেশিই উঁচু হবে। ধূসর রঙের ছোট জ্যাকেট-পরা শক্তসমর্থ খাটো মানুষটি যেন ঝিমুচ্ছেন মনে হচ্ছিল। বাঁ হাত কপালে রেখে চোখ আর নাক ঢেকে বসে আছেন; মুখের যে-অংশটি নজরে পড়ে তা হল তাঁর ছোট-ছোট রুক্ষ্ম গোঁফে ঢাকা ঋজু ঠোঁটের রেখা আর পেশী কুঁচকে-ওঠা ক্ষৌরস্পর্শহীন গাল। তাঁকে যারা ভালো করে জানে তারাই শুধু ধরতে পারবে যে আসলে তাঁর ওই মুখ ঢেকে-রাখা ক্লান্ত আঙুলের ফাঁক দিয়ে এক-জোড়া তীক্ষ্ন বুদ্ধি-প্রখর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে যাচ্ছে তাঁর সামনের বক্তাটিকে এবং সেই সঙ্গে অন্য তিনজনের মুখও।

অনবরত বেজে চলেছে টেলিফোন। কার্তুজের বেল্টপরা সেই চওড়া-কাঁধ ফৌজী লোকটিই রিসিভার তুলে নিয়ে নীচু গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠছে : 'সোব-নারকম্*...সভা...অসম্ভব'। মাঝে মাঝেই কেউ না কেউ এসে করিডোরের দরজায় মাথা ঠোকে আর কবাটের পেতলের নব্‌টা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায়। বাইরে সমুদ্রের বাতাস গর্জন করছে, জানলার কাঁচে ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি আর জমাট বরফের কণা।

বক্তা যা বলছিলেন শেষ করলেন বলা। টেবিল ঘিরে সবাই বসে আছেন মাথা নীচু করে, কিংবা হাতের তেলোয় মুখ রেখে। কেশবিরল মাথাটা ছাড়িয়ে আরো খানিকটা উঁচুতে হাত তুলে চেয়ারম্যান কী যেন কয়েকটি কথা টুকে নিলেন কাগজে। একটা শব্দের নীচে তিনি এমন জোরে দাগ দিলেন যে কলমের খোঁচায় কাগজই ফুটো হয়ে গেল। তাঁর সামনের লোকটির ওপাশে যিনি বসেছিলেন লেখাটা তাঁর দিকেই ছুঁড়ে দিলেন চেয়ারম্যান।

লেখাটুকু পড়া হতেই গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসলেন খাড়া খাড়া চুল আর কালো গোঁফওলা শীর্ণদেহ লোকটি। চিরকুটটার উপর একটা জবাব লিখে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।......

জানলা দিয়ে বাইরের প্রবল তুষার-ঝড়ের দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান আস্তে আস্তে চিরকুটটা ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে।

"বক্তা ঠিকই বলেছেন—আমাদের সৈন্যও নেই, রসদও নেই",—গলার স্বরটা কেমন যেন ভারী আর চাপা শোনায়—"আমরা যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি। জার্মানরা এগিয়ে আসছে এবং আরও এগিয়ে আসতে থাকবে। বক্তা ঠিকই বলেছেন।"

এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলেন তাঁকে বাধা দিয়ে ঃ

---

*পিপ্‌লস্‌ কমিসারদের পরিষদ
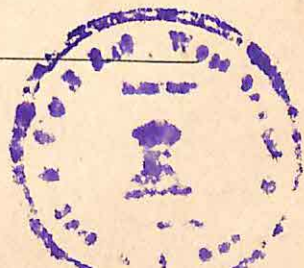
"কিন্তু এই তাহলে শেষ! কী করা যেতে পারে? আত্মসমর্পণ? আত্মগোপন করা?"

"কী করা যেতে পারে?"—চোখটা কুঁচকে উঠল তাঁর—"লড়াই! নির্মমভাবে লড়াই চালাতে হবে! জার্মানদের হারাতেই হবে! এখন যদি ওদের হারাতে না পারি তাহলে মস্কো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে গিয়েও লড়াই করতে হবে। আর জার্মানরা যদি মস্কোও দখল করে নেয় তাহলে আমরা পৌঁছিয়ে যাব উরাল পর্যন্ত। উরাল-কুজনেৎস্ক্ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব আমরা। সেখানে কয়লা আছে, লোহা আছে আর আছে জঙ্গী প্রোলেতারিয়েত। পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের আমরা সেখানে নিয়ে যাব। বেশ চমৎকারই হবে। আর যদি প্রয়োজন হয় আমরা সুদূর কাম্‌চাট্‌কা অবধি ছুটে যাব। একটা জিনিস যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই—শ্রমিকশ্রেণীর যাঁরা রত্নস্বরূপ তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, কখনোই তাঁদের আমরা ধ্বংস হতে দেব না। তারপর আবার আমরা মস্কো আর পেত্রোগ্রাদ দখল করব...পশ্চিমের দিকে তো পরিস্থিতি ক্রমাগতই পালটাবে!......মাথা নীচু করে চুল ছিঁড়তে বসা বলশেভিকদের পথ নয়!......"

উঁচু চেয়ারটা ছেড়ে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি লাফিয়ে উঠলেন—পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুটে চললেন ওক কাঠের দরজাটার দিকে, খুলে দিলেন একদিকের কবাট। পেত্রোগ্রাদের মজুরদের শীর্ণ মুখগুলো এগিয়ে এল তাঁর দিকে—করিডোরের ক্ষীণ আলোয় জ্বল্‌জ্বল করছে ওদের চোখ। গুমোট আবহাওয়া ছেড়ে ওরা সামনে আসতেই তিনি তাঁর কালির ছোপ লাগা হাতটা শূন্যে তুলে বললেন:

"কমরেডস্, আমাদের সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমি আজ বিপদের মুখে......!"

॥ দুই ॥

শীতের শুরুতেই অগণিত মানুষের দু'টো স্রোত দু'দিক থেকে এসে মিলছিল দক্ষিণ-রাশিয়ার রেলওয়ে জংশনগুলোতে—একটানা অবিরামগতিতে। উত্তর দিক থেকে আসছিল শৌখীন রাজনীতিবিদ্, উর্দিপরা অফিসার, ব্যবসায়ী, পুলিশের লোক, আগুন-লাগা প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে-আসা জমিদার, রোমাঞ্চ-সন্ধানী, অভিনেতা, লেখক, সরকারী কর্মচারী আর ছাত্রের দল যারা ভাবতো ফেনিমোর কুপারের অ্যাডভেঞ্চারের দিনগুলো বুঝি ফিরে এসেছে আবার;—অর্থাৎ সেদিন পর্যন্ত যারা রাজধানী দুটোতে হৈ-হল্লায় মেতেছে সেই শহুরে জনতারই নানা স্তরের মানুষ আজ পালিয়ে এসেছে এইখানে, পালিয়ে এসেছে ধর্মশাস্ত্রের উপসংহারে আগামী দিনের যে ভয়াবহ উপপ্লবের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে। দন, কুবান আর তেরেক্-এর শস্য-সুফলা প্রাচুর্যভরা অঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে তারা। দক্ষিণ দিকে থেকে আগত বিশাল ট্রান্সককেসীয়-বাহিনীর সঙ্গে পথে মোলাকাত হচ্ছে তাদের, উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে এই বাহিনী, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনগান, গুলিগোলা আর ট্রাক-বোঝাই নুন, চিনি, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে। দুটো জনস্রোত যেখানে মিলেছে সেখানে মানুষের কী অসম্ভব ভীড়। প্রতিবিপ্লবী শ্বেতরক্ষী (হোয়াইট গার্ড) গোয়েন্দারা ওরই মধ্যে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে। গ্রাম থেকে কসাকরা আসছে অস্ত্রশস্ত্র কিনবার আশায়, ধনী কৃষকরা শস্য আর শুয়োরের চর্বির বদলে নিয়ে যাচ্ছে কাপড়। চারিদিকেই ডাকাত আর পকেটমারের উপদ্রব। যারা ধরা পড়ছে পত্রপাঠ 'সাফ্' হয়ে যাচ্ছে রেলগাড়ীর তলায়।

লাল রক্ষীদের (রেড গার্ড) কয়েকটি বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিল না তারা, মাকড়সার জালের মতো কেবলই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এ হল স্তেপ অঞ্চল, স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার পীঠভূমি। সেই স্মরণাতীত কাল থেকে কসাকরা চরে বেড়াচ্ছে এখানে। সবকিছুই নিষ্ফল এখানে, বেসামাল, বগলাহীন আর অনিশ্চিত......আজ হয়তো জমিহীন চাষী আর বহিরাগতেরা মিলে খাড়া করল একটি নির্বাচিত সোবিয়েত, কালই আবার দেখা যাবে গ্রামাঞ্চলের কসাকরা নির্মম তলোয়ারের সাহায্যে খেদিয়ে দিয়েছে কমিউনিস্টদের, নভোচেরকাস্কের আতামান (কসাক-সর্দার) কালেদিনের কাছে হয়তো কোনো দূতকে পাঠিয়েছে তার টুপির নীচে গোপন চিঠি লুকিয়ে রেখে। সুদূর পেত্রোগ্রাদের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে এখানে থোড়াই গ্রাহ্য করে লোক।

কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ওরা টের পেতে শুরু করল পেত্রোগ্রাদের শক্তি। নাবিক, শ্রমিক আর গৃহহীন সৈনিকদের নিয়ে তৈরি হল প্রথম বিপ্লবী ফৌজীদলগুলো। জরাজীর্ণ সৈন্যবাহী-ট্রেনে চেপে তারা এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গা পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। বড়ো শৃঙ্খলাহীন আর মারমুখী তাদের স্বভাব।

লড়াই করে সাংঘাতিক মরীয়া হয়ে, কিন্তু সামান্যতম বিপর্যয়েই দমে যায়। যখনই কোনো যুদ্ধে শেষ হয় সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সভা ডেকে তারা শাসাতে থাকে, কম্যান্ডারকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।

পরিকল্পনা তৈরি হল ঃ তিন দিক থেকে দন আর কুবান অঞ্চলকে ঘিরে ফেলতে হবে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসবে সাব্‌লিন, উক্রাইন থেকে দন অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে সে; সিভার্স্‌-এর বাহিনী রস্তভ আর নভো-চেরকাস্ক্‌-এর দিকে রওনা হবে অর্ধবৃত্তের আকারে, আর কৃষ্ণসাগরীয় নাবিকদের কয়েকটি দল নভোরোসিস্ক্‌-এর দিকে থেকে চাপ দিতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে ভেতর থেকে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলবে শিল্প ও খনি অঞ্চলে।

জানুয়ারি মাসে লাল সৈন্যদল এগিয়ে চলল তাগান্‌রগ্‌, রস্তভ্‌ আর নভো-চেরকাস্কের দিকে। দনের গ্রামাঞ্চলগুলোতে তখনও কসাক আর বহিরাগতদের মধ্যে বিরোধটা ততো প্রবল হয়ে দেখা দেয় নি। দন তখনও নিষ্ক্রিয়। আতামান কালেদিনের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লাল-বাহিনীর চাপে পড়ে লড়াই না দিয়েই ফ্রণ্ট ছেড়ে সরে পড়তে লাগল।

শত্রুর কাছে লাল-বাহিনী যেন সাক্ষাৎ যমদূত। তাগান্‌রগের মজুররা বিদ্রোহ ক'রে কুতেপভের 'ভলাণ্টিয়ার'-বাহিনীকে শহর থেকে ভাগিয়ে দিল। নভো-চেরকস্কে মোতায়েন আতামান-বাহিনীকে সম্পূর্ণ পিষে গুঁড়িয়ে দিল সার্জেণ্ট পদ্‌তেলকভের লাল সৈন্যদল।

এরপর আতামান সর্দার কালেদিন মরীয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করলেন। জেনারেল কর্নিলভ, আলেক্‌সিয়েভ আর দেনিকিন রস্তভে যে 'ভলাণ্টিয়ার বাহিনী' তৈরি করেছিলেন তখন সেটাই তাঁদের একমাত্র শক্ত সামরিক সংগঠন। দনের কসাকদের কাছে আতামান কালেদিন শেষবারের মতো আবেদন জানালেন সেই 'ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে' স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যোগ দেবার জন্য। কিন্তু আতামান সর্দারের কথা কেউ কানেই তুলল না।

ঊনত্রিশে জানুয়ারি নভোচেরকাস্কের প্রাসাদে আতামান সরকারের এক বৈঠক আহবান করলেন কালেদিন। সাদা হলঘরটায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিলের সামনে বসল চোদ্দজন দন-কসাক কর্নেল, ডাকসাঁইটে জেনারেল আর "নৈরাজ্যবাদ ও বল-শেভিকবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মস্কো কেন্দ্র" থেকে আগত একদল প্রতিনিধি। বিষণ্ন চেহারার ঝোলা-গোঁফওয়ালা লম্বা মানুষ আতামান। গাম্ভীর্যভরা শান্ত গলায় বললেন তিনি :

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের অবস্থা এখন নৈরাশ্যজনক। বলশেভিকদের শক্তি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। কর্নিলভ সমস্ত রণাঙ্গন থেকে তাঁর ফৌজ হটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় নেই। দন জেলাকে বাঁচাবার জন্য আমি যে আবেদন জানিয়েছিলাম তাতে মাত্র একশো সাতচল্লিশজন সাড়া দিয়েছেন। দন আর কুবানের লোকেরা আমাদের শুধু মদত দিতেই অস্বীকার করেনি—তারা এখন আমাদের প্রতি রীতিমত শত্রু-

ভাবাপন্ন। কেন এমনটা ঘটল? এই লজ্জাজনক অবস্থার জন্য কি কৈফিয়ত আমরা দিতে পারি? ভ্রষ্টাচারই আমাদের সর্বনাশের মূল। আগের মতো সে কর্তব্যবোধও নেই, সেই ভক্তিশ্রদ্ধাও নেই। আমি প্রস্তাব করছি, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ইস্তফা দিন আর অন্যের হাতে কর্তৃত্বভার তুলে দিন।" আসনে বসেই কারুর দিকে না তাকিয়ে তিনি আরেকটু যোগ করলেন—"অল্পের মধ্যে সারবেন, ভদ্রমহোদয়গণ; সময়ের বড়ো অভাব!..."

আতামানের সহকারী মিত্রোফান বোগায়েভ্‌স্কি ক্রুদ্ধভাবে মন্তব্য করল : "তার মানে বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার প্রস্তাব করছেন আপনি?"

জবাবে আতামান জানালেন ঃ "কসাক গভর্নমেণ্ট যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।" সঙ্গে সঙ্গে ভারী পা ফেলে সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন পাশের দরজা দিয়ে নিজের কোয়ার্টারের দিকে। ঘরে গিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন বাগানের পাতাঝরা গাছের দোলায়মান মাথাগুলোর দিকে। তুষার বয়ে-আনা মেঘ কেমন যেন ঘোলাটে আর বিষণ্ন। স্ত্রীকে চেঁচিয়ে ডাকলেন আতামান। কিন্তু কোনো জবাব এল না। শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। লোহার জাল-খোলা চুল্লীটায় আগুন জ্বলছে। জ্যাকেট ও ক্রুশখানা খুলে ফেলে তিনি এই প্রথম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলেন বিছানার পাশে ঝোলানো যুদ্ধের মানচিত্রটির দিকে। এখনও কেন যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছে না! দন আর কুবানের স্তেপ অঞ্চল ঘিরে গুচ্ছ গুচ্ছ ছোট লাল পতাকা ঘন করে আঁটা। শুধু রস্তভের ওই কালো বিন্দুটির উপরে একখানা তেরঙ্গা নিশান। সামরিক অফিসারের ডোরা-কাটা পাতলুনটার পিছনের পকেট থেকে চ্যাপটা, উষ্ণ ব্রাউনিং পিস্তলখানা বার করলেন আতামান। তারপর নিজের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিলেন।

ফেব্রুয়ারির ন' তারিখে জেনারেল কর্নিলভ তাঁর ক্ষুদ্র 'ভলান্টিয়ার' বাহিনীটি নিয়ে বেরিয়ে এলেন রস্তভ্ ছেড়ে। বাহিনীর মধ্যে এখন রয়েছেন শুধু অফিসার আর ক্যাডেটবৃন্দ, সঙ্গে কয়েক গাড়ি জেনারেল আর বাছা বাছা কয়েকজন 'বাস্তুহারা'। ডন নদী পেরিয়ে স্তেপ অঞ্চলে প্রবেশ করলেন তাঁরা।

প্রধান সেনাধিনায়ক কর্নিলভ, মঙ্গোলীয় ধরনের ছোটখাটো রগ-চটা চেহারার মানুষটি, পিঠে ন্যাপস্যাক্ ঝুলিয়ে মার্চ করে চলেছেন সৈন্যদের আগে আগে। সারবন্দী গাড়িগুলোর একখানিতে রয়েছেন ভাগ্যহত জেনারেল দেনিকিন। ব্রঙকাইটিসে শয্যাশায়ী হয়ে তিনি এখন ডোরা-কাটা একখানা কম্বলের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন।

রেলের কামরার জানলা দিয়ে দেখা যায় তুষারের আবরণহীন নগ্ন হলদে স্তেপভূমি ছুটে চলেছে পিছন দিকে। ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে ঠেলে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস, তাতে বরফ-গলা মাটির ভিজে গন্ধ। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল কাতিয়া। মোলায়েম 'ওরেনবুর্গ' শালে তার মাথা আর কাঁধটা ঢাকা,

পিঠের দিকে গিঁট বাঁধা। রুশ্‌চিন তার আসনটিতে বসে ঝিমুচ্ছে। গায়ে সৈনিকের গ্রেটকোট, মাথায় চূড়োতোলা টুপি।

মন্থরগতিতে চলেছে ট্রেন। বড়ো বড়ো লম্বা গাছ নজরে পড়ে। তাদের ঝাপড়া ডালগুলোয় ঘন হয়ে ঝুলছে দাঁড়কাকের বাসা। গাছগুলোর মাথার উপরে চক্কোর দিচ্ছে অসংখ্য কাক, ডালের উপরেও বসে বসে দুলছে কতকগুলো। জানলা ঘেঁসে বসল কাতিয়া। বাচালের মতো উদ্বেগভরে 'কা-কা' করছে দাঁড়কাকগুলো— মনে হয় যেন বসন্তকাল। কাতিয়া যখন ছোট্টটি তখনও ওরা ওইভাবেই 'কা-কা' করে ডাকতো বসন্তের তুমুল বৃষ্টিধারা, পাতলা কুয়াশা আর প্রথম ঝড়ের গান গেয়ে।......

কাতিয়া আর রুশ্‌চিন চলেছিল দক্ষিণমুখো। কোথায় তা ওরা নিজেরাই জানে না—রস্তভ্‌ কিংবা নভোচেরকাস্ক্‌ অথবা দন অঞ্চলের কোনো গ্রামদেশে। এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে যেখানে গৃহযুদ্ধের আল্‌গা বাঁধন শক্তহাতে গেরো দেয়া হচ্ছে। রুশ্‌চিন ঘুমিয়ে পড়েছে মাথাটা ঝুলিয়ে। পাতলা মুখখানা ভরে গেছে দাড়িতে, রুচিবাগীশ চাপা ঠোঁটদুটি ঘিরে কঠিন কালো রেখা। কাতিয়া যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়। এ তো 'ওর' মুখ নয়, উঁচু নাক-ওয়ালা এ যে এক অপরিচিত চেহারা।......বাতাসে ভেসে আসে কাকের কর্কশ স্বর। লাইনের জোড়-গুলোয় খট্‌খট্‌ আওয়াজ তুলে ধীরে এগিয়ে চলেছে গাড়ীটা। স্তেপভূমির উপর দিয়ে একটা কর্দমাক্ত রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। রাস্তাটা জুড়ে সারবন্দী হয়ে চলেছে অসংখ্য গাড়ি—ঝাঁকড়া-লোমওলা টাট্টু ঘোড়া, কাদার চাপড়া লেগে থাকা খামার-গাড়ি, আর তার মধ্যে কুৎসিত ভয়ংকর চেহারার দাড়িওয়ালা সব মানুষ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রশ্‌চিন গলা থেকে বের করছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। নাক-ডাকানি আর আর্তবিলাপের মাঝামাঝি একধরনের শব্দ, কর্কশ অথচ করুণ।

"ভাদিম, ভাদিম!"

ভয়ঙ্কর শব্দটা হঠাৎ থেমে যায়। চোখ খুলে তাকায় রশ্‌চিন, দৃষ্টিতে তার ভাবের লেশমাত্র নেই।

"উঃ! কী বিশ্রী স্বপ্নই না দেখছিলাম!..."

ট্রেন এসে দাঁড়ায় এক জায়গায়। এবার দাঁড়কাকের গলার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর। পুরুষের বুট জুতো পায়ে ভীড় ঠেলে ঠেলে ছুটে আসছে মেয়েরা, পিঠে বোঝা নিয়ে মালগাড়ীতে উঠবার সময় উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের ফর্সা উরু। কামরার যে জানলাটার কাছে কাতিয়া বসেছিল, হঠাৎ তেল-চকচকে চূড়ো-টুপি পরা একটা মাথা উঁকি দিল সেখানে। লোকটার একেবারে চোখের নীচে পর্যন্ত ঘন দাড়ির জঙ্গল ছড়িয়ে পড়েছে।

"মেশিনগান বিক্রি আছে নাকি হে?"

উপরের তাকটা থেকে একটা জোর কাশির শব্দ শোনা গেল। কে যেন ধড়-মড়িয়ে ঘুরে ফুর্তিভরা গলায় জবাব দিল সেখান থেকে ঃ

"মেশিনগান তো সব বিক্রি হয়ে গেছে কর্তা, দু'একটা কামান টামান পেতে পারো।"

"না, ও দিয়ে কোনো কাজ হবে না আমাদের"—বলল চাষীটি। মস্ত বড় মুখের হাঁ, যখন খোলে তখন তার দাড়িটা উঁচিয়ে থাকে ঝাঁটার মতো। কামরার মধ্যে কাঁধ পর্যন্ত মাথাটি ঢুকিয়ে একবার সে সুতীক্ষ্ম চোখে চারদিকটা দেখে নেয় ঃ "কিছুই কি পাওয়া যাবে না হে?" উপরের তাকটা থেকে তড়াক করে নীচে নেমে আসে একজন দীর্ঘকায় সৈনিক—চওড়া মুখমণ্ডল, চোখ দুটো শিশুর মতো নীল আর সুগঠিত মাথাটি বেশ কামানো। সতেজ ভঙ্গীতে সে কোটের বেল্‌টখানা এঁটে নেয়।

"এ বয়সে তো তোমার লড়াই করা উচিত নয় দাদু, এখন যে তোমার চুল্লীর ধারে শুয়ে বিশ্রাম নেবার সময়......"

"সে তো ঠিক কথাই"—একমত হয়ে বলে চাষীটি, "কিন্তু সেপাইজী, এখন যে শুয়ে বিশ্রাম করার কায়দা নেই কোনো। বিশ্রাম তোমায় করতে দিচ্ছে কে? যে ভাবেই হোক্ পেটটা তো চালাতে হবে!"

"ডাকাতি করে?"

"ছি-ছি, ও কথা বলবেন না!"

"তা হলে মেশিনগান চাই কেন?"

"না, এই ব্যাপার হচ্ছে..." নাকটার উপর হাত ডলে ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ করে সে। চোখের কোণের চক্‌চকে ধূর্ত হাসিটাকে ঢাকবার জন্য জুলফির উপর হাত চাপা দিয়ে বলে ঃ "লড়াই থেকে ফিরেছে আমার ছেলেটা। আমায় বলল— যাও তো একবার স্টেশনমুখো, মেশিনগানের দরটা জেনে এসো। বদলে গম দেব, চার পুড পর্যন্ত উঠতে পারি......।—বুঝেছ তো?"

সৈনিকটি হেসে উঠল ঃ "কুলাকের দল! ধূর্ত শয়তান সব। বলি কতগুলো ঘোড়া আছে তোমার, দাদু?"

"তা ঈশ্বরের কৃপায় আটটা। কিন্তু বিক্রি করবার মতো কারুরই কি কিছু নেই তোমাদের ? অস্ত্র কিংবা অন্য কিছু?" আর একবার সে যাত্রীদের উপর নজর বুলোয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। চোখ দুটো ঘোলাটে করে সে পিছনে হটে যায়, যেন গাড়ীর লোকদের দেখতে গিয়ে সে গোবরগাদায় পা দিয়ে ফেলেছে। পিছনে ঘুরে সে প্লাটফর্মের কাদার উপর দিয়ে ছুটতে থাকে হাতের চাবুকটা ঘুরিয়ে।

"বুঝেছেন তো ব্যাপারটা?" কাতিয়ার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল সেই সৈনিকটি, "আটটা ঘোড়া! আর হয়তো ছেলেও আছে ডজনখানেক। সবগুলোর পিঠেই জিন এঁটে দেয় নিশ্চয়, আর সারা স্তেপ জুড়ে ছুটে বেড়ায় লুটেরাগুলো। নিজে হয়তো গোলাঘরে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা রেখে শুয়ে থাকে, আর খালি পাহারা দেয় লুটের মাল।"

সৈন্যটি এবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় রুশচিনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরু দুটো উঁচু হয়ে ওঠে ঃ

"আরে এ কী, ভাদিম পেত্রোভিচ্, আপনি!" মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার।

কাতিয়ার দিকে একবার চট্ করে তাকিয়ে দেখে রুশ্চিন। কিন্তু আর কোনো উপায় তো নেই! অভ্যর্থনা জানিয়ে হাতটা বাড়িয়েই দিতে হল তাকে। হৃদ্যতার সঙ্গে হাতটা চেপে ধরল সৈনিকটি, পাশে এসে বসল। কাতিয়া বেশ দেখতে পেল রুশ্চিন যেন কেমন মিইয়ে গেছে।

"তা হলে আবার দেখা হল আমাদের!" শুকনো গলায় বলল রশ্চিন—"তোমার চেহারার উন্নতি দেখে খুশি হলাম, আলেক্সি ইভানোভিচ্। দেখতেই পাচ্ছ কেমন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে!"

এবার কাতিয়া বুঝতে পারল সৈনিকটি আর কেউ নয়, আলেক্সি ক্রাসিল্নিকভ্ রশ্চিনেরই প্রাক্তন আরদালি। ভাদিম পেত্রোভিচ্ প্রায়ই তার কথা বলত, বুদ্ধিমান আর প্রতিভাবান রুশ চাষীর নমুনা হিসাবে সুখ্যাতি করত তার। কাতিয়া ভেবে পেল না লোকটির প্রতি তার স্বামী অমন বিরূপ হয়ে উঠেছে কেন। কিন্তু ক্রাসিল্নিকভ্ বোধহয় ঠিকই ধরতে পেরেছে। হেসে একখানা সিগারেট ধরিয়ে সে নেহাত সাদামাটা নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল ঃ "আপনার স্ত্রী বুঝি?"

"হ্যাঁ, বিয়ে করেছি আমি। এস আলাপ করিয়ে দি'। কাতিয়া, এই আমার ইষ্টদেবতাটি—তোমায় তো বলেছি ওর কথা অনেকবার। যাক্, আলেক্সি ইভানোভিচ্, তোমাতে আমাতে মিলে কত লড়াই-ই তো লড়লাম, এবার এসো তোমায় অভিনন্দন জানাই—এই নোংরা শান্তির জন্য। রাশিয়ার সেই ঈগল..." (তিক্তভাবে হাসল সে)। "এখন আর কি, আমি আর কাতিয়া চলেছি দক্ষিণ-মুখো...সূর্যের কাছাকাছি।..." (কথাগুলো নিজের কানেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল, ভ্রূকুটি করে উঠল রশ্চিন। ক্রাসিলনিকভ্ লেশমাত্রও ভাবাবেগ দেখালো না) "কিছুই তো আর রইল না এখন...কৃতজ্ঞ দেশ আমাদের, পুরস্কার দিল পেটে বেয়নেট চালিয়ে।...(সারা গায়ে উকুন লেগেছে এইভাবে সে শিউরে উঠতে থাকে) "বহিষ্কৃত, জনগণের শত্রু...এই তো বলা হয় আমাদের..."

"আপনি বড়ো কঠিন অবস্থায় পড়েছেন!"—মাথা নেড়ে বলল ক্রাসিলনিকভ। আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। একটা ভাঙা বেড়ার ওপাশে খোলা জায়গাটায় জড়ো হয়েছে একদল মানুষ। জায়গাটা স্টেশনেরই সম্পত্তি। বলে চলে ক্রাসিলনিকভ্ ঃ "একজন বিদেশী এসে যেমন কঠিন অবস্থায় পড়ে তেমনি অসুবিধে হয়েছে আপনার। আমি কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছি আপনার সমস্যাটা। তবে, সবাই তা বুঝবে না। আপনি এখন পর্যন্ত দেশের মানুষকে চিনে উঠতে পারেন নি!"

"ও কথার মানে?"

"মানে সোজা, আপনারা আগেও ওদের চিনতেন না। বরাবরই একটা ধোঁকার মধ্যে রয়ে গেছেন আপনারা।"

"কে ধোঁকা দিল?"

"ধোঁকা দিয়েছি আমরা, মানে সৈন্য আর মুঝিক্‌রা...যখনই পিঠ ঘুরিয়েছেন আপনারা, আমরা হেসে উঠেছি। ভাদিম পেত্রোভিচ্! নিঃস্বার্থ বীরত্ব, জারের প্রতি ভক্তি, দেশপ্রেম—সবই তো আপনাদের ওই ভদ্দরলোকদের আবিষ্কার, পল্টনদের মধ্যে গিয়ে আমাদের ঐ বুলিগুলোই আওড়াতে হত।...আমি তো একজন মুঝিক্‌মাত্র, সাধারণ চাষী। ছোট ভাইকে রস্তভ্ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যাচ্ছি। জখম হয়ে সে পড়ে আছে ওখানে—বুকে তার গুলি লেগেছে, অফিসারের গুলি। গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই যাচ্ছি। হয়তো আবার জমিতে লাঙল দেব, কিংবা হয়তো লড়াইও ফের করতে হতে পারে।...ওখানে গিয়েই বোঝা যাবে সব। কিন্তু লড়াই যদি একবার শুরু করি, তখন আর আমাদের পায় কে! সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় লড়ব, ড্রাম বাজিয়ে আমাদের চাঙা করবার দরকার হবে না, আর লড়বও মরণপণ! দক্ষিণ দিকে আর নাই-বা গেলেন ভাদিম পেত্রোভিচ্। মনে হয় না ওতে আপনার কোনো সুবিধে হবে।"

উজ্জ্বল চোখে রশ্‌চিন চেয়ে রইল তার দিকে। শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে নিল একবার। ক্রাসিল্‌নিকভ্ এবার আরো উৎসুক হয়ে বাইরের দিকটা লক্ষ্য করতে থাকে—স্টেশনের বেড়ার ওপাশে কী যেন ব্যাপার ঘটছে। অনেকগুলো রাগ-চাপা গলার গুঞ্জন ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। কিছু কিছু লোক গাছে চড়ে বসেছে ভাল করে দেখবার জন্য।

"ওদের সামলানো আপনাদের কর্ম নয়, তা বলে দিচ্ছি! আপনারা বুর্জোয়ারা হলেন বিদেশীদেরই মতো, বিদেশীদের চেয়ে কোনো অংশে ভাল নন আপনারা। বুর্জোয়া কথাটার মানেই আজকাল দাঁড়িয়ে গেছে খারাপ-এই যেমন 'ঘোড়াচোর' কথাটা। কর্নিলভের মতো একজন ঝানু সৈন্য—যে কিনা নিজের হাতে সেন্ট জর্জের ক্রুশ এঁটে দিয়েছিল আমার বুকে—সেই লোকটাই শেষে 'সংবিধানী পরিষদের' হয়ে লড়ার জন্য কসাকদের জড়ো করবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফয়দা কিছু হল?—কিচ্ছু না! ওদের বোঝাবার মতো কথাই খুঁজে পায় নি লোকটা, অথচ আপনারা তো বলবেন জনসাধারণকে সে কতই না জানতো বুঝতো।......এখন নাকি কুবান স্তেপের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে বেচারা, একপাল নেকড়ের মধ্যে একলা একটি কুকুরের মতো।......মুঝিক্‌রা বলে : 'মস্কোতে সুবিধে করতে না পেরে ক্ষেপে উঠেছে বুর্জোয়াগুলো...।' ওরা কিন্তু তেল দিয়ে রাইফেল সাফ্ করে রাখছে। কখন কী ঘটে, তাই তৈরি হয়ে থাকা আর কি। এ ব্যাপারে কিন্তু ভুল করবেন না আপনারা! না, না, ভাদিম পেত্রোভিচ্, আপনি রাজধানীতেই ফিরে যান, আপনি আর আপনার স্ত্রী...এখানে এই মুঝিকদের মধ্যে থাকার চেয়ে ওখানটাই বরং আরো নিরাপদ হবে আপনার পক্ষে।...ঐ তো দেখুন না কেন..."

(হঠাৎ তার গলাটা একটু চড়ে গেল, ভ্রূকুটি করে বলল) "মেরে ফেলবে বুঝি লোকটাকে..."

রেলিং-এর ওধারে ব্যাপারটা যেন এবার বেশ ঘনিয়ে এসেছে মনে হল। দুটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারার সৈনিক ভয়ঙ্কর মুখ করে শক্ত হাতে চেপে ধরেছে একটা দুর্বল পাতলা লোককে। লোকটার পরনে ফ্লানেলের কম্বলে তৈরি একটা ছেঁড়া জ্যাকেট। দাড়িগজানো মুখটা ভীষণ আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, নাকটা ফোলা আর কম্পিত ঠোঁটের কিনারা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তার সামনেই রাগে ফুঁশছে একটি জোয়ান-বয়েসী স্ত্রীলোক। লোকটি ওর প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছে ঘোলা ঘোলা নিষ্প্রভ চোখে। মাঝে মাঝে মাথার মোটা শালটা টেনে ছিঁড়ছে স্ত্রীলোকটি, স্কার্ট ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ছে, আবার উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাংশু-মুখ লোকটির উপর, তার খাড়া খাড়া চুলের মুঠি চেপে ধরে যেন বিজয়গর্বেই চীৎকার করে বলছে ঃ

"এই বেটাই চুরি করেছে, আমার সায়ার তলা থেকে। জানোয়ার কোথাকার! দে, পয়সা ফিরিয়ে দে আমার!"

লোকটির গাল দুটো একেবারে মরণ-থাবা দিয়ে খামচে ধরে সে। ফ্যাকাশে লোকটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদুটো তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে। স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্নকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের মতো মাথাওয়ালা সেই চাষীটি সবাইকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ায়। কাঁধ দিয়ে ঝট্‌কা মেরে সে যুবতীটিকে এক পাশে হটিয়ে দেয়। তারপর সেই ফ্যাকাশে লোকটার মুখের ওপর সেরেফ একটা চাঁটি বসিয়ে জোরগলায় ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে। মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে যায় মানুষটা। লম্বা-হাতা কোট গায়ে আরেকজন লোক গাছের ওপর থেকে ঝুঁকে চেঁচিয়ে : "খুন!" ভীড়টা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। দেহটার উপর ঝুঁকে পড়ে তারা, তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মুষ্টি আস্ফালন করে।

রেল-কামরার জানলাটা অবশেষে ভীড়ের পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত চলল তারা! একটা চাপা আর্তনাদ যেন কাতিয়ার গলা পর্যন্ত উঠে এসে আটকে যায়। রশ্‌চিন বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে। মাথা নাড়তে থাকে ক্রাসিলনিকভ্‌।

"চুঃ! চুঃ! হয়তো-বা অমনি অমনিই লোকটাকে মেরে ফেলল", বলল সে ঃ "ঐ মেয়েমানুষগুলো সবাইকে পাগল করে ছেড়ে দেবে মনে হচ্ছে। মরদগুলোর চেয়েও খারাপ ওগুলো। এই চার বছর হল ওদের যে কী হয়েছে কে জানে! লড়াই থেকে ফিরে এলাম আমরা; এসে দেখলাম কি?—মেয়েগুলো একেবারেই অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন আর লাগাম চড়িয়ে ওদের শুড়শুড়ি দেবার সাহস হবে না কারুর—নিজদের বন্দোবস্ত নিজেরাই করে নাও এবার। উঃ কী উঁচুকপালেই না হয়েছে এই মেয়েগুলো!"

"রাশিয়ার মুক্তি-সংগঠকরা" অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক আলেক্‌সিয়েভ আর লাভ্‌র্‌ কর্নিলভ যে কেন মুষ্টিমেয় একদল সৈন্য ও ক্যাডেট নিয়ে (সবশুদ্ধ হাজার পাঁচেক হবে) দক্ষিণের দিকে একাতেরিনোদার-এ গিয়ে উপস্থিত হলেন সেটা প্রথম নজরে বোঝা দুষ্কর। অথচ তাদের গোলন্দাজবাহিনীর অবস্থা তখন সঙ্গীন, গোলাগুলি কার্তুজ নেই বললেও চলে, তার ওপর তারা পড়ল গিয়ে বলশেভিক ফৌজের একেবারে সিংহ-গুহায়—কুবান কসাকদের রাজধানী ঘিরে তখন ওরা একটা অর্ধবৃত্ত ব্যূহ রচনা করেছে।

কোনো বাঁধাধরা সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এদের ছিল বলে মনে হয়নি প্রথমে। রস্তভ থেকে ভলান্টিয়ার বাহিনীকে জোর করেই উৎখাত করে দেয়া হয়েছে—সেখানে দখল বজায় রাখার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বিপ্লবের ঢেউ এসে তাদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কুবানের স্তেপভূমিতে। কিন্তু একটা রাজনৈতিক মতলব যে এদের ছিল সেটা প্রকাশ পেল মাস দুয়েক বাদে। কসাকদের মধ্যে যারা ধনী তারা তো একদিন বহিরাগতদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই! বহিরাগতরা হল এক নতুন ধরনের অধিবাসী যারা কসাকদের জমির বাবদ খাজনা দিত বটে কিন্তু কোনো স্বত্বাধিকার ভোগ করতে পারতো না।* যেখানে কসাকদের সংখ্যা হল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ, সেখানে 'বহিরাগতেরা' এক কোটি ষাট লক্ষ।

'বহিরাগতেরা' স্বভাবতই জমি আর ক্ষমতার জন্য লড়তে বাধ্য। আর কসাকরাও তাদের নানা অধিকার বজায় রাখবার জন্য অস্ত্রধারণ করতে একই রকম বাধ্য! বলশেভিকরা 'বহিরাগত'দের নেতৃত্ব দিতে লাগল। প্রথমটায় কসাকরা তো কোনোরকম কর্তৃত্বই মেনে নেবে না। নিজের নিজের এলাকায় ওরা প্রভু হয়ে বসে থাকবেই—এর চেয়ে আলাদা কোনো ব্যবস্থা হতেই পারে না। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে একটা ব্যাপার ঘটল। গোলুবভ নামে একজন কসাক ভাগ্যান্বেষী সঙ্গে সাতাশ জন কসাক সেপাই নিয়ে ঢুকে পড়ল আতামান নাজারভের সভাকক্ষে। নভোচেরকাসক্‌-এর যুদ্ধ-দপ্তরে তখন নাজারভের সভা চলছিল। রাইফেল উঁচিয়ে, বন্দুকের বল্টু খটখটিয়ে চীৎকার করে বলল গোলুবভ ঃ "উঠে দাঁড়া, বদমাশইগুলো! সোবিয়েত আতামান গোলুবভ এসেছে ক্ষমতা হাতে নিতে!" পরদিন আতামান নাজারভ আর তার সাগরেদের শহরের বাইরে একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হল। এদিকে আতামান-প্রভুর শাসন-দণ্ডখানা হাতে নেবার জন্য গোলুবভ দু'হাজার কসাক অফিসারকে গুলি করে খতম করল; ঘোড়া ছুটিয়ে গেল স্তেপ অঞ্চলে মিত্রোফান্‌ বোগায়েভ্‌স্কি-কে বাগাবার আশায়।

---

* কসাক স্বত্বাধিকার—জমির উপর কসাকদের অধিকার সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিয়মটা হল পদমর্যাদা অনুসারে জমিহীন কসাকদের মধ্যে চিরজীবনের মেয়াদে জমি বিলিয়ে দেওয়া; ১৮৩৫ সালে জারের গভর্নমেণ্ট এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

মিত্রোফানকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়ালো সভা সমিতিতে। উদ্দেশ্য, 'স্বাধীন ডন-ভূমি' আর তার নিজের কর্তৃত্ব সম্পর্কে ওকালতি করে মিত্রোফান বক্তৃতা দিক সেইসব সভায়। কিন্তু অল্প ক'দিন বাদে জাপলাভ্স্কায়া গ্রামের এক সভায় যখন গোলুবভ নিজেই নিহত হল, তখন আর নেতা বলতে কসাকদের কেউ রইল না। উত্তর দিক থেকে তখন বিশৃঙ্খল, অস্থির আর ক্ষুধার্ত গ্রেট রাশিয়া যেন ভয়ংকর মূর্তি ধরে এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে।

'ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর' নেতাদের তাই গোড়ার দিকের মতলব ছিল এই ধরনের : একাতেরিনোদার থেকে কসাক-আন্দোলন পরিচালনা করা হবে, একটা নিয়মিত কসাক ফৌজ তৈরি করে বলশেভিক রাশিয়া থেকে ককেশাসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে, সেই সঙ্গে বাকু আর গ্রজ্নির তেলের খনিগুলোও বলশেভিকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। এইভাবেই 'মিত্রপক্ষের' প্রতি তাদের ভক্তির প্রকৃষ্টতর নমুনা দেখানো যাবে। এ হল সেই পরিকল্পনা যা নাকি পরে 'তুষার অভিযান' নামে পরিচিত হয়।

আলেক্সি ক্রাসিল্নিকভের ভাই নাবিক সেমিয়ন ক্রাসিল্নিকভ এবং ওরই মতো আর দু'একজন সঙ্গী রেললাইনের কাছে একটা লাঙল-চষা ক্ষেতের মধ্যে শুয়েছিল। জায়গাটা একটা উপত্যকার ধারে। ওদের পাশেই একজন সৈনিক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। ইঁদুরের মতো পরিশ্রম করছিল লোকটা। খোঁড়া জায়গাটায় গা গলিয়ে সে হাতের রাইফেলটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরল। সেমিয়নের দিকে ফিরে বলল : "আরেকটু খোঁড়ো ভাই।"

নীচে থেকে এঁটেল মাটির দলা খুঁড়ে বের করতে ভয়ানক মুশকিল হচ্ছিল সেমিয়নের। মাথার উপর দিয়ে শিস্ কেটে চলেছে বুলেট। কোদালটা ঠুকে গেল একটা ইটের ওপর। গাল পাড়তে পাড়তে সে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠতেই হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন আঘাত অনুভব করল। দম আটকে খাবি খেতে খেতে সে নিজেরই খোঁড়া গর্তটার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

'ভলাণ্টিয়ার বাহিনী'কে প্রতিরোধ করবার জন্য অসংখ্য ছোট-খাট লড়াই করতে হয়েছিল সেমিয়নদের। সেইরকমই একটা লড়াই এখানেও চলছে। লাল বাহিনীর সংখ্যা বরাবরই অনেক বেশি থাকে, এবারও তাই। আর যখন তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয় সেটাও তাদের পক্ষে বড়ো একটা মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় না, কারণ লড়াই করবার পুরো শক্তি বজায় রেখেই তারা পিছু হটে। গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জয়লাভটাই তাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন ছিল না। অবস্থা যদি সুবিধাজনক না-ও থাকে, কিংবা ক্যাডেটদের তরফ থেকে আক্রমণটা যদি কোনো সময়ে একটু বেশি মারাত্মকই হয়ে পড়ে, তাহলেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। তারা তখন আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—কর্নিলভকেও নির্বিবাদে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

'ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর' কাছে কিন্তু প্রত্যেকটা লড়াইই জীবন-মরণের প্রশ্ন।

যুদ্ধে জেতাটা তাদের পক্ষে নেহাতই বাধ্যতামূলক। আর প্রত্যেকটা লড়াইয়ের পরই রসদ-বোঝাই গাড়ী আর আহতদের নিয়ে এক একদিনে প্রকাণ্ড রাস্তা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে হয় তাদের। পশ্চাদপসরণ করার কোনো সুবিধেই নেই। তাই নেহাত মরীয়া হয়ে গিয়ে সেই জোরেই কর্নিলভের সৈন্যরা যুদ্ধে জিতে ফেলে। এবারও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটছে।

রণাঙ্গনের যে রেখা বরাবর মেশিনগানের গুলিগোলা চলছে সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে গতবছরের পুরনো একটা খড়ের গাদার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন কর্নিলভ, পা দুটো ফাঁক করে। কনুই উঁচু করে ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখছিলেন, কাঁধের উপর দুলছিল একটা ক্যানভাসের ঝোলা। ধূসর পটিলাগানো কালো ভেড়ার চামড়ার কোটটার বোতামগুলো সব খোলা। বড় গরম বোধ হচ্ছিল তাঁর। ছ্যাঁকড়া পাকা দাড়িতে ঢাকা থুতনিটা একগুঁয়ে ভঙ্গীতে উঁচিয়ে ছিল ফিল্ডগ্লাসের তলা দিয়ে।

খড়ের গাদার একদিকটা চেপে ধরে নীচে দাঁড়িয়েছিল লেফটেন্যাণ্ট দোলিন্‌স্কি, কম্যাণ্ডারের সহকারী। যুবকটির বড়ো বড়ো চোখ আর কালো ভুরু, পরনে অফিসারের লম্বা কোট আর নক্‌শাকাটা চটকদার চূড়ো টুপি। উত্তেজনায় গলার ভেতরটা যেন আটকে যাচ্ছিল তার, ঢোঁক গিলে সামলে নিয়ে কম্যাণ্ডারের পাকা দাড়িওয়ালা থুতনিটার দিকে তাকাচ্ছিল সে—যেন ঐ ক'গাছি দাড়ির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ওদের সব আশাভরসা, ওদের প্রাণ-ভোমরা—কত আপন আর কত কাছাকাছি!

"জেনারেল সাহেব, আপনি দয়া করে নেমে আসুন—আমার অনুরোধ।—গুলি লেগে যেতে পারে হঠাৎ।" বারে বারে কাতরভাবে মিনতি জানাতে থাকল দোলিন্‌স্কি। ওর নজরে পড়ল কর্নিলভের বেগুনী ঠোঁট দুটো উত্তেজনায় ফাঁক হয়ে গেছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। এর অর্থ অবস্থা খুব ঘোরালো। দোলিন্‌স্কি আর চেয়ে দেখল না ওই দিকটাতে যেখানে বলশেভিক সারির খুদে খুদে কালো মূর্তিগুলো সচল হয়ে উঠেছে, বাদামী-সবুজ স্তেপভূমির ওপরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে তারা। ওদের মাথার উপর দিয়ে একটানা শিস্‌ কেটে ফেটে পড়ছে কামানের গোলা। কিন্তু দোলিন্‌স্কি তো ভাল করেই জানে কটা মাত্র গোলা তাদের আর অবশিষ্ট আছে!—হা ভগবান্‌, কটা মাত্র গোলাই বা রয়েছে! পুলটা যেখানে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তারই ওপাশ থেকে বলশেভিকদের ভারী কামানের গম্ভীর 'বুম্‌ বুম্‌' আওয়াজ ভেসে আসছে। ...দ্রুততালে খক্‌ খক্‌ করে গর্জে উঠছে মেশিনগান। কম্যাণ্ডারের মাথার উপর দিয়ে অসংখ্য মৌমাছির মতো গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে বুলেটের ঝাঁক।

"গুলি লেগে যাবে যে, জেনারেল সাহেব!...'

কর্নিলভ ফিল্ড-গ্লাস জোড়া ছেড়ে দিলেন হাত থেকে—পাশে ঝুলতে লাগল সেটা। পাখীর মতো কালো চোখ বসানো মঙ্গোলীয় ছাঁচের রোদে-পোড়া মুখটা কুঁচকে উঠল একবার। খড়ের গাদাটার ওপর একবার পা দাপিয়ে তিনি ঘুরে

দাঁড়ালেন। ঘোড়া থেকে নেমে একদল তুর্কমেন সওয়ার জড়ো হয়েছিল খড়ের গাদাটার পেছনেই। সেই দিকে ঝুঁকলেন কর্নিলভ। ওরা সবাই তাঁর দেহ-রক্ষী। রোগা প্যাঁকাটির মতো শরীর ওদের, পাগুলো ধনুকের মতো বাঁকা,—আবার এদিকে মাথায় চড়িয়েছে ভেড়ার চামড়ার তৈরি বড় বড় গোল টুপি, গায়ে গোলাপী-নারঙ্ সিরকাশিয়ান জামা। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে রোগা রোগা ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ওরা।

হেঁড়ে গলায় খেঁকিয়ে উঠে কর্নিলভ কী একটা আদেশ করলেন, আঙুল দিয়ে দেখালেন উপত্যকার দিকটা। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের মতো তড়াক করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনের ওপর। তালুতে জিভ লাগিয়ে একটা বিশেষ ধরনের আওয়াজ করে উঠল একজন। মাথার ওপর বাঁকা তলোয়ার ঘুরিয়ে সবাই ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল; প্রথমে কদম চালে তারপর পূর্ণগতিতে তারা ছুটে চলল উপত্যকার দিকের স্তেপ অঞ্চলে। উপত্যকার পাশেই একফালি কালো ক্ষেত-জমি, আর পিছন দিকে সেই রেললাইনটি।

সেমিয়ন ক্রাসিলনিকভ কাত হয়ে পড়ে আছে—এই ভাবেই এখন খানিকটা আরাম বোধ হচ্ছে তার। ঘণ্টাখানেক আগেও যে লোকটা সবল আর সতেজভাবে চলাফেরা করেছে, এখন সে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে ক্ষীণকণ্ঠে, মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তের গাঁজলা। তার ডানে ও বাঁয়ে দুদিকেই, কমরেডরা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর গুলি ছুঁড়ছে। ওর মতো তারাও সবাই তাকিয়ে রয়েছে উপত্যকার উল্টো তরফের ওই হলদে ঢালু জমিটার দিকে। প্রায় পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার ঢাল বেয়ে নামছে লাভাস্রোতের মতো। শত্রুপক্ষের রিজার্ভ অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়েছে।

পিছন থেকে একটি লোক ছুটে এসে ক্রাসিল্‌নিকভের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হাতে একটা 'মসার' পিস্তল নাচিয়ে সে ভাঙা গলায় চীৎকার করতে লাগল। পরনে তার কালো চামড়ার জ্যাকেট। ঘোড়সওয়াররা খটমট্ করে উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামছিল। চামড়ার জ্যাকেটপরা লোকটি নিতান্ত অসামরিক ধরনে অথচ রীতিমত হুকুমের ঢঙে চেঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ

"পালাবে না খবরদার!—দাঁড়িয়ে থাক যে যেখানে আছ!"

উপত্যকার এদিককার ঢালটায় এবার অনেকগুলো বড়ো বড়ো টুপি দেখা গেল, আর সেই সঙ্গে শোনা গেল বাতাসের গর্জনের মতো একটানা চীৎকার। তুর্কমেনরা এগিয়ে আসছে সবেগে। ডোরাকাটা তুলোর জামা গায়ে ঘোড়ার কাঁধের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে ঝুঁকে পড়ে তারা জোর কদমে ডিঙিয়ে আসছে এঁটেল মাটির ক্ষেতটা। লাঙলের দাগের মধ্যে মধ্যে এখনও দেখা যায় ধুলো-মাখা বরফের চিহ্ন। ঘোড়ার খুরে লেগে ছিটকে উঠছে কাদামাটির ডেলা। লম্বা-টুপিপরা ঐ ক্ষুদে মানুষগুলোর গলা থেকে এমন বিকট আওয়াজ বেরুচ্ছে যে শুনলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। গোঁফওয়ালা রোদ-পোড়া মুখগুলোর মধ্যে তাদের ঐ বিস্ফারিত দাঁতগুলো যেন হিংস্র হাসিতে ঝিকিয়ে উঠছে। জলে রোদ্দুর পড়লে

যেমন হয় তেমনি চিক্‌চিক্‌ করে উঠছে বাঁকা তলোয়ারগুলো। অশ্বারোহীবাহিনীর এই আক্রমণ কিভাবে ফিরিয়ে দেবে লাল-বাহিনী? ক্ষেত ছেড়ে উঠে পড়ে ধূসর-কোটপরা মূর্তিগুলো। গুলি চালাতে চালাতে পিছু হটতে থাকে তারা। চামড়ার জ্যাকেটপরা কমিসার এবার ক্ষেপে গেলেন—লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের একজনের পিঠে গুঁতো দিয়ে বললেন—"সামনে চলো—বেয়নেট চালাও এবার!"

ক্রাসিল্‌নিকভের মনে হল ডোরাকাটা জামা-পরা মূর্তিগুলোর একটা যেন ইচ্ছে করেই ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ওস্তাদ ঘোড়াটাও ঘাড় বেঁকিয়ে ভীতিবিহ্বল চোখে একবার তাকিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, ধোঁয়ার কালো মেঘে ঢেকে গেল চারদিক, ফৌজী সারির উপর ফেটে পড়ল কামানের গোলার হলদে বজ্রশিখা। ঢল্‌ঢলে লম্বাকোট পরা রসিক ছেলে ওই ভাস্‌কা,—হঠাৎ সে আতঙ্কে রাইফেলটা ছেড়ে দিল হাত থেকে। বিবর্ণ চোখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল বজ্র-দমকে এগিয়ে আসা করাল মৃত্যুর মুখোমুখি। ঘোড়সওয়াররা ক্রমেই কাছে চলে আসছে, ক্রমান্বয়ে বড়ো হয়ে উঠছে তাদের মূর্তিগুলো। ওদের মধ্যে একজন যেন তীরবেগে বাতাস চিরে এগিয়ে এল কুকুরের মতো ঘাড় নীচু করে,—তার ছুটন্ত ঘোড়াটা যেন বুক দিয়ে মাটি ছোঁয় আর কি! ঘোড়ার রেকাবের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় সওয়ার। তার পোশাকের প্রান্ত যেন আলাদা হয়ে উড়তে থাকে বাতাসে।

রাইফেলটার দিকে হাত বাড়িয়ে ক্রাসিল্‌নিকভ ফুঁশে উঠল : "শুয়োরটা! আমাদের কমিসারকে খুন করবে দেখছি!" কমিসারের চামড়ার জ্যাকেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়সওয়ার।

"গুলি করো, গুলি করো লোকটাকে—কি, পারছ না?"

ক্রাসিল্‌নিকভ শুধু দেখতে পেল একটা বাঁকা তলোয়ার ঝল্‌কে নেমে আসছে চামড়ার জ্যাকেটটার উপর।...পর মুহূর্তে গোটা ঘোড়সওয়ার দলটাই বন্যার মতো নেমে এল ওদের সৈন্য-সারির উপর। ঘোড়ার ঘামের গন্ধে-ভরা একটা দমকা গরম বাতাসও বয়ে এল সেই সঙ্গে।

লাইন ডিঙিয়ে তুর্কমেনরা ছুটে গেল একেবারে কিনারার দিকে। হালকা-ধূসর আর কালো গ্রেটকোট পরা আর একদল লোক ঠিক সেই সময় ছুটে বেরিয়ে এল উপত্যকা থেকে, হুমড়ি খেয়ে তারা এগিয়ে এল ক্ষেত পেরিয়ে। তাদের কাঁধের ওপর অফিসারদের প্রতীক-চিহ্ন চক্‌চক্‌ করছে।

'হুর্‌-রা-হ্‌!'

লড়াইটা ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এল রেল-লাইনের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে ক্রাসিল্‌নিকভ শুনতে পাচ্ছিল আহত কমিসারের একটানা আর্ত গোঙানি। গুলিগোলার শব্দ ক্রমেই কমে আসছে। অবশেষে বন্দুকের আওয়াজ একেবারেই থেমে গেল। ক্রাসিলনিকভ্‌ চোখ বুজে আছে—তার মাথাটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বুকেও একটা বেদনা। নিজের জন্য একটা দারুণ মায়া অনুভব করতে লাগল সে, মরতে সে কখনই চায় না। শরীরটা যেন ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে, এখনই যেন

মাটির মধ্যে ডুবে যাবে সে। বড্ড মনে পড়ছে তার স্ত্রী মাত্রিয়োনার কথা। সে ছাড়া তার স্ত্রী বাঁচবেই বা কেমন করে! তার পথ চেয়ে কত অধীর প্রতীক্ষাই না করেছে মাত্রিয়োনা, তাগান্‌রগে সে লিখেছে চিঠির পর চিঠি—এস গো, একবারটি এস! মাত্রিয়োনা এখন যদি থাকতো তার কাছে, ক্ষতস্থান বেঁধে দিত, জল এনে দিত—উঃ এক'গ্লাস ঠাণ্ডা জল পেলে এখন কী আরামই না হত...তারপর এক ভাঁড় দই...

ক্রাসিল্‌নিকভের কানে এল অনেকগুলো গলার আওয়াজ, কারা যেন গালাগাল করছে। তার কমরেডরা তো নয়, এতো অফিসারদের গলা—সাবধানে চোখ খুলল সে। চারজন অফিসার একসঙ্গে হেঁটে চলেছে। একজনের গায়ে সিরকাশিয়ান জামা, দুজনের পরনে অফিসারদের গ্রেটকোট, আর চতুর্থজনের গায়ে 'এন্‌-সি-ও' প্রতীকচিহ্ন লাগানো ছাত্রদের ওভারকোট। রাইফেলগুলোকে বগলদাবা করে হাঁটছে ওরা শিকারীদের মতো।

"দেখ দেখ, নাবিক একটা—বেজন্মাটাকে খতম করে দাও তো!"—বলল একজন।

"ছেড়ে দাও,—মরে গেছে লোকটা। ঐ যে ওদিকের লোকটা এখনও বেঁচে আছে দেখছি।"

পরিহাস-প্রিয় সেই ভাস্‌কা ছেলেটির ভূ-লুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সিরকাশিয়ান জামা-পরা লোকটা হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, "ওঠ্‌!"—সঙ্গে সঙ্গে ভাস্‌কার উপর ঝাড়ল একটা লাথি।

ক্রাসিল্‌নিকভ দেখল ভাস্‌কা উঠে বসেছে, মুখের অর্ধেকটা তার ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

"টেন্‌—শান!" —চীৎকার করে উঠেই সিরকাশিয়ান-পরা লোকটা ভাস্‌কার মুখের উপর চড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গে চারজনই বাগিয়ে ধরল রাইফেল।

"আমায় ছেড়ে দিন খুড়ো, দয়া করে!"— কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল ভাস্‌কা।

সিরকাশিয়ান জামাপরা লোকটা এক লাফ দিয়ে সরে গেল তার কাছ থেকে। তারপর সজোরে ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে ভাস্‌কার পেটের মধ্যে গেঁথে দিল বেয়নেটের ফলাটা। ঘুরে দাঁড়িয়েই লোকটা হাঁটতে শুরু করল। অন্য তিন-জন তখন ভাস্‌কার উপর ঝুঁকে পড়ে তার বুটজোড়া টেনে খুলতে লেগেছে।

বন্দীদের গুলি করে মেরে, গ্রাম কাউন্সিলের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে ভলাণ্টিয়াররা গ্রামের মানুষদের শিক্ষা দিতে লাগল যাতে তারা আর দ্বিতীয়বার টুঁ শব্দটি না করে। তারপর তারা দক্ষিণের পথ ধরে আবার এগোতে শুরু করল। এদিকে কসাকরা গ্রামে ফিরে আসার মুখে ক্ষেতের মধ্যে ক্রাসিল্‌নিকভকে পেয়ে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এল। সদ্য-গজানো হালকা সবুজ ঘাসের শীষে ঢাকা স্তেপভূমিকে পেছনে ফেলে ক্যাডেটদের সৈন্যরেখা নীচু দিগন্তের আড়ালে সবেমাত্র অদৃশ্য হয়েছে, এমন সময় গ্রামে ফিরে এল কসাকরা তাদের স্ত্রী-পুত্র গরুভেড়া নিয়ে।

সেমিয়ন ক্রাসিল্‌নিকভ চায়নি যে সে অজানা অচেনা একদল মানুষের

মাঝে এসে মারা পড়ে। সঙ্গে কিছু পয়সাকড়ি ছিল। একজন লোকও জুটে গেল যে তার গাড়ীতে করে সেমিয়নকে রস্তভ পৌঁছে দিতে পারে। রস্তভে এসে সেমিয়ন তার ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখে জানাল যে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে সে, অপরিচিতদের মধ্যে মরতে তার ভয় হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাত্রিয়োনাকে দেখবার ইচ্ছাও প্রকাশ করল সে। পত্রের বাহক সেমিয়নদের গ্রামেরই লোক।

১৯১৮ সাল অবধি সেমিয়ন কৃষ্ণ-সাগরীয় নৌবহরে কাজ করেছে। 'কার্চ্' ডেস্ট্রয়ারের নাবিক ছিল সে। এই নৌবহরটা ছিল অ্যাডমিরাল কল্চাকের অধীনে। কল্চাকের প্রতিভা ছিল, শিক্ষাদীক্ষা ছিল, তাঁর ধারণায় তিনি রাশিয়াকে ভালোবাসতেন নিঃস্বার্থভাবে; অথচ কী ঘটেছে না ঘটেছে, দেশের মাটিতে আজ কোন্ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না লোকটির। সারা দুনিয়ার নৌশক্তি আর অস্ত্রশস্ত্রের খবর ছিল তাঁর নখদর্পণে, সামুদ্রিক কুয়াশার মধ্যেও তিনি শুধু রেখাকৃতি দেখে যে-কোনো যুদ্ধ-জাহাজকে চিনে ফেলতে পারতেন, মাইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি; তার ওপরে আবার 'ৎসুসিমা'র* বিপর্যয়ের পর থেকে রুশ নৌবহরের কর্মদক্ষতা বাড়াবার অভিযানে তিনি একটা প্রধান ভূমিকাও নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালের আগে তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে স্রেফ জবাব দিতেন যে ও-ব্যাপারে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই, তিনি ওসব বোঝেনও না। তাঁর মতে রাজনীতি হল রং-চটা কেতাব-পড়া মেয়ে, ইহুদী আর ছাত্রদের কারবার।

তার কাছে রাশিয়ার একমাত্র রূপ হল: সারি সারি যুদ্ধ-জাহাজের ধূমায়মান চিম্নি (বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে), নৌবহরের প্রধান জাহাজটার মাস্তুলে সগর্বে পত্পত্ করছে সেণ্ট্ এণ্ড্রুর পতাকা, আর তাই দেখে ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে জার্মানি। যুদ্ধসংক্রান্ত সরকারী দপ্তরখানা-বাড়ীর কড়া সম্রাজশাহী স্টাইলের প্রবেশপথটা তাঁর ভারী পছন্দ; চিরপরিচিত হলঘরের খাস-খানসামা এসে তাঁর কোটটা খুলতে সাহায্য করবে পিতৃসুলভ যত্নসহকারে, আর বলবে, 'বড্ড বিশ্রী আবহাওয়া, আলেকসান্দার ভাসিলিয়েভিচ্!' ভদ্র-পরিবার-জাত সুপুরুষ সহকর্মী বন্ধুদেরও তিনি ভালবাসতেন, আর মনে মনে ভক্তি করেন অফিসার ক্লাবের গাম্ভীর্যময়, অন্তরঙ্গ পরিবেশটিকে। কল্চাক যে সমাজের তারিফ করতেন, যে ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতেন তার উৎসমুখ ছিলেন স্বয়ং রুশ-সম্রাট।

---

* ৎসুসিমা—কোরিয়া প্রণালীর একটি দ্বীপ। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় (১৯০৪-০৫) জারের আনাড়ি সমরনীতির দৌলতে রুশ নৌবাহিনী জোর মার খেয়ে যায় জাপানীদের হাতে। অবশ্য জাপানী নৌবহরেরও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

আর একটি রাশিয়াও ছিল যাকে কল্চাক কম ভালবাসতেন না : সে হল ফিতে-লাগানো-টুপি-পরা চওড়া-মুখ রোদে-পোড়া শক্ত-সমর্থ নাবিকদের রাশিয়া, যে-রাশিয়া কোয়ার্টার ডেকের উপর সারি বেঁধে দাঁড়াত; সে হল সেই রাশিয়া যার পরিচয় পেতেন কল্চাক সূর্যাস্তের সময় পতাকা অবনমিত হলে সান্ধ্য উপাসনার উদাত্ত কণ্ঠসংগীতে, সে রাশিয়া জানতো কেমন করে টুঁ শব্দটি না করে হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এমন দেশ নিয়েই তো গর্ব করা চলে।

১৯১৭ সালে একমুহূর্ত কালবিলম্ব না করে কল্চাক 'অস্থায়ী সরকারের' প্রতি তাঁর আনুগত্যের শপথ জানালেন। কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের পরিচালনা-ভার তাঁর হাতেই রয়ে গেল। যা ছিল অবশ্যম্ভাবী তার প্রতি বশ্যতাস্বীকারের তিক্ত অনুভূতি নিয়ে কল্চাক নিঃশব্দে হজম করে গেলেন সাম্রাজ্যের কর্ণধারের পতনের জ্বালা। দাঁতে দাঁতে চেপে মেনে নিলেন নাবিক-কমিটিকে, বিপ্লবী কাজ-কানুনের ধারাকে,—রাশিয়া আর তার নৌশক্তিকে জার্মানির সাথে লড়াইয়ের সামিল রাখবার জন্য তিনি সবকিছুই মেনে নিতে পারতেন। সমস্ত হারিয়ে শেষ পর্যন্ত একখানা টর্পেডোবোট মাত্র সম্বল করেও তিনি লড়াই চালাতে প্রস্তুত ছিলেন। সেবাস্তোপোলের নাবিক-সভাগুলোতে গিয়ে তিনি স্থানীয় কিংবা বাইরের বক্তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতার জবাবে শুধু এই কথাই বলতেন যে, দার্দানেলিস্ আর বস্ফোরাসে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থই নেই, কারণ তাঁর জমিও নেই কারখানাও নেই, রপ্তানি করার মতো মালও নেই—তিনি শুধু চান যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ, 'বুর্জোয়াদের দালাল হিসাবে নয়' (এ-কথাটা বলার সময় অবশ্য তাঁর বলিষ্ঠ চিবুক, দুর্বল ঠোঁট, আর কোটরে-বসা চোখওয়ালা পরিষ্কার-কামানো মুখটা উন্নাসিক বিকৃতিতে কুঁচকে উঠতো), 'সত্যিকারের রুশ দেশপ্রেমিকের মতোই' তিনি যুদ্ধ কামনা করেন।

নাবিকরা হাসতো। অসহ্য মনে হতো কল্চাকের! দু'দিন আগেও এরা দেশের জন্য, সেণ্ট্ এণ্ড্রুর পতাকার জন্য, যে কোনও ঝড়-ঝঞ্ঝা সইতে রাজী ছিল আর আজ কিনা তাদেরই অ্যাডমিরালকে হুমকি দিয়ে চীৎকার করছে : 'সাম্রাজ্যবাদের দালালরা নিপাত যাক!'

'রুশ দেশপ্রেমিক' কথাটি তিনি একটু জোর দিয়েই বলতেন। যখন বলতেন তখন ভাবভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে খোলাখুলি এটাই বুঝিয়ে দিতেন যে সেই মুহূর্তেই প্রয়োজন হলে তিনি জীবনদান করতে প্রস্তুত;—অথচ, ঐ হতচ্ছাড়া নাবিকগুলোর মাথায় যে কী শয়তানী ঢুকেছে, অ্যাডমিরাল সাহেবের বক্তৃতা শুনে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তিনি তাদের শত্রু, নানা ফন্দীবাজি করে তাদের ভোলাতে এসেছেন ফাঁদে ফেলবার জন্য।

মিটিং-এ শুনেছে সেমিয়ন ক্রাসিল্নিকভ, যুদ্ধটাকে যারা টানতে চায় তারা আসলে 'দেশপ্রেমিক' নয়, তারা হল শিল্পপতি আর বড় বড় জমিদার, লড়াইয়ে যাদের ষোল আনা মুনাফা; জনসাধারণের কোনই প্রয়োজন নেই অনর্থক যুদ্ধ

চালিয়ে যাবার। সে শুনেছে যে জার্মানরাও আসলে রুশদেরই মতো কিসান আর মজুর, তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের রক্তচোষা বুর্জোয়া আর মেন্‌শেভিকদের পাল্লায় পড়ে। সভা-সমিতিগুলোতে নাবিকরা যেন ঘৃণায় পাগল হয়ে উঠত ঃ "হাজার বছর ধরে ওরা রাশিয়ার মানুষকে প্রবঞ্চনা করছে! আমাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে হাজার বছর ধরে!—ঐ জমিদার আর বুর্জোয়ার দল, বিষাক্ত গোখ্‌রোগুলো!" চোখ খুলে যেত লোকের : "এইজন্যই তাহলে আমরা চিরকাল গরুভেড়ার মতো জীবন কাটিয়েছি?...ঐখানেই তাহলে দুশমনগুলোর মাথা গুঁজবার জায়গা?" বাড়ীর জন্য সেমিয়নের মনটা ভয়ানক ছটফট করত। ছেড়ে-আসা জোতজমি, আর ঘরে তার যুবতী স্ত্রী। কিন্তু তবু সে যখন বক্তাদের কথা শুনতো, উত্তেজনায় তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠত, অন্য সকলের মতো সে-ও বিপ্লবের মদে চুর হয়ে যেত, প্রচণ্ড নেশায় সে ভুলে বসত বাড়ীঘরের কথা, সুন্দরী মাত্রিয়োনার জন্য তার আকুল প্রতীক্ষার কথা।......

ভাসিলি রুব্‌লেভ নামে একজন নামজাদা আন্দোলনকারী এল পেত্রোগ্রাদ থেকে। রুব্‌লেভ তাদের প্রশ্ন করল ঃ "তোমরা কি চিরকালই ভাঁড়ের অভিনয় করে যাবে ভাইসব? সভাসমিতিতে দাঁত খিঁচিয়েই কি খুশি থাকবে চিরদিন? কেরেন্‌স্কি অনেকদিন আগেই তোমাদের বিকিয়ে দিয়েছে পুঁজিবাদীদের হাতে। আর কটা দিন মাত্র ওরা সময় দেবে তোমাদের ঠেকিয়ে রাখবার, তারপরই প্রতি-বিপ্লবীরা শুরু করবে হত্যার অভিযান, প্রত্যেককে কচুকাটা করবে তারা। তাই ভাইসব, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই কল্‌চাকের নিকেশ করে ফেল, তোমাদের মজুর ও কিসানদের হাতে তুলে নাও নৌ-বহরের ভার।......"

পরদিন একটি যুদ্ধজাহাজ থেকে বেতারযোগে ঘোষণা করা হল ঃ "অফিসার-দের নিরস্ত্র কর!" কয়েকজন অফিসার আত্মহত্যা করল, বাদবাকী সবাই অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল। প্রধান সামরিক পোত 'বিজয়ী সেণ্ট জর্জ'-এর উপরতলার ডেকে কল্‌চাক তাঁর গোটা নাবিকবাহিনীকে তলব করলেন। হাসতে হাসতে কোয়ার্টার ডেকের ওপর উঠে এল নাবিকরা। পুরো উর্দি পরে কল্‌চাক দাঁড়িয়েছিলেন 'ব্রিজ'-এর ওপর।

"নাবিক সেপাইরা!" সুতীক্ষ্ম ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি, "সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ঘটে গেছে। জনগণের শত্রু গুপ্ত জার্মান দালালরা অফিসারদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়েছে। এমন নির্বোধ কি কেউ আছে যে সত্যি সত্যিই বলতে পারে অফিসাররা প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত পাকাচ্ছিল? মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আমি একথা আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রতিবিপ্লব বলে কোনো বস্তু নেই—প্রতিবিপ্লব বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই নেই।"

এই পর্যন্ত বলে অ্যাডমিরাল ব্রিজের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন। কোমরে ঝোলানো তলোয়ারটার ঝনৎকারে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মেজাজ কতটা চড়ে আছে।

"যা কিছু ঘটেছে তাকে আমি প্রধানত ও প্রথমত আমারই ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করি, তোমাদের প্রধান অফিসার হিসাবে এ-সব আমারই অপমান।

স্বভাবতই, নৌবহরকে পরিচালনা করতে আমি আর পারব না এবং আমি তা করবও না। এখনই আমি গভর্নমেণ্টকে তার পাঠাব 'নৌবহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি' বলে। যথেষ্ট হয়েছে আমার!"

সেমিয়ন দেখল অ্যাডমিরাল তাঁর তলোয়ারের সোনা-বাঁধানো হাতলটা চেপে ধরে চেষ্টা করছেন বেল্ট থেকে সেটাকে টেনে বের করতে। কিন্তু বিশ্রীভাবে আটকে গেছে দেখে তিনি রেগে টানাটানি করতে লাগলেন প্রাণপণে। তাঁর ঠোঁট পর্যন্ত নীল হয়ে উঠেছে।

"যে কোনো খাঁটি অফিসার আমার জায়গায় হলে ঐ একই পথ ধরত!"

তলোয়ারটা শূন্যে তুলে তিনি সেটাকে ছুঁড়ে দিলেন সমুদ্রগর্ভে। কিন্তু বীরত্বের এই মহান্ ব্যঞ্জনাতেও এতটুকু মুগ্ধ হল না নাবিকরা।

সেই মুহূর্ত থেকে গোটা নৌবাহিনী চঞ্চল হয়ে উঠল, ঝড় জমে উঠল দিগন্তে। সমুদ্র-জীবনের সাধারণ সূত্রে বাঁধা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, বেপরোয়া, কর্মকুশল নাবিকদের ঐক্যও সুনিবিড়; দেশবিদেশ ঘুরে, নানা সাগর-মহাসাগর দেখে তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে বিস্তর। স্থলসৈনিকদের চেয়ে এমনিতেই তাদের চেতনা অনেক অগ্রসর। অফিসারদের মেস-ঘর আর সাধারণ খালাসীদের কোয়ার্টারের মধ্যে ফারাকটা যে কত দুস্তর সে-ও তারা ভাল করেই জানে। আর তাদের এই অভিজ্ঞতার ফলে বারুদের মতো প্রচণ্ড বিস্ফোরকে পরিণত হয়েছে তারা। বিপ্লবের কাজে লাগাতে ওদের একটুও বেগ পেতে হয় নি। পুঞ্জীভূত ক্ষুব্ধ আবেগ নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামের আগুনে। যে দুশমন তখন পর্যন্ত আগু-পিছু করছিল, মনস্থির করতে না পেরে দীর্ঘসূত্রতার পথ ধরে বলসঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল, তাকে ওরাই প্রথম খুঁচিয়ে তুলল, টেনে আনল লড়াইয়ের আঙিনায়।

সেমিয়নের তখন আর বাড়ীঘর-বৌয়ের কথা ভাববার সময় নেই। অক্টোবর মাস না পড়তেই, বক্তৃতাবাজির দিন ফুরিয়ে গেল, শুরু হল বন্দুকের ভাষায় কথা বলার পালা। আনাচে-কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে শত্রু। ঘৃণাভরা প্রত্যেকটি চোখের চঞ্চল ভয়চকিত দৃষ্টিতে মৃত্যুর হাতছানি। বিশৃঙ্খলার পঙ্কশয্যায় সারা রাশিয়া হাবুডুবু খাচ্ছে—বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, শ্বেতসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর। সেমিয়নও কাঁধে ঝুলিয়ে নিল তার রাইফেল, 'সহস্র-ফণা প্রতিবিপ্লবী নাগিনীর' বিষদাঁত ভাঙবার অভিযানে কদম বাড়াল সে।

একটা পুলিন্দা আর কেতলি পিঠে ঝুলিয়ে রশ্চিন ও কাতিয়া স্টেশনের প্রচণ্ড ভীড়ের মাঝে পথ করে এগিয়ে আসছিল! মানুষের বন্যাস্রোত তাদের ঠেলে নিয়ে এল পাহারা-ঘুমটির উদ্যত বেয়নেট দুটির মাঝে। একবার বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাদের চলার গতি হয়ে গেল উদ্দেশ্যহীন, রস্তভের প্রধান সড়কটা ধরে এগিয়ে চলল তারা। ছ' সপ্তাহ আগেও পিতাসর্বস্ব সমাজের সেরা সুন্দরীরা এখানকার দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়িয়েছে সওদা করে। দেহরক্ষীদের টুপি আর রেকাবের টুংটাং আওয়াজে সেদিনও রাজপথগুলো হয়ে উঠেছে আনন্দমুখর, এখানে

ওখানে হয়তো শোনা গিয়েছে দু'একটা ফরাসী শব্দের টুকরো, ঠাণ্ডা ভিজে বাতাসের হাত থেকে নাক বাঁচাবার জন্য দামী ফারের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন বাহারে পোশাক পরা মহিলারা। অবিশ্বাস্যরকম হালকা চিন্তা এঁদের, খালি হয়তো ভেবেছেন এখানে আর কটা দিন শীতটা কাটিয়ে তারপর যথাসময়ে ফিরে যাবেন পেত্রোগ্রাদের উজ্জ্বল নৈশজীবনে, আবার আশ্রয় নেবেন তাঁদের ফ্ল্যাটে আর অট্টালিকায় ভক্তিমান্ খানসামাদের মাঝে, থামওয়ালা বসার-ঘরে, কার্পেট আর গন্‌গনে আগুনের উষ্ণ পরিবেশে। আহা, পিতার্সবুর্গ! শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভালোভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে নিশ্চয়! বাহারে পোশাক পরা মহিলাদের দোষ দেবার আর কি আছে!

তারপর হঠাৎ,—যেন কোনো বিরাট ঘূর্ণ্যমান অভিনয়-মঞ্চের অধ্যক্ষের হাতের তালি শুনেই, অদৃশ্য হয়ে গেল সবকিছু। দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেল। রস্তভের রাস্তা পরিত্যক্ত, দোকানঘরগুলো ঢাকা পড়ল তক্তার আড়ালে, বুলেটের গর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গেল জানলার শার্সিগুলো। ভদ্রমহিলারা তাঁদের ফারের জামা লুকিয়ে ফেললেন, রুমাল বাঁধলেন মাথায়। কর্নিলভের সঙ্গে পালালেন কয়েকজন অফিসার কিন্তু বাদবাকি সবাই এক নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিরীহ নাগরিকে পরিণত হলেন, কেউ অভিনেতা, কেউ ক্যাবারে-গায়ক, কেউ নৃত্যশিক্ষক, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ফেব্রুয়ারির বাতাস এসে আবর্জনার মেঘে ঢেকে দিল প্রশস্ত রাজপথগুলো।

"বড্ড দেরিতে এসে পড়লাম আমরা" বলল রশ্‌চিন।

মাথা নীচু করে হাঁটছিল সে। তার মনে হচ্ছিল রাশিয়ার সারা দেহটিকে বুঝি হাজার টুকরোয় চুরমার করে ফেলা হয়েছে। সাম্রাজ্যের প্রহরী ওই পিতার্স-বুর্গের গম্বুজ আজ খান্‌খান্ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। জনসাধারণ পরিণত হয়েছে গড্ডালিকায়। মঞ্চের স্বচ্ছ পর্দার মতো মিলিয়ে গেছে ইতিহাস, অতীতের মহান্ গৌরব। আবরণ খসে বেরিয়ে পড়েছে নগ্ন, রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তর, সর্বাঙ্গে অসংখ্য কবরের ব্রণচিহ্ন নিয়ে। রাশিয়ার শেষ দিন...। রশ্‌চিনের মনে হল তার বুকের ভেতরে কি যেন একটা জিনিস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর তারই তীক্ষ্ম ভাঙা টুকরোগুলো বিঁধছে তার মনের সেই আজন্ম-কল্পিত অবিনশ্বর বস্তুটিতে, যাকে কেন্দ্র করে এতদিন আবর্তিত হয়েছে তার সমগ্র জীবন। কাতিয়ার পেছনে পেছনে হাঁটছিল সে, মাঝে মাঝে হোঁচটও খাচ্ছিল। ভাবছিল, রস্তভের পতন হয়েছে। রাশিয়ার যে অন্তিম ভগ্নাংশটুকু এখনও বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ কর্নিলভের ফৌজ, এবার তা'ও ধ্বংসের মুখোমুখি। সুতরাং ওরা যখন শেষ হবে তখন আর মগজে বুলেট চালিয়ে দেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না!

এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা। রশ্‌চিনের মনে পড়ল কয়েকজন প্রাক্তন ফৌজী বন্ধুর ঠিকানা। কিন্তু তারাও সম্ভবত পালিয়েছে কিংবা মারা পড়েছে। তা হলে এখন মৃত্যু ছাড়া তো আর কোনো পথ নজরে পড়ছে না। কাতিয়ার দিকে তাকাল সে। খাটো সুতীর জ্যাকেট আর ওরেনবুর্গ শালখানা চাপিয়ে সে পরম অচঞ্চল আর অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে। বড়ো বড়ো ধূসর চোখ-ওয়ালা মিষ্টি মুখখানা যেন অবাক বিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে দেখছে ছেঁড়া আবেদনপত্র

আর দোকানের জানলার ভাঙা শার্সিগুলো। একটা আবছা হাসির রেখা খেলে গেল কাতিয়ার ঠোঁটের কোণে। রশ্চিন ভাবে, 'ব্যাপারটা কী ভয়ংকর সে-সম্পর্কে কাতিয়ার কোনো ধারণাই নেই? তাও কি হয়? আমি তো বাবা এমন বিশ্বপ্রেমের কোনো মানেই বুঝি না!'

নিরস্ত্র একদল সৈনিক রাস্তার কোণে দাঁড়িয়েছিল। ওদের মধ্যে একজনের কালো চোখ, মুখে বসন্তের দাগ। বগলের নীচে একটা পোড়া-রঙের রুটি, তা থেকে আস্তে আস্তে একেকটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে সে মুখে ফেলে দিয়ে চিবুচ্ছে ধীরে ধীরে।

"এখানে যে কার কর্তৃত্ব, সোবিয়েত না আর কারুর, তা বোঝাই দুষ্কর, বুঝলে হে।" তাকে লক্ষ্য করে আরেকজন বলল কথাগুলো। শেষোক্ত লোকটির হাতে কাঠের একটা বাক্স, তার সঙ্গে বাঁধা পুরনো একজোড়া ফেল্টের জুতো। রুটি হাতে লোকটা জবাব দিল :

"কর্তৃত্ব হচ্ছে কমরেড ব্রয়নিত্স্কির। চল না একবার খুঁজে বের করি তাকে। ও যদি আমাদের একটা ট্রেন দেয় তা হলে চলে যাব। আর যদি না যাই তা হলে তো অনন্তকাল পচেই মরতে হবে এখানে।"

"ও লোকটি আবার কে? কোন্ পদের লোক?"

"মিলিটারি কমিসার, কিংবা ঐ রকম কিছু হবে......"

রশ্চিন এগিয়ে গেল সৈনিকদুটির সামনে। জিজ্ঞাসা করল একটা ঠিকানার কথা। নীরস গলায় জবাব দিল একজন :

"আমরা নিজেরাই নতুন এসেছি।"

আরেকজন বলল :

"খুব খারাপ সময়ে দনের এদিকটায় এসেছেন, অফিসার।"

কাতিয়া স্বামীর জামার হাতাটা চেপে ধরল। তারপর দুজনে গিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে উঠল। সেখানে একটা পাতাহীন গাছের নীচে ভাঙা বেঞ্চির উপর বসেছিল একজন বুড়ো মানুষ। পরনে সুতীর কোট, স্ট্র'-এর টুপি। ছড়ির হাতলটার উপর দাড়িগজানো থুতনি রেখে বসে আছে। ভয়ানকভাবে কাঁপছিল লোকটি, বোজা চোখের ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল ভাঙা গাল বেয়ে।

কাতিয়ার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল একটা কম্পনের রেখা। রশ্চিন তার জামার হাতাটা ধরে টানল।

"চলে এস, সবাইকে দয়া দেখাতে গেলে আর চলবে না..."

নোংরা জীর্ণ শহরটার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর অবশেষে তারা যে-বাড়ীটি চাইছিল সেটি খুঁজে পেল। ফটকের মধ্যে ঢুকতেই মোটা-মোটা পা-ওয়ালা একটি বেঁটে লোকের সঙ্গে দেখা হল ওদের। মাথাটা তার ডিমের খোলার মতো। একগাছি চুল নেই সেখানে। পরনে তুলোর আস্তর-দেয়া হাতা-শূন্য ফৌজী গেঞ্জী, তার ওপর জুতোর কালির ছোপ লেগেছে। কাঁধে একটা মদের ঝুড়ি, উগ্র দুর্গন্ধ সইতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে লোকটি। লেফটে-

ন্যান্ট কর্নেল তেৎকিন, রুশ্‌চিনের সহকর্মী অফিসার। ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ভাদিম পেত্রোভিচ্‌কে, তারপর সামরিক কায়দায় পায়ের গোড়ালি ঠুকে কাতিয়ার করমর্দন করল।

"সব বুঝতে পেরেছি—আর একটি কথাও না। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করছি আমি। কিন্তু একটা কামরার মধ্যে ভাগাভাগি করে থাকতে হবে। অবশ্য, তিন-ভাঁজ আয়না রয়েছে একটা, আর টবের মধ্যে রবার-গাছের চারা একটা। আমার গিন্নীটি হলেন এ-অঞ্চলেরই লোক, জানেন তো...। আগে আমরা ঐ ওখানটায় থাকতাম" (দোতলা ইটের বাড়ীটার দিকে দেখালো সে), "তারপর এলাম এখানে, একেবারে প্রোলেতারিয়ান কায়দায় আর কি!" (পাঁজর-বের-করা কাঠের কোঠা-ঘরটার দিকে দেখালো এবার), "আর আমি, দেখতেই পাচ্ছেন, বুট পালিশের কাজ করছি। লেবার এক্সচেঞ্জে বেকার হিসেবে নাম লিখিয়েছিলাম। আমাদের পড়শীরা যদ্দিন না খবরাখবর দিচ্ছেন তদ্দিন হয়তো কাটিয়ে যাব কোনোমতে। আমরা হলাম রাশিয়ান, এ সব অভ্যেস আমাদের আছে।"

প্রকান্ড মুখটা ব্যাদান করে সে হাসল, চমৎকার একপাটি দাঁতও দেখা গেল। তারপর হঠাৎ চিন্তান্বিতভাবে বলল লোকটি ঃ "দেখেছেন তো কী অবস্থা হয়েছে আমাদের!" হাত দিয়ে টাক ঘষতেই বুট পালিশের কালি লেগে গেল তার মাথায়।

তার মতোই বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারা তার স্ত্রীর। মিষ্টি সুরেলা গলায় সে অতিথিদের স্বাগত জানাল। কিন্তু তার পাতলা বাদামী রঙের চোখ-দুটো দেখে তাদের মনে হল না যে সে খুব একটা খুশিতে উপচে পড়ছে। রশ্‌চিন ও কাতিয়াকে একটা নীচু কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। দেয়ালের কাগজ-ঢাকা ছিঁড়ে গেছে, কোণের দিকটায় সত্যিই একটা নোংরা তিন-ভাঁজ আয়না, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে আয়নাটার কাঁচ; টবের মধ্যে একটা রবার গাছও রয়েছে। আর আছে লোহার খাট একখানা।

তেৎকিন বলল, "আয়নাটাকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছি জিনিসটাকে বাঁচাবার জন্য। দামী জিনিস, বুঝতেই পারছেন। একবার যদি এখানে ওরা হানা দিতে আসে তা হ'লে গুঁড়ো করে দেবে আয়নাটাকে। ওরা নিজের মুখ পর্যন্ত দেখতে ভালবাসে না।" টাক চুলকোতে চুলকোতে হেসে ফেলল সে আবার, "অবশ্য এক দিক দিয়ে আমি ওদের মনোভাবটা বুঝি। চারিদিকে এত ভাঙা-চোরা, বুঝলেন, তার মধ্যে আস্ত একটা আয়না—দেখলে ভাঙবার জন্য হাত নিশ্‌পিশ করবে বৈকি!"

তেৎকিনের স্ত্রী টেবিলটা গোছগাছ করছিল। কাঁটা-চামচগুলোয় অবশ্য মরচে ধরে গেছে। প্লেটগুলো ভাঙা—সম্ভবত ভালো জিনিসগুলো ওরা তুলে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ভাদিম আর কাতিয়া বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেল—ভাপে-সেদ্ধ মাছ, সাদা রুটি, চর্বি ও ভাজা ডিম। চারিপাশে ঘুরঘুর করে তদারক করে বেড়াচ্ছিল তেৎকিন আর মাঝে মাঝে ওদের প্লেটে তুলে দিচ্ছিল

খাবার। বুকের ওপর মোটা হাত দুটো ভাঁজ করে রেখে তেৎকিনের স্ত্রী সারাক্ষণ গজগজ করতে লাগল নানান্ কথা নিয়ে। "এই সব জঘন্য ব্যাপার চলছে, আর কী অত্যাচার—সেরেফ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়! মাসখানেক হল বাড়ী ছেড়ে মোটে বাইরেই বেরুইনি।...উঃ, ঐ বলশেভিকগুলোকে যদি একবার তাড়ানো যেত! আচ্ছা, রাজধানীতে এসব সম্পর্কে ওরা কি বলে? শিগ্গীরই এদের ঠান্ডা করে দেবে তো?"

উদ্বিগ্নস্বরে তেৎকিন বলল, "সাবধানে কথা বল, সোফিয়া। যা দিনকাল পড়েছে! এ সব শুনলে কেউ তোমায় আদর করে ছেড়ে দেবে, সে কথা মনেও এনো না।"

"না আমি থামবো না, গুলি করে মারুক না আমায়!" সোফিয়া ইভানোভ্নার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল, আরও জোরে হাত দুটো চেপে ধরল বুকের ওপর। "জার ফিরে আসবেন, নিশ্চয় ফিরে আসবেন!" স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুঁশতে ফুঁশতে বলল সে, "তুমিই খালি বোঝো না কিচ্ছু!"

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গী করে ভুরু উঁচোলো তেৎকিন। ওর বৌ যখন রাগে গজরাতে গজরাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল, ফিস্ফিস্ করে ও বলতে লাগল ঃ

"ও কিছু নয়, অমনিই একটু। লোক বড়ো ভাল আর কাজকম্মও যথেষ্ট করে, কিন্তু এই যা সব ব্যাপার চলছে এতেই ও পাগল হবার যোগাড়।..." (কাতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, চা পান করে তাজা হয়ে উঠেছে সে; আর রুশ্চিনও তখন একটা সিগারেট পাকিয়ে নিচ্ছে) "উঃ ভাদিম পেত্রোভিচ্, কী জটিলই যে হয়ে উঠেছে সব! যেমন-তেমন করে তো কিছু উড়িয়েও দিতে পারেন না? কত লোকের সাথেই তো মিশি, দেখিও অনেক কিছু।...দনের ওপারে ধরুন ঐ বাতায়িস্ক্, জায়গাটায় প্রায়ই যাই আমি—ওখানে যারা থাকে বেশির ভাগ লোকই গরিব, মজুর। কিন্তু ওরা বদমায়েশ নয়, ভাদিম পেত্রোভিচ্। উঁহু, ওরা আসলে অত্যাচারিত অপমানিত একদল মানুষ। সোবিয়েত শাসনের জন্য ওরা কি দারুণ লালায়িত! ঈশ্বরের দোহাই আমাকে তা বলে বলশেভিক বা ঐ রকম কিছু মনে করবেন না যেন..." (আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গী করে তার খাটো লোমশ হাতজোড়া সে বুকে চেপে ধরল)। "গোঁয়ারগোবিন্দ অকর্মা শাসকগুলো রস্তভ শহরটাকে তুলে দিয়ে গেল বলশেভিকদের হাতে। আতামান কালেদিনের আমলে যে কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার চলছিল তা যদি একবারটি আপনি দেখতেন! লম্পট আর দেমাকী সেপাইগুলো হরদম সাদোভায়া স্ট্রীটে পায়চারি করে বেড়াত। আর বোলচাল ঝাড়ত কত!—'শুয়োরগুলোকে ঝেঁটিয়ে তাড়াব খোঁয়াড়ের মধ্যে!' হ্যানো ত্যানো। 'শুয়োরগুলো' মানে রাশিয়ার জনসাধারণ। তারা তো আর মানল না, তারা রীতিমত বাধা দিল। খোঁয়াড়ে যাবার মানুষই তারা নয়। ডিসেম্বর মাসে আমি নভোচেরকাস্কে গিয়েছিলাম। ওখানকার সদর সড়কের ওপর যে শান্ত্রী-ঘরটা আছে সেটার কথা মনে আছে তো আপনার? পুণ্যবান আলেকজান্দারের আমলে নাকি

আতামান প্লাতভ্ তৈরি করেছিলেন ঐ ছোট বাড়ীটা, একেবারে 'সম্রাজশাহী' কায়দায়। এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই, ভাদিম পেত্রোভিচ্, সেই বারান্দার সিঁড়িটা, রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে...পাশ কেটে চলে যাবার সময় শুনেছিলাম ভয়ংকর একটা চীৎকার—মনে হচ্ছিল যেন কাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে মারা হচ্ছে। দিনে-দুপুরে, দনের রাজধানীর একেবারে বুকের ওপর!...এগিয়ে গেলাম কাছে। মস্ত ভীড় জমেছে—কসাকরা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া নিয়ে, শান্ত্রীঘরটার ঠিক সামনেই। নির্বাক হয়ে সবাই তাকিয়ে আছে—থামের নীচে চলছে চাবুক। জনসাধারণকে ভয় দেখানো হচ্ছে আর কি! একেকবারে দু'জন দু'জন করে টেনে নিচ্ছে সারি থেকে,—সবাই মজুর, গ্রেপ্তার হয়েছে বলশেভিকদের সমর্থন জানানোর অপরাধে —খেয়াল করুন কথাটা, সমর্থন জানিয়েছে মাত্র তারা, এই হল অপরাধ! সংগে সংগে হাতের কব্জি মুড়িয়ে বেঁধে ফেলছে তাদের থামের সংগে। চার চারটে কসাক মিলে চাবকাচ্ছে তাদের পিঠে পাছায়। শিস্ কেটে উঠছে চাবুক, প্রথমে খসে পড়ছে ছেঁড়া শার্ট পাতলুনের টুকরো, তারপর মাংসের দলা ছিটকে উঠছে শূন্যে আর সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্তের নদী, যেন কসাইখানা একটা!...আমি বড়ো সহজে ঘাবড়াই না, কিন্তু সেবারে আর পারি নি...কী ভয়ংকর চীৎকার যে করছিল ওরা। শুধু দৈহিক কষ্ট পেলে ওরকম চেঁচায় না লোকে।..." চোখ নিচু করে রশ্চিন শুনছিল তার কথা। সিগারেট-ধরা আঙুল দুটো কাঁপছিল তার। টেবিলক্লথের ওপর থেকে কাসুন্দির দাগটা খুঁটে খুঁটে তুলছিল তেৎকিন।

"আর তারপর কি হল, দেখতেই পাচ্ছেন। আতামান আর বেঁচে নেই, শহরের বাইরের ওই ভাগাড়ের মধ্যে এখন কসাক কুলরত্নটি হাবুডুবু খাচ্ছেন। সিঁড়ির ওপরের সেই রক্ত এখন প্রতিশোধের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। গরীবের শক্তি।...আমি নিজে অবশ্য বুট পালিশ করি কি অন্য কিছু করি তা নিয়ে তোয়াক্কা করি না।...মহাযুদ্ধ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলাম, একমাত্র জিনিস যাকে কদর করি সে হল জীবনের শ্বাস-বায়ু। কথাটা একটু ভারিক্কি হল, মাফ করবেন। যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে থাকতে থাকতে অনেক বই-ই তো পড়েছিলাম, তাই কথাবার্তাগুলো মাঝে মাঝে একটু সাহিত্যিক ধরনের হয়ে যায়।...তো, এই তো ব্যাপার..." (দরজার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে সে গলার স্বর নামিয়ে নেয়) "যে কোনো রাজত্বকেই মেনে নিতে রাজি আছি আমি, যতক্ষণ দেখব দেশের মানুষ সুখী।...আমি কিন্তু বলশেভিক নই, বুঝেছেন তো ভাদিম পেত্রোভিচ্..." (আবার সে কাঁচুমাচু ভাব করে বুকের কাছে হাতজোড়া ঠেকালো) "আমার নিজের প্রয়োজন অতি যৎসামান্য—এই এক কামড় রুটি, এক চিম্টি তামাক আর খাঁটি ভগবৎভক্তি খানিকটা, ব্যস্।..." (ক্ষমা চাইবার হাসি হাসল) "কিন্তু সেইটেই তো কথা— মজুররা গজগজ করে, সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।...মিলিটারী কমিসার কমরেড ব্রয়নিত্স্কির নাম শুনেছেন তো? আমার উপদেশ শুনুন, যখনই তার গাড়ি দেখবেন রাস্তায়, লুকিয়ে পড়বেন অমনি! স্তম্ভ দখল হবার

সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটি কর্তা হয়ে বসেছে। সামান্য একটু কথা হয়েছে কি অমনি বলে উঠবে ঃ 'কমরেড লেনিনই আমার কদর বোঝেন, তাঁকে আমি এখুনি ব্যক্তি-গতভাবে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।'...যত সব দাগী বদমায়েশগুলোকে নিয়ে ও চলাফেরা করে—হরদম জবরদখল চালাচ্ছে তারা, গুলি করে মারবার জন্য ঘর থেকে মানুষ টেনে বের করছে। রাতে যে-কোনো লোককে দেখলে কাপড় খুলে নেবে। ঠিক যেন ডাকাতের মত ব্যবহার করছে লোকটা।...জঘন্য ব্যাপার! এই সব দখল-করা সম্পত্তি যাচ্ছে কোন্ ভান্ডারে? বিপ্লবী কমিটি নিজেরাই তো পারছে না তাকে সামলাতে, বুঝলেন কিনা! ওরা ভয় পায়...আমার মনে হয় না লোকটার কোনো নীতির বালাই আছে। শ্রমিকশ্রেণীর যা লক্ষ্য সেদিক থেকে ভাল কিছু তো করছেই না, বরং ক্ষতিই করছে সে।..." (কিন্তু এই পর্যন্ত বলে তেৎকিনের মনে হল বড্ড বেশি বলে ফেলেছে, পাশ ফিরে সে হাঁচল একবার, তারপর আবার বুকের উপর রাখল হাত দুটো। আর একটি কথাও বলল না সে।)

নীরসকণ্ঠে বলল রশ্চিন : "আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না কর্নেল। আপনার ওই ব্রয়নিৎস্কি আর তার দলবল হল প্রায় নিখাদ সোবিয়েত সোনা, সামান্য ভেজাল থাকলেও। ওদের তারিফ করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, ওদের সঙ্গে আমাদের মরণপণ লড়াই..."

"কার জন্য লড়বেন শুনি?" চট্ করে জিজ্ঞেস করল তেৎকিন।

"মহান্ রাশিয়ার নামে লড়ব, কর্নেল!"

"সেটা কি চীজ্ একবার বলুন তো আমায়? মাফ করবেন—নেহাৎ মূর্খের মতোই তুলছি প্রশ্নটা ঃ মহান্ রাশিয়া যে বলছেন, সেটা কার ধারণায় মহান্? দয়া করে একটু গুছিয়ে বলুন কথাটা। মহান্ সে কি পেত্রোগ্রাদ সমাজের কাছে? তার একটা মানে হয় অবশ্য। নাকি ঐ পদাতিক রেজিমেন্টের কাছে, যেখানে আপনি আমি লড়াই করেছি, কাঁটা-তারের বেড়ায় বীরের মতো প্রাণ দিয়েছি? কিংবা হয়তো মস্কো ব্যবসায়ী সম্মেলনের কথা বলছেন আপনি? মনে আছে রিয়াবুশিন্স্কি কেমন করে কাঁদছিল বলশয় থিয়েটারে, মহান্ রাশিয়ার জন্য? সেটা হল আর এক অর্থে মহান্। আবার, বলতে পারেন একজন মজুরের কথা যে কেবল ছুটির দিন হলেই রাশিয়ার মহত্ব উপলব্ধি করে, অর্থাৎ সেই চোখেই তখন সে নোংরা ভাঁটিখানা থেকে রাশিয়াকে দেখে। কিংবা ধরুন দশ কোটি কৃষকের কথা যারা..."

"কি পাগলের মতো যা-তা..." (চট্ করে টেবিলের তলা দিয়ে রশ্চিনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয় কাতিয়া) "মাফ করবেন, কর্নেল! এই খানিক আগেও আমার জানা ছিল যে রাশিয়া হচ্ছে গোটা পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ, যেখানে মহান্ ঐতিহ্যময় একটা জাতি বাস করে।...হয়তো-বা এটা বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গী হল না।...আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে..." (তিক্ত হাসি হেসে সে অতি কষ্টে দমন করে রাখল প্রবল বিরক্তির ভাবটা)।

"আমারও ঐ একই মত। দেশের জন্য গর্ব আমারও আছে। যখন রুশ

রাষ্ট্রের ইতিহাস পাড় তখন তো রীতিমত তৃপ্তিতে ভরে উঠে বুকটা—অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু দশ কোটি কৃষক তো আর সে-সব বই পড়েনি। তাদের বুক গর্বে ভরেও উঠে না। তারা চায় তাদের নিজের ইতিহাস সৃষ্টি হোক—অতীতের নয়, ভবিষ্যতের ইতিহাস।...অগ্রগতির ইতিহাস।...সে সম্পর্কে আপনার আমার করার কিছু নেই। আর ওদের নেতা হল—শ্রমিকশ্রেণী। ওরা আবার আরো এক-কাঠি বাড়া—বিশ্ব-ইতিহাস যাকে বলেন তাই সৃষ্টি করতে চায় ওরা!...এ-বিষয়েও আমাদের কিছু করার আছে মনে হয় না।...আপনি আমায় বলশেভিকবাদের অপবাদ দিচ্ছেন, ভাদিম পেত্রোভিচ্, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমার সাংঘাতিক দোষ হল আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে খালি ভেবে-ভেবেই দিন কাটাই। কিন্তু আমার কাছে এর অবশ্য একটা কৈফিয়ত আছে, এতদিনকার যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন কাটাবার পর এখন যে স্নায়ুর অবসাদ দেখা দেবে এ তো স্বাভাবিক। আশা রাখি একদিন খুব তৎপর হয়ে উঠব কাজে, এবং তখন হয়তো আপনার এ অভিযোগের প্রতিবাদও জানাবো না।..."

বলতে বলতে তেৎকিনের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তার উজ্জ্বল কপালে এসে জমল বিন্দু বিন্দু ঘাম। রুশ্চিন তাড়াতাড়ি কোটটা চাপিয়ে নিল গায়ে, বোতামগুলো লাগাতে শুরু করল ভুল বোতাম-ঘরে। উদ্বেগে কুঁচকে উঠেছে কাতিয়ার কপাল, একবার স্বামীর দিকে একবার তেৎকিনের দিকে তাকাতে লাগল সে। একটা বেদনাদায়ক স্তব্ধতার পর রশ্চিন বলল :

"একজন বন্ধুকে হারালাম বলে মনে দুঃখ থেকে গেল। আপনার আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি..."

করমর্দনের অপেক্ষা না রেখেই ভাদিম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া। এতকালের শান্তশিষ্ট গোবেচারী কাতিয়া এবার যেন ক্ষেপে উঠে হাতের বদ্ধমুষ্টি চেপে বলতে লাগল :

"ভাদিম! দয়া করে একটু সবুর করো..." (রশ্চিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ভুরু-দুটো উঁচু করল) 'এবার কিন্তু তুমি ভুল করছ, ভাদিম..." (প্রচন্ড দৃপ্ত হয়ে ওঠে কাতিয়ার ভঙ্গী) "তোমার মতো অদ্ভুত চিন্তাভাবনা আর মতামতের সঙ্গে মন মিলিয়ে চলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।..."

"ওঃ হো, তাই নাকি!"—ফুঁশিয়ে উঠল রশ্চিন, "আমার অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি।"

"ভাদিম, জীবনে কখনো আমায় জিজ্ঞেস করনি আমি কী ভাবি, কী চাই। আর আমিও কোনোদিন কোনো দাবি জানাইনি তোমার কাছে, তোমার ব্যাপারে মাথা গলাই নি কখনো। তোমার ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা ছিল। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত, ভাদিম আমার,—তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। অনেকদিন ভেবেছি তোমায় বলব কথাটা। একেবারে অন্য রকম কিছু করা দরকার আমাদের। এখানে যে কারণে এসেছ সে-পথে নয়।...প্রথমে তোমায় পরিষ্কার করে বুঝতে হবে সব কিছু। তারপরেই, যখন মন একেবারে নিশ্চিত হবে..." (উত্তেজনায়

হাতদুটো নামিয়ে কাতিয়া টেবিলের তলাকার জোড়াগুলো খুলতে থাকে) "যখন তুমি একেবারে নিশ্চিত যে তোমার বিবেকের তরফ থেকে কোনো বাধাই নেই— তখন ছুটে যাও, খুন করো, যা খুশি করো..."

"কাতিয়া!"—কর্কশভাবে চীৎকার করে উঠে রশ্‌চিন, যেন একটা ভীষণ ঘুষি খেয়ে চমকে উঠেছে, "দয়া করে মুখটা সামলাও!"

"না থামব না! তোমায় ভালবাসি বলেই একথা বলছি। খুনী তুমি কখ্‌খনো হতে পারবে না, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না!..."

ওদের কারুকেই সামলাবার চেষ্টা না করে তেৎকিন কেবল বিড়বিড় করে বলতে থাকল ঃ

"বন্ধুরা, আসুন না, আলাপ-আলোচনা করেই মিটিয়ে ফেলি ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত মতের মিল হবেই।"

কিন্তু মতের মিল হবার আর সময় নেই তখন। যে-প্রবল ঘৃণাটা গত কয়েক মাস ধরে জমে উঠেছিল রশ্‌চিনের মনের মধ্যে, তা এবার হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল সাংঘাতিক রূপ নিয়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে ধনুকের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল কাতিয়ার দিকে। তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে বাইরে।

"তোমায় আমি ঘৃণা করি!"—হিস্‌হিসিয়ে উঠল সে, "চুলোয় যাও তুমি আর তোমার ন্যাকা ভালবাসা! একটা ইহুদী যোগাড় করে নাও গে যাও...কিংবা বলশেভিক্ একটা! গোল্লায় যাও তুমি!"

রেলগাড়ীর কামরায় বসে কাতিয়া যে দীর্ণ বিলাপধ্বনি শুনেছিল রশ্‌চিনের কণ্ঠে, আজ আবার যেন সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার গলায়। মনে হচ্ছে যেন এখনই ভেঙে পড়বে সে। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থমথমে হয়ে উঠেছে গভীর বিপদাশংকায়...(তেৎকিন এবার সত্যি সত্যিই সরে এল কাতিয়ার সামনে।) কিন্তু রশ্‌চিনের চোখদুটো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল। ধীরে ধীরে চলে গেল সে।

হাসপাতালের খাটে বসে সেমিয়ন ক্রাসিল্‌নিকভ গম্ভীর হয়ে শুনছিল তার ভাই আলেক্সির কথা। খাটের পায়ার কাছে পড়ে আছে মাত্রিয়োনার পাঠানো উপহারের জিনিস—শুয়োরের চর্বি, পোষা মুরগী, মাংসের পুর-দেয়া পিঠে ইত্যাদি। সেমিয়ন ভালো করে দেখেও নি ওগুলো। রোগা হয়ে গেছে সে, মুখখানা শুকনো, গালে ক্ষুর পড়ে নি। অনেকদিন শুয়ে থেকে থেকে চুলগুলো এলোমেলো। হলদে সুতীর পাজামার মধ্যে তার পা দুটো রোগা রোগা দেখাচ্ছে। একটা লাল ডিম সে এ-হাত থেকে ও-হাত করছে। আলেক্সির মুখটা রোদে-পোড়া, দাড়িতে সোনালি ছোপ ধরেছে। মজবুত বুটপরা পা দুখানা অনেকখানি ফাঁক করে সে একটা টুলের ওপর বসে। খুব মিষ্টিগলায় দরদভরা প্রাণে সে কথা বলছিল ভাইয়ের সঙ্গে, কিন্তু ওর কথাগুলো যেন সেমিয়নকে মোটেই কাছে টানতে পারছিল না, তার থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল সেমিয়ন।

"চাষীদের পথ হল আলাদা, বুঝলি ভাই, আর মজুরদের জন্যও আলাদা রাস্তা" বলে চলল আলেক্সি, "ওই তো, মজুররা তো সব গিয়েছিল 'গভীর খনির' মধ্যে, তারপর যখন বানের জলে ভেসে গেল সব, মেশিন বিগড়ে একাকার কান্ড, ইঞ্জিনিয়াররাও সব পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু খেয়ে বাঁচতে হবে তো আমাদের? তাই সব মজুর ছুটল লাল রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে। তার মানে মজুররা চায় তাদের নিজেদের স্বার্থেই বিপ্লবটাকে আরো গভীরে ঠেলে দেয়া হোক, তাই না? কিন্তু আমাদের চাষীদের বিপ্লব হল অন্য—সরেস মাটির দশ ইঞ্চি গভীরে। আর তাকে আরও গভীর করব আমরা লাঙল চালিয়ে, বীজ বুনে আর ফসল ঘরে তুলে। ঠিক কিনা? আমরা সব্বাই যদি লড়াই করতে ছুটি, তা হলে কাজ করবে কে শুনি? মেয়েরা? ওরা যদি ঘরের গাইগরু সামলাতে পারে সেই যথেষ্ট! মাটির জন্য বাবা মেহনতের দরকার, যত্নের দরকার। এই হল ব্যাপার, বুঝলি ভাই। তার চেয়ে বাড়ী ফিরে চল্, ঘরেরটা খেয়ে তাড়াতাড়ি সেরেও উঠবি। এখন তো আমাদের নিজেদের হাতেই জমি। অথচ এদিকে কাজকারবারের লোকের অভাব। নিড়ানি দাও রে, বীজ বোনো রে—অতসব কাজ কি আর একা আমি আর মাত্রিয়োনা কুলিয়ে উঠতে পারি? এই তো আঠারোটি শুয়োর হল, তা ছাড়া আর একটা গাই কিনতেও মন উঠেছে। এসব দেখাশোনার জন্য তো মুনিষের দরকার!"

পকেট থেকে একটা ঘরে-তৈরি তামাকভরা থলি বের করল আলেক্সি। মাথা নেড়ে সেমিয়ন জানালো খাবে না সে ঃ "বুকটা এখনো ব্যথা-ব্যথা করে আমার।" তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবার পীড়াপীড়ি শুরু করল আলেক্সি। উপহারের জিনিসগুলোর দিকে ঝুঁকে মাংসের পুর-দেয়া একখানা খাস্তা পিঠের উপর আঙুল দিয়ে বলল ঃ

"খেয়ে নে এটা—তৈরি করতে পুরো এক পাউন্ড ঘি লাগিয়েছে মাত্রিয়োনা।"

"দেখ আলেক্সি, কিভাবে তোমার কথার জবাব দেব জানি না। জখমটা সেরে উঠলে আমি খুশিমনেই বাড়ি যাব। কিন্তু বাড়িতে থেকে খেতখামারি করতে যাচ্ছি না আমি, সুতরাং সে চিন্তাও আর মনে এনো না।"

"হুম্, কেন তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

"আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয় আলিওশা" (হঠাৎ একটা খিঁচুনিতে তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, কিন্তু অতি কষ্টে সে সামলে নিল নিজেকে)। "তুমি বিশ্বাস করো এ আমি কখনো পারব না। আমি ভুলতে পারি না এ-জখমটার কথা, ভুলতে পারি না ওরা আমার কমরেডদের উপর কী দারুণ অত্যাচার করেছিল।" (জানলার দিকে ফিরল সে, তখনো কাঁপছে, চোখে তার আগুন জ্বলছে ধক্ ধক্ করে)। "একবার তুমি আমার অবস্থাটা কল্পনা করে দেখ, আমার জায়গায় তুমি নিজেকে ভাবো দেখি। ঐ শয়তান গোখ্‌রোগুলো ছাড়া আর কিছুর কথা আমি ভাবতেই পারি না।..." ফিস্ ফিস্ করে কি উচ্চারণ করল। লাল ডিমটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে জোরে জোরে বলে উঠল ঃ

"যতোদিন ওই কালসাপগুলো আমাদের রক্ত শুষতে থাকবে ততোদিন বিশ্রাম নেই আমার, বিশ্রাম নেই!"

মাথা নাড়ল আলেক্সি ইভানোভিচ্। সিগারেটের ডগায় থুথু দিয়ে সেটা দু' আঙুলে চেপে নিভিয়ে ফেলল; এদিক ওদিক দেখে কোথায় ফেলবে ঠিক করতে না পেরে অবশেষে সিগারেটটাকে সে খাটের নীচেই চালান করে দিল।

"যাই হোক্, সেমিয়ন, এ হল তোর নিজের ব্যাপার, আর তুই যার জন্য লড়ছিস সেটা ন্যায়েরই লড়াই। বাড়িতে এসে দু'দিন থেকে ভাল হয়ে যা। আমি তোকে জোর করে আটকে রাখব না।"

আলেক্সি ক্রাসিল্নিকভ হাসপাতাল-বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে আসতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ইগ্নাতের। তারই দেশের লোক, প্রবীণ যোদ্ধা। দু'জনে করমর্দন করে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করে। ইগনাত জানায় 'কার্যকরী কমিটির' শোফারের কাজ করছে সে।

"একবার এসো না আমার সঙ্গে 'সলেইল্'-এ"—অনুরোধ জানালো ইগনাত, "রাতে তুমি আমার সঙ্গেই ফিরে আসতে পারবে। আজ রীতিমত একটা লড়াই হয়ে যাবে ওখানে। কমিসার ব্রয়নিত্স্কির নাম শুনেছ তো? জানি না কি ভাবে আজ সে তার কুকীর্তির কৈফিয়ৎ দেবে। তার সাঙ্গোপাঙ্গগুলো হল এক-দল গুণ্ডাবিশেষ, সারা শহরটা ওদের জ্বালায় পাগল। দুটো ইস্কুলের ছেলে, একেবারে বাচ্চা,—তাদের ধরে দিনে-দুপুরে রাস্তার ঐ কোণটায় কেটে ফেলল, অথচ কোনো কারণই নেই,—শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ল তলোয়ার নিয়ে—ব্যস্। ঐ জায়গাটায় পাহারায় ছিলাম আমিই—দেখে তো একেবারে পেট যেন গুলিয়ে গেল আমার।"

'সলেইল্' সিনেমাঘর পর্যন্ত ওরা কথা বলতে বলতেই চলে এল। ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে ওরা বাজনদারদের জায়গার পাশেই দাঁড়াবার স্থান করে নিল। পাংশু চেহারার গোল-কাঁধওয়ালা একটি লোক ছোট মঞ্চটার ওপর এপাশ-ওপাশ পায়চারি করছিল খাঁচায় আটকানো জন্তুর মতো। মাথায় এক গোছা কালো চুল। মঞ্চটার সামনেই সভাপতিদের টেবিল পাতা রয়েছে। সেখানে বসে আছেন সৈনিকের কোট-পরা একজন মহিলা, মুখখানি গোলাকৃতি; মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা একজন গম্ভীর চেহারার সৈনিক; চোখে চশমা-আঁটা শুকনো ধরনের বুড়ো শ্রমিক একজন; আর সৈনিকের উর্দিপরা দু'জন যুবক। পাংশু চেহারার সেই লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছিল। দুর্বল হাতের মুঠোখানা সে একঘেয়েভাবে শূন্যে তুলছিল করাত চালানোর ভঙ্গি করে, আর এক হাতে চেপে ধরেছিল এক বান্ডিল সংবাদপত্রের কাটিং।

ক্রাসিল্নিকভের কানে কানে বলল ইগ্নাত, "উনি হলেন একজন শিক্ষক—আমাদের সোবিয়েত থেকে এসেছেন।"

"আর চুপ করে থাকতে পারি না আমরা...এখন আর চুপ করে থাকা উচিতও

নয়...শহরে এই যে সোবিয়েত শাসন চলছে, এই ধরনের সোবিয়েত শাসনের জন্যই কি আপনারা লড়েছিলেন কমরেড? হিংসা ছাড়া কি আমাদের আর কোনো পুঁজি নেই? এ যে জারের চেয়েও নিকৃষ্ট স্বৈরাচার।......শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ঘরে ঢুকে হামলা করা!...সন্ধ্যের পর বাইরে বেরুনো এক মহা বিপদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন তখন আপনার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেবে। শিশুদের ধরে রাস্তায় খুন করা হচ্ছে। আমি এ সম্পর্কে কার্যকরী কমিটিতে বলেছি, বিপ্লবী কমিটিতেও এ সব কথা তুলেছি। তাঁরা সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন...মিলিটারী কমিসার তাঁর সমস্ত অপরাধ ঢেকে রাখছেন একটা সীমাহীন ক্ষমতার জোরে।......কমরেডস্......" (উত্তেজনার আতিশয্যে হাতের কাগজের বান্ডিলটা ঠুকলো সে নিজের বুকে), "কেন, শিশুদের হত্যা করছে কেন তারা? তার চেয়ে বরং আমাদেরই গুলি করে মারুক...কিন্তু কচি বাচ্চাদের খুন করবে কেন তারা?"

তার শেষ কথাগুলো মিলিয়ে গেল সারা হলঘরের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে। শ্রোতারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো উত্তেজনামিশ্রিত ভীতিবিহ্বল চোখে। টেবিলে এসে বসল বক্তা, একটা খবরের কাগজের আড়ালে তার রেখাকুঞ্চিত মুখখানা ঢেকে রাখল। সভাপতি সেই মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা সৈনিকটি মঞ্চের উইংসের দিকে তাকালো।

"লাল রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক কমরেড ত্রিফনভ্ এবার কিছু বলবেন।"

শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে মাথার উপর হাত তুলে হাততালি দিতে লাগল। হলের মাঝখান থেকে কয়েকটি নারীকণ্ঠ একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল : "কমরেড ত্রিফনভ্!" একটা ভারী মোটা গলা শোনা গেল : "সাবাস্ কমরেড ত্রিফনভ্!" ঠিক সেই সময় আলেক্সি ক্লাসিল্নিকভের নজরে পড়ল একজন লম্বা দোহারা চেহারার মানুষ। কায়দাদুরস্ত ছোট চামড়ার জ্যাকেটের ওপর অফিসারের স্ট্র্যাপ্ আড়াআড়িভাবে আঁটা। এতক্ষণ সে শ্রোতাদের দিকে পিছন ঘুরিয়ে বাজনদারদের জায়গাটা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল উল্লসিত শ্রোতাদের মুখোমুখি। তার বড়ো-বড়ো ইস্পাত-ধূসর চোখের শীতল বিদ্রূপভরা দৃষ্টি একে-একে প্রত্যেকটি মুখের উপর ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল তাদের করতালিমুখর হাতগুলো, কাঁধের মধ্যে যেন ঢুকে গেল হেঁট হয়ে যাওয়া মাথাগুলো। উল্লাসের আর চিহ্ন রইল না। কে যেন তাড়াতাড়ি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল বেরিয়ে যাবার দরজাটার দিকে।

ইস্পাতের মতো শীতল-কঠিন চোখে লোকটি বিদ্রূপভরে হেসে উঠল, ক্ষিপ্র হাতে পিস্তলের খাপটা ভালোভাবে কোমরে বসিয়ে নিল। পরিষ্কার করে কামানো তার লম্বা মুখখানা অনেকটা অভিনেতাদের মতো। আর একবার মঞ্চের দিকে ফিরে সে হাতের কুনুই দুটো রাখল অর্কেস্ট্রার ঘের-দেওয়া উঁচু জায়গাটির উপর। ক্লাসিল্নিকভকে খোঁচা দিল ইগনাত।

"ওই হল ব্রয়নিত্স্কি। একবার যদি মুখের দিকে তাকায়ও, সঙ্গে সঙ্গে দমে যায় লোকে!"

উইংসের দিক থেকে সজোরে ভারী বুটের আওয়াজ তুলে সামনে এসে দাঁড়াল লালরক্ষী বাহিনীর কম্যাণ্ডার ত্রিফনভ। ফ্লানেলের জ্যাকেটের হাতায় একটা লাল বন্ধনী-চিহ্ন। হাতের মুঠোয় ধরা টুপির কিনারায় একটা লাল জিনিসের ঘের-দেওয়া। বলিষ্ঠ অচঞ্চল ভঙ্গিতে ধীর পদক্ষেপে সে মঞ্চের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। কামানো মাথার উপর কাল্চে চামড়াটা কুঁচকে উঠল। ঝুলে-পড়া ভুরুর ছায়ায় তার চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গেছে যেন। হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল হলঘরটায়। অর্ধবদ্ধ হাতের মুঠি দিয়ে মঞ্চের নীচে ব্রয়নিত্স্কিকে দেখিয়ে বলল সে :

"দেখুন কমরেডরা, মিলিটারী কমিসার কমরেড ব্রয়নিত্স্কি তো এখানেই রয়েছেন। খুব ভালো কথা! এবার তিনি পূর্ববর্তী বক্তার শেষ প্রশ্নটির জবাব দিন। তিনি যদি জবাব দিতে গররাজি থাকেন তো আমরা তাঁকে বাধ্য করব..."

"ওঃ-হো!" নীচে থেকে ভেসে এল ব্রয়নিত্স্কির ভয়ংকর গলার স্বর।

"হ্যাঁ—বাধ্য করব! মজুর কিসানের শক্তি হলাম আমরা, এ শক্তিকে তাঁর মেনে নিতে হবে, মানতে তিনি বাধ্য। কমরেডস্, সময়টা এখন এমন যাচ্ছে যে পুরোপুরি সব জিনিস যাচাই করে নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না—সে বড়ো কঠিন কাজ।...ভয়ানক গোলমেলে এই দিনগুলো।...আর সে ক্ষেত্রে, ভালো করেই জানেন আপনারা—অনেক নোংরা তলানি আজ ভেসে উঠছে উপরে। তাই এও আমাদের কাছে পরিষ্কার যে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের বদমায়েশও এসে জুটে যায়..."

"নাম করে বল কার কথা বলছ!" কড়া পোলিশ উচ্চারণভঙ্গি ব্রয়নিত্স্কির গলার স্বরে ঃ "নাম জানাতে হবে!"

"নাম যথাসময়েই বলা হবে, তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই।...কিসান মজুরদের আত্মত্যাগ আর লড়াইয়ের ফলেই আমরা শ্বেতরক্ষী দস্যুদের হাত থেকে রস্তভকে মুক্ত করতে পেরেছি।...আজ দন অঞ্চলে সোবিয়েতের শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে চারিদিক থেকে এত প্রতিবাদের ঝড় কেন? মজুররা অস্থির হয়ে উঠেছে, লাল রক্ষীরাও অসন্তুষ্ট।...ট্রেনের ফৌজ তো রীতিমত হৈ-চৈ করতে শুরু করেছে—ওরা জানতে চায় সাইডিং-এ রেখে ওদের কি কারণে পচিয়ে মারা হচ্ছে। এই তো আমরা এখুনি শুনলাম একজন বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধির কথা।" (পূর্ববর্তী বক্তাকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে)। "ব্যাপারটা তাহলে কি? সবাইকে দেখতে পাচ্ছি সোবিয়েত শাসনে বিক্ষুব্ধ। ওরা প্রশ্ন তোলে : তোমরা লুঠ-তরাজ করো কেন? মাতলামি করো কেন? শিশুদের হত্যা করো কেন? আগের বক্তা তো গুলি খেয়েই মরতে চাইলেন।..." (কেউ কেউ হেসে ফেলল। চাপা একটা উল্লাসের ভাব যেন ফুটে উঠল শ্রোতাদের মধ্যে) "কমরেডস্,

সোবিয়েত শাসনশক্তি কখনো লুঠতরাজ আর শিশুহত্যা করতে পারে না। কিন্তু কতগুলো নোংরা জীব রয়েছে যারা সোবিয়েতের শক্তির সঙ্গে নিজেদের জুড়ে রেখেছে; তারাই এইসব খুন-জখম আর লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে তারা সোবিয়েত শক্তির উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করছে, আমাদের শত্রুদের হাতে ধারালো অস্ত্র তুলে দিচ্ছে..." (কিছুক্ষণ চুপচাপ, অত অসংখ্য লোকের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না) "এখন কমরেড ব্রয়নিত্স্কিকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই ঃ কাল যে দু'জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে সে খবর কি আপনি রাখেন?"

নীচের থেকে আসে একটা শীতল-কঠিন গলার স্বর ঃ

"হ্যাঁ রাখি।"

"বেশ! আর রোজ রাত্রে যে লুটপাট হয়, প্যালেস হোটেলে মাতলামি আর হুল্লোড় হয় সেও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে? আপনি এও বোধ হয় ভালো করেই জানেন কার হাতে জবরদখল-করা সম্পত্তিগুলো গিয়ে জমছে? কথা বলছেন না যে কমরেড ব্রয়নিত্স্কি? জবাব দেবার মতো কিছু থাকলে তো জবাব দেবেন। ঐসব দখলে-আনা সম্পত্তি উড়িয়ে গুন্ডার দলের মদের খরচ জোগানো হয়, তাই না?"...(হলের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। ত্রিফনভ্ হাত তোলে)। "আর এই যে, নতুন একটা জিনিসও আবিষ্কার করা গেছে—কেউ আপনাকে রস্তভের ক্ষমতা দেয় নি, আপনার নিয়োগ-পত্রটা জাল। আপনি যে কথায় কথায় মস্কোর দোহাই পাড়েন, কমরেড লেনিনের কথা আর নাই-বা বললাম,—এ সমস্তই হচ্ছে জঘন্য ধৃষ্টতাপূর্ণ মিথ্যা...।"

ব্রয়নিত্স্কি এবার খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ওই সুন্দরপানা মুখটার উপরে কম্পনের রেখা, মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।...হঠাৎ সে একপাশে লাফিয়ে পড়ল। শণের মতো চুলওয়ালা একটি ছোকরা সৈনিক হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। ব্রয়নিত্স্কি তার কোটটা চেপে ধরে ত্রিফনভের দিকে দেখিয়ে হিংস্রকণ্ঠে আদেশ করল ঃ

"গুলি করো বদমায়েশটাকে!"

কাঁধ থেকে রাইফেলটা জোর করে ছিনিয়ে নেবার সময় ছোকরাটার মুখ ভয়ংকরভাবে কুঁচকে উঠলো। পা দুটি ফাঁক করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ত্রিফনভ। মাথাটা সে একবার নীচু করল বলিষ্ঠ বৃষের মতো। একজন শ্রমিক ছুটে এল উইংসের আড়াল থেকে. তাড়াতাড়ি রাইফেলের বল্টু খুলে সে ত্রিফনভের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরো একজন এল তার পেছনে পেছনে, আরো একজন—এইভাবে গোটা মঞ্চটাই ভরে গেল অসংখ্য কালো জ্যাকেট আর লম্বাকোটে, বেয়নেটের ঝন্ঝনায় চঞ্চল হয়ে উঠল জায়গাটা। সভাপতি এবার লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর চেয়ারের দিকে। চোখের উপর ব্যান্ডেজটা এসে পড়ছিল, হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে তিনি সর্দিভরা গলায় চীৎকার করে উঠলেন :

"কমরেডস্, আতঙ্কের কোনো প্রয়োজন নেই—এমন কিছু কল্পনাতীত

ব্যাপার ঘটেনি। দয়া করে পেছন দিকের ওই দরজাটা বন্ধ করে দিন তো। কমরেড ত্রিফনভ সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন। কমরেড ব্রয়নিত্‌স্কিকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে তাঁর বক্তব্য হাজির করবার জন্য।"

কিন্তু ব্রয়নিত্‌স্কি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু শণের মতো চুলওয়ালা সেই সৈনিকটি অর্কেস্ট্রার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে, বিস্ময়ে তার ঠোঁটদুটো হাঁ হয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

করেনভ্স্কায়া গ্রামে ভলান্টিয়ার বাহিনীকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল। বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও অবশ্য গ্রামটাকে দখল করা হল। কিন্তু শ্বেত-রক্ষীরা যে বিপজ্জনক খবরটার কথা ভেবে সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিল সে-খবরটাই আর ফৌজের কাছে চাপা থাকল না : দিন কতক আগেই কুবানের রাজধানী একাতেরিনোদার বলশেভিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে একটা বন্দুকের গুলি পর্যন্ত খরচা না ক'রে। শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সমগ্র অভিযানের লক্ষ্য, তাদের এক-মাত্র সম্ভাব্য আশ্রয় আর ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের ঘাঁটি এই একাতেরিনোদার। ওখানে যারা ছিল—পক্রভ্স্কির কুবান ভলান্টিয়ার, কুবান আতামান আর স্বয়ং 'রাদা' (শাসন-পরিষদ), সবাই পালিয়েছে, কোথায় তা কেউ জানে না। অভিযানের লক্ষ্যে পৌঁছুতে আর মাত্র তিনদিন বাকি এমন সময় আচম্বিতে তাদের ফৌজটা যেন ফাঁদে পড়ে গেল।

কুবানে তাদের সাদর অভ্যর্থনা পাবার যে ভরসাটুকু ছিল তাও নির্মূল হল। কসাকরা এবার ক্যাডেটদের সাহায্য না নিয়ে নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই সামলাবার চেষ্টা করছে। তাই ফৌজের রাস্তায় যতো বাড়ীঘর পড়ে, সবই এখন পরিত্যক্ত, প্রত্যেক গ্রামে বসেছে পাহারার ঘাঁটি, আর প্রত্যেকটি পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে মেশিনগান। ভলান্টিয়ার ফৌজের তা হলে আর আশা-ভরসার কি রইল এখন? কুবানের কসাকরা নিশ্চয়ই আর "কর্নিলভের জয় হোক, দেশমাতা জিন্দাবাদ!" বলে চটকদার অফিসার ও গোঁফ-দাড়ি-কামানো ক্যাডেটদের দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না! এখন আর উক্রেইনীয় বসবাসকারীদের উপর কিংবা রাশিয়ানদের জাত-শত্রু সির-কাশিয়ানদের উপরও ভরসা করা চলে না, এমন-কি কুবানের সুজলা-সুফলা মাটিতে যারা আটক পড়ে যাচ্ছে সেই ককেসীয় বাহিনীর উপরও এখন আর আস্থা নেই। অথচ একমাত্র মন্ত্র যা ভলাণ্টিয়ার বাহিনী ওদের দিতে পারত তা হল এই "কর্নিলভের জয় হোক! ইত্যাদি"—কিন্তু জারের আমলের ঘসা পয়সার মতই অচল আর ওঁচা হয়ে উঠেছে এই মন্ত্র। এ-মন্ত্র দিয়ে দু'দলকেই খুশি করতে চায় ভলাণ্টিয়ার বাহিনী—ধনী কসাক গ্রামগুলোকে (এরা এর মধ্যেই সুর ধরেছে : আমাদের স্বতন্ত্র কসাক প্রজাতন্ত্র চাই!), আর বহিরাগতদের। বহিরাগতরা এখন লাল পতাকার নীচে জমায়েত হয়ে লড়াই করছে ডন-কুবানের জমি আর মাছ-ধরার ব্যাপারে সমান অধিকার কায়েম করার জন্য, গ্রাম-সোবিয়েতের জন্য।...

ফৌজের মধ্যে অবশ্য একজন নামজাদা আন্দোলনকারী রয়েছে—নাবিক ফিদর বাত্কিন। ধনুকের মতো বাঁকা পা-ওয়ালা এই হোঁতকা লোকটির পরনে সবসময় খালাসীদের খাটো জ্যাকেট, মাথায় সেণ্ট জর্জের রিবন-অলংকৃত নাবিক-টুপি। নোংরা ইহুদি আর বলশেভিক-কুত্তীর-বাচ্চা নাম দিয়ে অফিসাররা তাকে বারে বারে গুলি করে মারার ফিকির করেছে। কিন্তু স্বয়ং কর্নিলভ তাকে এ যাবৎ

রক্ষা করে এসেছেন। তাঁর বিবেচনায় নামজাদা এই খালাসীটি আছে বলেই ফৌজের মতাদর্শের দুর্বলতাটা ঢেকে রাখা যাচ্ছে; যখন জনসাধারণকে উদ্দেশ করে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন হয় (কসাক গ্রামগুলোতে), সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ে বাত্‌কিনের, ওকে দিয়েই প্রথম শুরু করানো হয়।—বাত্‌কিনও গ্রামবাসীদের চমৎকারভাবে বুঝিয়ে বলে যে কর্নিলভই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিপ্লবের স্বপক্ষে, আর ওই বলশেভিকগুলো বিপ্লব-বিরোধী জার্মান-দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়!

ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর পক্ষে তখন আত্মসমর্পণ করাও সম্ভব নয়, কারণ সে-সময় কাউকে বন্দী হিসেবে গ্রহণ করবার প্রথাই ছিল না। তাই দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়লে একে একে মৃত্যু বরণ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। একবার পরিকল্পনা করা হল আস্ত্রাখান স্তেপভূমি ডিঙিয়ে তারা ভলগা পর্যন্ত যাবে এবং সেখান থেকে সাইবেরিয়ায়। কিন্তু কর্নিলভ গোঁ ধরলেন : যেমন করে হোক ঝড়ের বেগে একাতেরিনোদার দখল করতেই হবে, সুতরাং অভিযান চলুক। করেনভ্‌স্কায়া থেকে ফৌজ দক্ষিণ দিকে মোড় ঘুরল। উস্ত্‌-লাবিন্‌স্কায়া গ্রামে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ওরা কুবান নদী পার হল—নদীর এক ভয়ঙ্কর কুলপ্লাবী রূপ এই ঋতুতে। রাস্তায় এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করে ফৌজ ক্রমাগত এগিয়ে চলল সামনের দিকে। দলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য আহত সৈন্য। কিন্তু তবু তাদের মারাত্মক শক্তি বিশেষ কমে নি, এখনও তারা এমন সাংঘাতিক প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম যার ফলে লাল বাহিনীর ব্যূহ বারে বারে ভেঙে পড়ছে, প্রত্যেকটি মোকাবিলায় ভলাণ্টিয়ার বাহিনীকে তাদের পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য ভলাণ্টিয়ার বাহিনী মাইকপের দিকে রওনা হল বটে, কিন্তু ফিলিপ্‌পভ্‌স্কায়া গ্রামে এসে বেলায়া নদী পার হয়ে তারা হঠাৎ পশ্চিম-মুখো ঘুরে একাতেরিনোদারের একেবারে পেছন দিকটায় অভিযান শুরু করল। বেলায়ার অপর পারে সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্যে এসে পড়তেই শক্তিশালী লাল বাহিনী ওদের বাগে পেয়ে গেল। অবস্থা তখন রীতিমত নৈরাশ্যজনক। যারা সামান্য আহত তাদের মধ্যেও রাইফেল বিলি করা হল।......সারাদিন চলল লড়াই। উঁচু টিলা থেকে লাল ফৌজ কামান দাগছে, মেশিনগান্ থেকে সমানে গুলিবর্ষণ করছে রাস্তার মোড় আর রসদবাহী ট্রেন লক্ষ্য করে। শত্রুকে ওরা কিছুতেই ওপরে উঠতে দেবে না। অবশেষে সন্ধ্যের মুখে ছিন্নভিন্ন অবিন্যস্ত ভলাণ্টিয়ার ইউনিটগুলো মরীয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করল পাল্টা আক্রমণের; লালফৌজ এবার টিলাগুলো থেকে সরে দাঁড়িয়ে কর্নিলভের বাহিনীকে পশ্চিমদিকে যাবার রাস্তা করে দিল। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি : একদিকে সামরিক অভিজ্ঞতার জয়, আর অন্যদিকে যেমন করে হোক্ জান-প্রাণ কবুল করে লড়াইয়ে জিততেই হবে, এই উপলব্ধির জয়।

যেদিকে তাকানো যায় সারারাত ধরে গ্রামগুলোয় কেবল আগুন জ্বলছে। হঠাৎ যেন দিনের হাওয়াটাও পাল্টে গিয়ে উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঘন

দুর্ভেদ্য মেঘে আকাশটা ঢেকে গেছে। পনেরোই মার্চ তারিখে নভো-দ্মিত্রভ্স্কায়ার দিকে অগ্রসরমান ভলাণ্টিয়ার বাহিনী পড়ল মহাবিপদে—সামনে অপার জল থৈ-থৈ করছে, তার ওপর তরল কাদার স্রোত। দূরে দূরে একেকটা পাহাড়, সুতোর মতো সরু সরু রাস্তা, পাহাড়গুলোকে ঘিরে তারা এ'কে বেঁকে হারিয়ে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রান্তরের মাঝে। হাঁটু অবধি জলে নেমে ওরা হেঁটে চলে, গাড়ী আর কামানের চাকা একেবারে অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে গেছে। গোড়ার দিকে যে ভিজে বরফ-ঝরা বাতাসটা বইছিল অবশেষে তা ভয়ংকর তুষার-ঝড়ের রূপ নিল।

মালগাড়ী থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রশচিন। রাইফেল আর থলিটা গুছিয়ে নিয়ে সে চারিদিকটা চেয়ে দেখল একবার। রেল লাইনের উপর একদল সৈনিক জড়ো হয়ে চেঁচামেচি করছে। এরা সবাই ভারনাভ্ রেজিমেণ্টের লোক। কারুর পরনে লম্বাকোট, কারুর ভেড়ার চামড়ার, কয়েকজন আবার দড়ি দিয়ে কোমর বেঁধে বে-সামরিক ওভারকোটও চাপিয়েছে গায়ে। ওদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই মেশিনগান-বুলেটের বেল্ট, হাত-বোমা, রিভলবার। কেউ কেউ মাথায় দিয়েছে সাধারণ চূড়ো-টুপি, কেউ কোণাচে ধরনের ফারের টুপি, কেউ কেউ আবার ফাটকাবাজদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া বোলার-টুপিও মাথায় দিয়েছে। ছেঁড়া জুতো, ফেল্টের জুতো, ন্যাকড়া-জড়ানো পায়ে প্যাঁচপেঁচে কাদা মাড়াচ্ছে সবাই। সঙ্গীনে সঙ্গীনে গুঁতো লেগে আওয়াজ উঠছে, আর নানা এলোমেলো চিৎকার কথা-বার্তা জড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের মধ্যে : "মিটিং-এ দেখা হবে বন্ধুরা! ব্যাপারটা আমাদের নিজেদেরই ফয়সালা করতে হবে! এ-ভাবে কসাইখানার দিকে আমাদের আর টেনে নেয়া চলবে না!"

উত্তেজনাটার কারণ হল গুজব—এসব ব্যাপারে যেমনটা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ফিলিপ্পভ্স্কায়ায় লাল ইউনিটের পরাজয়ের খবরটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওদের কাছে হাজির করা হয়েছে। চীৎকার উঠছে : "কর্নিলভের হাতে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার ক্যাডেট, আর আমাদের দলের রেজিমেণ্টগুলোকে এক এক করে পাঠানো হচ্ছে তারই কবলে।......এ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুরা! কম্যাণ্ডারকে এখনই ধরো।"

সৈনিকেরা ছুটে যাচ্ছিল স্টেশনের দিকে। গ্রামের ঠিক পরেই স্টেশনের হাতা শেষ হয়ে মিশে গেছে কুয়াশা-ঢাকা স্তেপ-প্রান্তরের মাঝে। মালগাড়ীর দরজাগুলো অনবরত ঝপ্ঝপ্ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে—রাইফেল কাঁধে নিয়ে অর্ধোন্মত্ত মানুষগুলো উৎসুক হয়ে ছুটে চলেছে একটা জায়গায়। লম্বার্ডি পপ্লারের নগ্ন শাখায় দোলা দিয়ে শিস্ কেটে যাচ্ছে বাতাস। দাঁড়কাকগুলো মাথার ওপর চক্কোর দিয়ে দিয়ে ডাকছে। ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢাকা একটা বরফ-ঘরের ছাদে উঠে বক্তারা মুষ্টি আস্ফালন করে চীৎকার করছে : "কমরেডস্, কর্নিলভের দল আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে কেন? একাতেরিনোদারের দিকে ক্যাডেটদের বিনা বাধায় যেতে দেয়া হচ্ছে কেন? কী ধরনের ফন্দী এটা? কম্যাণ্ডার আমাদের বুঝিয়ে বলুন দেখি!"

হাজারখানেক লোকের ভীড়ের মাঝখান থেকে প্রতিধ্বনি উঠল : "কম্যান্ডারকে চাই!" আওয়াজে ভড়কে উঠে পালিয়ে গেল একদল দাঁড়কাক। স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রশ্‌চিন লক্ষ্য করল কম্যান্ডারের কুঁচকে-যাওয়া টুপিখানা অসংখ্য সচল মাথার ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ঘাসের চাপড়া-ঢাকা বরফ-ঘরটার দিকে। পরিষ্কার করে কামানো তার রোগা ফ্যাকাশে মুখখানা আর দু'চোখের স্থিরদৃষ্টি যেন দৃঢ়সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠেছে। রশ্‌চিন এবার তার পুরনো বন্ধুকে চিনতে পারল—সার্গি সার্গিয়েভিচ্ সাপঝ্‌কভ।

যুদ্ধের আগে একটা সময় ছিল যখন এই সাপঝ্‌কভকে দেখা যেত "আগামী-যুগের-মানুষ" দলের হয়ে গলাবাজী করতে। সাবেকী রীতিনীতির আদ্যশ্রাদ্ধ করত সে। বুর্জোয়া সমাজে চলাফেরা করত গালে লোভনীয় প্রসাধনী রং মেখে, উজ্জ্বল সবুজ ফাস্টিয়ান কাপড়ের ফ্রককোট পরে। যুদ্ধের সময় সে অশ্বারোহী বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যোগ দেয়, বেপরোয়া গোয়েন্দাগিরি ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নাম কিনে ফেলে, অবশেষে তাকে অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বিতীয় লেফটেন্যাণ্টের পদে উন্নীত করা হয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে পেত্রোগ্রাদে চালান করে দেয়া হয়। কোনো এক গোপন সংগঠনের সদস্য এই অভিযোগে তাকে গুলি করে মারার হুকুম দেয়া হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তার মুক্তি হয়। সৈনিক প্রতিনিধিদের সোবিয়েতে তাকে কিছুকাল দেখা যায় অ্যানার্কিস্ট দলের লোক হিসেবে। তারপর আবার অদৃশ্য। অক্টোবরের শেষ দিকে তার পুনরায় আবির্ভাব হল উইণ্টার প্রাসাদ দখল করার সময়। লাল রক্ষীবাহিনীতে যে-সব নিয়মিত ফৌজী অফিসার যোগদান করেছিল সাপঝ্‌কভ তাদের অন্যতম।

ঠেলেঠুলে কোনোমতে সামলে নিয়ে সে ছাদের উপরে গিয়ে উঠল। হাতের বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে দিল বেল্টের মধ্যে। থুতনিটা গলার ভাঁজ পর্যন্ত নামিয়ে নিয়ে সে চারদিকটায় একবার নজর বুলিয়ে নিল। হাজারটা মাথা উৎসুক হয়ে উঁচিয়ে আছে তার দিকে।

"গলা-ফাটানো হতভাগার দল, জানতে চাও ঐ সোনার পদক ঝোলানো বেজম্মাগুলো কেন তোমাদের হারিয়ে দিল? তোমাদের এই চেঁচামেচি আর হৈচৈ-এর জন্যই!"—বিদ্রূপের টান তার কথায়, জোরে বলছে না অথচ সবাই শুনতে পাচ্ছে তার গলা : "তোমরা যে শুধু উপরওয়ালা কম্যান্ডারের হুকুম মানো নি তাই নয়, সামান্যতম উস্কানিতেই তোমরা যে চ্যাঁচাতে শুরু করো শুধু তাই নয়, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে যারা ভয়-তরাসে, গুজব ছড়িয়ে বেড়ানোই তাদের পেশা। কে তোমাদের বলেছে আমরা ফিলিপ্‌পভ্‌স্কায়ায় হেরে গিয়েছি? কর্নিলভ যে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়েই একতেরিনোদারের দিকে অভিযান চালাচ্ছে এ-কথা কে বলল তোমাদের? কে? তুমি বলেছ নাকি হে?" (সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজনের দিকে চট্ করে রিভলবার-ধরা হাতখানি বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সে) "চলে এস তাহলে! সামনা-সামনি কথা হোক আমার সঙ্গে!"

ওঃ—হো, তুমি নও বুঝি?" (অনিচ্ছাভরে সে রিভলবারটা পুনরায় পকেটস্থ করল)
"আমাকে কি মেনি-বেড়ালটি পেয়েছ তোমরা? আমি কি বুঝি না তোমরা কেঁউ-কেঁউ করছ কিসের জন্য? তা হলে বলব কথাটা, শুনতে চাও? ফিদর ইভল্‌গিন, এক নম্বর; পাবলেংকভ্, দুই; তেরেন্তি দুলিয়া, তিন—এরা সবাই সরাসরি গন্ধ পেয়েছিল ভাঁটিখানার, খবর পেয়েছিল আফিপ্‌স্কায়া গাঁয়ে নাকি মদের ভরা পিপে রয়েছে।..." (হেসে ফেলল সবাই। এমন-কি রশ্‌চিনও একবার কাষ্ঠহাসি হেসে ভাবল : যাক্ শয়তানটা দেখছি চালাকি করে পার পেয়ে গেল!) "হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক যে এ ছোকরারা কেউই যুদ্ধ করতে পেছ-পা নয়। মদের পিপে-গুলো ধরো যদি কর্নিলভের অফিসারদের হাতে পড়তো?—তা হলে তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যেত যে আমাদের কম্যান্ডার-ইন-চীফ হলেন বিশ্বাস-ঘাতক!......আমাদের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সে এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা হত, কি বল?" (হাসি ফেটে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আর একবার দাঁড়কাকগুলো উড়তে শুরু করল আকাশে) "আমার মনে হয়, কমরেডস্, এখানেই এ-ঘটনার ছেদ টানা ভাল। রণাঙ্গনের সর্বশেষে বুলেটিনটা এবার আমি পড়ে শোনাব।"

কতগুলো ইশ্‌তেহার বের করে সাপোঝ্‌কভ উচ্চকণ্ঠে পড়তে লাগল। রশ্‌চিন ফিরে চলল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে। সেখানে একটা ভাঙা বেঞ্চির উপর বসে সে একটুকরো কাগজে ঘরে-তৈরি তামাক জড়াতে শুরু করল। হপ্তাখানেক আগে কতগুলো জাল দলিলপত্র জোগাড় করে সে লালরক্ষী বাহিনীর একটা ইউনিটে যোগ দিয়েছে। ইউনিটটা তখন রণাঙ্গনের দিকেই যাচ্ছিল। কাতিয়ার সঙ্গে সে ইতিমধ্যে যেমন-তেমন একটা বোঝাপড়াও করে নিয়েছে। তেৎকিনের সঙ্গে চায়ের টেবিলে সেই বেদনাদায়ক তর্কবিতর্কের পর সারাটা দিন রশ্‌চিন শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। রাতে অবশ্য কাতিয়ার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু পাছে কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে এই ভয়ে কাতিয়ার দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে রীতিমত কড়া গলায় বলেছিল :

"আর একমাস কি দু'মাস এখানে থাকতে পারবে হয়তো, ঠিক জানি না কতো দিন।...আশা করি তেৎকিনের সঙ্গে এ সময়টুকু বেশ ভালোই মানিয়ে চলবে তুমি। তোমাকে এখানে রাখার খরচাটা অবশ্য আমি সুযোগ পেলেই দিয়ে দেব। দয়া করে তাকে এখনই বলে দাও যে তার হাতে পয়সা গুণেই দেয়া হবে, তার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে আসিনি আমি। ভালো কথা—কিছুদিনের জন্য আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। "

ঠোঁট প্রায় না খুলেই কাতিয়া প্রশ্ন করে :

"ফ্রণ্টে যাচ্ছ নাকি?"

"আজ্ঞে মাফ করো। সে ভাবনা আমার নিজস্ব।"

কাতিয়ার সময় কাটছিল অত্যন্ত খারাপ, অত্যন্ত শোচনীয়। মনে পড়ে এই সেদিনও জুলাইয়ের এক চমৎকার সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে সে আর রশ্‌চিন বসেছিল নেভা নদীর ধারে একটা পাথরের বেঞ্চিতে; আয়নার মতো স্বচ্ছ নদীর বুকে ছায়া

মেলেছিল ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের বনবীথি আর সেতুর রেখাকৃতি। রশ্চিন তাকে বলেছিল : "যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই, বিপ্লবও মিলিয়ে যাবে একদিন, কিন্তু তোমার এ প্রেমের মাধুরী? এ কোনোদিন ফুরিয়ে যাবার নয়।" আর আজ? এই নোংরা আঙিনায় দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে শত্রুর মতো আক্রোশ বুকে নিয়ে।......কাতিয়ার প্রেমজীবনের পরিণতি কি এর চেয়েও মহত্তর কিছু হতে পারতো না?..."কিন্তু সারা রাশিয়াই যখন ডুবতে বসেছে, তখন আর এর মর্যাদা কতটুকু!"

রশ্চিনের পরিকল্পনা নিতান্তই সহজ সরল : যে কোনো একটা লালরক্ষী ইউনিটের সঙ্গে যুদ্ধ এলাকায় গিয়ে ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর মুখোমুখি আসা, তারপর সুযোগ বুঝলেই অপর পক্ষে ডিঙিয়ে চলে যাওয়া। ফৌজে থাকতে তার সঙ্গে জেনারেল মারকভ ও কর্নেল নেঝেন্‌ৎসেভের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। রশ্চিন অনায়াসেই লালবাহিনী সম্পর্কে নানা মূল্যবান্ তথ্য তাঁদের সরবরাহ করতে পারবে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা সে অন্তত এইটুকু স্বস্তি পাবে যে সে তার আপনার লোকজনের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে পেরেছে। অনায়াসেই তার এই ঘৃণ্য মুখোশটা ছুঁড়ে ফেলতে পারবে সে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে আবার। 'এই হতভাগা হাঁদাগুলো, অবাধ্য অসভ্যগুলোর' মুখের উপর তখন সে চরম ঘৃণার থুথু ছুঁড়ে মারবে প্রত্যেকটি বুলেটের সঙ্গে সঙ্গে।

"কম্যান্ডার ঐ মদের ব্যাপারটা ঠিকই বলছিল। শুধু শুধুই চিৎকার করি আমরা। এই এত যে হৈ-চৈ করছি, এতে কি দুর্গতির শেষ হবে? কী ব্যাপার হয়েছে তাই নিয়ে এত খোঁজখবরে কোন্ ফয়দাটা হবে!"—বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল একটি ছাঁপোষা-চেহারার লোক। ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটটার এখানে-ওখানে পশম বেরিয়ে পড়েছে। পাশে এসে বসল। এক চিমটি তামাক চাইল রশ্চিনের কাছে।

"আমি হচ্ছি বুড়োদের দলে, বুঝলে—পাইপটাই পছন্দ করি।" (রশ্চিনের দিকে তার ঝড়-ঝাপটা-সওয়া শেয়ানা মুখখানা ঘুরিয়ে দেখল একবার। সাদাটে ধরনের দাড়ি, চোখদুটো যেন কুঁচকে আছে) "নিঝ্নির সওদাগরদের গোলাঘরে কাজ করতাম, ওখানেই পাইপ-ধরানো শিখেছি। সেই ১৯১৪ সাল থেকে কেবল যুদ্ধই করছি—নেশা ধরে গেছে বুঝলে ভাই, আমি হলাম লড়াকু, একেবারে নির্ভেজাল লড়াকু যাকে বলে।"

মনে মনে বিরক্ত হয়ে রশ্চিন বলল : "এবার তা হলে ক্ষান্তি দিয়ে বিশ্রাম করো।"

"বিশ্রাম? বিশ্রাম কোথায় পাব শুনি? তুমি তো বড়লোকের বাচ্চা, দেখেই মালুম হচ্ছে। না হে না, লড়াই আমি ছাড়বো না কখখনো! বুর্জোয়া-গুলোর উৎপাতে সারা জীবন কষ্ট সয়েছি। সেই ষোলো বছর বয়েস থেকে চাকরি করছি—চৌকিদারের চাকরি। তারপর ভাসেন্কভদের ওখানে ঢুকলাম কোচ-ম্যানের কাজ পেয়ে—ভাসনেকভ্দের নাম শুনেছ বোধ হয়? ব্যবসাদার ওরা—কিন্তু

ওদের অমন চমৎকার একজোড়া ঘোড়াকে আমি জল খাইয়ে খাইয়েই মেরে ফেললাম। ঘোড়া দুটোর দফা আমিই শেষ করে দিয়েছিলাম, স্বীকার করি সে-কথা। চাকরিটা অবশ্য গেল। ছেলে খুন হয়ে গেছে, বউ মরেছে অনেকদিন আগে। এবার বলো দেখি কার হয়ে লড়তে পারি আমি?—সোবিয়েত, না বুর্জোয়া? বেশ ভালই খাই দাই এখন, গত হপ্তায় একটা মরা-মানুষের পা থেকে একজোড়া বুট খুলে নিয়েছি। মালটা ভালই—এই দেখ না! ভিজে জলকাদা একদম ঢোকে না। এখন আমার কাজ হল শুধু একটু-আধটু গুলি চালানো আর 'হুর-রে' বলে চিৎকার করা। তারপর গিয়ে ঝোলের কড়াইটার পাশে বসা, ব্যস্। এ হল নিজের দলের হয়ে কাজ করা, বুঝলে বাছা! গরীব, কপর্দক নেই যার, গা-ঢাকবার জামাটি পর্যন্ত নেই, দুঃখ কষ্ট যাদের চিরসংগী—তাদের নিয়ে হল আমাদের এই ফৌজ। আর ওই সংবিধানী পরিষদ?—নিঝ্‌নিতে তো দেখেছি—ওখানে যতো রাজ্যের ভদ্রলোক আর পণ্ডিতমুখ্যুকে পাঠানো হয় ভোট দিয়ে।"

"জিভ নাড়তে শিখেছ তো বেশ!" সংগীর দিকে চোরা চাউনি দিয়ে বলল রশ্‌চিন। লোকটির নাম ক্‌ভাশিন। পুরো এক হপ্তা ধরে ওরা একই রেলের কামরায় ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে দিন কাটিয়েছে। কামরার সবাই ক্‌ভাশিনকে জানতো তার সরকারী নামে—'দাদু'। দাদুকে সর্বদাই দেখা যেত কামরার একটি কোণ বেছে নিয়ে খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে। পাতলা নাকের ওপর সোনার প্যাঁশ্‌নেজোড়া এঁটে নিচু গলায় খবর পড়ত সে।

"প্যাঁশ্‌নে-জোড়া পেয়েছি সামারায়, একেবারে অর্ডারী মাল। কোটিপতি বাশ্‌কিরভ অর্ডার দিয়েছিলেন তাঁর নিজের জন্য, আর এখন পরছি আমি।"—প্রায়ই সে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো কথাটা।

রশ্‌চিনের জবাবে সে বলল : "জিভ নাড়তে শিখেছি, সত্যি কথাই। একটা মিটিংও বাদ দিই না। প্রত্যেকটি স্টেশনে হুকুমনামা আর সরকারী বিজ্ঞপ্তি পড়ি। আমাদের শ্রমিকদের শক্তিই তো হল কথার মধ্যে—হ্যাঁ, জিভ্ নাড়ার মধ্যেই। যদি কথাই না বলতে পারতাম তা'হলে আমাদের পুঁছতো কে শুনি? শ্রেণী চেতনা না থাকলে আমাদের কেউ মূল্য দিত? যে চুনোপুঁটি সেই চুনোপুঁটিই থাকতাম!'

একটা খবরের কাগজ বের করে সাবধানে ভাঁজ খুলল সে। ধীর মর্যাদাভরা ভংগীতে চোখে প্যাঁশনেখানা এঁটে সে সম্পাদকীয় স্তম্ভটা পড়তে শুরু করল। বিদেশী ভাষা পড়ার মতো প্রত্যেকটা শব্দ জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে লাগল।

'......স্মরণে রাখিবেন আপনাদের এই সংগ্রাম মেহনতী মানুষ ও অত্যাচারিত জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আপনারা লড়িতেছেন মহত্তর এক জীবন, ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এক জীবন গড়িয়া তুলিবার অধিকারের জন্য।......'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রশ্‌চিন। সে লক্ষ্যও করল না শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করবার সময় ক্‌ভাশিনের চোখজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্যাঁশনের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

"যে কেউ দেখলেই বুঝবে তুমি ধনীলোকের বাচ্চা"—ক্ভাশিনের গলার স্বর পাল্‌টে গেছে একদম : "তুমি আমার পড়াটা পছন্দ করছ না। টিকটিকি নও নিশ্চয়ই, কি বল?"

আফিপ্‌স্কায়া থেকে ভারনাভ্‌ রেজিমেণ্টের ফৌজীদলটা পদব্রজে চলে এল নভোদ্‌মিত্রভ্‌স্কায়া গ্রামে। রাতের অন্ধকারে অসংখ্য সঙ্গীনের ফাঁকে শিস্‌ কেটে যাচ্ছিল বাতাস, সৈনিকদের পরনের পোশাক যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল দমকা হাওয়ায়, বরফের গুঁড়ো ওদের মুখের ওপর ঝাপটা মেরে চলে যাচ্ছিল। মাটির ওপরকার তুষার আস্তরণ ভেদ করে পা ডুবে যাচ্ছিল প্যাঁচপেঁচে কাদার মধ্যে। বাতাসের গোঁ গোঁ আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল চিৎকার : "থাম! একটু আস্তে চল! অমন গুঁতোগুঁতি করছ কেন হতভাগারা!"

পাতলা কোট মানছিল না ঠাণ্ডা। হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। রশ্‌চিন ভাবল : "আবার পড়ে টড়ে না যাই যেন, একবার পড়লেই দফা রফা। পায়ের তলায় একেবারে পিষে যাব।......" সবচেয়ে উৎকট জিনিস হল মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে পড়া। সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে চীৎকার আসতে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওরা পথ ভুল করে ফেলেছে। একটা উপত্যকার কিনারা দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা, নদীর ধার ঘেঁষে। "আর যেতে পারব না ভাই আমি"—ভাঙা গলায় কে যেন বলে উঠল কাছ থেকেই। 'ক্ভাশিন নয় তো? বরাবরই পাশে পাশে রয়েছে লোকটা। আমার সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে নিশ্চয়, তাই আমার একটা কথাও সে বিশ্বাস করে নি।' (গত সন্ধ্যায় রশ্‌চিন বহুকষ্টে তার হাত এড়াতে পেরেছে)। 'আবার বুঝি সামনের দিকটায় ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল!' তুষার জল লেগে শক্ত হয়ে গিয়েছে সামনের লোকটির কোটের পিছনটা। রশ্‌চিনের নাকে এসে লাগল ধাক্কা। জামার হাতার মধ্যে ঠাণ্ডা অসাড় আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল রশ্‌চিন : 'ক্লান্তি না মেনে হাজার হাজার মাইল হেঁটে চলেছি আমি, একমাত্র উদ্দেশ্য এদের খুন করা। দারুণ দরকারী কাজ এটা, একাজের একটা অর্থ আছে। রেগে গিয়ে তো কাতিয়াকে ছেড়ে এলাম—অবশ্য তেমন একটা গুরুত্ব নেই ব্যাপারটার। আজ হোক, কাল হোক, অন্যপক্ষে চলে যাবই। তখন শুরু করব এই লোকগুলোকে, এই রাশিয়ানগুলোকে খুন করতে। এই রকম তুষার ঝড়ের মধ্যে বাগে পেয়ে এদের মারতে শুরু করব। অদ্ভুত! কাতিয়া বলত আমি নাকি বড় নরম প্রকৃতির লোক, মনটা নাকি খুব উঁচু। অদ্ভুত, কী অদ্ভুত ব্যাপার!'

নিদারুণ কৌতূহলে সে তার নিজের ভাবনার গতি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ভাবল—'আঃ! কি বিচ্ছিরি ব্যাপার হল। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি যে! মরার সময় মানুষের যে-সব কথা মনে হয় সেইসব দারুণ দরকারী কথাগুলোই এখন মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। এর মানে শিগগীরই এই বরফের উপর শয্যা নিতে হবে আর কি!'

কিন্তু ওর সামনের সেই বরফ-জমা কোটটা আবার চলতে শুরু করল। তাই রশ্‌চিনকেও গা ঝাড়া দিয়ে তার পিছন পিছন চলতে হল। কাদার মধ্যে হাঁটু অবধি ডুবে গেছে তার। বুটজোড়া টেনে তোলা রীতিমত কঠিন মনে হয়, টন-খানেক ওজন হয়ে গেছে সেটার। টুকরো টুকরো দু'একটা আওয়াজ ভেসে আসছে কানে : "নদী এসে পড়ল হে!" গালিগালাজ উঠল আবার। আগের মতোই বাতাস শিস্‌ কেটে যাচ্ছে সঙ্গীনের ফলাগুলোর মাঝ দিয়ে, ওদের মাথার মধ্যে খেলিয়ে যাচ্ছে নানা চিন্তার ঢেউ। রশ্‌চিনের গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে আবছা কুঁজো দেহগুলো। বাদবাকী যেটুকু শক্তি ওর তখনও অবশিষ্ট ছিল তাই জড়ো করে সে পা-টাকে টেনে তুলল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানির আওয়াজ। তারপর আবার সে চলতে লাগল টলতে টলতে।

বিস্তীর্ণ বরফের উপর ঘন দাগ কেটে এগিয়ে গেছে কুলপ্লাবী নদীর জল। তার ওপরে সবকিছু অদৃশ্য, তুষার ঝড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। নদীর কিনারায় পা হড়কে যাচ্ছে ওদের। উদ্ধত ভঙ্গীতে ছুটে চলেছে কালো জল। কে যেন বলে উঠল : "পুলটা তলিয়ে গেছে,......ফিরে যাবো নাকি আমরা?" "কে বলল ফিরে যাবার কথা? তুমি বলেছ—ফিরে যাবার কথা?" "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, কমরেড!" "কুঁদো দিয়ে দিয়েছ তো একখানা—?" "উঃ-উঃ!"

নীচে নদীতটের একেবারে কিনারায় গিয়ে পড়ল বৈদ্যুতিক টর্চের একটা ত্রিকোণ আলোকরেখা। কুঁজো পুলটা আলোকিত হয়ে উঠল—ধূসর উচ্ছ্বসিত জল আছড়ে পড়ছে পুলের গোড়ায়, রেলিংয়ের ভাঙা টুকরোগুলোও দেখা যাচ্ছে। টর্চের আলো এবার আরো উঁচুতে উঠল—এপাশ ওপাশ এঁকে বেঁকে ঘুরে অবশেষে নিভে গেল সেটা। একটা ভাঙা কর্কশ গলা এমনভাবে চিৎকার করে উঠল যে শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায় :

"স্কোয়াড!......নদী পার হও!......রাইফেল কার্তুজ মাথার ওপরে, ঠেলা-ঠেলি নয়—দুজন দুজন করে।......এগোও!"

রাইফেল মাথার ওপর তুলে ধরে রশ্‌চিন কোমর-জল ঠেলে এগিয়ে চলল। জলটা বাতাসের মতো অতো ঠাণ্ডা নয়। ডান পাশটায় ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছে, জলের তোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত, মনে হচ্ছিল যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওই ধূসর-সাদা অন্ধকারের দিকে, গভীর জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেবে। পুলের ওপর পা পিছলে যাচ্ছিল, পায়ের নীচে ভাঙা তক্তাগুলোর অস্তিত্বই টের পাচ্ছিল না রশ্‌চিন।

নভোদ্‌মিত্রভ্‌স্কায়াতে ভারনাভ্‌ রেজিমেণ্টকে পাঠানো হল স্থানীয় ফৌজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য। গ্রামের সমস্ত মানুষ লেগে গেছে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে, গ্রাম-কাউন্সিল ও অন্যান্য বাড়ীগুলোকে সুরক্ষিত করছে, মেশিনগান বসাচ্ছে। ভারী কামান-গুলো পাতা হয়েছে আরো দক্ষিণে গ্রিগরিয়েভ্‌স্কয়া গ্রামে। এই একই এলাকায় রয়েছে দু'নম্বর উত্তর ককেশীয় বাহিনী, যার অধিনায়ক হলেন দ্‌মিত্রি। সেই রস্তভ্‌ থেকে এই ফৌজটি ভলাণ্টিয়ার বাহিনীকে সমানে তাড়া করে চলেছে।

পশ্চিমদিকে আফিপ্স্কায়াতে কামান আর সাঁজোয়া ট্রেন সমেত একটা গ্যারিসন মোতায়েন আছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে লাল বাহিনী। পথঘাট যখন গলা বরফে আচ্ছন্ন হয়ে দুর্গম হয়ে উঠেছে তখন এভাবে ছড়িয়ে থাকাটা তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই সমীচীন হয় নি।

সন্ধ্যের দিকে একজন কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে এল গ্রাম কাউন্সিলের দিকে। সর্বাঙ্গে তার কাদা আর ভিজে বরফের প্রলেপ। গাড়ীবারান্দার নীচে এসে লাগাম রুখল সে। ঘোড়ার স্ফীত প্রসারিত দেহ থেকে বাষ্প উঠেছে।

"কমরেড কম্যান্ডার কোথায়?"

তাড়াতাড়ি কোট আঁটতে আঁটতে কয়েকজন লোক ছুটে এল ফটকের মুখে। সাপোঝ্কভ্ বেরিয়ে এল ভেড়ার চামড়ার ঘোড়সোয়ারী জ্যাকেট গায়ে দিয়ে।

"আমিই কম্যান্ডার"—ওদের এক পাশে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল সে।

একটু দম নিয়ে কসাকটি জিনের ওপর ঝুঁকে বলল : "ঘুম্টির সমস্ত সৈন্যকে শেষ করে দিয়েছে। আমিই শুধু বেঁচে পালিয়ে এসেছি।"

"আর কোনো খবর?"

"খবর : আজ রাতেই কর্নিলভ এসে পড়বে এখানে, তার পুরো ফৌজ সঙ্গে নিয়ে।......"

ফটকের সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। ওদের মধ্যে গ্রাম প্রতিরক্ষার সংগঠক কমিউনিস্টরাও ছিল। সাপোঝ্কভ ফোঁস করে নিঃশ্বাস টেনে বলল :

"আমি তৈরিই আছি—তোমাদের খবর কি কমরেডস্?"—থুতনির নিচে ফুটে উঠল চামড়ার ভাঁজ।

ঘোড়া থেকে নেমে কসাকটি বলতে শুরু করল কী ভাবে সেনাপতি এরদেলির ফৌজের সিরকাশিয়ানরা পাহারা-ঘুম্টির সৈন্যদের খতম করেছে। ফটকের কাছে জড়ো হতে লাগল সৈনিক, কসাক স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেদের ভীড়। সবাই চুপ করে শুনছে কথা।

মাথায় একটা কাপড় ঘোমটার মতো বেঁধে রশ্চিনও এসে হাজির হয়েছে। এর মধ্যেই বেশ একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছে সে। প্রায় জন পঞ্চাশেক লালরক্ষীর সঙ্গে একটা উষ্ণ দুর্গন্ধময় কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। পা-বাঁধা পট্টি আর ভিজে কাপড়-চোপড়ের মধ্যে মেঝেতে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়েছিল ওরা। সে বাড়ির গিন্নীটি ভোর না হতেই উঠে রুটি সেঁকেছে, নিজের হাতে কেটে রুটি বিলি করেছে ওদের।

"ভাল করে লড়ো, বন্ধুরা! অফিসারগুলোকে আর গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে দিও না।"—বলেছিল সেই জোয়ান বয়েসী গিন্নীটি।

জবাবে লাল সৈনিকেরা বলেছিল :

"ঘাবড়ে যেও না গো! তোমার হল একটা জিনিসেরই ভয়, তা হচ্ছে......"

এমন একটা কথা ব্যবহার করেছিল ওরা যে খেপে গিয়ে গিন্নীটি হাতের রুটিটা প্রায় ছুঁড়ে মারে আর কি :

"হতচ্ছাড়া ষাঁড়গুলো! মরতে বসেছো, তবু! একটুও বদলাও নি দেখছি......"

সারারাত হেঁটে রশ্‌চিনের সর্বাঙ্গ ব্যথায় টন্‌টন্ করছিল। কিন্তু ওর মাথায় যে মতলব ঢুকেছে সে কথা ও একবারও ভোলেনি। সেই সকাল থেকে তরকারীর ক্ষেতে ঢুকে সমানে হিমজমাট মাটি কুপিয়েছে। তারপর গাড়িগুলো থেকে গোলাবারুদের বাক্স খালাস করে গ্রাম-কাউন্সিলের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে।

খাবার সময় প্রত্যেকেই এক কাপ করে মদ খেয়ে নিয়েছিল। সেই তরল আগুনের স্পর্শেই ব্যথা বেদনা দূর হয়ে গেছে রশ্‌চিনের। গিঁটে গিঁটে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তার আর চিহ্নও নেই এখন। তাই আর দেরি করার কথা ভাবতে পারল না সে। আজই যা করবার করে ফেলতে হবে এই হল তার মতলব।

ফটকের কাছে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল সে সুযোগের অপেক্ষায়—হয়তো ওকে কোনো একটা পাহারা ঘুম্‌টিতেই পাঠিয়ে দেবে। আগের থেকেই সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছিল সে, এমন কি উর্দির ওপরে ক্যাপ্টেনের স্কন্ধ-চিহ্নটাও সেলাই করে নিয়েছিল। যেমনটি সে আশা করেছিল ঠিক তেমনটিই ঘটল। সাপঝ্‌কভের পাশে দাঁড়ানো গাঁট্টাগোট্টা চেহারার নাবিকটি সিঁড়ি থেকে নেমে এসে আবেদন জানাতে লাগল—এই বিপজ্জনক কাজে কিছু স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন।

"ভাইসব!"—বজ্রগম্ভীর গলায় হেঁকে বলল সে : "এখানে কি এমন কেউ আছে যে জীবন দিতে প্রস্তুত?"

ঘণ্টাখানেক বাদে পঞ্চাশজন সৈন্যের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল রশচিন। কুয়াশাচ্ছন্ন সমতলভূমির দিকে বিষন্ন ক্লান্তিতে এগিয়ে চলল ওরা। মন্থর গোধূলির আলো নেমে আসছিল পৃথিবীর বুকে। বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে, দমকা বাতাসে ভারী এক এক পশলা বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে ওদের মুখে। জল থৈ থৈ করছে, রাস্তা হারিয়ে গেছে জলের নীচে। তার মধ্যেই ওরা মার্চ করে চলল। মনে হচ্ছিল যেন হেঁটে হ্রদ পেরুচ্ছে ওরা। সামনেই কোনো উঁচু টিলায় গিয়ে পরিখা খুঁড়তে হবে ওদের।

হঠাৎ আকাশে জাগলো বিদ্যুতের মতো ঝল্‌কানি। সঙ্গে সঙ্গে গুম-গুম আওয়াজ। একটা তীক্ষ্ন আর্তনাদে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল সকালের আর্দ্র কুয়াশা। পরমুহূর্তেই টিলাগুলোর মাথায় আর নদীর কিনারায় এলোমেলো বন্দুকের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আবার চমকে উঠল বিজুলি, একটা গোলা এসে ফেটে পড়ল, সামনেই কোথা থেকে ভেসে এল মেশিনগানের কট্‌-কট্ আওয়াজ।

কর্নিলভ আসছেন এগিয়ে। তাঁর অগ্রগামী ইউনিটগুলো এর মধ্যেই

নদীর ওপারে এসে হাজির হয়েছে। রশ্‌চিনের মনে হল যেন কয়েকটি মূর্তিকেও দেখতে পাচ্ছে সে মাথা নীচু করে নদীর পাশের ঝোপগুলোর দিকে ছুটে আসতে। বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল তার। নদীর পাড়ে খোঁড়া অগভীর পরিখার মধ্যে থেকে গলা বাড়িয়ে রইল সে।

কিনারা পর্যন্ত ছাপিয়ে ওঠা হলদে-সবুজ ঘোলা জলে দেখা যাচ্ছে একটা পুল,—জলের মধ্যে অর্ধেক তলিয়ে গেছে। প্রায় গোটা কুড়ি আবছা মূর্তি জল থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে পুলটার ওপর। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। টিলার ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিগোলা যেন ক্রমশই এলোমেলো আর ঘন হয়ে আসতে থাকে নদী আর পুলের ওপরে। নদীর উল্টো দিকে একটা কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ এক অগ্নিজিহবা—বেশ কাছাকাছিই। রশচিন যে পরিখাটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে পড়েছিল তার ঠিক ওপরেই ফাটলো একটা গোলা। কতকগুলো ছায়ামূর্তি,—কোনোটা কালো, কোনোটা ধূসর,—চূড়োর ওধার থেকে বেরিয়ে ছুটে চলল সেতুমুখটার ওদিকে—কখনো ওরা দৌড়চ্ছে, কখনো বা বসে পড়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলছে, কখনো গড়াচ্ছে, কখনো পড়ে যাচ্ছে। ওদের কাঁধের স্ট্র্যাপগুলো পর্যন্ত রশচিন এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

আবার গোলার-বিস্ফোরণ হল। ট্রেঞ্চের ওপর আবার একটা কর্কশ কান-ফাটানো গর্জন। "ভাইসব, ভাইসব—ওঃ" কোথা থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। অসংখ্য গুলিগোলার শব্দের মধ্যে শোনা গেল একটা দীর্ণ চীৎকার ঃ "ওরা আমাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছে! পেছনে হঠে এস সবাই!"

এইবার বুঝি সেই চরম মুহূর্তটি এল, এতদিন প্রতীক্ষার পর—ভাবতে লাগল রশচিন। সটান সামনের দিকে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে। মাথার মধ্যে পাগলের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল নানা ধরনের চিন্তা : '...রুমাল তো নেই সঙ্গে......সার্টের ছেঁড়া টুকরো একখানা বেয়নেটের মাথায়......আর ফরাসী ভাষায় চীৎকার করতে হবে কিন্তু...।' আচম্বিতে কে যেন ওর পিঠের ওপর প্রচন্ড বেগে লাফিয়ে এসে পড়ল,—ওর গলাটা হাত দিয়ে জড়িয়ে চেপে ধরে আঙুল দিয়ে কন্ঠনালী পিষতে লাগল আর ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করতে লাগল। রশচিন ভড়কে গিয়ে কাঁধ ফিরিয়ে দেখল একখানা রক্তাপ্লুত মুখ, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ক্‌ভাশিনের দন্তহীন মুখগহ্বরটা ব্যাদান করে আছে!—আবার এসেছে! উন্মাদের মতো বারে বারে চিৎকার করে বলছে সে :

"ও, পালিয়ে যাচ্ছিলে বুঝি ওদিকে? নিজের দলের লোকের দেখা পেয়েছ, তাই না!"

পিঠ থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলে রশ্‌চিন টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্‌ভাশিনের আঙুল যেন সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে তার কাঁধজোড়া। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে রশচিন ট্রেঞ্চের পাশের উঁচু মাটিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; ক্‌ভাশিনের দুর্গন্ধ ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটটার মধ্যে সাংঘাতিকভাবে দাঁত বসিয়ে

দিল। তরল কাদার মধ্যে পিছলে যাচ্ছে তার কনুই আর হাঁটু, টের পাচ্ছিল সে। আর মাত্র হাতখানেক তফাতেই পাহাড়ের কিনারা—তারপর খাদ।

"ছেড়ে দাও!"—মরীয়া হয়ে গর্জে উঠল রশচিন। তারপর অকস্মাৎ পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন—খাদ বেয়ে দুটো দেহ জড়াজড়ি করে পড়ল নদীর মধ্যে।

কামানের গর্জনে চারিদিকটা গুম্‌গুম্‌ করতে থাকে। মাটি কেঁপে ওঠে বিস্ফোরণের শব্দে। ফৌজের প্রধান অংশটা তখন নদী পার হচ্ছে। গ্রিগারিয়েভস্কায়া গ্রাম থেকে গোলন্দাজবাহিনী তখন সেতুমুখের ওপরে গোলা বর্ষণ করছে। বরফ-ঢাকা মাঠটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে হাত বোমার টুকরোয়। নদীর মধ্যে যখনই এক-আধটা বোমা পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে ফুলে উঠছে ছোট ছোট জলস্তম্ভ।

শ্বেতরক্ষী পদাতিকরা নদী পার হচ্ছিল—দু'জন দু'জন করে এককেটা ঘোড়ায় চেপে। খরস্রোতা নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েই ঘোড়াগুলো পিছনে হঠে আসে, কিন্তু তারপরেই বেয়নেটের গুঁতোনি খেয়ে এগোতে বাধ্য হয়। ঘোড়ায়-টানা একখানা কামান-গাড়ী নদীর ঢালু পিছল তট বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসছিল। এ-পাশে ও-পাশে দুলতে দুলতে কামানগাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেল অতল জলের মধ্যে। ঘোড়সওয়ারের চাবুক খেয়ে রোগা রোগা ঘোড়াগুলো কোনোমতে পড়িমরি করে অর্ধমগ্ন পুলের উঁচু জায়গাটায় উঠতে থাকে। চারিদিকে পড়ছে কামানের গোলা, হিসহিস্‌ করে উঠছে জল। ভয়ানকভাবে ভড়কে গিয়ে ঘোড়া-গুলো পিছু হঠতে থাকে; দড়ির মধ্যে জড়িয়ে যায় ওদের পেছনের পা-গুলো।

মেশিনগান-বাহী গাড়িগুলো পুল ঘেঁষে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছিল জলের মধ্যে। ভাসতে ভাসতে পাক খেয়ে যাচ্ছিল অসহায়ভাবে। একটা গাড়ি সম্পূর্ণ উল্টে গেল, মানুষ ঘোড়াসমেত ভেসে চলল একদিকে। প্রাণপণে চাকা আঁকড়ে ধরে হাবুডুবু খেতে লাগল মানুষগুলো। ঘূর্ণ্যমান তালগোল পাকানো এই স্তূপের ওপর আকাশ থেকে নেমে এল একটা বোমা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কাঠের টুকরো আর মাংসের দলা সমেত শূন্যে পাক খেয়ে উঠল একটা জলের স্তম্ভ।

একটা ছোট লোমশ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেঁটে খাটো একজন লোক নদীর ধারে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ছোট করে ছাঁটা দাড়ি, পরনে বাদামী ফ্লানেলের জামা। লম্বা একখানা সাদা ফারের টুপি চোখ পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। হাতের চাবুকটা ভয়ংকর ভঙ্গিতে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি তীব্র দর্পিত কণ্ঠে চীৎকার করছিলেন। ইনি হলেন জেনারেল মারকভ। নদী পার হবার সমস্ত অভিযানটা তিনিই পরিচালনা করছিলেন। মারকভের সাহস সম্পর্কে নানা অদ্ভুত কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

মারকভ লড়াই করেছেন মহাযুদ্ধে, তাঁর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বিষাক্ত বায়ু। ঘোড়ার পিঠে চড়ে চোখে ফিল্ড্‌ গ্লাস লাগিয়েই হোক, অথবা তলোয়ার হাতে সৈনিকদের পুরোভাগে থেকে যুদ্ধের ভয়ংকর খেলা পরি-

চালনা করার ব্যাপারেই হোক, সর্বত্রই মারকভ অনুভব করেন এক অনির্বচনীয় তুরীয়ানন্দ। যে কোনো আদর্শের জন্য যে কোনো শত্রুর সঙ্গেই তিনি নির্বিচারে লড়াই করতে প্রস্তুত। তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে পোরা আছে তৈরি মালের মতো কয়েকটি বাঁধাধরা সূত্র—ঈশ্বর, জার ও রাশিয়া সম্পর্কে। এগুলোই তাঁর কাছে একমাত্র শাশ্বত সত্য, আর কোনোরকম বাড়াবাড়ির ধার ধারেন না তিনি। দাবা-খেলোয়াড়ের কাছে যেমন দাবার ছক ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই, ওঁর কাছেও তেমনি সারা দুনিয়াটা সংকুচিত হয়ে গেছে এক গণ্ডীবদ্ধ এলাকায় যেখানে দাবা-বোড়ের চাল দেয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক। নিম্নপদস্থদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যেমন রূঢ় তেমনি উদ্ধত। ফৌজের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ভয় করে চলে, অনেকেই আবার তাঁর সম্পর্কে মনে মনে পোষণ করে তীব্র ঘৃণা—মানুষকে মানুষ বলে গণ্যই করেন না তিনি, মনে করেন দাবার ঘুঁটি। কিন্তু কী প্রচণ্ড সাহস! জানেন কোন্ চরম সংকটের মুহূর্তে জীবন নিয়ে জুয়া খেলার প্রয়োজন—যখন সারাদিন লড়াইয়ের পর জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে অধিনায়কের জুয়ার চালের ওপর, সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থেকে তখন তিনি চাবুক আস্ফালন করে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বুলেটের ঝড়ের নীচে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল নদী পার হবার কাজ। নদী আর তটরেখা ঘিরে আবার এল তুষার-ঝড়। বাতাসের গতি বেড়ে উঠল উত্তরমুখী হয়ে। তুষারপাতের পরিমাণ বেড়েই চলল ক্রমশ। রশচিন পড়ে ছিল নদীর উঁচু ঢালের কিনারায়। তার কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। বন্ধুদের নজরে পড়বার আশা সে একেবারেই ত্যাগ করেছে। যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে জামার বুক থেকে কোনো রকমে খুলে নিল সামরিক চিহ্নগুলো, যেমন-তেমন করে সেগুলো পিন দিয়ে এঁটে নিল কাঁধের ওপর। টুপি থেকে ছিঁড়ে ফেলল পাঁচকোণা তারকা-চিহ্নটা। এতক্ষণ অনেক দূরে ভেসে গেছে কভাশিনের মৃতদেহ। চারিদিকে পড়ে আছে আহত সৈনিক—ওদের দিকে তাকাবারও কারো অবসর নেই এখন।

নদীটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও না থেমে ফৌজ সিধে এগিয়ে চলল নভোদ্‌মিত্রভ্‌স্কায়ার দিকে। সৈনিকদের উর্দি ঠান্ডায় জমাট হয়ে সেঁটে আছে গায়ে—বরফের পুরু আস্তরণে ঢেকে গেছে। ঘোড়ার খুর আর গাড়ির চাকায় কেঁপে উঠছে হিমজমা মাটি। বুট ছিঁড়ে গেছে, পায়ের ছাল চামড়া উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো মাটি আর রাস্তার গর্তে পড়ে।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন উঠে হামাগুড়ি দিয়ে চলল নদীর খাড়া পাড়ের দিকে, যেমন করে হোক আঁকড়ে ধরে থাকতেই হবে জীবনকে। কখনো কখনো পা হড়কে পেছিয়ে পড়ছিল ওরা। রশ্‌চিনের মনে হল যেন মাটির মধ্যে জমে গিয়েছে তার পা জোড়া। দাঁতে দাঁত চেপে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল (কাঁধে আর পাছায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল তার, হাঁটুর হাড়টাও ভেঙে গিয়েছে), আহত সৈনিকদের পিছন পিছন সে টলতে টলতে এগিয়ে চলল। কেউ তাকে নজর করেও দেখল

না। নদীর পাড় পর্যন্ত এসে যখন দাঁড়াল, তার যেন দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা। সেখানে তখন প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের গোঙানি, মাথার উপর দিয়ে শিস্ কেটে চলেছে বুলেট। সামনেই দাঁড়িয়েছিল অফিসারের লম্বাকোট আর চুড়ো-টুপি পরা একজন গোল-কাঁধওয়ালা লোক। হঠাৎ একপাশে টলে গিয়ে লোকটা পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপ্‌টার হাত থেকে বাঁচবার জন্য রশচিন শুধু একবার মাথাটা নীচু করল।

বরফের নীচে চাপা পড়েছিল একটা ঘোড়ার মৃতদেহ। একপাশ দিয়ে শুধু বেরিয়ে রয়েছে আড়ষ্ট একখানা ঠ্যাং। দুটো রুগ্ন শীর্ণ ঘোড়া মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল পরিত্যক্ত একটা কামানের পাশে। পরস্পরের গা জুড়ে গিয়েছে বরফের চাপে, পিঠের ওপর চেপে বসেছে তুষারের জিন। সামনে মেশিনগানের কট্‌কট্ আওয়াজটা যেন আরো উদগ্র, আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার আগেই গ্রাম্য কুটীরের উষ্ণতায় আশ্রয় নেবার আশায় মরীয়া হয়ে লড়ছিল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী—অধীর হয়ে উঠেছিল তারা রণাঙ্গনের তুষার-ঝড়ের অনিবার্য মৃত্যুর হাত এড়াবার আকাঙ্ক্ষায়।

গ্রিগরিয়েভ্‌স্কায়ার গোলন্দাজবাহিনী তখন আক্রমণকারীদের ওপর গোলা-বর্ষণ করছিল। কিন্তু লাল বাহিনীর বাদবাকী অংশ তখনও লড়াইয়ে নামে নি—আফিপ্‌স্কায়ার রিজার্ভ সৈন্যরাও নয়। নভোদ্‌মিত্রভ্‌স্কায়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল ভারনাভ রেজিমেন্ট। হাতাহাতি রাস্তার লড়াইয়ে সুবিধা করতে পারে নি। এই অবরোধের পরই দ্বিতীয় ককেসীয় রেজিমেন্টের ওপর হুকুম এল আক্রমণ চালাবার। একটানা জলাভূমি আর বন্যাপ্লাবিত এলাকার ওপর দিয়ে দীর্ঘ ছ' মাইল রাস্তা ভেঙে ককেসীয় ফৌজ অবশেষে শত্রুর পেছন দিকে এসে আঘাত হানল। জলমগ্ন হয়ে অথবা তুষারের আক্রমণ সইতে না পেরে পথেই অবশ্য তাদের হারাতে হয়েছিল পুরো একটি কোম্পানী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ককেসীয় ফৌজের এই আঘাতের ফলে ভারনাভ রেজিমেন্টের অবশিষ্ট অংশ অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হল।

শ্বেতরক্ষী বাহিনীর মধ্যেও একই রকম গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা। কথা ছিল পক্‌রোভ্‌স্কির কুবান ফৌজটি দক্ষিণ দিক থেকে গ্রাম আক্রমণ করবে। কিন্তু তারা স্রেফ্ অস্বীকার করে বসল—জলা জায়গার মধ্যে দিয়ে তারা কিছুতেই এগোতে পারবে না। পক্‌রোভ্‌স্কি নিজেও হাড়ে হাড়ে চটেছিল জেনারেল আলেক্সিয়েভের ওপর। সেনাপতির পদক সে জারের কাছ থেকে পায় নি, পেয়েছিল কুবান গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে। আর এই আলেক্সিয়েভ কি-না সামরিক সম্মেলনে তাকে অভিজাতসুলভ বিদ্রূপের সুরে খোঁচা দিয়ে বলেছিল : "যথেষ্ট হয়েছে কর্নেল—আমি দুঃখিত যে আপনাকে এখন কী বলে সম্বোধন করা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না!..." এই 'কর্নেল' কথাটার জ্বালা কোনোদিন ভুলতে পারবে না পক্‌রোভ্‌স্কি। জলাভূমির মধ্যে দিয়ে সৈন্য নিয়ে যেতে অস্বীকার করার মূলে রয়েছে এই জ্বালা। জেনারেল এর্দেলির ঘোড়সওয়ার

বাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল উত্তর দিক থেকে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলবার জন্য, কিন্তু বন্যাপ্লাবিত উপত্যকা ডিঙিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাত হয়ে আসার মুখে তারা সেতুমুখটার কাছেই আবার ফিরে আসে।

নভোদ্ মিত্রভ্স্কায়ায় প্রথম যে শ্বেতরক্ষী বাহিনীটি ঢুকল সেটা পুরো-পুরি অফিসারদের নিয়েই গঠিত একটা রেজিমেন্ট। শীতে অর্ধেক জমে গিয়েছে সিনিয়র অফিসারের দল, প্রায় উন্মাদের মতো তারা রাস্তায় শুঁকছে সদ্য-সেঁকা রুটির লোভনীয় ঘ্রাণ, জানলায় জানলায় উষ্ণ আগুনের আভা দেখে তারা আর নতুন ফৌজের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে নি—তুষার আর কাদার জমাট স্তূপ ডিঙিয়ে, বরফের পাতলা আস্তরণে ঢাকা জল নালা পেরিয়ে তারা ছুটে এসেছে গ্রামে। গ্রামের একেবারে সড়কের মুখেই ধরা পড়ে গেল তারা, মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হতে লাগল তাদের ওপর। প্রচণ্ড বেয়নেট আক্রমণ শুরু করল অফিসাররা। ওদের প্রত্যেকটি লোকই জানতো বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোন্ পদ্ধতি নিতে হয়, কী করতে হয়। মারকভের সাদা উঁচু টুপিটা দেখা যেতে লাগল সর্বত্র। এ এক অসম যুদ্ধ—পেশাদার অফিসারদের সঙ্গে বিশৃঙ্খল পরিচালনাহীন একদল সৈন্যের লড়াই।

অফিসাররা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল বাধা চূর্ণ করে। ভারনাভ সৈন্য ও গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে তারা হাতাহাতি সংঘর্ষে নামলো এবার। অন্ধকারে হুড়োহুড়ির মধ্যে মেশিনগান-চালকদের উপর বেয়নেটের আক্রমণ শুরু হল, কোনো কোনো জায়গায় আবার বোমার আঘাতে উড়েও গেল তারা। শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে অনবরত নতুন সৈন্য এসে যোগ দিচ্ছিল। চারিদিক থেকে ঘেরাও দিয়ে লাল সৈন্য পশ্চাদপসরণ করতে করতে একেবারে শহর চত্বরের দিকে কোণঠাসা হয়ে পড়ল—বিপ্লবী কমিটির ঘাঁটিটাও ছিল ওইখানেই—গ্রাম কাউন্সিলের বাড়ীতে।

প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ থেকে ছুটে আসতে লাগল বন্দুকের গুলি, রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলল লড়াই। কামানবাহী একখানা গাড়ি কাদার ফোয়ারা ছিটিয়ে এগিয়ে এল দ্রুতবেগে। চত্বরের মোড়েই ঘুরল গাড়িটা, কামানের মুখ সিধে গ্রাম কাউন্সিলের বাড়ী লক্ষ্য করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলা গিয়ে পড়ল বাড়ীটার একেবারে মাথায়। ঘরের লোকেরা জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাইরে। হলদে ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা—বাড়ীর ভেতরকার কার্তুজের কেস্ বোঝাই ঝুড়িগুলোয় গোলার আগুনের স্পর্শ লেগেছে।

দ্বিতীয় ককেসীয় রেজিমেন্টটা ঠিক সেই মুহূর্তে পূব দিক থেকে গুলি-গোলা ছুঁড়ছিল আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে। শত্রুর পেছন থেকে ভারনাভ সৈন্যদের কানে এসে ঢুকল সেই লড়াইয়ের আওয়াজ—ওরা এবার আশ্বস্ত হল, বল পেল বুকে। চিৎকার করে গালাগালি করে সাপ্‌ঝকভের গলা একেবারে ভেঙে গেছে। অয়েলক্লথ মুড়িয়ে রাখা ঝাণ্ডাটা পতাকাবাহকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মেলে ধরল শূন্যে। শ্বেতরক্ষীরা যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মোতায়েন, চত্বর ডিঙিয়ে সেই উঁচু দোলায়মান পপলার গাছগুলোর দিকে

সাপঝ্কভ ছুটে চলল হাতের ঝাণ্ডা নাড়তে নাড়তে। রাইফেল উঁচিয়ে ভারনাভ দল ছুটে বেরিয়ে এল চারিদিক থেকে, শ্বেতরক্ষীদের সারি ভেঙে ওরা পশ্চিম দিকে গ্রাম ছেড়ে বাইরে চলে এল।

পরিত্যক্ত একটা গাড়ির ওপর খড়ের গাদায় মাথা গুঁজে সমস্ত রাতটা কাটিয়ে দিয়েছে রশচিন। শোবার আগে গাড়িটার মধ্যে থেকে দুটো ঠাণ্ডা মড়া টেনে বার করে ফেলতে হয়েছিল রশচিনকে। সারা রাত ধরে কামান গর্জেছে, নভোদ্মিত্রভ্স্কায়ার ওপর ফেটে পড়েছে গোলা। কালুঝ্স্কায়ায় রাত কাটানোর পর ভোরের দিকে ভলান্টিয়ার বাহিনীর আহত সৈন্যদের সারি তল্পিতল্পা বোঝাই গাড়িগুলো সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করল আবার। গাড়ি থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে রশ্চিন ওদের পেছু নিল। উত্তেজনায় ও এত অধীর হয়ে গেছে যে ব্যথাযন্ত্রণার কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

পূব দিক থেকে আগের মতোই প্রবল বেগে বইতে শুরু করেছে বাতাস। বরফ আর জলগর্ভ মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছে। সকাল আটটা না বাজতেই পুঞ্জীভূত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পরিষ্কার নীল আকাশ উঁকি দিকে লাগল। উন্মুক্ত উষ্ণ তলোয়ারের মতো সূর্যের রশ্মি। বরফ গলতে শুরু করেছে। স্তেপ প্রান্তর ক্রমান্বয়ে গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে চলেছে—এখানে ওখানে লেগেছে উজ্জ্বল সবুজের ছোপ, সদ্য গজানো চারাগাছগুলো মাথা তুলছে; তারই মাঝে মাঝে আবার মুড়ো ঘাসের সোনালী রেখা। যতোদূর চোখ যায় ঝলমল করছে জল আর জল। রাস্তায় চাকার দাগে দাগে জলের নালা তৈরি হয়েছে! টিলার ওপর মৃতদেহগুলো দৃষ্টিহীন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে স্বচ্ছ নীলাকাশের দিকে।

চলমান একটা গাড়ি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল : "দেখ—দেখ! রশচিন না? হ্যাঁ তাই তো বটে! রশচিন! তুমি এখানে কি ক'রে এলে?" ঘুরে দাঁড়াল রশচিন। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত-বাঁধা তিনজন লোক বসেছিল নোংরা লক্কড় একখানা গাড়িতে। চালক একজন গোমরামুখো কসাক, কাঁধের ওপর ছেঁড়া চামড়ার কোর্তা চড়িয়ে নিয়েছে সে। ওদের তিনজনের মধ্যে থেকে শীর্ণ ল্যাংলেঙে চেহারার একজন লোক কলারের ভেতর থেকে গলাটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখছিল। ফাটা-ফাটা ঠোঁটদুটো ফাঁক করে একগাল হেসে রশচিনকে সে নমস্কার জানাতে লাগলো ঘন ঘন মাথা নেড়ে। প্রথমটায় ভাস্কা তেপ্লভকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল রশচিনের। তারই পুরনো ফৌজী বন্ধু, একসময়ে গোলাপী গাল নিয়ে ফুর্তিবাজী করেছে, মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করেছে। মদও খেত কথায় কথায়। রশ্চিন নিঃশব্দে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে, তেপ্লভকে আলিঙ্গন করে বলল :

"কার কাছে যাবো বলো দিকিনি তেপ্লভ! তুমিই বল! তোমাদের চীফ-অব-স্টাফ কে? দেখছো তো কাঁধের এই স্ট্র্যাপগুলো কোনোরকমে পিন দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি? কালই লাইন পেরিয়ে চলে এসেছি এদিকে।..."

"ঢোকো ঢোকো, উঠে এস ভেতরে! কই হে থামাও! এই শুয়োরটা, লাগাম টেনে ধর্!"—চালককে উদ্দেশ করে বলল তেপ্লভ। কসাকটা গজ্ গজ্ করতে থাকলেও হুকুম মানলো। গাড়ির এককোণে লাফিয়ে চড়ে বসল রশ্চিন। চাকার ওপর ঝুলিয়ে দিল পা দুটো। উষ্ণ রোদে এইভাবে গাড়িতে চলতে পেরে মনটা আনন্দে ভরে উঠল তার। রিপোর্ট পেশ করার মতো নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে সে বলে গেল তার অ্যাডভেঞ্চারের কথা, সেই মস্কো ত্যাগ করার সময় থেকে শুরু করে পুরো কাহিনীটা বিবৃত করল সে। অল্প একটু কেশে তেপ্লভ বলল :

"আমি নিজেই তোমাকে জেনারেল রোমানভ্স্কির কাছে নিয়ে যাবো।...... গ্রামে গিয়ে একটু উদরপূর্তির বন্দোবস্ত করতে হবে প্রথমে, তারপর তোমার যাহোক একটা হিল্লে করতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।...তুমি কি সত্যি সত্যিই ভেবেছিলে বলা-নই কওয়া-নেই সিধে তাঁর কাছে চলে যাবে, বোকা গর্দভ? ভেবেছিলে হাত কচলে বলবে : মহাশয় শ্রবণ করুন, আমি লাল দস্যুদল হইতে আসিয়াছি...? তুমি আমাদের অবস্থাটা তো জানো না। সদর দপ্তরের দিকে এগোবামাত্র ওরা তোমায় বেয়নেট খুঁচিয়ে মারতো। ঐ দেখ, দেখ!" (রাস্তার পাশে অফিসারের ভারীকোট-পরা একটা ঢ্যাঙা মৃতদেহের দিকে আঙুল দেখালো তেপলভ) "ও হচ্ছে মিশ্কা, ব্যারন কর্ফ্...মনে আছে না ওর কথা? আঃ কী ছেলেটাই না ছিল! দেখি, সিগারেট টিগারেট ছাড়ো দিকি নি! কী চমৎকার ঝলমলে সকাল দেখেছ? কাল বাদ পরশু, বুঝলে হে বুড়ো খোকা, একাতেরিনোদার পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। তারপর বিছানায় লম্বা ঘুম দিয়ে সোজা পার্কের দিকে ছুটব—মজা আছে হে, তোফা গানবাজনা, মেয়ে আর বীয়ারের বোতল।"

প্রচণ্ড উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লো সে। টান-ধরা স্বাস্থ্যহীন মুখমণ্ডলটার ওপর জেগে উঠল অসংখ্য ভাঁজ, চোয়ালের উঁচু হাড়ে যেন জ্বরতপ্ত একগাদা ফোঁড়ার জ্বালা ধরেছে।

"আরে ভাই সারা রাশিয়া জুড়ে গানবাজনা, মেয়েমানুষ আর বীয়ারের হিড়িক লেগে যাবে। একটি মাস শুধু একাতেরিনোদারে বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের একটু সাফসুফ্ করে নেবার ওয়াস্তা, তারপর প্রতিশোধ! হা রে বুড়ো খোকা, আমরা আর আগের মতো বোকা নই।...রীতিমত রক্ত খরচা করে অধিকার কিনেছি, রুশ সাম্রাজ্য নিয়ে এখন যা খুশি করার অধিকার আছে আমাদের। শৃঙ্খলা কাকে বলে এবার দেখিয়ে দেব হতভাগাদের...বেজম্মাগুলো! ওই দেখ না একটাকে, পড়ে রয়েছে ওখানে!" আঙুল দিয়ে দেখাল খাদের কিনারায় ভুলুণ্ঠিত একটা মৃতদেহের দিকে। ভেতরে চামড়ার জ্যাকেটের মধ্যে থেকে অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আছে হাত-পাগুলো। "ওদেরই কোনো দান্তন টান্তন হবে লোকটা..."

ওদের গাড়িটাকে ছাড়িয়ে একটা ওঁচা ধরনের বেতের তৈরি ফিটনগাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ভেতরে দুজন লোক বসে। সর্বাঙ্গে কাদা। কোটের কলার উল্টে দিয়েছে দুজনেই। মাথায় ভিজে ফারের টুপি। ওদের মধ্যে একজনের প্রকাণ্ড দশাসই চেহারা, কটা রঙের মুখখানা ঝুলে পড়েছে।

আরেকজনের উস্কোখুস্কো ধূসর গোঁফজোড়া। চোখের নীচেটা ফুলো ফুলো। বিস্ফারিত ঠোঁট দুটোর মধ্যে গুঁজে রেখেছে একটা লম্বা সিগারেট-ধরা নলচে।

"এই তো এঁরাই হলেন দেশের মুক্তিদাতা"—ওদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল তেপ্লেভ : "এদের আমরা মেনে নিয়েছি স্রেফ অন্য আর কেউ নেই বলে। হয়তো এদের দিয়ে কিছু কাজও হতে পারে।"

"ওই মোটা লোকটি হল গুচ্কভ, তাই না?"

"হ্যাঁ, ওই! ভেবো না, যথাসময়েই ওকে গুলি করে সাবাড় করা হবে! সিগারেট-ওয়ালা ওই লোকটি হল বোরিস সুভোরিন। ওর ইতিহাসও খুব যে একটা নিষ্কলঙ্ক তা নয়। ও হল রাজতন্ত্রের সমর্থক, বুঝলে তো, তবে ঠিক রাজতন্ত্রীও নয় খুব মারপ্যাঁচওয়ালা লোক, কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে বেশ শেয়ানা। ও-কে আমরা গুলি করে মারব না।"

গাঁয়ের দিকে মোড় ঘুরল গাড়ি। বাগানগুলোর পেছনে যে-সব বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে সবগুলোই মনে হচ্ছে সদ্য পরিত্যক্ত। এখনও ধোঁয়া উঠছে ছাইচাপা আগুন থেকে। দু'-একটি মৃতদেহও পড়ে রয়েছে মাটিতে, কাদায় অর্ধেক ডুবে গেছে কোনো কোনোটা। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে,—চোরাকুঠুরি আর খড়ের গাদা থেকে টেনে বার করে 'বহিরাগত'দের খতম করে দেওয়া হচ্ছে, তারই নিশানা। এক সারি গাড়ি চত্বরটার ওপর এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে আহতদের আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। পুরুষদের ব্যবহার্য নোংরা জোব্বাকোট পরে নার্সরা গাড়িগুলোর আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করছে। অবসন্ন হয়ে পড়েছে ওরা, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না আর। কাছেই একটা বাড়ির উঠোন থেকে এল অমানুষিক একটা আর্তনাদ, সেই সঙ্গে চাবুক হাঁকানোর শব্দ। ঘোড়সওয়াররা এদিক ওদিক ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে একদল ক্যাডেট সৈনিক টিনের গামলা থেকে দুধ খাচ্ছে।

নীল আকাশের সব মালিন্য মুছে দিয়েছে বাতাস—নির্মল গভীরতায় আরো উজ্জ্বল আরো উষ্ণ হয়ে উঠেছে সূর্যের কিরণ। একটা গাছের সঙ্গে টেলিগ্রাফের খুঁটি পর্যন্ত আড়কাঠ বেঁধে দেয়া হয়েছে—তাতে ঝুলছে সাতটা মৃতদেহ, গলা ছিন্ন, নগ্ন পায়ের আঙুলগুলো মাটির দিকে ফেরানো। এ সাতজন হল বিপ্লবী কমিটি ও ট্রাইবুন্যালের কমিউনিস্ট সদস্য।

কর্নিলভ অভিযানের আজ শেষ দিন। ঘোড়সওয়ার স্কাউটরা চোখের ওপর হাত দিয়ে সূর্য আড়াল করে দেখতে পায় একাতেরিনোদার শহর—সকালের কুয়াশা ভেদ করে কুবান নদীর ওপাশে দেখা যায় তার সোনালি গম্বুজগুলো।

অগ্রগামী অশ্বারোহী দলটার এখন একমাত্র কাজ হল এলিজাভেতিনস্কায়া গ্রামে গিয়ে লাল বাহিনী এসে পড়ার আগেই কুবান নদীর পারঘাটাটি দখল করা। ওই একটিমাত্র পারঘাটাই নদীতে রয়েছে। কর্নিলভের এ হল এক নতুন চাল। দক্ষিণে নভোদ্মিত্রভ্স্কায়া থেকে কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমে

নভোরোসিস্ক্-একাতেরিনোদার রেলশড়কের দিক থেকে তিনি আক্রমণ করতে পারেন এইটে প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি যে শহরের পশ্চিম দিক থেকে ওই রকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক ঘুরপথটাই বেছে নেবেন তা কেউ কল্পনাতেই আনতে পারে নি। পুরো ফৌজ নিয়ে তিনি কুবানের ওই রুদ্র জলস্রোত ডিঙোবেন এমন একটা জায়গায় যেখানে পুল নেই, আছে একটা মাত্র পারঘাটা, অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ করার পথ পর্যন্ত বন্ধ। কর্নিলভের এই অদ্ভুত সামরিক কর্মপন্থার কথা কম্যান্ডার-ইন-চীফ আভ্‌তোনমভের লাল সদর দপ্তরের কারুর পক্ষে আগে থেকে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল। আর ঠিক এই দুর্বলতম অরক্ষিত রাস্তাটাই বেছে নিলেন ধূর্ত কর্নিলভ—দু' তিন দিন লড়াই থেকে অবসরও পাওয়া যাবে, তারপর সিধে ফৌজ নিয়ে ঢুকে পড়বেন একাতেরিনোদারের ফলবাগান আর শব্‌জিক্ষেতের মধ্যে।

রসদের জোগানে যে ঘাটতি পড়েছিল, আফিপ্‌স্কায়া রেলস্টেশন দখলে রাখার সময় তা উশুল করে নেয়া গেল। সাঁজোয়া ট্রেন থেকে গুলিবর্ষণ করছিল লাল বাহিনী, ভলাণ্টিয়াররা লাইন উড়িয়ে দিয়ে গুলির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার প্রয়াস পেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাল বাহিনীর একখানা ট্রেন থেকে মেশিনগানের বুলেট এসে ছেঁকে ধরল হামলাদারদের পাশের দিকটা। হামলাদাররা তখন বরফ-গলা জলের স্রোত পার হচ্ছিল। বড়ো বড়ো জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে এক সারি বুলেট ছড়িয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের মতো জলে ডুব দিতে শুরু করল ওরা, আগে মাথা তারপর গা। তারপর মাথা জাগিয়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। আফিপ্‌স্কায়ায় মোতায়েন লাল সৈন্য মরীয়া হয়ে প্রতিরোধ করতে লাগল। কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার লড়াই চালিয়ে আর কতক্ষণ রুখবে ওরা—শত্রুরাই তখন আক্রমণের উদ্যোগ হাতে নিয়েছিল।

ভলাণ্টিয়ার ইউনিটগুলো মন্থর গতিতে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নানা পথ ঘুরে অবশেষে আফিপ্‌স্কায়া গ্রামটিকে একেবারে ঘেরাও করে ফেলল। উজ্জ্বল সূর্যের আলো যেন গলে পড়ছে নীল জলাজমির মধ্যে। সমতলভূমি এখানে ওখানে জেগে রয়েছে গাছের সারি, খড়ের গাদা, খামার বাড়ির ছাদ; বন্যাজলে বাসন্তী মেঘের ছায়া যেন পরস্পরকে ধাওয়া করে ছুটে চলেছে। মরীচিকার মতো এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটির মাঝে কর্নিলভকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে—পরনে তাঁর ভেড়ার চামড়ার ছোট জ্যাকেট, কাঁধে জেনারেলের নরম স্ট্র্যাপ, হাতে ফিল্ডগ্লাস আর একটি মানচিত্র। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হুকুম দিচ্ছেন, জলের মধ্যে ঘূর্ণি ছিটিয়ে ওরা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে। এক সময়ে গুলির আক্রমণের মধ্যেই পড়ে গেলেন তিনি; সঙ্গে ছিল জেনারেল রোমানভ্‌স্কি, সামান্য আহত হল সে।

পশ্চিম দিক থেকে রেলস্টেশন আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদস্তুর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। কর্নিলভ ঘোড়া চাবকে সিধে আফিপ্‌স্কায়ার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁরই জয় যে সুনিশ্চিত এ-সম্পর্কে একমুহূর্তের জন্যেও কোনো

সন্দেহ তাঁর মনে আসে নি। রেললাইনের ওদিকটায় পরিত্যক্ত ট্রেন, স্টেশনবাড়ি, মালগুদাম আর ব্যারাকঘরগুলোর মাঝে মাঝে লড়াই চলতে লাগল—ফাঁদের মধ্যে পেয়ে লাল রক্ষীদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী।

এই হল ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর সর্বশেষ জয়—চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ে অর্জিত।

মৃতদেহগুলো ডিঙিয়ে কর্নিলভের কাছে লাফিয়ে ছুটে আসে কর্নেল নেঝেন্‌ৎসেভ। গালগুলো লাল হয়ে উঠেছে। যুবকের মতো দেখাচ্ছে তাকে, ফুর্তি যেন উপচে পড়ছে। প্যাঁশনের কাঁচজোড়া ঝিলমিলিয়ে উঠল। রিপোর্ট করল :

"আফিপ্‌স্কায়া স্টেশন দখলে এসে গেছে, জেনারেল সাহেব।"

অধৈর্য কণ্ঠে কর্নিলভ তাকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"রসদ কাড়তে পেরেছ ওদের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনারেল সাহেব! সাত শো গোলা, চার গাড়ি বোঝাই ছোট-খাটো অস্ত্রশস্ত্র আর গুলিবারুদ।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" বিনয়াবনত ভঙ্গিতে তিনি মাথার ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে শক্ত কোটের ওপরটা চুলকে নিলেন একটু। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ......"

নেঝেন্‌ৎসেভ্ চোখ ঘুরিয়ে দেখাল স্টেশনের দিকটা—একদল 'শক ফাইটার' জটলা করছিল সেখানে। ওরা হল ভয়ডরহীন সংশপ্তকদের একটা বিশেষ রেজিমেণ্ট। প্রত্যেকের উর্দির হাতার ওপর সেলাই করা তেরঙ্গা চৌকো সামরিক চিহ্ন। রাইফেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা, যেন দুরারোহ পাহাড়ে ওঠার পর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মুখে ওদের রাগ ফুটে উঠেছে, চোখ ঘুরছে, হাতে রক্তের ছাপ, কারো কারো মুখও রক্তমাখা।

"দু' দু'বার ওরা আসন্ন বিপদকে ঠেকিয়েছে, জেনারেল সাহেব। আর ছুটে এসে ঢুকেছেও ওরা সবার প্রথম!"

"তাই নাকি!" ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকালেন কর্নিলভ, পূর্ণ গতিতে ছুটে গেলেন 'শক্' পল্টনদের মাঝে। অবশ্য দূরত্বটা এমন কিছু বেশি ছিল না। চঞ্চল হয়ে উঠল গোটা দলটা। তৎক্ষণাৎ ওরা সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্নিলভ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন স্মৃতিস্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান ঘোড়সওয়ারের মতো। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ঃ

"আমার ঈগলপাখীর দল, তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যে চমৎকার কীর্তি তোমরা আজ দেখালে তার জন্য তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি শত্রুর রসদ কেড়ে নিতে পেরেছ বলে।......কৃতজ্ঞতায় আমি মাথা নোয়াচ্ছি তোমাদের সামনে।......" প্রত্যেকটা কথা যেন তিনি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে বের করলেন গলা থেকে।

রসদের এক নতুন জোগান হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী কুবান নদী পার হতে শুরু করল। অশ্বারোহী একটা ইউনিট আগেই এসে তক্তার

একটি ফেরী-নৌকা দখল করে নিয়েছিল। সেই ফেরীতেই তারা পার হতে শুরু করল। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তখন ন'হাজার, সঙ্গে চার হাজার ঘোড়া। তিনদিন ধরে নদী পেরুনো চলল। পারঘাটার এ পাশ থেকে ওপাশ বিরাট ক্যাম্প সাজিয়ে বসেছে পল্টনেরা, গাড়ী-ঘোড়া, কামান-বন্দুকের স্তূপ আর রসদ সঙ্গে নিয়ে। কাপড়-চোপড় কেচে শুকোতে দেয়া হয়েছে ঘোড়ার গাড়ির জোয়ালের ওপর —বসন্তের বাতাসে তাই উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। ক্যাম্পের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘোড়াগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। পেটমোটা অফিসাররা লাফিয়ে উঠছে গাড়ির ওপর, চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে তারা আকাশের নীল দিগন্তে খুঁজছে বহু-আকাঙ্ক্ষিত শহরটির ফলবাগিচা আর গির্জার চূড়োগুলো।

"মাইরি বলছি, আমরা যেন ধর্মযোদ্ধার দল, জেরুজালেম শহরে ঢুকতে যাচ্ছি!"

"হ্যাঁ, তবে জেরুজালেমে ছিল ইহুদী ছুঁড়িগুলো আর এখানে সব প্রলেতারিয়ান-সুন্দরী।"

"আমরা কিন্তু মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করব!...... হাঃ হাঃ হাঃ ......"

"স্নানের ঘর, পার্ক, বীয়ারের দোকান, আর কি চাই!"

একাতেরিনোদারের তরফ থেকে কেউ নদী পার হবার পথে বাধা দিতে চেষ্টাই করল না। মাঝে মাঝে শুধু স্কাউটরা ফাঁকা গুলি চালাচ্ছিল। শহর রক্ষা করবে মনস্থ করেছিল লাল বাহিনী। শহরের সমস্ত মানুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ছুটল পরিখা খুঁড়তে, কাঁটা তারের বেড়া আর কামান পাতার কাজে। কৃষ্ণ-সাগরীয় নাবিকদের একটা পল্টনবাহিনী বন্দুক গোলাবারুদ সমেত এসে হাজির হল নভোরোসিস্ক্‌ থেকে। কর্নিলভের ভলাণ্টিয়ারবাহিনীর শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে পল্টনদের বুঝিয়ে বললেন কমিসাররা। ওরা হল "নির্মম বিশ্ব-পুঁজিবাদীচক্রের দালাল, আর এই পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধেই আমরা অবিশ্রাম লড়াই চালাচ্ছি, কমরেডস্‌।" ওরা প্রতিজ্ঞা করল মরবে তবু একাতেরিনোদার ছাড়বে না।

অভিযানের চতুর্থ দিনটিতে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল কুবানের রাজধানীর ওপর।

ভলাণ্টিয়ারদের প্রচণ্ড আক্রমণের পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু হল। কৃষ্ণ-সাগর রেলস্টেশন আর কুবান পারঘাটার কামানগুলো থেকে ঝড়ের মতো অগ্নিবৃষ্টি চলল। কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো জমি আর ফলবাগান, নালা, বেড়া, খাল ইত্যাদি থাকার ফলে আক্রমণকারী ভলাণ্টিয়াররা গা-ঢাকা দিয়ে শহরে এসে পৌঁছুতে পারল—ক্ষতি তাদের পোয়াতে হল সামান্যই।

এইবার শুরু হল লড়াই। 'খামার' নামে পরিচিত একটি সাদা বাড়ীর কাছে লাল বাহিনী অমিত বিক্রমে বাধা দিল। বাড়ীটা ছিল কুবান নদীর উঁচু পাড়ে একটা নির্জন নিস্তব্ধ পপলার বাগানের একেবারে কিনারায়। লাল বাহিনী প্রথমবার হঠে গেলেও আবার ছুটে এল বিপুল সংখ্যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর

মেশিনগানরে ওপর। খামারটা ওরা দখলও করল বটে, কিন্তু কর্নেল উলাগায়ের কুবান কসাকদের আক্রমণে ঘণ্টাখানেক বাদে সরে যেতে বাধ্য হল ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্নিলভ আর তাঁর সহকারী কর্মচারীরা সদর দপ্তরের ঘাঁটি বসালেন একতলা বাড়ীটায়। সেখান থেকে একাতেরিনোদারের সিধে রাস্তাগুলো, উঁচু শাদা বাড়ি, পাঁচিল, গোরস্তান, কৃষ্ণ-সাগর রেলস্টেশন, সবই এক নজরে দেখে নেওয়া যায়—একেবারে সামনে পরিখার লম্বা সারিগুলো পর্যন্ত চোখে পড়ে এখান থেকে। আলো-বাতাস ভরা উজ্জ্বল বসন্তের দিন। গুলির আওয়াজের পরে পরেই সর্বত্র ভেসে বেড়ায় ধোঁয়া। নিরবচ্ছিন্ন কামান গর্জনের তালে তালে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে নীল কুয়াশা। লালবাহিনী আর শ্বেতরক্ষী দু'দলই সেদিন জানের পরোয়া না করে লড়ে।

সাদা বাড়িটার এক কোণের একটি কামরা শুধু কার্নিলভের জন্যই নির্দিষ্ট থাকল। ফিল্ড টেলিফোন, টেবিল চেয়ারে সাজানো হল ঘরখানা। একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে কার্নিলভ ঢুকলেন, টেবিলের সামনে বসেই মানচিত্রখানা খুলে বিছিয়ে নিলেন। দাবাখেলার পরবর্তী চালগুলো নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি! তাঁর দুজন সহকর্মী, সেকেন্ড লেফ্‌টেন্যান্ট দোলিন্‌স্কি আর খান খাদ্‌জিয়েভ পাশেই ছিলেন—একজন জায়গা করে নিলেন দরজার গোড়ায় আর একজন বসলেন টেলিফোনের সম্মুখে।

প্রধান সেনাপতির মঙ্গোলীয় আদলের ভাঁজ-পড়া মুখখানা এর আগে এমন আঁধার কেউ দেখে নি। পাক-ধরা চুল তাঁর শক্ত আর খাড়া হয়ে উঠেছে যেন। পার্চমেন্টের মতো ফ্যাকাশে ছোট হাতখানা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে মানচিত্রটার ওপর। নামখোদাই করা সোনার আংটি কড়ে আঙুলে। আলেক্সিয়েভ, দেনিকিন এবং আরো অনেক সেনাপতি নিষেধ করা সত্ত্বেও একমাত্র তিনিই গোঁ ধরেছিলেন যেমন করে হোক শহর দখল করবেনই, আর এখন লড়াইয়ের প্রথম দিনটা কাটতে না কাটতেই তাঁর আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু তিনি নিজে পর্যন্ত বুঝতে চান না সে-কথা।

দুটো প্রকাণ্ড ভুল হয়েছে ঃ এক নম্বর, ট্রেন পাহারা দেবার জন্য পারঘাটায় জেনারেল মারকভের অধীনে ছেড়ে আসা হয়েছে গোটা সৈন্যবাহিনীর তিনভাগের একভাগ; এর ফলে একাতেরিনোদারের ওপর তাদের প্রথম আঘাতটা তেমন জোরালো হয় নি; যেমন প্রত্যাশা করা হয়েছিল তেমন ফল পাওয়া যায় নি, কারণ লালবাহিনী সে-আঘাত সামলে নিয়ে ঘাঁটি আঁকড়ে রয়েছে, এবং সহজে তাদের সেখান থেকে নড়ানো যাবে বলেও মনে হয় না। দু' নম্বর ভুল : পথে আসতে কার্নিলভের বাহিনী যেমন গ্রামে গ্রামে পিটুনি অভিযান চালিয়েছিল, সেই একই কৌশল তারা একাতেরিনোদারেও খাটাতে চেষ্টা করেছে; সমস্ত প্রবেশপথ ও বাইরে যাবার পথ বন্ধ করবার জন্য তারা শহরটাকে ঘিরে ফেলেছে (ডান পাশে চামড়ার কারখানা পর্যন্ত নদী বরবার এক ডিভিশন পদাতিক আর স্কাউট মোতায়েন করেছে তারা, বাঁপাশে জেনারেল এরদেলির নেতৃত্বে অনেক

দূর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী); শহরের প্রতিরক্ষী ও সাধারণ মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছে তারা গুলি চালিয়ে, ফাঁসি ঝুলিয়ে, মারপিট করে—'দস্যু' আর 'বিদ্রোহী শুয়োরের দল' নাম দিয়ে। তাদের এই নীতির ফলে আত্মরক্ষাকারীরা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করে ফেলল—ফাঁসি-কাঠে ঝুলে মরার চেয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ঢের ভাল ('কর্নিলভের হাতে কারুরই নিস্তার নেই'—কথাটা যেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে)। স্ত্রীলোক, বালিকা, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, সবাই প্রচণ্ড বুলেট-বর্ষণের মাঝেও ছুটে চলল পরিখার দিকে, সঙ্গে তাদের দুধের জগ, সর-ননীরের কেক, আর পাই-পিঠে। "খেয়ে নাও তো নাবিকেরা, খেয়ে নাও, সৈনিক, প্রিয় কমরেডরা, খেয়ে নিয়ে আমাদের বাঁচাও......" রক্ষীদের কাছে খাবার আর গোলাবারুদের বাক্স টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল শহরের লোকেরা, এমন-কি যখন ঘোড়সওয়ারের দল শহরের চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে তখনও; সন্ধ্যে লাগতেই ঘোড়সওয়ারদের চেঁচাতে হয় : "রাস্তা থেকে হঠো, এই! ঘরের দিকে! আলো নিবিয়ে ফেলো সব!"

এইভাবে প্রথম দিনটার লড়াই শেষ হল লালবাহিনীর সাফল্যে। শ্বেত-রক্ষীদের তিনজন সেরা কম্যাণ্ডার সেদিন মারা পড়ল। অফিসার আর সাধারণ সৈনিক মিলিয়ে খতম হল প্রায় হাজার খানেক। ভাণ্ডারের তিনভাগের একভাগ গোলাগুলি খরচা করেও তাদের লাভ যা হয়েছে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তার ওপর আবার নভরোসিস্ক্ থেকে এসে হাজির হলো সৈন্য, গুলিগোলা আর কামানে বোঝাই জরাজীর্ণ ট্রেনগুলো। একটার পর একটা গাড়ি আসছিল প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি উপেক্ষা করে। সৈন্যরা বগিগুলো থেকে সরাসরি লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল ট্রেঞ্চের মধ্যে। এত বেশি সংখ্যায় গাদাগাদি করে ঠেলে এগিয়ে আসছিল তারা যে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বহীন অবস্থায় তাদের হতাহতের পরিমাণও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল।

কর্নিলভ তাঁর সেই কোণের ঘরটায় বসে মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন। তিনি এখন বেশ বুঝতে পারছেন, অন্য কোনো রাস্তা নেই। হয় এস্পার নয় উস্পার—হয় শহরটাকে যেমন করে হোক দখলে আনতে হবে, নয় তো তাদের সবাইকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। একবার আত্মহত্যার চিন্তাটাও উঁকি দিয়ে গেল তাঁর মনের মধ্যে। এত বড় একটা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি তিনি, আর সেই বাহিনীটি আজ কিনা রাংতার তৈরি পল্টনের মতো আগুনের ছোঁয়া লেগে গলে যাচ্ছে! কিন্তু কর্নিলভ হলেন একগুঁয়ে, নির্বোধ, বেপরোয়া বলীবর্দের মতোই একগুঁয়ে।

এলিজাভেতিনস্কায়া গাঁয়ের গির্জার সিঁড়িতে প্রখর রোদ মাথায় করে বসেছিল জনা কুড়ি আহত অফিসার। পূব দিক থেকে কামানের শব্দ আসছিল। কখনো জোরে, কখনো আস্তে। কিন্তু এখানকার এই নির্মেঘ আকাশে বোমা-বিধ্বস্ত ঘণ্টাঘরটার ওপরে উড়ে বেড়াচ্ছিল একদল পায়রা। গির্জার সামনের চত্বরটা

একেবারে ফাঁকা। কুটিরগুলোর জানলা ভেঙে গেছে, পরিত্যক্ত ঘর। মাটিতে অর্ধেক পোঁতা একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ওয়াট্‌ল্‌-লতার বেড়াটার পাশে। মাছি ভন্‌ ভন্‌ করছে সেটার ওপর। বেড়ার লাগোয়া লিল্যাক্‌ ঝোপটায় ফুলের কুঁড়ি-গুলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

গির্জার সিঁড়ির ওপর তখন চাপা গলায় আলোচনা চলেছে।

"আমার যে প্রেমিকাটি ছিল, ভারী চমৎকার মেয়ে, মন একদম মজিয়ে দিত। এখনো চোখ বুজলে চোখের সামনে দেখতে পাই তাকে, আর তার সেই গোলাপী ঝালর দেওয়া পোশাকটি। কোথায় আছে এখন কে জানে!"

"প্রেম!......আঃ, এখন যেন আর বিশ্বেসই হতে চায় না!...পুরোনো জীবন কি আর ফিরে আসবে?......সেই সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেয়ে, নিজের গায়ের পোশাকটিও মন্দ নয়, চুপচাপ রেস্তোরাঁয় বসে থাকা। আহা, কী চমৎকার দিনই যে গেছে মশাই......!"

"খুদে বলশেভিকটা বেজায় বদগন্ধ ছড়াচ্ছে। পুঁতে ফেললেই ভাল হত বোধ হয়।"

"মাছিগুলোই সাবাড় করে দেবে, ভাবনা কি!"

"শ্‌শ্‌! চুপ করুন মশাই, আবার শুরু হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের মতো গোলা ছোঁড়া।"

"ঝামেলা এই শেষ হল বলে, ধরে নিন আপনারা! আমাদের সিপাইরা এর মধ্যেই শহরে ঢুকে পড়েছে!"

নিস্তব্ধ। মাথা ঘুরিয়ে পুব দিকটা দেখল একবার। একাতেরিনোদারের আকাশে ধূসর হলদে ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ জমেছে। লালচুলো একজন অফিসার খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এল। কঙ্কালের মতো শীর্ণ হয়ে গেছে লোকটা। ওদের পাশে এসে বসল।

"এইমাত্র মারা গেছে ভাল্‌কা......" বলল সে, "কি কান্নাটাই কাঁদছিল : 'মা, মা, শুনতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ' বলে!"

সিঁড়ির ওপর থেকে কর্কশ গলায় কে যেন বলে উঠল :

"প্রেম! ঝালর দেওয়া পোশাক-পরা মেয়ে!......র্‌-র্‌-রাবিশ্‌! এসব খোশগপ্‌পো ঐ আগুন পোয়াতে বসেই চলে! আমার বউ, জানো, তোমার ওই সাধের ঝালর-ওয়ালী প্রেমিকাটির চেয়ে ঢের সুন্দর ছিল......আর আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি......" (রাগে ফুঁশে উঠল সে)। "রাজ্যের যতো মিছে কথা বলছ আর কি, ও সব প্রেমিকা ট্রেমিকা তোমার কস্মিন্‌কালেও ছিল না। জ্যাকেটে গোঁজা রিভলবার, আর কোমরে তলোয়ার—এই তো বাবা বয়ে এসেছ চিরকাল, ছাই-গুষ্টি বলতে তো এই একমাত্র সম্বল।"

গির্জের সামনে পাহারার কাজ পড়েছিল রশ্‌চিনের। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বক্তার মুখের দিকে। সোনালি-চুল সুপুরুষ লোকটির মুখখানিতে অবশ্য এখনও তারুণ্যের ছাপ, নাকটা বোঁচা,

মুখের দু'পাশে কড়া দাগ পড়ে গেছে। নীল চোখ দুটো ভারী, বুড়োটে ধরনের, নিষ্প্রভ, দেখলে মনে হয় যেন কোনো নিদ্রাহীন খুনীর চোখ। রশ্চিন রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়াল। পা দুটো দপ্ দপ্ করছে এখনও, আর বারে বারে মনটাকে ছেঁকে ধরছে নানা দুশ্চিন্তা। পরিত্যক্তা কাতিয়ার স্মৃতি যেন করুণার আবেগে রোমন্থিত হচ্ছে মনের মধ্যে। সঙ্গীনের ঠাণ্ডা ফলাটার ওপর কপাল রেখে সে ভাবল : 'যথেষ্ট হয়েছে! এ হল মনের দুর্বলতা, এ জিনিস তো প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।......' একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার টাটকা সবুজ ঘাসের ওপর পায়চারি শুরু করল। 'করুণা বা প্রেম দেখাবার সময় এটা নয়...'

গোলাবিধ্বস্ত ইটের দেয়ালের পাশে বেঁটে খাটো চেহারার একটি লোক ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে, চোখে ফিল্ডগ্লাস। দুরস্ত চামড়ার জ্যাকেট, চামড়ার ব্রীচেস্ আর কসাক ঘোড়সওয়ারী নরম বুটজোড়া শুকনো কাদায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ইটের দেয়ালটায় ফট্ ফট্ করে বুলেট এসে লাগছে। লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারই নীচে খানিকটা তফাতে এক সারি কামান সাজানো। গোলাবারুদের সবুজ বাক্সগুলো স্তূপাকৃতি হয়ে আছে। দেয়ালের কাছে খানিক আগেই কয়েকটা ঘোড়া এনে রাখা হয়েছে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো, ওদের পরিত্যক্ত মল থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে। কামানগাড়ির ওপর পা ছড়িয়ে বসে ধূমপান আর হাসাহাসি করছে কমানের ক্রু'রা, মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে তাদের কম্যাণ্ডারের দিকে। ক্রু'দের প্রায় সবাই নাবিক, তিনজন শুধু গোলন্দাজবাহিনীর লোক—দাড়িওয়ালা উস্কোখুস্কো এই তিনজন যেন দলটার মধ্যে ভিড়ে পড়েছে কোনো গতিকে।

আদিগন্ত উঁচু নীচু জমি, পরিখার সারি, ফলের বাগিচা, সবই ঢাকা পড়ে গেছে ধোঁয়া ধুলোর আবরণে। কম্যাণ্ডারের নজরে যা কিছু পড়ছে সবই তার দৃষ্টিসীমানার মধ্যে কখনো জেগে উঠছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে। কম্যাণ্ডারের সামনের বাড়িটা থেকে গেঞ্জি আর পাতলুন-পরা একজন তামাটে চেহারার নাবিক বেরিয়ে এল। বিড়ালের মতো ক্ষিপ্র নিঃশব্দ গতিতে দেয়াল ঘেঁসে বেরিয়ে এসে লোকটা বেঁটেখাটো কম্যাণ্ডারটির পায়ের কাছে বসে পড়ল। উল্কি-আঁকা পেশীবহুল হাত দুটো দিয়ে নিজের হাঁটু জড়িয়ে ধরে সে বলল :

"নদীর ঠিক পাড়েই দুটো গাছ দেখতে পাচ্ছেন তো?"—বাজপাখীর মতো বাদামী চোখজোড়া কুঁচকে উঠল তার।

"হ্যাঁ!"

"ঠিক ওর পিছনেই একটা ছোট বাড়ি আছে, শাদা দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ!"

"ওটা হল আমার বাড়ি।"

"জানি।"

"ডানদিকে রয়েছে একটা ফলবাগান। তার ওপারেই একটা রাস্তা।"

"দেখতে পাচ্ছি।"

"চারটের সময় কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চেপে এল, দেখলাম সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। সন্ধ্যের সময় দুটো গাড়ি এসে ভিড়ল। ঐখানেই শয়তানটা বসে, আর কোথাও নয়।"

"এবার নামো তো!" হুকুমের সুরে বেঁটে লোকটি বলে উঠল। গোলন্দাজ-দের নায়ককে ডাকল কাছে। ভেড়ার চামড়ার কোট-পরা দাড়িওয়ালা একটা লোক ছুটে এল টিলার উপর। বেঁটে কম্যাণ্ডারটি ফিল্ডগ্লাসজোড়া তার হাতে দিতেই সে অনেকক্ষণ ধরে ধরে দেখল সেটি চোখে ঠেকিয়ে।

"স্লুসারেভ খামার বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি।" সর্দিভরা গলায় উচ্চারণ করল সে কথাগুলো : "সাড়ে চার মাইল হবে এখান থেকে। স্লুসারেভের ওপর কামান দাগা চলতে পারে।"

দূরবীনটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার সে পড়ি-মরি করে ঢাল বেয়ে নেমে গেল নীচে। টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে চিৎকার করে হুকুম দিল :

"কামান তৈরি! নিশানা......পয়লা তোপ......ফায়ার!......"

কামানের পিতল-কণ্ঠ গর্জে উঠল, নলীগুলো কেঁপে উঠতেই মুখগহ্বর থেকে আগুনের ঝলক বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভারী গোলাগুলি ছুটে গেল সামনের দিকে, আকাশে আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুসঙ্গীতের মুহুর্মুহু ঐকতান। কুবানের উঁচু পাড়ের দিকে, পত্রহীন পপলার গাছদুটোর দিকে ছুটে গেল অগ্নি-পিণ্ডগুলো। কর্নিলভ তখন ছোট সাদা কুঠরিটার মধ্যে শুকনো মুখে বসে আছেন মানচিত্রখানা সামনে রেখে।

আক্রমণের দ্বিতীয় দিনে জেনারেল মারকভ ও তার অফিসারদের রেজিমেণ্টকে রসদবাহী ট্রেন ছেড়ে চলে আসবার হুকুম দেওয়া হল। রশ্চিন এই রেজিমেণ্টটার একজন সাধারণ সৈনিক। একাতেরিনোদারের পথে মাইল ছয়েক রাস্তা তারা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পেরিয়ে এল। আগের দিনটির চেয়েও অনেক বেশি, অনেক পুরু হয়ে ধুলো আর কামানের ধোঁয়া জমেছে সারা পথে। আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন মারকভ। তুলোর আস্তর দেওয়া জামার বুকটা খোলা, মাথার একদম পিছনে ঠেলে দিয়েছেন লম্বা ফারের টুপি। সহকর্মী কর্নেলটি তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না। তার সঙ্গেই আলাপের ফাঁকে ফাঁকে কর্তাদের উদ্দেশে নানারকম গালিগালাজ আর অভিশাপ বর্ষণ করছিলেন মারকভ :

"ব্রিগেডটাকে তো ভেঙেই দিল, আর আমাকে হুকুম দিল—মাল টানাটানি করে মর্ গে যা!..." (এক রাশ অশ্লীল কথা তুবড়ির মতো বেরিয়ে এল মুখ থেকে) "ওরা যদি আমাকে ব্রিগেডের সঙ্গে যেতে দিত, তা'হলে এতক্ষণে কখন গিয়ে বসে থাকতাম একাতেরিনোদারে।" (আরও একপ্রস্থ অশ্লীল গালাগাল)।

একটা নালা লাফিয়ে পার হয়ে তিনি হাতের চাবুকখানা তুলে ধরলেন। সবুজ

মাঠটার ওপর অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সৈন্যসারিটা। ওদের দিকে ফিরে গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন হুকুম করলেন তিনি।

অফিসাররা হাঁফাচ্ছিল। গম্ভীর ঘর্মাক্ত মুখগুলো। হুকুম পেয়েই ছুটতে শুরু করল তারা। গোটা সারিটাই চাকার মতো ঘুরে গেল অক্ষের ওপর, চার চারটে আঁকাবাঁকা রেখাসূত্রে তারা মাঠটাকে ঘিরে ফেলল শহরের উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে। মারকভের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছিল রশ্চিন। কয়েকমিনিট দাঁড়াল তারা সবাই। রাইফেলের বল্টু ঠিক করে কার্তুজের ব্যাগগুলো পরীক্ষা করে নেয়া হল। স্বরবর্ণগুলো টেনে টেনে উচ্চারণ করে মারকভ আর একবার কী হুকুম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল একটা অগ্রণী রক্ষীদল। সামনে একেবারে অনেকটা দূর থেকে দলটা ছুটতে শুরু করতেই তাদের পিছন পিছন রওনা হল বাদবাকী সমস্ত সৈন্য।

ভাঙাচোরা গাড়িগুলো আহত সৈনিকদের নিয়ে পিছল রাস্তার উপর দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে আসছিল বাঁ দিক থেকে। আহত কয়েকজন লোক আবার মাথা নীচু করে হেঁটে হেঁটেই পথ চলছিল। অনেকে বসেছিল নালাগুলোর ধারে ধারে কিংবা উল্টোনো গাড়িগুলোর উপর। গাড়ি আর জখমী মানুষের যেন সীমাসংখ্যা নেই, সারা ফৌজটাই যেন ওদের দিয়ে তৈরি।

মোটা লম্বা একজন গোঁফওয়ালা লোক কালো ঘোড়ার ওপর চেপে ছুটে গেল রেজিমেণ্ট ছাড়িয়ে। টুপিতে লাল ফিতের ঘের দেওয়া। দুরস্ত ফিটফাট উর্দির কাঁধের ওপর শোভা পাচ্ছে মিলিটারী আস্তাবলের পদকচিহ্ন। উল্লসিত কণ্ঠে সেনাপতি মারকভকে সে কী একটা কথা বলল। জবাব না দিয়েই একপাশে মাথা ফিরিয়ে রইলেন মারকভ। লোকটি হল রদ্জিয়াঙ্কো। যানবাহনের তদারকী ছেড়ে একাতেরিনোদার দখলের লড়াই দেখবার অনুমতি জোগাড় করেছে সে।

আবার থামলো রেজিমেণ্টটা। অনেকটা দূর থেকে ভেসে এল সেনাপতির হুকুম। অনেকে দেশলাই জেবলে ধূমপান করতে শুরু করল। সবাই নীরবে চেয়ে দেখছিল নালা আর টিলাগুলোর ওদিকটা, অগ্রণী রক্ষীদল এখন ওরই মাঝে আত্মগোপন করে আছে। চাবুক হাঁকিয়ে জেনারেল মারকভ ছুটে চললেন উঁচু পপ্লার গাছগুলোর দিকে। গাছের ঝাপসা সবুজ কুয়াশা যেখানে প্রায় অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেছে, তারই আড়াল থেকে কিছুক্ষণ বাদে বাদে উঠছে এলোমেলো ধোঁয়ার স্তম্ভ; অনেক উঁচুতে আকাশে ছিটকে উঠছে গাছের ডাল আর মাটির ডেলা।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল ওরা। সাড়ে চারটা বেজে গেছে এতক্ষণ। বাগিচা থেকে কদম চালে ঘোড়া চালিয়ে ছুটে এল একজন সওয়ার—ঘোড়ার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়েছে তার মাথাটা। রশ্চিন দেখল, একটা নালার পাশে এসে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটা নাচতে শুরু করেছে, যেন লাফিয়ে পার হতে ভয় পাচ্ছে মনে হল। তারপরেই হঠাৎ লেজটা একবার দুলিয়ে নিয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে পড়ল সামনে—সওয়ারের টুপিটা ছিটকে গেল একদিকে। রেজিমেণ্টের সামনে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলল সে :

"গোলাবারুদের ব্যারাকঘরগুলো......আক্রমণ করো......জেনারেল সামনেই রয়েছেন, ওই দিকে......"

একটা টিলার দিকে হাত দেখালো সে। গুটিকয়েক মানুষ সেখানে আসা-যাওয়া করছিল, একজনের মাথায় উঁচু ফারের টুপি। বাতাস কাঁপিয়ে আদেশ এল :

"লাইনস্......ফরওয়ার্ড!"

রশ্‌চিনের গলা যেন বন্ধ হয়ে এল, চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল; শঙ্কা আর তীব্র আনন্দের একটা লহমা,— রশ্‌চিন অনুভব করল যেন সেই এক লহমার বিহ্বলতায় তার সর্বশরীর নিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে, একটা সুতীব্র বাসনা জেগে উঠছে তার মনে, ছুটে চলে যাও, চীৎকার করে ওঠো, চালাও গুলি, সঙগীন দিয়ে গেঁথে ফেলো; আকাঙ্ক্ষা জাগছে—রক্তে টৈটম্বুর হয়ে উঠুক তার কল্‌জেখানা, এ-কল্‌জে সে বলি দেবে......।

প্রথম সারিটা এগিয়ে গেল সামনে। রশ্‌চিন ছিল তারই বাঁ পাশে। টিলার ওপর দেখা যাচ্ছে মারকভকে, অগ্রসরমান রেজিমেণ্টের দিকে তাকিয়ে তিনি পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন।

"এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, বন্ধুরা!"—সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন তিনি। স্বাভাবিক মিটমিটে চোখদুটো যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে এখন...বড়ো ভয়ানক...।

মাটির ওপর জেগে-ওঠা শুকনো ঘাসের শীষগুলো এবারে নজরে পড়ল রশ্‌চিনের। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সর্বত্র বস্তার মতো শুয়ে আছে সৈনিকের উর্দি-পরা, নাবিকের জ্যাকেট ও অফিসারের লম্বাকোট-পরা নিশ্চল দেহগুলো, কোনোটি পড়ে আছে সটান লম্বা হয়ে, কোনোটি কাত হয়ে। রশ্‌চিনের সামনেই ওয়াট্‌ল্ লতার নীচু বেড়া, আর পাতাহীন কাঁটাগাছের ঝোপ। সৈনিকের খাটোজামা-পরা একজন লম্বা-মুখো লোক বসেছিল বেড়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, মাঝে মাঝে সে মুখটা খুলছিল আর বন্ধ করছিল।

বেড়া ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ল রশ্‌চিন। নজরে এল একটা চওড়া রাস্তা। দ্রুতবেগে অনেকগুলো ধূলিস্তম্ভ এগিয়ে আসছিল রাস্তা বেয়ে। বলশেভিকরা মেশিনগান চালাচ্ছে হামলাদারদের লক্ষ্য করে। মাঝপথেই থেমে পড়ল রশ্‌চিন, পেছিয়ে এসে নিঃশ্বাস নিয়ে একবার ফিরে তাকাল পিছন দিকে। যারা লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে-ছিল সবাই শুয়ে পড়ছে মাটিতে। রশ্‌চিনও ওদের পথ ধরল, গালটা ঠেকিয়ে রাখল খোঁচা-খোঁচা ঘাসওয়ালা মাটির ওপর। একবার সে জোর করেই মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল। গোটা সারিটাই শুয়ে পড়েছে। প্রায় পঞ্চাশ পা দূরে মাঠের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা মাটির ঢিবি, পাশেই খোঁড়া হয়েছে পরিখা। রশ্‌চিন লাফিয়ে উঠে মাথা নীচু করে ছুটে গেল পরিখাটার দিকে। বুকটা ভয়ানক ঢিপ্‌-ঢিপ করছিল। পরিখার প্যাঁচপেঁচে কাদার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। রশ্‌চিনের পেছনে পেছনে গোটা সৈন্যসারিটাই চলে এল একের পর এক। দু'একজন পথেই ধরাশায়ী হল। পরিখার মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে সবাই হাঁফাতে লাগল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে তখন বুলেট উড়ে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ সামনে কী একটা পরিবর্তন ঘটল—কোথা থেকে যেন ওদের পাশ কেটে কামানের গোলা গিয়ে পড়তে লাগল ব্যারাকঘরের দিকে। মেশিনগানের গুলি-বর্ষণ স্তিমিত হয়ে এল।

অতিকষ্টে পরিখা থেকে উঠে সৈন্যরা সামনের দিকে এগোতে লাগল। রশ্চিন দেখল তার নিজের লালচে-কালো ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে পিছলে সরে যাচ্ছে, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে তার আকৃতিটা, কখনো কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, কখনো অনেকদূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রশ্চিন ভাবল, 'কি অদ্ভুত! এখনো বেঁচে রয়েছি আমি, ঐ তো আমার ছায়াটাও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।'

ও তরফ থেকে আবার জোরালো হয়ে উঠল গুলিবর্ষণ। কিন্তু ব্যারাক থেকে মাত্র একশো হাত দূরে একটা গভীর খাদের মধ্যে এখন এসে গেছে রশ্চিনরা। দলের লোক অবশ্য ক্রমেই কমে যাচ্ছে সংখ্যায়। কর্দমাক্ত খাদটার মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ পায়চারি করছিলেন মারকভ। চোখ দুটো তাঁর ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

চেঁচিয়ে বলছিলেন তিনি : "ভদ্রমহোদয়গণ! একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময়......একবার শেষ চেষ্টা......কিছুই নয়, এই সামান্য কয়েক পা রাস্তা......"

রশ্চিনের পাশেই একজন বেঁটে টাক-মাথা অফিসার। খাদটার ওপর বিস্ফোরিত বুলেটের ধোঁয়া উঠতে দেখে সে ক্রমাগত একই ভাষায় গালাগাল করে যাচ্ছিল চাপা গলায়। কয়েকজন সৈনিক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পড়েছিল। একজন পা মুড়িয়ে বসে কপালের রগ চেপে ধরে রক্তবমি করছিল। খাঁচায় আটকানো হায়েনার মতো খাদটার তলায় এ-পাশ ও-পাশ পায়চারি করছিল অনেকে। হুকুম এল : "আগে বাড়ো!" কেউ যেন শুনতেই পেল না কথাটা। সারা শরীরে একটা খিঁচুনির ভাব করে রশ্চিন তার বেল্টটা এঁটে নিল। কাঁটাঝোপের ডাল-পালা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করল একবার। পিছলে পড়ে গেল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে আবার এগিয়ে গেল। অবশেষে যখন একেবারে মাথায় গিয়ে উঠল, দেখল মারকভ সেই খাদটার একেবারে কিনারায় বসে চেঁচাচ্ছেন :

"এগিয়ে গিয়ে হামলা করো! যাও!"

কয়েক গজ সামনেই রশ্চিন দেখতে পেল মারকভের চক্চকে বুটের তলা, এমন-কি তার ফুটোগুলোও নজরে পড়ল তার। কয়েকজন লোক তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। অস্তগামী সূর্যের কিরণে ঝলমলিয়ে উঠেছে ব্যারাকঘরের ইটের দেয়াল। জানলায় লেগে-থাকা কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলো রাঙা হয়ে উঠেছে। দু'একটা মূর্তিকে দেখা যাচ্ছে ব্যারাক ছেড়ে মাঠ পেরিয়ে ছুটে পালাতে। দূরের ছোট ছোট বাগানওয়ালা কুঠুরিঘরগুলোর মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে ওরা।

গোলন্দাজ ব্যারাকের বালিভরা আঙিনাটার মধ্যে একটা ভাঙা ব্যায়াম-সরঞ্জামের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একদল বেসামরিক নাগরিক ও কয়েকজন সৈনিক। ওদের মুখ ফ্যাকাশে, পরিশ্রান্ত, চিন্তাচ্ছন্ন। চোখ নীচু করে নিস্পন্দ অসাড় হাতগুলো দু পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে ওরা। ওদের মুখোমুখি রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা ক্ষুদ্রতর দল। এরা সবাই অফিসার। দীর্ঘকালের সঞ্চিত এক

ঘৃণা নিয়ে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। দুটো দলই নির্বাক হয়ে কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন ফন মেক্ এগিয়ে গেল ক্ষিপ্র গতিতে (রশ্‌চিন তাকে চিনতে পেরেছে : খুনীর মতো বিনিদ্র-চোখ সেই লোকটি)। বন্দীদের সামনে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে গিয়ে হাজির হল সে। "সবগুলোকেই" —উল্লসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল সে : "সকলের জন্যই এ হুকুম...অফিসারদের মধ্যে থেকে দশজন এগিয়ে আসুন তো সামনে..."

বন্দুকের বল্টু খটখটিয়ে দশজন অফিসার সামনে এগিয়ে আসার আগেই বন্দীদের মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা গেল। চওড়া-বুকওয়ালা ঢ্যাঙা মতো একজন বন্দী জামাটা মাথার ওপর টেনে তুলল। দাঁতহীন, কালো সোজা গোঁফওয়ালা আরেকজন সাধারণ নাগরিক, দেখলে মনে হয় ক্ষয়রোগে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার বুকটা, চেঁচিয়ে উঠল ভাঙা গলায় :

"মজুরদের রক্ত শুষে খাস্, পরগাছার দল!"

ওরা দুজন পরস্পরকে সজোরে আলিঙ্গন করে রইল। একটা ঘ্যাঁসঘেসে গলা বেসুরোভাবে গেয়ে উঠল গান :

"জাগো, বন্দী যারা......"

দশজন অফিসার কাঁধে ঠেকিয়ে নিল রাইফেলগুলো। রশ্‌চিনের হঠাৎ যেন মনে হল কে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল সে। (একটা বাক্সের ওপর বসে তখন সে পায়ের বুট খুলতে ব্যস্ত)। একজোড়া চোখ (মুখটা নজরে পড়ে নি রশ্‌চিনের), একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, দৃষ্টিতে মুমূর্ষুর তিরস্কার, কী যেন একটা বিশাল তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সে দৃষ্টিতে। 'ধূসর চোখ—হা ভগবান! ও চোখ যে আমার কতো আপনার, কতো আদরের!'

"ফায়ার!"

একের পর এক তড়বড় করে চালিয়ে দেওয়া হল গুলি। শোনা গেল গোঙানি আর চীৎকার। রশ্‌চিন তখন মাথা নীচু করে নোংরা এক ফালি ন্যাকড়া দিয়ে পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছে—লড়াইয়ের সময় বুলেটে ছড়ে গিয়েছিল জায়গাটা।

প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও ভলান্টিয়ার বাহিনীর কোনো জিতই হল না। ডানদিকটাতে তারা গোলন্দাজ ব্যারাক দখল করলেও, রণাঙ্গনের মাঝখানটায় এক পা-ও এগোতে পারেনি। সেই অংশটাতে কর্নিলভ বাহিনী একজন সেরা কম্যান্ডারকে হারিয়েছে—সে হল কর্নিলভের প্রিয়পাত্র কর্নেল নেঝেন্‌ৎসেভ। বাঁদিকে এরদেলির ঘোড়সওয়ারবাহিনী ক্রমাগতই পশ্চাদপসরণ করছিল। অভূতপূর্ব প্রতিরোধের পরিচয় দিচ্ছিল লালবাহিনী, যদিও তখন একাতেরিনোদারের প্রায় ঘরে ঘরে আহত মানুষের ভীড়। ট্রেঞ্চের কাছে কিবা রাস্তায় অসংখ্য নারী ও শিশু প্রাণ দিয়েছে। আভ্‌তোনমভের বদলে যদি আর কোনো সদক্ষ অধিনায়কের হাতে লাল পল্টনদের সংগঠিত করে পূর্ণ সর্বাত্মক আক্রমণ চালাবার ভার দেয়া হত, তা হলে

আর এই ছিন্নভিন্ন ভলান্টিয়ার বাহিনীকে টিঁকতে হত না, তাদের বিশৃঙ্খল আশা-ভরসাহীন ইউনিটগুলো অনায়াসেই হেরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।

ভলান্টিয়ার রেজিমেণ্টগুলোর সৈন্যসারির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নতুন লোক ভর্তি করে হতাহতদের স্থান পূরণ করা হয় নি। তা সত্ত্বেও তৃতীয় দিনে আবার তাদের পাঠানো হল আক্রমণ করতে। কিন্তু যেখান থেকে শুরু করেছিল ওরা, মার খেয়ে সেখানেই আবার ফিরতে হল তাদের। অনেকে আবার রাইফেল-টাইফেল ফেলে দিয়ে আশ্রয় নিল পিছনে—মালবাহী ট্রেনগুলোর মধ্যে। সেনাপতিরা ভয়ানক দমে গেলেন। আলেক্সিয়েভ এসেছিলেন একবার সৈন্যদের ঘাঁটি তদারক করতে। পাকা চুলওয়ালা মাথাটি নিরাশভাবে নেড়ে তিনি সরে পড়লেন। কিন্তু এমন সাহস কারুর হল না যে প্রধান সেনাপতিকে গিয়ে মুখোমুখি বলে আসেন—এ খেলা আর খেলে লাভ নেই, খেলা আগেই খতম হয়ে গেছে, আর যদি-বা কোনো দৈবগতিকে একাতেরিনোদারে তাঁরা ঢুকেই পড়েন, তবু শহরটাকে দখলে রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

নেঝেন্‌ৎসেভের মৃতদেহ গাড়িতে করে টেনে আনা হয়েছিল খামারবাড়িতে কর্নিলভের জানালার কাছে; প্রিয়পাত্রের ঠাণ্ডা কপালে সেই যে একবার ঠোঁটটা ঠেকিয়েছিলেন তিনি, তারপর থেকে কর্নিলভ আর সে ঠোঁট খোলেন নি, একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু তাঁর ঘরের কাছে যখন একবার একটা কামানের শ্রাপনেল এসে ফাটল আর তা থেকে একটি বুলেট জানলা গলে ছিটকে এসে ছাদের মধ্যে গেঁথে বসল, তখন আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিষাদগম্ভীর মুখে তাঁর লোলচর্ম আঙুলটা ছাদের দিকে দেখিয়ে তিনি কি জানি কি কারণে তাঁর সহচর খান খাদ্‌জিয়েভকে বললেন :

"ওটা সঙ্গে রেখে দাও, খান!"

চতুর্থ দিনের রাত্রিতে প্রধান-সেনাপতির আদেশ সর্বত্র ফিল্ড টেলিফোনযোগে প্রচারিত হল : "আক্রমণ চালিয়ে যাও।"

এর মধ্যে অবশ্য সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, আক্রমণের তীব্রতা আর আগের মতো নেই, যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। নিহত নেঝেন্‌ৎসেভের স্থান নিয়েছিলেন সেনাপতি কুতেপভ্‌। অনেক সাধ্যসাধনা করেও কুতেপভ্‌ কর্নিলভ রেজিমেন্টটিকে (বাহিনীর সেরা রেজিমেন্ট) রাজি করাতে পারলেন না শবজীক্ষেত ছেড়ে আসতে—ঐখানেই ওরা তখন মাটি আঁকড়ে পড়েছিল। পল্টনরা লড়াই করছিল নেহাত ঢিলেঢালাভাবে। এরদেলির ঘোড়সওয়ারবাহিনী তখনও পশ্চাদপসরণ করছিল। রাস্তায় মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন মারকভ, চেঁচিয়ে আর গালাগাল করে তাঁর গলাটি ভেঙে গেছে। ব্যারাক ছেড়ে এক পা'ও নড়তে রাজি হচ্ছিল না তাঁর অফিসারবৃন্দ।

বেলা দুপুরের সময় কর্নিলভের ঘরে সামরিক পরিষদের ডাক পড়ল। আলেক্সিয়েভ, রোমানভস্কি, মারকভ, বোগায়েভ্‌স্কি, ফিলিমনভ ও দেনিকিন প্রভৃতি

সেনাপতিরা জমায়েত হলেন। কর্নিলভের ছোট রূপোলি মাথাটা কাঁধের মধ্যে ঢুকে গেছে। রোমানোভ্‌স্কির রিপোর্ট শুনছিলেন তিনি ঃ

"গোলা নেই, কার্তুজ নেই। কসাক স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। সমস্ত রেজিমেন্ট বিশৃঙ্খল অবস্থায়। সৈন্যদের যুদ্ধোদ্যম ফুরিয়ে এসেছে। আহত হয়নি এমন অনেকে রণাঙ্গন ছেড়ে পেছনে আশ্রয় নিচ্ছে।......" এমনি আরও অনেক অনেক খবর।

সেনাপতিরা চোখ নীচু করে শুনছিলেন রিপোর্ট। পাশেই কার কাঁধের ওপর মাথাটি রেখে ঘুমোচ্ছিলেন মারকভ। গোধূলির আলোয় (জানালার পর্দাটা অবশ্য টেনে দেওয়া আছে) কর্নিলভের চোয়াল-উঁচু মুখখানাকে দেখাচ্ছে যেন কুঁচকে-যাওয়া ম্যামির মতো। চাপা গলায় বলতে লাগলেন তিনি ঃ

"তা হলে, ভদ্রমহোদয়গণ, অবস্থা সত্যিই খুব ঘোরালো। আমি তো একাতেরিনোদার দখল করা ছাড়া আর কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। আমি ঠিক করেছি কাল ভোরেই শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব—সমস্ত রণাঙ্গনে একসঙ্গে যুক্ত আক্রমণ চলবে। কাজানোভিচ্‌ রেজিমেণ্টকে হাতে রাখা হয়েছে। আমিই সেটিকে সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করব।"

যেভাবে ফুঁশিয়ে উঠে তিনি শেষের কথাগুলো বললেন, কেউ সেরকমটা আদৌ প্রত্যাশা করে নি। সেনাপতিরা যে যার আসনে চুপচাপ বসে রইলেন মাথা নীচু করে। জেনারেল দেনিকিন হাঁসফাঁস করছিলেন; স্থূল, ধূসর-দাড়িশোভিত লোকটিকে দেখায় অনেকটা করিৎকর্মা কেরানির মতো। মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারেই তাঁর গলা বেরিয়ে আসছিল : "হা ভগবান, ওঃ ভগবান!" কাশির দমক সামলাতে না পেরে তিনি দরজার দিকে রওনা হলেন। কর্নিলভের কালো চোখ একবার তাঁর পেছনটা দেখে নিল চট্‌ করে। সকলের ওজর আপত্তি শুনলেন কর্নিলভ, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করলেন, পরিষদের সভা সাঙ্গ হল। ঠিক হল যে চূড়ান্ত আঘাত হানা হবে পয়লা এপ্রিল তারিখে।

আধঘণ্টা বাদে কর্নিলভের ঘরে ফিরে এলেন দেনিকিন, গলা দিয়ে তেমনি সাঁই-সাঁই করে আওয়াজ বেরুচ্ছিল। চেয়ারে বসে একটা বিনম্র সুবিবেচনার সুরে বললেন তিনি :

"জেনারেল সাহেব, মানুষ যেমন মানুষের সঙ্গে মন খুলে কথা বলে তেমনি-ভাবে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"বলুন, আন্তন ইভানোভিচ্‌।"

"লাভ্‌র্‌ জর্জিয়েভিচ, আপনি এমন অনমনীয় হয়ে রয়েছেন কেন?"

কর্নিলভ যেন অনেক আগে থেকেই এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এমনিভাবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জবাবটি দিয়ে দিলেন :

"এছাড়া যে পথ নেই। একাতেরিনোদার যদি আমাদের দখলে না আসে তা হলে নিজের মাথায় বুলেট চালিয়ে দেব আমি।"—ডান কপালের রগটা আঙুল দিয়ে দেখালেন কর্নিলভ। আঙুলের নখটা একেবারে শেষ পর্যন্ত দাঁত দিয়ে কাটা হয়েছে।

"না, তা আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না!" দেনিকিন তাঁর ফুলো-ফুলো ফর্সা হাতটা বুকের ওপর রাখলেন : "ঈশ্বর সাক্ষী করে, স্বদেশের মুখ চেয়ে বলুন......কে এই বাহিনী পরিচালনা করবে, লাভ্‌র্‌ জর্জিয়েভিচ্‌?"

"আপনি।"

একটা অধৈর্য ভঙ্গী করে কর্নিলভ তাঁর প্রশ্নকর্তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আর কোনো কিছু বলতে তিনি নারাজ।

৩১শে মার্চ তারিখের সকালবেলাটা এলো আরামদায়ক উষ্ণতা নিয়ে—আকাশও মেঘশূন্য। সূক্ষ্ম একটা কুয়াশা উঠছে মাটি থেকে। সদ্যোজাত সবুজ তৃণে সবে ভরে উঠেছে পৃথিবী। কুবান নদীর ঘোলাটে হলদে জলস্রোত অলসভাবে বয়ে চলেছে খাড়া দুই পাড়ের মাঝ দিয়ে, শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে আলোড়ন যা হচ্ছে তা শুধু মাঝে মাঝে মাছ লাফিয়ে ওঠার সময়। সবকিছুই নিস্তব্ধ। একমাত্র আওয়াজ যা শোনা যাচ্ছে তা হলে কখনো সখনো রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ, কিংবা বহুদূর থেকে কামানের গর্জনের সঙ্গে বাতাসে শিস্‌ কেটে উড়ে যাওয়া গোলার শব্দ। প্রত্যেকেই সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে পরের দিন এক নতুন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মেতে উঠবে বলে।

বাড়ির সামনের প্রবেশপথটায় দাঁড়িয়ে লেফটেন্যাণ্ট দোলিন্‌স্কি ধূমপান করছিল। মনে মনে ভাবছিল সে : "শার্টটা আর ভেতরের জামাগেঞ্জিগুলো সাফ্‌ করা দরকার......মোজাজোড়াও সেই সঙ্গে। একটু স্নান করে নিতে পারলে ভারি আরাম হত......।" সত্যি সত্যি একটা পাখীও ঝোপের মধ্যে ফূর্তিতে কিচির মিচির করছে। দোলিন্‌স্কি মাথাটা তুলল। বু-উ-উ-ম্‌!—একটা গোলা সিধে এসে সবুজ ঝোপটার মাঝখানে পড়ল। ধাতব আওয়াজ করে বিস্ফোরিত হল গোলাটা। পাখীটা গান থামিয়েছে। একটা বোকা মুরগী কোনো-গতিকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাচ্ছিল, দোলিন্‌স্কি সিগারেটের প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল সেটার দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকল। দরজার কাছে বসেই পরমুহূর্তে কি মনে করে সে লাফিয়ে উঠে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকল। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কর্নিলভ তখন ট্রাউজারের প্রান্ত ধরে টানছিলেন উপর দিকে।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন : "চা তৈরি হয় নি এখনও?"

"এক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে, জেনারেল সাহেব। আমি বলে দিয়েছি।"

কর্নিলভ টেবিলে কনুই রেখে বসলেন। পার্চমেণ্টের মতো সাদা হাতটা দিয়ে তিনি কপালের ভাঁজগুলো সমান করবার চেষ্টা করলেন।

"তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল, লেফটেন্যাণ্ট।......কিন্তু এ তো ভাল কথা নয়, মনে করতে পারছি না যে......কি বিশ্রী......"

দোলিন্‌স্কি অবাক হয়ে ভাবছিল, কী বলতে চান কর্নিলভ? টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ তো এমনধারা কখনো করেন না, এমন শান্ত স্বর, এমন অন্যমনস্ক ভাব—বেশ একটু ঘাবড়ে গেল দোলিন্‌স্কি।

কর্নিলভ তাঁর শেষ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ

"কি বিশ্রী!......কি বিশ্রী! না, না, চলে যেও না, মনে হবে আমার। মনে হবে কথাটা। জানলা দিয়ে দেখছিলাম বাইরেটা। সুন্দর সকাল...ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে......"

কথা বন্ধ করে তিনি মাথা খাড়া করলেন—কি যেন শুনবার চেষ্টা করছেন মনে হল। দোলিন্‌স্কিও শুনতে পেল এবার, একটা গোলা ক্রমেই এগিয়ে আসছে কাছে, গোঁ-গোঁ আওয়াজে রক্ত যেন হিম হয়ে যায়—গোলাটা যেন পর্দা-ঢাকা জানালা গলে ঘরের একেবারে ভেতরে এসে পড়ল। এক পা পিছিয়ে এল দোলিন্‌স্কি। মাথার ওপর প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। বাতাস কেঁপে উঠল। প্রদীপের শিখা একবার দপ্‌ করে উঠল। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের দেহটা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে শূন্যে উঠে গেল......

দোলিন্‌স্কি একেবারে জানালার বাইরে ছিট্‌কে এসে পড়েছে। উঠে দেখে সে ঘাসের ওপর, চূর্ণবালিতে সর্বাঙ্গ সাদা, ঠোঁটজোড়া কাঁপছে। লোকে ছুটে আসছে তার দিকে......।

হাঁটু মুড়ে বসে একজন ডাক্তার কর্নিলভের দেহ পরীক্ষা করছিলেন। দেহটি পড়ে আছে স্ট্রেচারের উপর, ভেড়ার চামড়ার পোশাকে অর্ধেকটা ঢাকা। কাছেই একদল স্টাফ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। স্ট্রেচারটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন দেনিকিন, মাথার ওপর চূড়ো টুপিটা কেমন যেন বেয়াড়াভাবে বসানো।

এক মিনিট আগেও কর্নিলভের দেহে প্রাণ ছিল। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু কপালের একদিকের রগে সামান্য একটু আঁচড়। ডাক্তারটির চেহারা কেউকেটার মতো নয় মোটেই, কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তটিতে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সব জোড়া চোখ তাঁরই দিকে নিবন্ধ। যদিও তিনি জানতেন আগেই সব শেষ হয়ে গেছে, তবু মুখে একটা গুরুগম্ভীর ভাব এনে তিনি দেহ পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর ধীরস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন, নাকের ওপর চশমাজোড়া ভালো করে বসিয়ে তিনি মাথাটা নাড়লেন, যেন বলতে চাইছেন : "দুর্ভাগ্যক্রমে, এ-অবস্থায় কোনো ওষুধপত্র কাজে লাগবে না......"

দেনিকিন তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে ফ্যাঁসফেঁসে ধরা-গলায় বললেন :

"আমাদের কি কোনো সান্ত্বনার কথাই শোনাতে পারবেন না?"

"অসম্ভব, কোনো আশা নেই!" হাত উল্টে বললেন ডাক্তার : "শেষ হয়ে গেছে।"

দেনিকিন আবেগ-কম্পিত হাতে রুমাল বের করলেন; চোখে চেপে ধরলেন সেটা, কাঁধ দুটো স্ফীত হয় উঠছিল তাঁর। দশাসই চেহারাটা যেন মিইয়ে গেছে একেবারে। অফিসারদের দলটা মৃতদেহের দিকে আর না তাকিয়ে তাঁরই দিকে এগিয়ে এলো। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে তিনি কর্নিলভের হলদে মোমের মতো ফ্যাকাশে দেহটার উপর ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, চুম্বন করলেন মৃতদেহের কপালে। দুজন অফিসার তাঁকে তুলে ধরে দাঁড় করালো। আরেকজন উদ্বেগভরা গলায় জিজ্ঞেস করল : "সেনাপতিত্বের ভার এবার কে হাতে নেবেন, ভদ্রমহোদয়গণ?"

"আমিই নেব, আমিই"—তীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বললেন দেনিকিন : "লাভ্‌র্‌ জর্জিয়েভিচ্‌ এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কালই আমাদের এ-বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে।"

সেই রাতেই গোটা ভলাণ্টিয়ার বাহিনীটি নিঃশব্দে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, রসদ-গাড়ি, হাসপাতাল ইউনিট ও গাড়িভর্তি রাজনৈতিক সমর্থকদের নিয়ে সদলবলে উত্তরের দিকে সরে গেল। গ্নাচ্‌বাউ খামার এলাকার দিকে এগিয়ে গেল তারা, সঙ্গে দুটো মৃতদেহ নিয়ে—একটি কর্নিলভের, আরেকটি নেঝেন্‌ৎসেভের।

কর্নিলভের অভিযান এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এ-অভিযানের প্রধান নেতারা এবং যারা এতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রায় অর্ধেক লোকই নিহত হল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, ভাবীযুগের ইতিহাস-লেখকরা হয়তো সমস্ত ঘটনাটাকেই দু'একটা সামান্য কথায় সেরে ফেলতে পারবেন।

আসলে কিন্তু কর্নিলভের এই 'তুষার অভিযানের' অসীম তাৎপর্য। শ্বেত-রক্ষীরা এই অভিযানের মারফতই প্রথম তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ, তাদের ঐতিহ্য, তাদের সামরিক সংস্কার চরিতার্থতা খুঁজে পায়—যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে সদ্য-সৃষ্ট 'হোয়াইট অর্ডারে', তলোয়ার আর কণ্টক-মুকুটচিহ্নিত সেণ্টজর্জ রিবনে। ভবিষ্যতে নতুন সৈন্যসংগ্রহ ও সমাবেশের সময় তারা সামনে তুলে ধরতো ওই শহীদের মুকুট—বিদেশী শক্তিগুলোর সঙ্গে যখন তারা অবাঞ্ছিত বচসায় লিপ্ত হত, কিংবা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যখন তাদের বনিবনা হত না, তখন তাদের সমস্ত কার্যকলাপের দোহাই মানতো তারা শহীদের মুকুটের নামে—নির্যাতিত দেশভক্তের পুরস্কার হিসেবে এই ছিল তাদের সবচেয়ে বড়ো কৈফিয়ত। এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদই উত্থাপন করা চলতো না। যদিই-বা ধরুন সেনাপতি অমুক চন্দ্র অমুক কোনো বিশেষ জেলার গোটা অধিবাসীকে ধরে 'গাদন-দাণ্ডা' দিয়েই থাকেন তাহলেই বা কি? (তাদের বিশেষ পদ্ধতিটা ঐ নামেই চলত)। যারা এ কাজ করছেন তাঁরা নিজেরাই তো উৎসর্গিত-প্রাণ শহীদ, সুতরাং সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে তো আর শহীদের বিচার চলে না!

কর্নিলভের এই অভিযান হল বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম দৃশ্য—অবতরণিকার পরেই যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পরবর্তী দৃশ্যগুলো, দর্শকদের সামনে একে একে উদ্ঘাটিত হতে থাকল নতুনতর, আরও ভয়াবহ সব রোমাঞ্চকর দৃশ্য যার যাতনাদায়ক মাত্রাধিক্য অস্থির করে তোলে দর্শককে।

॥ চার ॥

গাড়ির পা-দানি থেকে লাফিয়ে পড়ল আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ, ছোট ভাইকে বাচ্চা ছেলের মতো কোলে তুলে নিয়ে নামিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মের ওপর। মাত্রিয়োনা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের দরজার কাছে, ঘণ্টাটির পাশে। সেমিয়ন প্রথমটায় তাকে চিনতে পারেনি; একটা শহুরে কোট গায়ে দিয়েছে মাত্রিয়োনা, তার চিকণ কালো চুল ঢাকা পড়েছে নতুন সোবিয়েত ফ্যাশানে বাঁধা সাদা ধব্‌ধবে রুমালের নীচে। তারুণ্যমাখা সুন্দর গোল মুখটায় একটা ভড়কে-যাওয়া ভাব, ঠোঁটদুটো এ'টে রেখেছে শক্ত করে।

সেমিয়ন যখন ভাইয়ের হাত ধরে এগিয়ে এল তার দিকে, পা যেন সরছিল না অবসাদে। মাত্রিয়োনার হাল্কা-বাদামী চোখদুটো থিরথিরিয়ে উঠল, মুখের ওপর দিয়ে কাঁপুনি খেলে গেল একটা......

"হা ভগবান্‌! কী দারুণ খারাপ হয়ে গেছে ওর চেহারা!"—বিড়বিড়িয়ে বলে উঠল মাত্রিয়োনা।

যন্ত্রণায় দম আটকে আসছিল সেমিয়নের। হাতটা রাখল স্ত্রীর কাঁধে, ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল তার অমলিন ঠান্ডা গাল। মাত্রিয়োনার হাত থেকে চাবুকটা ছাড়িয়ে নিল আলেক্সি। সবাই নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে। অবশেষে আলেক্সিই বলে উঠল :

"এই তো ফিরে পেলে স্বামীটিকে! ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল আর কি, তবে একেবারে শেষ করতে পারেনি। যাক্‌, কিছু ভাববার নেই—শিগগিরই সবাই মিলে লেগে যাবো খেতখামারের কাজে। এসো তবে ঘরের মানুষরা!"

মাত্রিয়োনা তার সাদর সবল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল সেমিয়নের কোমর, তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল ঘোড়ার গাড়িটার কাছে। গাড়ির মধ্যে পাতা আছে একটা ঘরে-বোনা চাদর, বালিশগুলোতে সূচের কাজ করা। সেমিয়নকে বসিয়ে দিয়ে মাত্রিয়োনা তার পাশটিতে বসল সামনে পা ছড়িয়ে, একজোড়া নতুন শহুরে জুতো তার পায়ে। আলেক্সি তার কোমরবন্ধনীটা এ'টে নিয়ে খুশিভরা গলায় বলল :

"ফেব্রুয়ারি মাসে একজন সৈন্য ঘোড়সওয়ার-ফৌজ থেকে আলাদা হয়ে পেছনে পড়ে যায়! পুরো দু'দিন আমি তাকে 'সামোগন' দিয়ে ডুবিয়েই রেখে-ছিলাম। তারপর কেরেন্‌স্‌কির নোটে তাকে পাঁচশো রুবল দিয়ে কী চমৎকার ঘোড়াখানা বাগিয়েছি এই দেখ"—লালচে-বাদামী রঙের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াটার পেছনে চাঁটি মারল সে। চালকের আসনে লাফিয়ে উঠে ভেড়ার চামড়ার টুপিটা মাথায় ভালো করে বসিয়ে নিয়ে আলেক্সি ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা। মাঠে সবে ঘাস গজিয়েছে। মেঠো পথ বেয়ে ওদের গাড়ি চলল। সূর্যের আলোয় ডানা কাঁপিয়ে আবেগময় কণ্ঠে গান গাইছিল একটা লার্কপাখী। সেমিয়নের দাড়ি-গজানো পাঁশুটে মুখে একটা হাসির রেখা খেলে গেল। মাত্রিয়োনা তাকে

ঘন করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। সেমিয়ন জবাব দিল ঃ

"তোমরা গাঁয়ের মানুষ তো দিব্যি আছ, তাই না?"

খোলামেলা নতুন চুণকাম-করা বাড়ীটার মধ্যে ঢুকতে সেমিয়নের মনটা বেশ খুশিই হয়ে উঠল। ছোট ছোট জানলায় সবুজ খড়খড়ি; একটা নতুন গাড়িবারান্দাওয়ালা ফটক; কতোকালের চেনা সেই নীচু দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সেমিয়ন যেন তাজ্জব হয়ে যায়, এমন স্বাচ্ছন্দ্য আর সাচ্ছল্যের পরিচয় সবকিছুর মধ্যে—চুণকাম-করা উষ্ণ চুল্লী, শক্ত টেবিলটা ছুঁচের কাজ-করা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তাকের উপরের থালা-বাসনগুলোর মধ্যে আর গেঁয়ো ছাপ নেই, তার বদলে কোনোটা নিকেল-করা, কোনোটা চীনামাটির তৈরি, মাত্রিয়োনার শোবার ঘরে লোহার খাট সাজানো, লেসের কাজ-করা লেপ দিয়ে ঢাকা, তোষকের উপর পাহাড় করা ফুলো ফুলো বালিশ। আর ডান দিকটায় আলেক্সির ঘর (মৃত্যুর আগে ওদের বাপ থাকতেন ঐ কামরাটায়), দেয়ালে ঝুলছে লাগাম-জিন, চক্‌চকে নতুন ঘোড়ার-সাজ, একটা তলোয়ার, একটা রাইফেল আর ফ্রেম-বাঁধাই আলোক চিত্র খানকয়েক। তিনটে কামরাই সযত্ন-লালিত ফুলের টব, রবার গাছ, আর মনসা গাছ দিয়ে সাজানো।......আঠারো মাস বাইরেবাইরেই কাটিয়েছে সেমিয়ন, আর আজ! টবের গাছ, রাজকন্যার যুগ্যি খাটপালঙ্ক, আর শহুরে কোট গায়ে দিয়ে মাত্রিয়োনা স্বয়ং!

"তোমরা দেখছি রাজার হালে থাকো!" বলল সেমিয়ন একটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে। গলায় জড়ানো স্কার্ফটা খুলতে তার বেশ কষ্টই হচ্ছিল। মাত্রিয়োনা নিজের চমৎকার কোটখানা খুলে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর এপ্রনটা বেঁধে নিয়ে টেবিলঢাকা কাপড়টা উলটো দিকে ঘুরিয়ে চট্‌পট্‌ সাজিয়ে ফেলল টেবিল। প্রকাণ্ড চিমটেখানা চুল্লীর মধ্যে চালিয়ে দেবার সময় সেটার ভারে যেন নুয়ে পড়ছিল মাত্রিয়োনা, কনুই পর্যন্ত খোলা, টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে মুখখানা। বর্শ্‌-এর লোহার পাত্রটা টেনে বার করল চিমটে দিয়ে। টেবিলে ইতিমধ্যেই এসে গেছে চর্বি, ভাপে-সেদ্ধ হাঁসের মাংস আর শুঁটকি মাছ। মাত্রিয়োনার চক্‌চকে চোখজোড়া ঘুরল আলেক্সির দিকে, আলেক্সি চোখ টিপে কি ইশারা করতেই মাত্রিয়োনা কলসী-বোঝাই সামোগন এনে হাজির করল।

দু'ভাই বসেছে টেবিল ঘেঁষে। আলেক্সি প্রথম গ্লাসটা ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। মাত্রিয়োনা মাথাটা ঝোঁকালো আদবমাফিক। সেই গলা-জ্বলানো নির্জলা স্পিরিটটুকু গিলবার সময় সেমিয়নের যখন প্রায় দম আটকে যাবার অবস্থা, আলেক্সি আর মাত্রিয়োনা তখন তার দিকে তাকিয়ে চোখ মুছ্‌ছে। সেমিয়ন আজ বেঁচে ফিরে এসে আবার ওদের সঙ্গেই এক টেবিলে বসেছে, এ যে কতো আনন্দের!

বর্শ্‌-টুকু ওরা প্রায় শেষ করে এনেছে। আলেক্সি বলল ঃ "রাজার হালে থাকি সে কথাটা হয়তো ঠিক নয় ভাই, তবে আরামেরও অভাব নেই।"

মাত্রিয়োনা এ'টো প্লেটগুলো সরিয়ে ফেলল, তারপর এসে বসল স্বামীর কাছ ঘেঁষে।

আলেক্সি তখন বলে চলেছে "জগলের কাছে সেই জমিটার কথা মনে আছে তো? সেই প্রিন্সের সম্পত্তি? সেই যে গো চমৎকার মাটি জায়গাটার? গাঁয়ের মধ্যে খুব একচোট লাগিয়ে দিয়েছিলাম যা হোক, চাষীদের জন্য ছ' ছ' বালতি সামোগন আমি একাই জোগান দিয়েছি, আর ওরাও আমার ভাগেই ছেড়ে দিল জমিটা। তারপর তো আমি আর মাত্রিয়োনা মিলে চাষবাস করছি ওতে। তা, গতবার গরমের সময় নদীর ধারের জমিটা থেকে তো বেশ ভালই ফসল পেয়েছিলাম। আর এই যে সব দেখছ—বিছানা, আয়না, কফির পেয়ালা, চামচে, কাঁটা, আরও সব এটা-সেটা নানান্‌টা—সবই কিনেছি এই শীতে। মাত্রিয়োনার মতো অমন গিন্নী আর দুটি পাবে না। হাটবারের দিন সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। আমি তো সেই পুরনো কায়দাই ধরে বসে আছি—টাকা ফেল, মাল উঠিয়ে নিয়ে যাও। ও কিন্তু তা নয়! এই একটা শুয়োর জবাই করল, কি ধর ঝটপট দুটো মুরগি মারল, অমনি উঠল গিয়ে গাড়িতে, এক বস্তা ময়দা, আর আলু সঙ্গে নিয়ে ছুটল শহর বলে......আর, বাজারের দিকে তো যাবে না ও, যাবে সিধে সাবেক বড়োলোকগুলোর বাড়ি, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের বলবে—পালঙ্কটার বদলে দু' পুড ময়দা আর ছ' পাউন্ড চর্বি দিতে পারি...আর বিছানার ঐ চাদরটার জন্য পাবে এক বস্তা আলু...। যেভাবে বাজার করে বাড়ি ফিরতাম আমরা, একবার দেখতে যদি! হাসতে হাসতে পিলে ফাটতো তোমার।—সাক্ষাৎ জিপসী যাকে বলে—গাড়ি বোঝাই রাজ্যের ওঁচা মাল নিয়ে বাড়িমুখো!"

মাত্রিয়োনা স্বামীর হাতটা চেপে বলল ঃ

"আমার সেই মামাতো বোন আভ্‌দোতিয়ার কথা মনে আছে তো? আমার চেয়ে বছরখনেকের বড়ো হবে। ওকে আমরা আলেক্সির সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।"

আলেক্সি হেসে উঠে পকেট হাতড়াতে থাকে।

"আমাকে বাদ দিয়েই ছুঁড়িগুলো বন্দোবস্ত করেছে, বুঝেছ? তা তুমি তো জানো ভাই, বিধবা থেকে থেকে একেবারে হয়রান হয়ে উঠেছি। মদ ওড়ান আর মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করা,—তারপর? খালি মনে হবে যেন কতো ময়লাই লেগে আছে সর্বাঙ্গে..."

পকেট থেকে একটা থলি আর পোড়ে-খাওয়া পাইপ বের করল আলেক্সি। পাইপটার গায়ে ঝুলছে তামার শিকলি। ঘরে-তৈরি তামাক ভরে নিয়ে আলেক্সি টানতে শুরু করল, সারা ঘরটা ভরে উঠল ধোঁয়ায়। সেমিয়নের মাথা ঘুরছিল বকবকানি শুনে আর সামোগনের ঝোঁকে জায়গায় বসে বসে সে খালি শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল।

বিকেলের দিকে মাত্রিয়োনা তাকে স্নান-ঘরে নিয়ে গেল। বেশ করে সাবান মাখিয়ে বাষ্প-স্নান করিয়ে মাত্রিয়োনা ওর সারা দেহ কচি ডালের গোছা দিয়ে রগড়ালো। তারপর ভেড়ার চামড়ার কোট দিয়ে তাকে ঢেকে নিয়ে এল ঘরে।

আবার তারা সবাই মিলে বসল টেবিলে, সান্ধ্য আহার হয়ে যাবার পর সামোগনের কলসীটা নিঃশেষ করল তারা, একেবারে শেষ ফোঁটাটি অবধি। সেমিয়নের ক্লান্তি এখনও কাটে নি। বৌয়ের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তার উষ্ণ বাহুর বেষ্টনে। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো সমস্ত ঘরখানিই মনে হল ওর কাছে উষ্ণতায় ভরা আর তক্‌তকে সাজানো। মাত্রিয়োনা বসে একতাল ময়দা ঠাসছে—খুশির হাসিতে ঝিকমিকিয়ে উঠছে তার চোখের কিনারা আর সাদা দাঁতের সারি। বসন্তের রোদ এসেছে চকচকে পরিষ্কার জানলার কাঁচ গলে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রবার গাছের পাতাগুলো। বিছানায় বসেই সেমিয়ন আড়মোড়া ভেঙে নিল পা-জোড়া টান-টান করে ঃ মাত্রিয়োনার একদিন একরাতের সাহচর্যেই তার শরীরের অনেকটা উন্নতি হয়েছে, বেশ বুঝতে পারল সে। পোশাক বদ্‌লে, হাতমুখ ধুয়ে একবার খোঁজ নিল দাদার দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা কোথায় থাকে। আলেক্সির ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে, সামনে একটা ভাঙা আয়নার টুকরো রেখে সে কামিয়ে নিল দাড়িটা। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে ফটকটার কাছে দাঁড়াতেই পাশের বাড়ির বাগানে বসে থাকতে দেখল একটি বুড়োকে। নমস্কার জানালো সে। বুড়ো আজকের লোক নয়, চারজন জারকে দেখেছে সে। বেশ কেতাদুরস্তভাবেই মাথা ঝুঁকিয়ে টুপি খুলে পালটা নমস্কার জানালো বুড়ো। ফেল্ট্‌বুটের মধ্যে ঢোকানো পা-জোড়া সামনের দিকে ছড়িয়ে বসেছে সে, লাঠির ওপর শিরা-ওঠা হাতদুটো ভাঁজ করে রেখেছে বেশ ছন্দোবদ্ধভাবে।

পরিচিত রাস্তাটা এই সময় একেবারে নির্জন। এক কুটির থেকে আরেক কুটিরের মাঝে দেখা যায় সুদূরবিস্তৃত সবুজ ঘেসো জমির ফালি। এখানে ওখানে একেকটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া-লাগামহীন খালি গাড়ি, দিগন্তের আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে তাদের অবয়বরেখা। বাঁদিকটায় তাকালো সেমিয়ন—দুটো বায়ুচালিত কল, অলসভাবে ঘুরছে তাদের পাখা, পেছনেই একটা খড়িমাটির খাত। অনেকটা নীচে ঢালু জমির ওপর ফলের বাগান, খড়ের কুটির, ঘণ্টাঘরের সাদা চুড়োটা ঝিকমিক করছে তার মধ্যে। ঝোপজঙ্গলের ওপাশে সূর্যের আলোয় চক্‌চক্ করছে কোনো প্রাক্তন কুলীনব্যক্তির মহলবাড়ির জানলাগুলো। বসন্ত এসে গেলেও গাছের পাতার বাহার নেই, ঝোপজঙ্গলগুলো প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। দাঁড়কাকের দল চারিদিকে চক্কোর দিয়ে কা-কা করছে। জঙ্গল আর চমৎকার বাড়িটার সামনের দিকটার প্রতিচ্ছবি পড়েছে টৈ-টম্বুর পুকুরের জলে। জলার ধারে বসে আছে একপাল গরু। ছেলেমেয়েরা খেলছে। ভাইয়ের জ্যাকেটটি গায়ে চাপিয়েছে সেমিয়ন; প্রকাণ্ড পকেট দুটোর মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিল সে ভুরু নীচু করে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এল তার মনের গভীরে। গ্রাম ছাপিয়ে-ওঠা স্বচ্ছ উষ্ণতার ঢেউ কেটে, নীলাভ ফলবাগিচা আর চষা জমির আড়াল থেকে এক অন্য পৃথিবী, এই শান্ত পরিবেশ ছাড়িয়ে অনেক দূরের এক পৃথিবী ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল তার চোখের সামনে। আলেক্সি গাড়ি চালিয়ে আসছিল, দূর থেকে

সেমিয়নকে দেখতে পেয়ে ফূর্তিভরা গলায় ডাকলো তাকে। ঘোড়াটার জিন-লাগাম খুলে নিয়ে সে বাড়ির হাতায় ঢুকল, ঝোলানো জলাধারটার নীচে এসে দাঁড়াল হাত ধোবে বলে।

"কিচ্ছু ভেবো না ভাই, ও ঠিক হয়ে যাবে"—দরদভরা গলায় বলল সেঃ "আমিও যেবার সেই জার্মান লড়াই থেকে ফিরে আসি, প্রথমে তো কিছুই ভাল লাগতো না, চেয়েও দেখতাম না কিছু। চোখে তখন খালি ভাসছে রক্ত, আর বুকে সে কি কষ্ট...। নিকুচি করেছে লড়াইয়ের...যাক, এসো তো এবার, খেয়ে নাও।"

সেমিয়ন কিছুই বলল না। কিন্তু মাত্রিয়োনাও বেশ ধরতে পেরেছে তার স্বামীর মনটা কেমন যেন উদাস নিরুৎসাহ হয়ে আছে। প্রাতরাশের পর আলেক্সি ফিরে গেল মাঠে। মাত্রিয়োনা খালি পায়ে স্কার্টটা তুলে ধরে গোবর সরাচ্ছিল। সেমিয়ন তার ভাইয়ের বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কিন্তু খালি উশখুশ করছে আর পাশ ফিরছে, ঘুম আসছে না কোনোমতেই। বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে আছে তার মনটা। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল নিজের মনে ঃ ওরা বুঝবে না, বুঝবে না—ওদের কি কিছু বলে লাভ আছে? কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় যখন ওরা তিনজনে কাঠের গুঁড়িটার উপর বসল, তখন আর সেমিয়ন চুপ করে থাকতে পারল না, বলে বসল ঃ

"কিন্তু তোমার রাইফেলটা তো অন্তত সাফ করে রাখতে পার, আলেক্সি?"

"চুলোয় যাক্ রাইফেল......একশো বছরের মধ্যে আর লড়বার কথাই উঠছে না, দেখে নিও।"

"আনন্দটা বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে না কি? রবার গাছের চাষ করবার সময় এখনো হয়নি বোধ হয়।"

"আর তুমিও অত চট্ করে ক্ষেপে যেও না, সেমিয়ন।"—আলেক্সি মুখ থেকে পাইপটা বের করে থুথু ফেলল। "এসো বরং গেরস্ত চাষীর মতো কথাবার্তা বলি, এখানে তো আর সভা করছি না আমরা। সভায় ওরা কি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে সবই জানা আছে আমার—কতোবার চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছি। তোমার যা প্রয়োজন শুধু সেটুকু জানলেই হল, যাতে তোমার দরকার নেই তাই নিয়ে কেন মাথা ঘামানো? খেটে-খাওয়া মজুরদের হাতে জমি দাও, বলছে এখন! বেশ তো, ভাল কথা। তারপর আবার এখন শুনছি—গরীব চাষীর কমিটি। আমাদের গাঁয়ে অবশ্য কমিটিতে যারা রয়েছে সবাই আমাদের হাতের লোক। কিন্তু ওদিকে সস্নোভকা গাঁয়ে তো অন্য ব্যাপার। ওখানকার গরীব চাষী কমিটি যা খুশি তাই করছে। যেভাবে দখল আর জবরদস্তি চালাচ্ছে ওরা, সে আর কহতব্য নয়। কাউন্ট বব্রিন্স্কির গোটা সম্পত্তিটাই চলে গেছে 'সভ্খোজের' হাতে, চাষীরা এক বিঘত জমিও পায়নি। আর কমিটি বলতে কারা? দু'জন মাত্র লোক, ঘোড়া পর্যন্ত নেই তাদের, আর বাদবাকীরা যে কী—

ভিনদেশী, না কয়েদী, না আর কিছু, তা এক ভগবানই জানেন! বুঝেছ তো আমার কথাটা?"

মাথা ঘুরিয়ে সেমিয়ন বলল, "আরে না, ওসবের কথা আমি মোটেই বলছিলাম না।"

"বেশ তো বুঝলাম, কিন্তু আমি যা বলছি সে কথাটাই শোন না-হয়! উনিশ শো সতের সালে আমিও লড়াইয়ের ময়দানে চেঁচিয়ে বেরিয়েছি বুর্জোয়াদের মুণ্ডপাত করে। যার বন্দুকের বুলেট এসে আমার পায়ে বিঁধেছিল ভগবান তাকে রক্ষা করুন—তার কল্যাণেই আমায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সিধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাড়িতে। আমি নিজে যেমন বুঝি ব্যাপারটা তা হচ্ছে, যতোই কেন ভূরিভোজ করো, পরদিন তোমার আবার খিদে পাবেই। মানুষকে তো কাজ নিয়ে থাকতে হবে?"

কাঠের গুঁড়ির উপর আঙুল বাজিয়ে সেমিয়ন বলল: "পায়ের নীচে মাটি অবধি জ্বলে গেল, আর তুমি তো ঘুমুচ্ছ নিশ্চিন্তে।"

আলেক্সি বেশ দৃঢ় গলায় বলল: "হয়তো নৌবহরে কিংবা তোমাদের ওই শহরগুলোতে বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এখানে যে-মুহূর্তে জমি ভাগাভাগি হল সেই মুহূর্তে বিপ্লবও খতম। এখন থেকে এই রকমই চলবে: প্রথমে ফসলের ব্যাপারটা সামাল দেব, তারপর শুরু করব কমিটিগুলোকে নিয়ে। সেন্ট পিটার্স দিবসের আগেই গাঁয়ে আর গরীব চাষী কমিটির চিহ্নও থাকবে না। জ্যান্ত কবর দেব ওদের। কমিউনিস্টদের ভয় পাই না আমরা, মনে রেখো সে কথা। শয়তানকেই থোড়া পরোয়া করি, তো কমিউনিস্ট।"...

"আর বলবেন না আলেক্সি ইভানোভিচ, দেখছেন না কেমন কাঁপছে ওর সারা শরীরটা!"—নরম গলায় বলল মাত্রিয়োনা। "রুগ্ন মানুষ তো, কী করবে!"

"রুগ্ন নই আমি!" চেঁচিয়ে উঠল সেমিয়ন—"এখানকার হালচাল বুঝতে পারছি না আমি, সেই হচ্ছে আসল গলদ!" দাঁড়িয়ে উঠে ওয়াট্‌ল্‌ লতার বেড়ার দিকে হেঁটে গেল সে।

আর এগোল না কথাবার্তা।

মুমূর্ষু সূর্যের অস্তরাগরেখায় ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যাচ্ছে দুটো বাদুড়, মনে হয় যেন দুটো দেহবিমুক্ত আত্মা। এখানে ওখানে দু'-একটা জানলায় দেখা যাচ্ছে আলোর আভা—সান্ধ্য আহার বোধ হয় শেষ হল।...অনেকগুলো মেয়েলি কণ্ঠের গান ভেসে আসছে দূর থেকে। হঠাৎ গানটা যেন থমকে যায়, গোধূলি-রঞ্জিত চওড়া রাস্তাটা থেকে একটা ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ আওয়াজ ভেসে আসে। চালক লাগাম টেনে ধরে, চীৎকার করে কি যেন বলে, তারপর আবার ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে। ভালো করে শুনবার আগ্রহে আলেক্সি তার মুখ থেকে পাইপটা বের করে নেয়, কাঠের গুঁড়ির আসন ছেড়ে খাড়া হয়ে ওঠে।

"কী ব্যাপার ঘটল এমন?"—কাঁপা গলায় উচ্চারণ করে মাত্রিয়োনা। অবশেষে

সওয়ারটি ছুটে আসে ওদের একেবারে সামনে। টুপিহীন, খালি-পা, অল্পবয়সা ছোকরা। চীৎকার করে জানায় ঃ

"জার্মানরা আসছে! চারজন লোক সস্‌নোভ্‌কায় খুন হয়ে গেছে।"

শান্তি চুক্তি হয়ে যাবার পর, নতুন পঞ্জিকা অনুসারে মার্চ মাসের মাঝামাঝি, জার্মান সৈন্যরা আকস্মিকভাবে উক্রেইন ও ডনবাস আক্রমণ করে বসল। রিগা থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ওরা অভিযান শুরু করল।

শান্তিচুক্তির শর্ত অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের (রাদা) কাছ থেকে জার্মানদের প্রাপ্য হল সাড়ে সাত লক্ষ পুড শস্য, জ্যান্ত গোরু-ভেড়া একলক্ষ দশ হাজার পুড, কুড়ি লক্ষ হাঁসমুরগি, পঁচিশ লক্ষ পুড চিনি, দু'লক্ষ লিটার স্পিরিট, আড়াই হাজার ট্রাকভর্তি ডিম, চার হাজার পুড চর্বি, তা ছাড়া মাখন, চামড়া, কাঠ, উল, ইত্যাদি তো আছেই।...

জার্মানরা উক্রেইন আক্রমণ করল পুরোপুরি সামরিক কানুনের মর্যাদা রেখে —অর্থাৎ খাকি উর্দি আর লোহার শিরস্ত্রাণ-পরা সৈন্যের সারি নিয়ে! লাল বাহিনীর দুর্বল ফৌজীদলগুলো জার্মান ভারী কামানের সামনে একেবারেই দাঁড়াতে পারছিল না, মাটির সংগে একেবারে মিশে যাচ্ছিল তারা।

পল্টনবাহিনী মার্চ করে চলেছে, পিছন পিছন রয়েছে মোটরচালিত যান-বাহন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামানের সাজসরঞ্জাম। আঁকাবাঁকা উজ্জ্বল রঙীন ডোরা দিয়ে বর্ণচোরা করে রাখা হয়েছে কামানগুলোকে; ট্যাংক আর সাঁজোয়া গাড়ি, নদী পারাপারের ছোট সেতু, এমন-কি বড়ো বড়ো গোটা পুলই টেনে আনা হয়েছে ওদের সংগে। মাথার ওপর অনবরত গর্জন করে যাচ্ছে এরোপ্লেন। প্রায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এক জাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে আধুনিক যন্ত্র-কৌশল। লাল ফৌজীদলগুলো পুরনো সৈনিক, কৃষক, খনি-মজুর আর কারখানার মজুরদের নিয়েই তৈরি, সংগঠন বলতে কিছু নেই তাদের, জার্মানদের চেয়ে সংখ্যায়ও দুর্বল। লড়াই করতে করতেই তারা ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করছে—উত্তর ও পূবের দিকে।

কেন্দ্রীয় রাদা উক্রেইনকে বিক্রি করেছিল জার্মানদের কাছে। তাদের জায়গায় এলেন জেনারেল স্করোপাদ্‌স্কি, জারের প্রাক্তন সাংগোপাংগদেরই একজন। উক্রেইনীয় জাতীয়তাবাদীদের বড়ো আদরের জিনিস চিরাচরিত উক্রেইনীয় নীল-কোট গায়ে দিয়ে তিনি হেৎমানের (মোড়ল) মুগুর ধরে বীরের মতো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন : "উক্রেইন দীর্ঘজীবী হোক! আজ থেকে শুরু করে চিরকালের জন্য শান্তি, শৃংখলা, আর সমৃদ্ধি! মজুররা—কল চালাও, চাষীরা—লাঙল ধরো! লাল শয়তানরা—ভাগো!"

বিপদের ভয়াবহ খবর নিয়ে সেই বার্তাবহটি ভ্লাদিমিরস্করে গ্রামের সদর শড়ক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবার পর আজ সাতদিন কেটে গেছে। একদল টহলদার ঘোড়সওয়ারকে একদিন সকালে আবির্ভূত হতে দেখা গেল খড়িমাটির

ঢালু জমিটার উপরে বায়ু-কল দুটোর পাশে। উঁচু উঁচু কালো ঘোড়ার পিঠে জনা-কুড়ি সওয়ার—দীর্ঘকায় অ-রুশীয় ধরনের চেহারা লোকগুলোর। পরনে খাটো সবুজে জ্যাকেট, মাথায় কোঁচানো উহ্লান টুপি। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা, তারপর ঘোড়া থেকে নামল।

গ্রামে তখনো অনেক লোক রয়ে গিয়েছে—সেদিন খেতখামারের কাজে যায়নি অনেকেই। ঘোড়সওয়ারদের দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি শুরু করল এক বাড়ীর দরজা থেকে আরেক বাড়ীর দরজায়, ওয়াট্ল-বেড়ার ওপর দিয়ে চেঁচামেচি করে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল মেয়েরা। দেখতে দেখতে গির্জার সামনের খোলা আঙিনাটায় জড়ো হল বিস্তর মানুষ। উপরের দিকে তাকিয়ে ওরা এবার স্পষ্টই দেখতে পেল উহ্লানদের—কলগুলোর ধারে দুটো মেশিনগান বসাচ্ছে তারা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আরেক তরফ থেকে শোনা গেল লোহার বেড়-লাগানো চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ, চাবুকের সপ্সপানি। গাঁয়ের রাস্তা বেয়ে তীব্র বেগে ছুটে আসছে একটা সামরিক গাড়ি, একজোড়া ঘোড়া পুরো কদমে টেনে আনছে সেটাকে স্কোয়ারের দিকে। মুখে ফেনা উঠেছে ঘোড়াদুটোর। চালকের আসনে বসেছিল হাল্কা-নীল চোখওয়ালা চোয়াল উঁচোনো একটি বেয়াড়া চেহারার সৈনিক, মাথায় বেগার-খাটিয়ের টুপি, পরনে আঁটসাঁট উর্দি। তার পেছনে বসেছিল একজন জার্মান অফিসার, কনুই উঁচিয়ে কোমরে হাত রেখে। চেহারা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ানক, এক চোখে একটা চশমা, আর টুপিটা আনকোরা, মনে হয় সদ্য দোকান থেকে কেনা। লোকটির বাঁদিকে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একজন পুরনো পরিচিত লোক—প্রিন্সের নায়েব, গত শরৎকালে যে-লোকটি অন্তর্বাসমাত্র সম্বল করে পালিয়ে গিয়েছিল জমিদারীর কাছারি ছেড়ে।

ওই তো বসে আছে গ্রিগরি কার্লোভিচ্ মিয়েল, ভালো কোট গায়ে, গরম টুপিটা মাথায় চড়িয়ে। চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে—সদ্য কামানো গোল-মুখ, চোখে সোনার রীম-লাগানো চশমা। গ্রিগরি কার্লোভিচ্কে দেখেই চাষীদের গায়ের চামড়া যেন শিরশির্ করে ওঠে।

"টুপি খুলে ফেলো সবাই!"—হঠাৎ রুশভাষায় চীৎকার করে হুকুম করল অদ্ভুতদর্শন অফিসারটি। গাড়ির একদম কাছে যারা ছিল শুধু তারাই গম্ভীর মুখে টুপি খুলে ফেলল মাথা থেকে। স্কোয়ারটায় পূর্ণ নিস্তব্ধতা। অফিসারটি আগের মতোই কনুই উঁচিয়ে কোমরে হাত রেখে বসে আছে, একচোখের চশমা ঝকঝক্ করছে। কথা বলতে শুরু করল সে, প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতে লাগলো—উচ্চারণ কষ্টকৃত হলেও ভাষা নির্ভুল ঃ

"ভ্লাদিমিরস্কয়ে গ্রামের খেতমজুর তোমরা, পাহাড়ের মাথায় ওই যে দেখতে পাচ্ছ দুজন জার্মান সৈন্য মেশিনগান বসাচ্ছে, ও-মেশিনগানগুলো চমৎকার চালু অবস্থায় রয়েছে...অবশ্য তোমরাও বেশ বুদ্ধিমান খেতমজুর, সে কথা জানি। তোমাদের কোনোরকম ক্ষতি করতে আমার মন উঠবে না। তোমাদের জানানো

আমার কর্তব্য যে সম্রাট উইল্‌হেল্‌মের জার্মান বাহিনী এখানে এসেছে তোমাদের মধ্যে সদাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করা হোক—এ জিনিস আমরা জার্মানরা মোটেই পছন্দ করি না। এ ধরনের কার্যকলাপের জন্য আমরা নির্মম শাস্তিই দিয়ে থাকি। বলশেভিকরা তো তোমাদের উল্টোটাই শিখিয়েছে, তাই না? আর ওই জন্যই তো আমরা বলশেভিকদের খেদিয়ে দিয়েছি, আর কখনো তারা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে না জেনে রেখো। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি আগে যে-সমস্ত খারাপ কাজ করেছ সে-সবের কথা ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ, মন ঠিক করো—এই জমিদারীর মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমরা কেড়ে নিয়েছ সব তাঁকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দেবার জন্য তৈরি হও।"

কথাগুলো শুনে নানাকণ্ঠে বিরক্তির গুঞ্জন ওঠে ভিড়ের মধ্যে থেকে। গ্রিগরি কার্লোভিচ্‌ যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল চোখ পর্যন্ত টুপিটা টেনে দিয়ে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাষীদের দিকে। তার স্থূল মুখের ওপর একবার ঝিলিক দিয়ে গেল একটা তৃপ্তির হাসি—বোঝা গেল কাউকে সে চিনতে পেরেছে ভিড়ের মধ্যে। অফিসার ততক্ষণে মুখ বন্ধ করেছে। চাষীরাও চুপ করে রইল বাক্যব্যয় না করে।

"আমার কর্তব্য আমি করেছি। এবার আপনি ওদের কিছু বলুন, মিঃ মিয়েল।"—নায়েবের দিকে তাকিয়ে বলল অফিসারটি।

গ্রিগরি কার্লোভিচ বিনয়ের সঙ্গে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো এ-প্রস্তাবে।

"ওদের কিছু বলার নেই আমার, লেফ্‌টেন্যান্ট। ওরা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সবকিছু।"

"ভালো কথা।" মন্তব্য করল অফিসার, ভাল-মন্দে অবশ্য তার বিশেষ কিছু আসে যায় না। "চালাও হে, অগাস্টিন!"

সপাং করে উঠল চালকের হাতের চাবুক। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল সামরিক গাড়িটা। রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সবাই। প্রিন্সের মহল-বাড়ির দিকে রওনা হল গাড়ি। মাত্র তিনদিন আগেই ওই বাড়িটায় জেলা কার্যকরী সমিতির আস্তানা হয়েছিল। অপসৃয়মান গাড়িটার পিছন দিকে তাকিয়ে থাকল চাষীরা ঃ

"জার্মানগুলো আবার গ্যাঁট হয়ে বসল দেখছি!"—ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলে উঠল।

"গ্রিগরি কার্লোভিচ্‌ তো একটি কথাও বলল না, ভাই।"

"একটু সবুরই করো না—বলবেই কথা!"

"হায় ভগবান, কী দুর্ভোগ হল আবার—কী অপরাধটাই যে করলাম!"

"পুলিশ অফিসারটা শিগগীরই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।"

"সস্‌নোভ্‌কায় তো এর মধ্যেই আড্ডা গেড়েছে সে। একটা মিটিং ডেকে-

ছিল, মুঝিকদের ধরে গালাগাল করেছে—তোরা বেটা অমুক-তমুক, ডাকাত, গুণ্ডা, ঊনিশ শো পাঁচ সালের কথা ভুলে গিয়েছিস্? তিন ঘণ্টা ঝাড়া গলাবাজি করেছে। খিস্তি-খেউড় করে টের পাইয়ে দিয়েছে ওদের রাজনীতি করতে যাওয়ার মানেটা কি!"

"কি হবে তাহলে এখন?"

"চাবুক—আর কি।"

"তাহলে জমির কি হবে? এখন এর মালিক হবে কে?"

"আধা-আধি হে আধা-আধি। ফসল ঘরে তুলতে দেবে, প্রিন্সের প্রাপ্য অর্ধেকটা কিন্তু নিয়ে চলে যাবে।"

"রেখে দাও তোমার!—চললাম আমি।"

"যাবে কোথায় হে, মুখ্যু?"

আর দু'-চারটে কথার পর চাষীরা সবাই ভঙ্গ দেয়। রাত হবার আগেই জমিদারের মহলবাড়িতে ফের গিয়ে জমতে থাকে সোফা, বিছানা, মশারি, গিল্টি-করা ফ্রেম-বাঁধানো আয়না আর ছবি।

কার্সিল্নিকভরা অন্ধকারের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে। হাতের চামচেটা নামিয়ে রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে আলেক্সি। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মাত্রিয়োনা চুল্লী আর টেবিলের মাঝখান দিয়ে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। সেমিয়ন বসে আছে কাঁধ নিচু করে, কপালের ওপর এসে পড়েছে তার কোঁকড়া কালো চুল। ভাঙা জিনিসের টুকরো-টাকরা সাফ করতে গিয়ে কিংবা টেবিলের ওপর ডিশ রাখবার অছিলায় মাত্রিয়োনা প্রত্যেক বারই ওকে ঘেঁষে চলে যাচ্ছে বাহু দিয়ে, স্তন দিয়ে। কিন্তু এক কঠিন মৌন বজায় রেখেছে সেমিয়ন, মাথা পর্যন্ত তুলছে না সে।

হঠাৎ আলেক্সি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল জানলার কাছে। নখ দিয়ে কাঁচের ওপর টোকা মারতে লাগল সে, তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। সন্ধ্যার নীরবতায় এখন পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল একটা দীর্ঘ বন্য আর্তচীৎকার। মাত্রিয়োনা ধপ্ করে একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল, দু' হাঁটুর মাঝে মোচড়াতে লাগলো হাতদুটো।

"ভাস্কা দিমেনতিয়েভকে চাবকাচ্ছে ওরা"—ধীরে ধীরে বলল আলেক্সি। "ওর খোঁজেই এসেছিল, ধরে নিয়ে গেছে প্রিন্সের বাড়িতে।"

"এই নিয়ে তিনজন হল।"—ফিস্ফিস্ করে বলল মাত্রিয়োনা।

তিনজনেই নীরবে কান পেতে রইল। আঁধার-ঘেরা গ্রামের সারা আকাশ বাতাস মথিত করছিল একটা তীব্র আর্তনাদ, আগের মতোই ভয় আর হতাশায় ভরা।

সেমিয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। চকিত গতিতে পাতলুনের বেল্ট্টা চেপে ধরে বেরিয়ে চলে গেল ভাইয়ের কামরায়। মাত্রিয়োনাও নিঃশব্দে দ্রুত অনুসরণ

করল তাকে। ততক্ষণে সেমিয়ন রাইফেলটা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিয়েছে। মাত্রিয়োনা দু' বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, মাথাটা পিছন থেকে হেলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পাথর হয়ে ঝুলে রইল সে সেমিয়নের গলা আঁকড়ে ধরে। সেমিয়ন তাকে সরাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মাটির মেঝেতে ঝুপ্ করে পড়ে গেল রাইফেল। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সেমিয়ন মাথা গুঁজলো বালিশে। মাত্রিয়োনা পাশে বসে ওর কর্কশ চুলে তাড়াতাড়ি হাত বুলোতে লাগল।

রক্ষীদের শক্তিতে আস্থা ছিল না নায়েব গ্রিগরি কার্লোভিচের, নতুন হেৎম্যান-পল্টন 'গাইদামাক'দের ওপরও তার ভরসা ছিল কম। তাই ভ্লাদিমিরস্কয়ে গ্রামে একটা পুরো গ্যারিসন মোতায়েন রাখবার জন্য বায়না ধরেছিল সে। জার্মানরাও এসব ব্যাপারে একটু ইতস্তত করে না; সঙ্গে সঙ্গে তারা দুটো পল্টন-বাহিনী পাঠিয়ে দিল—মেশিনগান সমেত তারা ঢুকলো এসে ভ্লাদিমিরস্কয়েতে।

গ্রামেই ঘাঁটি গেড়ে বসল সৈন্যদলটা। লোকের বিশ্বাস গ্রিগরি কার্লোভিচ নিজেই তাদের বলে দিয়েছিল কোন্ কোন্ বাড়িতে তাদের আস্তানা গাড়তে সুবিধে হবে। কিন্তু এ-গুজবের পেছনে সত্যি মিথ্যা যাই থাকুক, গত বছরে যে-সব চাষী প্রিন্সের মহলবাড়ি লুট করার ব্যাপারে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে এখন মাশুল দিতে হল ঃ একেক জন করে সৈন্য এবং একটা ঘোড়ার জন্য প্রত্যেককে ঘরে জায়গা দিতে হবে, তাদের ভরণপোষণ করতে হবে। জেলা কার্যকরী কমিটির যারা অদলীয় সদস্য ছিল তাদের ওপরও ওই একই হুকুম (তবে জার্মানরা এসে পড়ার আগেই তরুণ সদস্যদের দশজন গ্রাম ছেড়ে সরে পড়েছে)।

ক্রাসিল্নিকভরাও রেহাই পেল না। ভারিক্কি চেহারার একজন জার্মান সৈনিক কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে মাথায় হেলমেট পরে পুরো যুদ্ধসাজে এসে হাজির হল ওদের বাড়ির দরজায়। দুর্বোধ্য ভাষায় কী কতগুলো কথা বলে সে আলেক্সিকে দেখাল তার হুকুমনামা, ওর পিঠ চাপড়ে বলল ঃ

'গুট্ ফ্রয়েন্ড্...'

আলেক্সির কামরাটা দেয়া হল তাকে। ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ গুছিয়ে বসল লোকটা। বিছানায় পাতলো একটা ভাল কম্বল, দেয়ালে টাঙিয়ে দিল কাইজার উইল্হেল্মের ফটো। তারপর হুকুম করল মেঝেটাকে ঝাড়পোঁছ করে দেবার জন্য।

মাত্রিয়োনা যখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, লোকটা তার নোংরা পোশাক-আশাকগুলো এক জায়গায় জড়ো করে ওকে বলল পরিষ্কার করতে। "শ্মুৎসিক্—প্ফুই!" বলল সে : "বিট্টে হ্বাশেন্।" (নোংরা—সাফ করে দিও!) তারপর বেশ খুশি হয়েই বুট-শুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, চুরুট ধরালো একটা।

চুমরানো তির্যক গোঁফওয়ালা মোটা মানুষ। পোশাকটাও বেশ উঁচুদরের, আরামদায়ক। আর শুয়োরের মতোই খাই-খাই করে সবসময়। মাত্রিয়োনা যা

এনে দেয় তাই গপ্‌গপ্‌ করে গেলে। সবচেয়ে পছন্দ করে নোনা বেকন। একজন জার্মান এসে তার বেকনে ভাগ বসাবে এ মাত্রিয়োনা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না; কিন্তু আলেক্সি বলে : "যাক্‌ গে, ছেড়ে দাও! গিলুক আর পড়ে পড়ে ঘুমোক, অন্য ব্যাপারে নাক না গলালেই হল!"

অবসর সময়ে লোকটা সামরিক মার্চের শিস্‌ দেয়, কিংবা কিয়েভ-শহরের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে বাড়ির উদ্দেশে চিঠি লেখে। চমৎকার ব্যবহার, খালি একটু মাতব্বরি চালে পা দাপায় এই যা, নিজেকে বোধহয় ভাবে গোটা বাড়ির মালিক।

ক্রাসিল্‌নিকভরা এমনভাবে চলাফেরা করে যেন ঘরে একটা মৃতদেহ রয়েছে—নিঃশব্দে খেতে বসে, নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে ওঠে। আলেক্সি তো সব সময়ই গুম্‌ হয়ে থাকে, কপালে তার ভাঁজ পড়ে গেছে এর মধ্যে। মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়ায় মাত্রিয়োনা, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর গোপনে এপ্রনের প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মোছে। সবসময়ই তার ভয় এই বুঝি সেমিয়ন রাগে ফেটে পড়ে সংযম হারিয়ে বসে। কিন্তু এ ক'দিন সেমিয়ন যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে, মনে হয় যেন আপনাকে সে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

জেলা শাসনদপ্তরের বাড়ীর গায়ে আর খামারবাড়ীগুলোর ফটকে ফটকে আজকাল রোজই ঝুলতে দেখা যায় হেৎমান সাহেবের নতুন নতুন ফরমান। ওতে থাকে মালিকের কাছে গরুভেড়া ও জমি ফিরিয়ে দেবার হুকুম, জবরদখল ও আদায়ের হুমকি। কখনো বা বলা হয় বাধ্যতামূলকভাবে রুটি বিক্রির কথা। বিজ্ঞপ্তি থাকে : দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করলে কিংবা কমিউনিস্টদের সহায়তা করলে অথবা ওই রকম কিছু করলে নির্মম শাস্তি দেয়া হবে...।

চাষীরা বিজ্ঞপ্তি পড়ে বটে কিন্তু টুঁ শব্দটি করে না। নানা ধরনের অলক্ষুণে গুজব শোনা যেতে থাকে আজকাল—কোন্‌ গাঁয়ে নাকি জার্মান অশ্বারোহী সৈন্য-দের সঙ্গে নিয়ে একদল খরিদ্দার এসে জোর করে আ-ছাঁটা শস্য কেড়ে নিয়ে গেছে, বদলে যে-দাম তারা দিয়েছে বিদেশী কাগজের নোটে, মেয়েরা পর্যন্ত সে টাকা ছোঁয় না; অন্য একটা গাঁ থেকে নাকি অর্ধেক গরুভেড়া খেদিয়ে বের করে দিয়েছে তারা; আরেকটা গাঁ তারা এমনভাবে লুটে পুটে নিয়ে গেছে যে গাঁয়ের লোকদের না খেয়ে মরার অবস্থা।

চাষীরা রাত্তিরে গোপনে জড়ো হতে শুরু করে একেকটা জায়গায়—ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। সেখানে তারা নানাধরনের গুজব নিয়ে চর্চা করে, গজরায় ক্ষুব্ধভাবে। কী করা যেতে পারে? কোনো উপায় কি খুঁজে পাওয়া যাবে না? প্রচণ্ড আঘাত আজ নেমে এসেছে ওদের মাথায়, এমনভাবে দমিয়ে দিয়েছে ওদের যে নীরবে সবকিছু হজম করে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া ওদের আর কোনো গতি আছে বলে মনে হয় না।

খিড়কির আঙিনায়, নদীর পাড়ে, উইলোগাছের নীচে জটলা বসে গোপনে; সেমিয়নও যোগ দিতে শুরু করেছে ওদের সঙ্গে। কাঁধের ওপর কোটটি ফেলে

মাটিতে বসে, ধূমপান করে, কান পেতে শোনে ওদের কথা। মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে হয় লাফিয়ে উঠে কোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাইফেলটা শূন্যে তুলে ধরে চীৎকার করে ওঠে : 'কমরেডস্!'

কিন্তু কী লাভ হবে তাতে? খালি ভয় পেয়ে যাবে ওরা, হয়তো বা ঢলঢলে পাতলুন সামলাতে সামলাতে ছুটেই পালাবে সব।

একদিন পথে দেখা হয়ে গেল একটি লোকের সঙ্গে। সেমিয়নের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিল লোকটি। সেমিয়ন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় মৃদুস্বরে ডাকলো সে : "এই যে ভাই!"

সেমিয়ন চমকে উঠল। বন্ধু লোক তো ঠিক? না আর কিছু?

"কী চাই?" তেরছাভাবে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সেমিয়ন।

"আলেক্সির ভাই না তুমি?"

"হ্যাঁ, হলামই বা?"

"নিজের লোককে চিনতে পারছ না দেখছি...'কার্চ' জাহাজের নাবিক বন্ধুদের কথা ভুলে গেছ?"

"কোঝিন, তাই না?"

সেমিয়ন এবার সজোরে চেপে ধরল বন্ধুর হাতটি।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। চট্ করে আশে পাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে কোঝিন বলল :

"বন্দুকে করাত চালাতে লেগে গেছে নাকি সবাই?"

"না। এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ঝামেলা হয় নি।"

"তেজী জোয়ান ছোকরা-টোকরা আছে তোমাদের এদিকে?"

"কে জানে! আমি তো এখন পর্যন্ত কাউকে দেখলাম না। কিছুদিন সবুর করলেই টের পাওয়া যাবে।"

"কী করছ তোমরা বল তো?"—কোঝিন বলল। অনবরত এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল সে। গোধূলির আলোয় ফুটে-ওঠা দূরের অস্পষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে কি যেন উঁকি দিয়ে খুঁজতে থাকে। বলে : "কিছু ভেবে ঠিক করেছ তোমরা? বোকা হাঁসের মতো শেয়ালের খপ্পরে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছ মনে হচ্ছে। উস্পেন্স্কয়ের খবর রাখো? আমার বাড়ী তো সেখানে। কামানের গোলায় সেখানকার একটা জিনিসও আস্ত নেই তা জানো? মেয়েরা আর কাচ্চাবাচ্চারা সবাই পালিয়ে গেছে কোথায়, পুরুষরা আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে।...ফিওদরোভ্কা, গুলিয়াই-পালিয়ে সব জায়গা ছেড়ে লোকজন পালিয়েছে, সবাই আসছে আমাদের কাছে..."

"'আমাদের'—মানে?"

"দিব্রিভ্স্কি বন জানো তো? ওখানেই আমাদের মিলবার জায়গা।...তা, বেশ কথা...তোমার আর আর সব যারা আছে গোপনে তাদের কানে পৌঁছে দাও খবরটা : ভ্লাদিমিরস্কয়ে গ্রাম থেকে আমরা চাই চল্লিশটা করাতে-কাটা রাইফেল,

কার্তুজ সমেত দশটা রাইফেল, আর যতো পারো হাতবোমা।...সব জিনিসই লুকিয়ে রাখতে হবে খড়ের গাদার নিচে, খেতের মধ্যে। বুঝেছ তো কথাটা? সস্‌নভ্‌কাতেও ওরা অমনি লুকিয়ে রেখেছে খড়ের গাদার মধ্যে। ওখানকার ছেলেরা শুধু অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।...গুন্দায়েভ্‌কায় তিরিশজন চাষী ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমরা এবার রওনা হবো।"

"কোথায় যাবে তোমরা? কার কাছে?"

"আতামানের কাছে...লোকটার নাম শ্‌খুস্‌। সারা একাতেরিনোস্লাভ এলাকা জুড়ে আমরা ছোট ছোট ফৌজী দল তৈরি করছি। গত হপ্তায় গাইদামাক-গুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা কাছারি-বাড়িতে আগুন অবধি লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ...সে এক ভারি মজার ব্যাপার ভাই! শরাপ আর চিনি যা ছিল সব বিনে পয়সায় বেঁটে দিয়েছিলাম চাষীদের মধ্যে।...যা হোক, মনে থাকে যেন, এক হপ্তা বাদেই ফিরে আসছি আমি!'

সেমিয়নের দিকে চোখ টিপে ইশারা জানিয়ে সে ওয়াট্‌ল-লতার বেড়াটা টপ্‌কে চলে গেল, তারপর মাথা নিচু করে দৌড়োতে লাগল নলখাগড়ার বনের দিকে। ব্যাঙের দল তখন জোরগলায় ডাকাডাকি করছে সেখানে।

আতামানদের কথা, এদিক-সেদিক দু'একটা হামলার কথা এর আগেও ভ্ল্যাদিমিরস্কয়ে গ্রামে এসে পৌঁচেছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাসই করতে চায়নি এসব খবর। আজ কিন্তু জলজ্যান্ত একজন সাক্ষীর দেখা পেয়েছে সেমিয়ন। সেদিনই সন্ধ্যের সময় ভাইয়ের কাছে সে সব কথা খুলে বলল। গম্ভীর মুখে আলেক্সি শুনে গেল তার কথা। তারপর বলল :

"আতামানের নামটা কি?"

"শ্‌খুস্‌—বলল তো সে।"

"এর নামটা তো বাবা শুনিনি কোনোদিন। নেস্তর ইভানোভিচ্‌ মাখ্‌নোর দলে শুনেছি নাকি পঁচিশজন বেপরোয়া শয়তান আছে যারা জমিদার-বাড়িগুলোর ওপর হামলা করে বেড়ায়। কিন্তু শ্‌খুসের নাম তো কোনোদিন শুনিনি। হবেও বা—মুঝিকদের তো আজকাল কোনো কাজই করতে বাধে না। সে যাই হোক—শ্‌খুস্‌ই হোক আর যেই হোক, উদ্দেশ্যটা ভাল।...কিন্তু সেমিয়ন, মুঝিকদের কারুর কাছে ব্যাপারটা এখনই ফাঁস কোরো না যেন। সময় হলে যা বলবার তা আমি নিজেই বলব ওদের।"

সেমিয়ন হেসে কাঁধটা ঝাঁকালো।

"হ্যাঁ, সময় আর তোমার হয়েছে! হাড়মাস যখন আলাদা করে ছাড়বে ওরা, তখনও সবুর করেই কাটাবে।"

একা সেমিয়নের সঙ্গেই যে কোঝিনের মোলাকাত হয়নি সে ব্যাপারটা পরিষ্কার। করাতে-কাটা বন্দুক, হাতবোমা, আতামান দলগুলোর সম্পর্কে কানা-ঘুষা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। রাতে কান খাড়া করে রাখলে শোনা যায় খামার-বাড়িগুলোর পেছনের আঙিনায় উকো ঘষার ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ শব্দ। তা ছাড়া এমনিতে

কিন্তু সব চুপচাপ। জার্মানরা শৃংখলা পর্যন্ত কায়েম করেছে, হুকুম জারি করেছে—প্রতি শনিবার রাতে গ্রামের রাস্তা সাফ করতে হবে। কেউ আপত্তি তোলে না, রাস্তায়ও নিয়মিত ঝাড়ু পড়ে।

এর পরেই অবশ্য দুর্ভাগ্যের শুরু। একদিন খুব ভোর থাকতেই বুকে ব্যাজ-আঁটা একদল পুলিশ আর সেপাই ঝাঁট-দেওয়া পরিষ্কার রাস্তায় নেমে পড়ে। গরুঘোড়াগুলোকে তখনো জলার ধারে নিয়ে যাবার সময় হয় নি। বাড়িগুলোর জানলার শার্সিতে ঘা দিয়ে হাঁক পাড়ে ওরা :

"বেরিয়ে আয় বাইরে!"

খালি পায়ে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে চাষীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে ফটকের বাইরে। তাদের হাতে সেপাইরা গুঁজে দেয় সরকারী নোটিশ : 'অমুক খামার হইতে এতৎপরিমাণ শস্য, তুলা, চর্বি ও ডিম জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, পরিবর্তে তাহাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাইখ-মুদ্রা দেওয়া হইবে।' চৌমাথায় এর মধ্যেই এক সারি ফৌজী গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে—গির্জার ঠিক সামনে। যে-সব জার্মান অতিথিদের জন্য চাষীদের ঘরে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের দেখা গেল হাসিমুখে মাথায় হেলমেট চড়িয়ে দরজায় দরজায় রাইফেল হাতে খাড়া। চাষীরা মাথা চুলকোতে লাগল। কেউ কেউ বলল তাদের ভাঁড়ার একেবারে শূন্য। কেউ কেউ মাটিতে টুপি ছুঁড়ে দিয়ে বলল :

"ভগবান সাক্ষী, একটি দানাও নেই ঘরে। একেবারে শূন্য! আমাদের টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেললেও কিচ্ছুটি পাব না।"

এবার রাস্তায় দেখা গেল স্বয়ং নায়েবকে—এক্কাগাড়ি ছুটিয়ে আসছে সে।

চাষীরা সৈন্যদের কিংবা পুলিশদের তেমন ভয় করেনা যতোটা ভয় করে এই সোনার রীমওয়ালা চশমাজোড়াকে—গ্রিগরি কার্লোভিচ্ জানে সবকিছু, দেখে সবকিছু।

ঘোড়ার রাশ টানলো সে। পুলিশের সার্জেন্ট এসে দাঁড়াল এক্কাগাড়িটার কাছে। দু'জনে কথাবার্তা হল খানিকক্ষণ। তারপর পুলিশ-অফিসার খেঁকিয়ে উঠে কী যেন হুকুম করল পুলিশদের উদ্দেশে। সামনের আঙিনাটার মধ্যে ঢুকে সংগে সংগে তারা গোবরের গাদার তলা থেকে উদ্ধার করল শস্য। খামারের মালিকের আকুল আর্তনাদ শুনে ঝক্‌মক্ করে উঠল গ্রিগরি কার্লোভিচের চশমাজোড়া।

আলেক্সি তার বাড়ির উঠোনে পায়চারি করছিল। এমন বিমূঢ় হয়ে গেছে সে যে দেখলে কষ্ট হয়। মাত্রিয়োনা চোখে রুমাল ঢেকে কাঁদছিল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

"কী করব আমি ওদের টাকা দিয়ে, ওদের মার্ক কোন্ কাজে লাগবে আমার?" —চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সি। মাঝে মাঝে মাটি থেকে এক-আধটা কাঠের টুকরো কিংবা চাকার খণ্ড তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল সে বেড়ার কাছে গজিয়ে-ওঠা কাঁটাগাছ-গুলোর মধ্যে। একটা মোরগ দেখে মাটিতে পা দাপালো একবার, গালাগাল ঝাড়তে লাগলো সেটাকে উদ্দেশ করে। ভাঁড়ার ঘরের দরজার কুলুপটা একবার ঝাঁকুনি

দিয়ে পরখ করল। "কী খাবো তাহলে আমরা? ওদের ওই মার্ক্? মানে ওরা ঠিক করেছে আমাদের সবাইকে একেবারে পথের ভিখারি বানিয়ে ছাড়বে! একেবারে সাবাড় করবে আমাদের! আবার ঠেলে দেবে জোয়ালের দিকে, তাই ভেবেছে ওরা!"

মাত্রিয়োনার পাশেই বসে ছিল সেমিয়ন। বলল :

"দেখছ কি, আরো খারাপ হবে দিনে দিনে...তোমার সাধের ঘোড়াটাও কেড়ে নেবে ওরা।"

"না, না, তা নেবে না নিশ্চয়! নেবার চেষ্টা করলে আমিও কুড়োল চালাবো!"

"কিন্তু বড়ো দেরি করে ফেলেছ যে, বড্ড দেরি।"

হু-হু করে কাঁদছিল মাত্রিয়োনা : "দাঁত দিয়ে শয়তানগুলোর টুঁটি কামড়ে ধরব!" কে যেন দরজার ওপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঘা মারলো। স্থূলবপু জার্মান অতিথিটি এসে ঢুকলো, তেমনি ধীরশান্ত, ফুর্তিবাজ চেহারা, চলাফেরার মধ্যে জড়তা নেই, যেন নিজের বাড়িতেই রয়েছে। লোকটির পেছন পেছন এল ছ'জন সেপাই আর একজন সাধারণ বে-সামরিক লোক, মাথায় কর্মচারীদের মতো ত্রিশূল-চিহ্নিত টুপি (ত্রিশূলটা হল হেৎমানের প্রতীক-চিহ্ন), সঙ্গে বগলদাবা করা রেজিস্টারী বই একখানা।

গোলাঘরটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে জার্মানটি বলল : "প্রচুর জিনিস রয়েছে এখানে। চর্বি, বেকন..."

আলেক্সি কটমট করে একবার তাকাল লোকটার দিকে, তারপর খানিকটা পেছনে হটে এসে মরচে-ধরা প্রকান্ড চাবিখানা গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিলো হেৎমানের কেরানিটির পায়ের কাছে।

কেরানিটি চেঁচিয়ে বলল, "সাবধান, এই হতভাগা শুয়োর! ডান্ডা খেতে চাস্ নাকি কুত্তীর বাচ্চা?"

মাত্রিয়োনাকে কনুই দিয়ে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সেমিয়ন ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল দরজা পেরিয়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেয়নেটের একটা চওড়া ফলা এসে তার বুকের সামনে রুখে দাঁড়াল।

"থাম্ বলছি!" জার্মানটা হুকুমের সুরে রুক্ষভাবে খেঁকিয়ে উঠল, "ফিরে যা, রুশের বাচ্চা!"

সারাদিন ধরে বোঝাই হল মিলিটারী গাড়িগুলো, তারপর রাত বেশ গভীর হয়ে আসার পর বিদায় নিল তারা। গ্রামটাকে আগাগোড়া ঝেঁটিয়ে সাফ করেছে। বাতি জ্বলেনি কারুর ঘরে, রাতের খাওয়া পর্যন্ত হয়নি কারুর। কুটিরের অন্ধকারে বসে মেয়েরা বিলাপ করছে, হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকাচ্ছে তারা কাগজের মার্ক-গুলো নিয়ে।

এই জার্মান মার্ক পকেটে নিয়ে শহরে গেলে গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষদের কোন্ ইষ্টটা যে লাভ হবে কে জানে? গিয়ে দেখবে সব দোকান ফাঁকা—না পাওয়া যায় একগজ কাপড়, না এক টুকরো চামড়া, এমন-কি সামান্য একটা পেরেক পর্যন্ত নয়।

কারখানাগুলো স্তব্ধ। শস্য, চিনি, সাবান,—সবই ট্রেন বোঝাই হয়ে চলে গেছে জার্মানিতে। শৌখিন পিয়ানো, পুরনো ডাচ ছবির ক্যানভাস কিংবা চীনা চা-পাত্র দিয়ে কী করবে মুঝিক-দম্পতি? বড়ো জোর ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে গাইদামাকদের কপালের চুলের গোছা, তাদের ঝুলে-পড়া গোঁফ, নীল ঢিলে জামা আর চুড়োওয়ালা ফারের টুপিগুলো। আর সদর রাস্তায় ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করবে নীল-চোয়ালওয়ালা বোলার-টুপিপরা ফাটকা কারবারী কিংবা টাকা লেন-দেনের ব্যাপারীদের সঙ্গে। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ীর পথ ধরবে, যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে যাবে তারা। কিন্তু ফিরতি পথেই বা রেহাই কোথায়? প্রথম কুড়ি মাইল পেরিয়ে এসেই ট্রেনের চাকার দাঁড় অতিরিক্ত তেতে উঠে ট্রেন যাবে অচল হয়ে। এদিকে মেশিনের তেলও নেই যে ফের চালু করা যাবে, কারণ জার্মানরা একদম শুষে নিয়ে গেছে সবকিছু। বালি ছিটিয়ে দিয়ে আবার চালানো হবে বটে, কিন্তু আবারও থেমে যাবে চাকার দাঁড়ের উত্তাপ অতিরিক্ত বেড়ে যাবার ফলে।

রাইখ-মার্কগুলো হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে মেয়েরা যে কাঁদছে তার কারণই হল এই, আর এই একই কারণে পুরুষরাও জংলা জলা-জায়গায় লুকিয়ে রাখছে গরুভেড়ার পাল, এমন সব জায়গায় যেখানে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই—কে জানে কাল সকালে আবার হয়তো কোন্ নতুন নোটিশ ঝুলতে দেখা যাবে!

গ্রামে আলোর চিহ্ন নেই। সমস্ত ঘরগুলো আঁধার। কিন্তু ঝাড়জঙ্গলের ওধারে হ্রদটার ওই পারে বড়ো মহলবাড়িটার জানলার জ্বলজ্বল করছে আলো। জার্মান অফিসারদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করেছে নায়েব। সামরিক সঙ্গীতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে জার্মান ওঅলট্‌স্ নাচের সুর অন্ধকার গ্রামখানির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল বিভীষিকা জাগিয়ে। জ্বলন্ত সুতোর মতো একটা হাউই উঠে গেল আকাশের অনেক উঁচুতে—জার্মান সৈনিকদের খুশি করবার জন্য এই ব্যবস্থা! ওরা তখন মহলবাড়িটার খোলা আঙিনায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে, বীয়ারের একটা পিপে বের করে আনা হয়েছে ওদেরই জন্য। জ্বলন্ত সুতোটা ফেটে পড়ল তারার ফুলঝুরি হয়ে—মন্থরগতিতে সেগুলো নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে খড়ের চালাঘর, ফলবাগান, উইলোগাছ, সাদা ঘণ্টাঘরটা আর ওয়াট্‌ল্-লতার বেড়াগুলো আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অসংখ্য বিষণ্ণ মুখও ফিরে তাকিয়েছে এই সময় হাউইয়ের তারাগুলোর দিকে। এমনই উজ্জ্বল তাদের আলো যে সে মুখগুলোর প্রত্যেকটি ক্রুদ্ধ কুঞ্চনরেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কোনো অদৃশ্য ক্যামেরা দিয়ে হয়তো কেউ এমন একটি মুহূর্তে তাদের রোষদীপ্ত মুখ-মণ্ডলের ছবি তুলে রাখতে পারতো—আর সে ছবি জার্মান-জেনারেলদের হাতে পড়লে মস্তিষ্ক কণ্ডূয়নের যথেষ্ট খোরাকও মিলতো তাদের।

গ্রামের মাইলখানেক দূরে ক্ষেতগুলো অবধি যেন দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দু'একজন লোককে দেখা গেল নির্জন খড়ের গাদাটার কাছে চুপি-সারে এগিয়ে যেতে। চট্ করে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। একজন শুধু খড়ের

গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ থেকে ঝরে পড়া আলোগুলোর দিকে মাথা উঁচিয়ে দেখে সে হেসে বলল ঃ

"ঐ যে, দেখ দেখ!"

মাটিতে পৌঁছবার আগেই নিবে গেল আলোর ফুল্‌কিগুলো। আবার সূচীভেদ্য অন্ধকার। খড়ের গাদার আশেপাশে যারা ছিল সবাই এক জায়গায় এসে জড়ো হল। মাটিতে রাখবার সময় ওদের রাইফেলগুলো খট্‌খট্‌ করে উঠল।

"সবশুদ্ধ কতোগুলো?"

"দশটা করাত-চালানো বন্দুক, আর চারটে রাইফেল, কমরেড কোঝিন!"

"এই কটা মাত্র?"

"সময়ই পাওয়া গেল না, কি করব? কাল রাতে আরো কিছু নিয়ে আসব।"

"আর কার্তুজগুলো কোথায়?"

"এই যে রয়েছে আমাদের পকেটে। অনেকগুলো কার্তুজ।"

"তাহলে খড়ের গাদার নিচে লুকিয়ে রাখো জিনিসগুলো। হাতবোমা চাই, বুঝলে?" হাতবোমা নিয়ে এসো!......করাত-কাটা বন্দুকগুলো তো বুড়োদের জন্য, যারা ঝোপের আড়ালে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে! একবার গুলি চালিয়েই ব্যস্‌ পাৎলুন ভিজিয়ে একাকার। ছোকরা লড়িয়েদের জন্য চাই রাইফেল, তার চেয়েও বেশি দরকার হাতবোমা, বুঝেছ কথাটা? আর যারা তলোয়ার চালাতে জানে তাদের জন্য তলোয়ার। ঐ হল সব অস্তরের সেরা অস্তর।'

"আজ রাতেই আমরা শুরু করতে পারতাম, কমরেড কোঝিন। আমার জানের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি আজই ছিল সুয়োগ!"

"সারা গ্রামটাকে আজ জাগিয়ে দিতে পারা যেত...এমন রাগ জমা হয়ে আছে লোকের!...আমাদের একেবারে কলজের খুন শুষে নিয়েছে, দেখেছিস্‌...চল্‌ এই খুরপি কাস্তে নিয়েই সাবাড় করি ওদের, বন্দুক কামানের দরকার নেই।......ওরা এখন ঘুমে অচেতন, উঃ এমন সোজা হত কাজটা যে কী বলব!..."

"বলি কম্যাণ্ডারটি কে?—তুমি?" চাঁছা গলায় বলল কোঝিন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সে। আবার যখন মুখ খুলল, গলার স্বরটা প্রথমে নরম আর বিদ্রূপভরা হলেও ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠতে লাগল ঃ

"এখানে কম্যাণ্ডার কে শুনি? জানতে দেবে দয়া করে?...আমি কি এতক্ষণ তাহলে গর্দভদের সঙ্গে কথা বলেছি, জিজ্ঞেস করি?......তাহলে এখনই আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা জার্মান আর গাইদামাকদের হাতে মরো, লুটে নিক সব ওরা!" (একরাশ অশ্লীল গালাগাল বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে) "তোমাদের কি কোনো শৃঙ্খলাই নেই? এই এক কারণে কতো মাথা নিজের হাতে লুটিয়ে দিয়েছি জান? ফৌজী দলে যখন যোগ দিয়েছ তখন পুরোদস্তুর আতামানের বাধ্য হয়ে থাকার শপথ নিতে হবে—কোনো শর্তটর্ত নেই এতে। আর নয় তো থেকে যাও পেছনে। গান করো, ফুর্তি করো, কিন্তু আতামান যেই বলবেন 'চালাও ঘোড়া!'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সব কিছু ভুলে গিয়ে লেগে পড়তে হবে—এই হল নিয়ম। বুঝতে পেরেছ?" (চুপ করে গেল সে। শেষের কথাগুলো কঠোর শোনালেও আগের চেয়ে বেশি তোয়াজের সুর এসেছে গলায়) "জার্মানদের ঘাঁটাবার সময় এখনো হয় নি, আজ তো নয়ই, আগামীকালও নয়। এ কাজের জন্য রীতিমত শক্তির দরকার।"

"কমরেড কোঝিন, একবার যদি শুধু গ্রিগরি কার্লোভিচকে হাতে পেতাম—এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেয় না হতভাগা।"

"নায়েবটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো, কিন্তু এক হপ্তার আগে নয়; তাহলে আর আমার পক্ষে চালানো সম্ভব হবে না তা আমি বলেই দিচ্ছি। এই তো সেদিন একটা জার্মান সৈন্য ওসিপকভার একটি মেয়েকে বলাৎকার করেছিল। বেশ ভাল কথা। মেয়েটি কী করল জান? এক মুঠো সূঁচ ভরে রাখলো জার্মানটির মাংসের কাবাবের মধ্যে। এক কামড় খেয়েছে হতচ্ছাড়াটা, আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিল ছেড়ে দৌড়। একেবারে রাস্তায় গিয়ে সেই যে কাত হয়ে পড়ল আর উঠল না ইহজন্মে। মেয়েটাকে সঙ্গে সঙ্গে সাবাড় করে দিল জার্মানরা। মুঝিকরা খুঁজতে বেরুলো দা-কুড়োল!...কিন্তু জার্মানরা তারপর যা করল ভাবতেও শিউরে উঠেছি।...এখন আর ওসিপভ্কা গ্রামের চিহ্নও খুঁজে পাবে না। শুধু নিজের মগজের ওপর ভরসা করে আগে থেকে মতলব না ঠিক করে কাজ করলে ওই রকমই হয়। এক, দুই, তিন। ব্যস্—সব শেষ! তাই না?"

বিছানায় শুয়ে মাত্রিয়োনা খালি উশ্খুশ্ করছিল আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল। ভোর হয় হয়, মোরগ ডাকতে শুরু করেছে। খোলা জানলার চৌকাঠের নীচে শিশির জমেছে। একটা মশা ভন্-ভন্ করে বেড়াচ্ছে। চুল্লীর ওপরে বেড়ালটা জেগে উঠল, নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ে ঘরের কোণে জড়ো-করা আবর্জনার কাছে গিয়ে কি শুঁকতে লাগল।

দু'ভাই টেবিলের পাশে বসে চাপা গলায় কী কথাবার্তা বলছিল। হাতের মুঠোর ওপর থুতনি রেখে বসেছিল সেমিয়ন, আর আলেক্সি একদম ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে যেন নিরীক্ষণ করছিল তাকে।

"আমি পারব না, সেমিয়ন। সত্যি বলছি ভাই। মাত্রিয়োনা একা-একা কিছুতেই চালিয়ে নিতে পারবে না। কত বছর ধরে গায়ে খেটে এত সব জমিয়েছি—তার আজ কী করে ছেড়ে যাব বল? সবই শেষ হয়ে যাবে তাহলে। খালি ঠকঠকে উঠোনটা ছাড়া আর কিছুই পাব না ফিরে এসে।"

"তুমি বলছ ছেড়ে যেতে পারবে না, কিন্তু যদিই বা হারাও তাতে কী এমন ক্ষতি? আমরা যদি জিতি তাহলে পাকা বাড়ি তুলব যে।" (হাসলো সে) "আমরা এখন চাই গেরিলা লড়াই, আর এদিকে তুমি কিনা খামার আঁকড়ে পড়ে আছ?"

"কে তোমাদের মুখের গ্রাস জোগাবে বলতে পারো?"

"আমাদের তো তুমি খাওয়াচ্ছে না মোটের ওপর? তুমি তো অন্ন জোগাচ্ছ জার্মানদের, হেৎমান আর যতো সব শুয়োরগুলোর জন্য।...তুমি হচ্ছ ওদের গোলাম..."

"সবুর, এক মিনিট। সতেরো সালে কি বিপ্লবের জন্য লড়াই করি নি আমি? সৈনিক-কমিটিতে কি আমি নির্বাচিত হইনি? সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে কি আমিও ভাঙন ধরাই নি? আহা! সেমিয়ন, অমন ঝট্‌পট্ করে গালাগাল ঝেড়ে দিলে আমার ওপর? এমন কি এখনও যদি লাল ফৌজ এসে পড়ে তো আমিই প্রথম রাইফেল নিয়ে এসে যোগ দেব। কিন্তু জঙ্গলে এক আতামানের খোঁজে গিয়ে আমার লাভ কি হবে বল?"

"এই সময়টায় আতামানদের কাজে লাগানো যায়।"

"তা—হয়তো যায়।"

"আমার এই বিচ্ছিরি জখমটাই তো আমাকে বসিয়ে দিয়েছে একদম।"—টেবিলের ওপর বাহুটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল সে—"আমার দুর্ভাগ্য, নইলে আর...... আমাদের সেই কৃষ্ণসাগরীয় নাবিকছেলেরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে অনেকে এই সব ফৌজী দলগুলোতে। শুধু একটু সময়ের অপেক্ষা, দেখবে সারা উক্রেইন জ্বলে উঠবে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।"

"কোঝিনের সাথে আবার দেখা টেখা হল?"

"হয়েছে বৈকি।"

"কী বলে সে?"

"শিগগীরই তোমাদের গ্রামখানা জ্বালাবার ব্যবস্থা করছি।"

আলেক্সি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে। মুখখানা পাংশু হয়ে গেছে।

"তাই তো হওয়া উচিত। ওই হতচ্ছাড়া মহলবাড়িটা দু চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছে।...যতক্ষণ গ্রিগরি কার্লোভিচটা বেঁচে আছে কারো শান্তি নেই।..."

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল মাত্রিয়োনা। ওদের দিকে এগিয়ে গেল শেমিজের ওপর শুধু একখানা গোলাপ-ফুলের নক্‌শা-আঁকা শাল ঢেকে নিয়ে। টেবিলের ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে টোকা মেরে সে বলল—

"আমার যা সম্বল তাও কেড়ে নিচ্ছে শয়তানরা—আমি সহ্য করব না! তোমাদের আগেই আমরা মেয়েরা ওদের শায়েস্তা করব তা জেনো!"

সেমিয়ন বিস্মিত আনন্দে চেয়ে থাকলো ওর দিকে।

"তা তোমরা মেয়েরা লড়বে কেমন করে শুনি?"

"মেয়েদের মতোই লড়ব, আবার কি! যখন খেতে বসবে ওরা—দেব আর্সেনিক। কয়েকটাকে তো সাবাড় করব? তারপর একটাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাব খড়ের গাদার কাছে কিংবা বাথরুমে—সেলাইয়ের সূঁচ তো আছে আমার? বিঁধে দেব একেবারে মোক্ষম জায়গায়—টুঁ শব্দটি বের হবে না বাছাধনের গলা দিয়ে। কি করতে হবে আমরাই জানি—তোমাদের অমন ঘাবড়াবার কিছু নেই!

আর যদি নেহাতই তেমন দরকার পড়ে তবে তোমাদের মতোই রাইফেল কাঁধে তুলে নেব।..."

সেমিয়ন মেঝেতে পা দাপিয়ে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল।

"ছুঁড়ির কি তেজ দেখেছ? হায় ভগবান!"

"যাও!"

বাতাসে শাল উড়িয়ে মাত্রিয়োনা দরজার কাছে ছুটে গেল, নগ্ন পা দুখানি বুটের মধ্যে চালান করে দিয়ে দুমদাম করে হেঁটে বেড়ালো খানিক, তারপর চলে গেল বাইরে—গাইগরু তদারক করবার জন্যই নিশ্চয়। মাথা নেড়ে নেড়ে কেবলই হাসছিল সেমিয়ন ও আলেক্সি আর খালি বলছিল ঃ "ছুঁড়িটাকে দেখলে?—রীতিমত একটি আতামান!"

ভোর হবার ঠিক আগেই যে-বাতাসটা বইতে থাকে আজ তা খোলা জানলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে, রবার গাছের পাতাগুলোকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো কথা আর বিদেশী গানের কলিও ভেসে আসছে সে-বাতাসে। ওদের সেই জার্মান অতিথিটি, জমিদার-বাড়ি থেকে ফিরছে মাতাল হয়ে আর রাজ্যের ধুলো ছড়াচ্ছে বুটের গুঁতোয়। রাগে জানলা বন্ধ করে দেয় আলেক্সি।

"ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছ না কেন, সেমিয়ন?"

"ভয় পেলে নাকি?"

"ওই মাতাল শয়তানটা কোথায় কি গোল বাধিয়ে বসে, ঠিক আছে? তুমি ওকে সেদিন মারতে গিয়েছিলে সে কথা ও ভোলেনি।"

"আবার একদিন গিয়ে বসিয়ে দেব।" সেমিয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন নিজের ঘরের দিকেই যাবে সে। "আলেক্সি! আলেক্সি, তোমাকে ঠেলে তোলা এত কঠিন বলেই বোধ হয় বিপ্লবটা ধ্বসে যাচ্ছে...কর্নিলভকে দেখেও কি যথেষ্ট আক্কেল হয়নি? গাইদামাক আর জার্মানগুলোকে দেখেও কি তোমার সাধ মেটেনি? এর পরেও তুমি আর কি চাও বল তো?" (হঠাৎ তার গলার স্বর পাল্টে গেল) "কি হল ওখানে?"

উঠোনের দিক থেকে ভেসে এল একটা চাপা বিড়বিড়ানি আর সেই সঙ্গে একজোড়া বুটের এলোমেলোভাবে চলে বেড়াবার আওয়াজ। একটি স্ত্রীলোকের রুদ্ধ গলা শোনা গেল ঃ "ছেড়ে দাও বলছি!" তারপরেই ধ্বস্তাধ্বস্তি আর ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ! এবার আরো তীব্রকণ্ঠে যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল মাত্রিয়োনা, "সেমিয়ন, সেমিয়ন!"

সেমিয়ন ধনুকের মতো বাঁকা পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল ঘরের বাইরে। আলেক্সি দাঁড়িয়েই থাকলো নিজের জায়গায়, বেঞ্চিটা আঁকড়ে ধরে। মানুষ ক্ষেপে গেলে তার যে কী অবস্থা হয় তা সে জানে। কাল দরজার কাছে কুড়ুলটা রেখে দিয়েছিলাম—ওই সেটা কাজে লাগাবে, ভাবল আলেক্সি। বাইরের উঠোনে সেমিয়নের রুদ্ধ বন্য চীৎকার শোনা গেল। তারপরেই এল একটা আঘাতের শব্দ, হিস্‌হিসিয়ে উঠল কে যেন, গলায় ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হতে থাকল, তারপর ঝুপ্‌ করে কি একটা ভারি জিনিস পড়ে গেল মাটিতে।

মাত্রিয়োনা ঢ্কলো এসে ঘরে। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে ম্খখানা। মাটিতে ছে'চড়াচ্ছে শালটা। চুল্লীতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো সে, ব্কটা প্রচণ্ডভাবে ওঠা-নামা করছে। হঠাৎ ম্খের সামনে হাতটা নাড়ল সে, যেন সইতে পারছে না আলেক্সির দ্ষ্টি।

সেমিয়ন এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। ফ্যাকাশে চেহারা, চাঞ্চল্য নেই।

"একট্ সাহায্য করো দাদা", বলল সে, "ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দিতে হবে।..."

॥ পাঁচ ॥

জার্মান বাহিনী দন নদী আর আজভ সাগরের তীর পর্যন্ত এসে থেমে পড়ে। বিরাট এক এলাকা দখল করে বসেছে তারা। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা এই বিশাল অঞ্চলটি গোটা জার্মানির চেয়েও বড়ো। উক্রেইনের মতো দন অঞ্চলেও জার্মান বড়োকর্তারা রাজনৈতিক জীবনে নাক গলাতে একটুও দেরি করেনি,—বড়ো বড়ো খামারের মালিকদের সহায়তা করতে লাগলো তারা, উৎসাহ দিতে লাগলো হোমরাচোমরা কসাকদের। বছর চারেক মাত্র আগে এই কসাকরাই জাঁক করে বলত যে তারা বার্লিন আক্রমণ করে দখল করবে। গাঁট্টাগোট্টা চওড়া-মুখ লাল ডোরাকাটা পাৎলুন-আঁটা এই কসাক-পুংগবরাই এক সময় ছিল লোহার ছাঁচে গড়া দুর্দান্ত সবল মানুষ, আর এখন তারা পরিণত হয়েছে নিরীহ মেষ-শাবকে !!

রস্তভে জার্মানরা সবে পোঁচেছে কি পোঁছয়নি, এমন সময় আতামান-সেনাপতি পোপভের অধিনায়কত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল কসাক ফৌজ দনের রাজধানী নভোচেরকাস্ক্ শহর আক্রমণ করে বসল। দনের অববাহিকার উঁচু মালভূমি জুড়ে শুরু হল রক্তারক্তি লড়াই। নভোচেরকাস্ক্ গ্যারিসনের লাল কসাকদের মদত দেবার জন্য রস্তভ থেকে ছুটে এল বলশেভিক ফৌজ। মনে হল লড়াইয়ে আজ এরাই জয়ী হবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এক অদ্ভুত ঘটনায় লড়াইয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেল।

কর্নেল দ্রজ্‌দভ্‌স্কির নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার বাহিনীর একটা ফৌজীদল অভিযান শুরু করেছিল রুমানিয়া থেকে। বাইশে এপ্রিল তারিখে অপ্রত্যাশিত-ভাবে তারা রস্তভ শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যে অবধি শহরটা তারা হাতে রেখেছিল বটে কিন্তু তারপরে তারা মার খেয়ে হঠে গেল। কর্নিলভের ফৌজের খোঁজে তারা সারা স্তেপ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। পথেই (পঁচিশে এপ্রিল তারিখে) নভোচেরকাস্‌ক্‌-এর শহরতলী থেকে তারা শুনতে পেল লড়াইয়ের আওয়াজ। কে লড়াই করছে, কেন লড়াই করছে সে-সব কিছু বিচার না করেই তারা শহরের দিকে মোড় ঘুরল, সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে একদম এসে ঢুকে পড়ল লাল রিজার্ভ সৈন্যদের মধ্যে। সেখানে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল তারা। ওদিকে দন কসাকরা ভাবল উপরের দিক থেকে বুঝি তাদেরই সাহায্য এল। তাই তারাও শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। লাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হটিয়ে দিল তারা। ভলান্টিয়াররা দখল করল নভোচেরকাস্ক। বিপ্লবী কমিটির ক্ষমতা হস্তগত করল 'দন-ত্রাতা' সমিতি। তারপর এল জার্মানরা।

জার্মানদেরই সৌজন্যে 'দন-ত্রাতা'দের দল আতামানের শাসনদণ্ড তুলে দিল

জেনারেল ক্রাস্নভের হাতে,—নভোচেরকাস্কে যে এক গ্যারিসন সৈন্য রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়, এটুকু কাণ্ডজ্ঞান জার্মানদের ছিল। জেনারেল ক্রাস্নভ নিজেকে 'সম্রাট উইলহেল্মের ব্যক্তিগত বন্ধু' আখ্যা দিয়ে বিলক্ষণই আনন্দ পেতেন। মহা উৎসাহে আবার বাজতে শুরু করল ক্যাথিড্রালের ঘণ্টা। গির্জার ঠিক সামনেই পাথর-নুড়ি বসানো চত্বরটার মধ্যে ভীড় জমিয়ে কসাকরা হল্লা শুরু করল জয়ধ্বনি তুলে। নতুন রাজত্বের কল্যাণ কামনা করতে লাগল গ্রামের বুড়োরা।

রস্তভের ওপারে দন ও কুবান অঞ্চলগুলোর মধ্যে বেশিদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেনি জার্মানরা। রস্তভের মুখোমুখি নদীর বাঁ দিকটায় একখানি গ্রাম—বাতায়িস্ক্। রস্তভের ওয়ার্কশপ ও বড়ো কারখানার মজুররা বাস করত সেখানে, আর থাকত শহরের গরীব নিঃস্বদের ঝড়তিপড়তি অংশ। বাতায়িস্ক্ গ্রামটিকে 'স্বপক্ষে আনবার' জন্য জার্মানরা বহু সাধ্যসাধনা করেছিল। কিন্তু প্রবল গোলাবর্ষণ করেও, বার বার রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়েও জার্মানরা শেষ পর্যন্ত গ্রামটা দখল করতে পারেনি। বাঁধভাঙা বন্যার জলে প্রায় পরিবেষ্টিত হয়েও বাতায়িস্ক মাথা জাগিয়ে রইল দুর্দম প্রতিরোধে, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে।

জার্মানরা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। আতামানদের গদীর জোর বাড়াবার কাজেই আপাতত তুষ্ট রইল তারা—উক্রেইনের রুশ ঘাঁটিগুলো থেকে তারা যেসব রসদ দখল করেছিল তা এখন সরবরাহ করতে লাগল আতামানদের ফৌজকে। দেনিকিনের বাহিনী আর দ্রজ্দভ্স্কির ফৌজীদল—এই দুটো ভলান্টিয়ার দলের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন হবে সে জটিল প্রশ্নের সমাধানেও তারা কম বিচক্ষণতা দেখায় নি! দুটো আদর্শকে ভলান্টিয়াররা শিরোধার্য করে রেখেছিল ঃ এক, বলশেভিকদের ধ্বংস করতে হবে; দুই, জার্মানদের বিরুদ্ধে তাদের পুরনো লড়াই আবার খুঁচিয়ে তুলে মিত্রশক্তির প্রতি তাদের চিরন্তন আনুগত্যের পরিচয় দিতে হবে। জার্মানদের কাছে তাদের প্রথম আদর্শটা সুবিজ্ঞ এবং সৎ বলেই প্রতীয়মান হল, তবে দ্বিতীয় আদর্শটাকেও তারা খুব একটা বিপজ্জনক ধরনের নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করে নি। তাই ভলান্টিয়ারদের অস্তিত্ব তারা চোখ বুজেই মেনে নিল। আর দ্রজ্দভ্স্কি-দেনিকিনের লোকেরাও এমন ভাণ করল যেন রুশিয়ার মাটিতে জার্মানদের অস্তিত্ব তাদের নজরেই পড়েনি।

কিশিনেভ্ থেকে রস্তভ যাত্রা করার পথে দ্রজ্দভ্স্কির ব্যাটালিয়নকে একবার নদী পেরুতে হয়েছিল। নদীর একদিকে বরিস্লাভ্লে ছিল জার্মানরা, অন্য দিকে কাখোভ্কায় ছিল বলশেভিকরা।

জার্মানরা চেষ্টা করেও নদী পার হবার কোনো ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। দ্রজ্দভ্স্কির ফৌজীদলই তাদের হয়ে সে বন্দোবস্ত করল, কাখোভ্কা থেকে লাল ব্যাটালিয়ন-বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা নিজেদের পথ ধরে এগিয়ে চলল, জার্মানদের ধন্যবাদের জন্য আর অপেক্ষা করল না।

দেনিকিন কিন্তু এর চেয়েও বড়ো বড়ো এবং এর চেয়েও জটিল পরিস্থিতিতে নিজের ইতিকর্তব্য করে যেতে লাগলেন! একাতেরিনোদারের লড়াইয়ে ছিন্নভিন্ন

হয়ে পড়া সত্ত্বেও এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ নভোচেরকাস্কের মাইল তিরিশেক দূরে ইয়েগর্‌লিৎস্কায়া ও মেচেতিন্‌স্কায়া গ্রামের আশেপাশের এলাকায় ভলান্টিয়ার বাহিনী সদলবলে ঢুকে পড়ল। সেখানে এসে যখন তারা খবর পেল যে রস্তভ শহর এখন জার্মানদের হাতে আর নভোচেরকাস্‌ক্‌ও আতামান-পরিচালিত দন কসাকদের খপ্পরে পড়েছে তখন যেন অপ্রত্যাশিত আনন্দে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ......এদিকে লাল বাহিনী করল কি, ভলান্টিয়ারদের না ঘাঁটিয়ে আর একটি ফ্রন্ট খুলে বসল নতুন শত্রু জার্মানদের বিরুদ্ধে।

ভলান্টিয়ারদের এবার সুযোগ হল বিশ্রামের। আহতদের দেখাশোনা করা, নতুন করে শক্তি সমাবেশ করার মওকা মিলল তাদের। সৈন্যবাহিনীর সাজ-সজ্জার পুনর্বিন্যাস করাই হল এখন তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন।

রস্তভের উপর অভিযান চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল লাল বাহিনী—তিখরেৎস্কায়া থেকে শুরু করে বাতায়িস্ক্‌ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রেল স্টেশন জমজমাট হয়ে আছে সামরিক রসদপত্রের ঠাসাঠাসিতে। সেনাপতি মারকভ বোগায়েভ্‌স্কি ও এরদেলির বাহিনী তিন সারিতে ভাগ হয়ে লাল বাহিনীর পশ্চাৎভাগে সবচেয়ে কাছাকাছি অংশগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করল; ক্রিলভ্‌স্কায়া, সসিকা ও নভো-লিউশ্‌কভ্‌স্কায়া রেলস্টেশনের সৈন্যবাহী ট্রেনগুলো ধ্বংস করে, সাঁজোয়া ট্রেন একখানা উড়িয়ে দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে লুটের মাল সংগ্রহ করে তারা আবার পশ্চাদপসরণ করল স্তেপ অঞ্চলে। লাল বাহিনীর অভিযান রুদ্ধ হয়ে গেল।

লড়াই করতে গিয়ে কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল রশচিনের, তাছাড়া সামান্য ছড়েও গিয়েছিল এখানে সেখানে। এখন সেরে উঠেছে সে অনেকটা। শান্ত নিস্তব্ধ গ্রামটিতে গত কয়েকদিন কাটিয়ে শরীরের জোর ফিরে পেয়েছে সে, সূর্য কিরণে ঝরঝরে হয়ছে দেহ, আর প্রাণভরে খাওয়া-দাওয়াও করেছে সে।

যে-সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিল রশচিন, আজ তা সিদ্ধ হয়েছে—সেই মস্কো ছাড়ার সময় থেকেই একটি মাত্র চিন্তা মানসিক ব্যাধির মতো তাকে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিচ্ছিল ঃ বলশেভিকদের হাতে লাঞ্ছনার শোধ যেমন করে হোক তুলতে হবে। আজ তার উদ্দেশ্য সফল। প্রতিশোধ সে নিচ্ছে। কিন্তু একটি মুহূর্তের কথা তার স্মৃতিপটে চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে থাকবে। রেললাইনের বাঁধের দিকে ছুটে যাচ্ছিল সে...জয়লাভ হয়েছে।...হাঁটু কাঁপছিল, রগদুটো দপ্‌দপ করছিল তার। বেয়নেটের ফলা মুছবার জন্য অজ্ঞাতসারেই সে মাথার নরম টুপিটা খুলে ফেলেছিল পেশাদার সৈনিকদের মতো অভ্যস্ত ভঙ্গীতে—হাতের অস্ত্রটি ওরা সব সময় ওইভাবে পরিষ্কার করে রাখে। মনের সেই উন্মাদ ঘৃণা তখন আর ছিল না। মাথাটাকে কঠিন সীসের পাত দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে-ধরার মতো সেই অনুভূতিটা, চোখে রক্তোচ্ছ্বাস জেগে ওঠার সেই অসহ্য অনুভূতিটা তখন মিলিয়ে গিয়েছিল। একজন শত্রুকে স্রেফ ধরাশায়ী করে বেয়নেটটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল তার দেহে, তারপর টেনে বার করে নিয়ে রক্তটা মুছে ফেলেছিল সে। ঠিক কাজই

করেছিল রশচিন তা হলে! কোনো ভুল করেনি যা-হোক! তারপর তার মন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসে, বুঝতে চেষ্টা করে সে—সত্যিই কি ঠিক কাজ করেছে সে? কোনো ভুল হয়নি তার? তাই যদি হয়, তা হলে এ প্রশ্ন তার মনে জাগছে কেন? কেন অনবরত সে জিজ্ঞাসা করছে নিজেকে—ঠিক কি ভুল?

দিনটা ছিল রবিবার। গ্রামের গির্জায় উৎসবানুষ্ঠান চলেছে। রশ্চিনের দেরি হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। প্রবেশদ্বারে এসে দেখে সৈনিকদের ঠেলাঠেলি ভীড়। সদ্য-কামানো মাথা ওদের। রশচিন বেরিয়ে গিয়ে গির্জার পিছনে পুরনো গোরস্তানটার মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখে ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল ফুটেছে। ঘাসের একটা ডাঁটি তুলে নেয় সে চিবোবার জন্য। তারপর একটা ঢিবির ওপর গিয়ে বসে। ভাদিম পেত্রোভিচ্ মানুষটা সৎ, আর কাতিয়ার ভাষায় বলতে গেলে—ভালোমানুষ।

আধ-খোলা, মাকড়সার জাল-ঢাকা জানলাটার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসে ছেলেমেয়েদের গানের আওয়াজ। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ডিকনের ভরা-গলার দোহার শুনে মনে হয় যেন তার রোষভরা নির্মম কণ্ঠস্বরের দাপটেই বুঝি ভয়ে ছুটে পালাবে শিশুদের নরম গলা। ভাদিম পেত্রোভিচের চিন্তা আপন খেয়ালেই যেন চলে যায় সুদূর অতীতে, যেন উজ্জ্বল কিছু, নিষ্পাপ কিছু খুঁজে বেড়ায় অতীতের মাঝে।...........

নিছক আনন্দেই যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে সে। উঁচু জানালার ঝলমলে শার্সি ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে গেছে বসন্তের নীল আকাশে—এমন আকাশ তো সে কোনোদিনও দেখেনি আগে! বাগান থেকে গাছের মর্মরধ্বনি ভেসে আসছে তার কানে। সাদা ছিটফোটওয়ালা একটা নতুন সাটিনের শার্ট ঝুলছে বিছানার ধারে চেয়ারটার ওপর। জামাটায় কেমন যেন একটা 'সাবাথ'-দিনের গন্ধ। শুয়ে শুয়েই ভাবছে সে, কেমন করে কাটাবে এত বড়ো দিনটা, কার সঙ্গে দেখা করবে আজ—আর এমনি ভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবতেও এমন মজা লাগে, এমন টেনে নিয়ে যায় মনটাকে, যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারে।......মাথা তুলে দেয়ালমোড়া কাগজের দিকে তাকায় সে। ঢেউ-তোলা ছাদওয়ালা চীনের প্যাগোডা আঁকা রয়েছে তাতে। একটা পিঠ-কুঁজো পুলও রয়েছে, আর আছে ছাতা-মাথায় দুজন চীনা। আরেকজন চীনা পুলটার ওপর বসে মাছ ধরছে, মাথায় তার বাতির ঢাকনার মতো টুপি। একই ছবি আঁকা আছে পর পর অসংখ্যবার। বেচারি ওই মজার চীনেগুলো, নদীর পাড়ের ওই প্যাগোডায় কতো সুখেই না বাস করে তারা।......এই বুঝি বারান্দায় শোনা যাচ্ছে ওর মায়ের গলার আওয়াজ : 'ও ভাদিম, যাবে না? আমি কিন্তু তৈরি।' প্রশান্ত মধুর গলার স্বরটি যেন তার সারা জীবনটাকে সুখময়, কল্যাণময় করে তোলে। সাদা ফুটকিওয়ালা নীল শার্টটা গায়ে দিয়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায় সে। ওর মা পরেছেন চমৎকার একটা সিল্কের পোশাক। ওকে চুমু খেয়ে মা তাঁর নিজের মাথা থেকে চিরুণীটা খুলে নেন। ওর চুলগুলো আঁচড়ে দিয়ে বলেন : 'বাঃ এই তো চমৎকার হয়েছে! চলো এবার.....'

চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকেন মা। ছাতাটি মেলে ধরেন। বাড়ীর সামনের রাস্তাটায় সবে ঝাঁট দিয়ে গেছে, তার চিহ্ন নজরে পড়ে। বাদামী ঘোড়াওয়ালা 'ত্রয়কা'-গাড়িটা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কিছুতেই, এমন অশান্ত হয়ে উঠেছে ঘোড়াদুটো। সওয়ারী ঘোড়াটা তো বিরক্ত করছেই, এমন-কি গাড়ীটানা শান্ত ঘোড়াটা অবধি খুর ঘষে ঘষে রীতিমতো একটি ছোটখাটো গর্ত বানিয়ে ফেলেছে। কোচম্যানটির সু-ভুক্ত পরিতৃপ্ত চেহারা। মখমলের ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তার লাল শার্টটি। গালভরা দাড়ি নেড়ে সে বলে ঃ "ইস্টারের দিনে মঙ্গল হোক আপনাদের!" গাড়ির রৌদ্রতপ্ত গদীর ওপর আরামে গা এলিয়ে দেন ওর মা। ভাদিম তাঁর কোল ঘেঁষে বসে। বড়ো আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে সে—এখুনি গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কান ঘেঁষে বয়ে যেতে থাকবে বাতাস, গাছগুলো ছুটে ছুটে আসতে থাকবে তাদের দিকে। মহলবাড়িটার পাশে চক্কোর দিয়ে জোর কদমে চলতে থাকে ঘোড়াগুলো। এই এসে পড়ল গ্রামের চওড়া রাস্তাটা। ভক্তিভরে মাথা নীচু করে নমস্কার জানাচ্ছে চাষীরা। গাড়ির চাকার তলা দিয়ে ছুটে গিয়ে একসঙ্গে জটলা পাকাচ্ছে উস্কো-খুস্কো লোমওলা মুরগির বাচ্চাগুলো। ঐ দেখা যায় গির্জাটাকে ঘিরে চুণকাম করা বেড়া, সবুজ আঙিনা, বার্চগাছ, ডালে সবেমাত্র ছোট ছোট মুকুল দেখা দিয়েছে; গাছগুলোর নীচেই তির্যকভাবে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশচিহ্ন, মাটির ঢিবি......প্রবেশপথ, ভীড় জমিয়েছে ভিখারীর দল......ধূপের পরিচিত গন্ধে আমোদিত......

গির্জা আর বার্চগাছগুলো এখনও রয়েছে। নীল আকাশের পটে তাদের ম্রিয়মান শ্যামলিমা.—এখনও যেন ভাসছে ভাদিম পেত্রোভিচের চোখে......ওই বার্চগাছেরই একটির নীচে—গির্জাঘরের দিক থেকে পঞ্চমটিতে—অনেকদিন হল শুয়ে আছেন তার মা। কবরটার পাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা। তিন বছর আগে গির্জার বুড়ো সেক্সটন লিখেছিল ভাদিম পেত্রোভিচের কাছে—রেলিংটা ভেঙে গেছে, কাঠের ক্রুশটা পচে গেছে!......এখন এতদিন বাদে হঠাৎ তার মনে পড়ল কথাটা, গভীর ব্যথায় ভরে উঠল মন—চিঠিটার তো কোনো জবাবই দেয় নি সে!

বড়ো আদরের সেই মুখখানি, সেই স্নেহময় হাতের স্পর্শ, রোজ সকালে সেই যে গলার আওয়াজটায় ঘুম ভেঙে যেত তার, আর সারা দিনটাকে ভরিয়ে দিত আনন্দে......ওর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ, প্রতিটি আঁচড়ের রেখাকে স্নেহসিক্ত করে তুলতো তাঁর ভালবাসা......সে জানতো যত দুঃখই আসুক না কেন তার, ওর মায়ের স্নেহই পারে সব ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে। আর এখন? সব কিছুই মূক হয়ে পড়ে আছে বার্চগাছের তলার সেই ঢিবিটার নিচে। মাটির সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে মাটি হয়ে।

ভাদিম পেত্রোভিচ হাঁটুর ওপর কনুই রেখে হাত দিয়ে ঢাকলো মুখখানা।

কতো বছর কেটে গেছে। তবু তার বারে বারে মনে হয়েছে আর একটু চেষ্টা করলেই হয়তো আবার, আবার সে তেমনি নীল সকালে বুকভরা খুশি নিয়ে চোখ মেলতে পারবে। ছাতামাথায় সেই দু'জন চীনা হয়তো তাকে পিঠকুঁজো পুলটার

ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে উঁচু চুড়োওয়ালা সেই প্যাগোডার মধ্যে। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে একজন,—তার এত আপনার, এত কাছের যে সে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।......

ভাদিম পেত্রোভিচ্ ভাবে ঃ 'আমার জন্মভূমি......' আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় গ্রামের পথে টগবগিয়ে চলা সেই 'ত্রয়কা' গাড়ির কথা—রাশিয়া......কী ছিল এই রাশিয়া এক সময়! আর এখন? কিছুই অবশিষ্ট নেই তার, সে রাশিয়া আর ফিরেও আসবে না কোনোদিন। সাটিনের শার্টপরা সেই ছোট্ট ছেলেটি এখন খুনী হয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ভাদিম। পেছন দিকে হাতদুটো ভাঁজ করে ঘাসের ওপর পায়চারি করতে শুরু করে সে। হাতের আঙুলগুলো টেনে টেনে মটকাতে থাকে। ভাবনার রথে চড়ে একটু আগেই সে ফিরে গিয়েছিল এমন সব জায়গায় যেখানে, তার ধারণা তার জন্য চিরতরে সজোরে রুদ্ধ হয়ে গেছে দ্বার। সে যে তার নিশ্চিত মরণের দিকেই এগিয়ে চলেছে এতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।...... কিন্তু তবুও তো মরে নি সে......স্তেপেরই কোনো এক জলা জায়গায় পড়ে অনায়াসে চোখ বুজতে পারতো সে, চারিদিকে ভন্ ভন্ করতো মাছি, কত সহজই না হতো সে মৃত্যু......

কিন্তু—ভাবে সে : মৃত্যু তো সহজ ব্যাপার, আসলে বেঁচে থাকাটাই তো কঠিন।......মুমূর্ষু মাতৃভূমির কাছে শুধু এক তাল মাংস আর হাড় বলি দিলেই তো চলবে না, দিতে হবে বিরাট মূল্য—বিগত জীবনের সবগুলি বছর, প্রেম-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চীনের প্যাগোডা, আর জীবনের সমস্ত নিষ্কলুষতা উজাড় করে......

বিড়বিড়িয়ে ওঠে সে, পরক্ষণেই সতর্ক চোখে চেয়ে দেখে আশে-পাশে কেউ তার কথা শুনে ফেলেছে কি না। কিন্তু বাচ্চারা সব আগের মতোই গান গেয়ে চলেছে, ছ্যাঁতলা-ধরা কার্নিশে বসে বক্‌বকম করছে পায়রাগুলো।......চকিতে, যেন কোনো রকম জানান না দিয়েই তার মনে ঝলক দিয়ে যায় আর একটি অসহ্য বেদনাময় মুহূর্তের স্মৃতি (কথাটা কাতিয়ার কাছে বরাবরই চাপা রেখেছে সে)। প্রায় বছরখানেক আগে মস্কোতে ঘটেছিল ব্যাপারটা। স্টেশনে এসে রশ্‌চিন জানতে পারল যে কাতিয়া দ্‌মিত্রেভনার স্বামী সেইদিনই কিছুক্ষণ আগে কবরস্থ হয়েছেন, আর এখন ও একা—সম্পূর্ণ একা। গোধূলির আলোয় ওর সঙ্গে দেখা করতে গেল রশচিন। পরিচারকটি জানালো ও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং ড্রয়িং রুমে বসেই অপেক্ষা করবে মনস্থ করল সে। পরিচারকটি তার কাছে এসে বলল একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভনা নাকি সারাক্ষণ ধরে কেবল কেঁদেছেন : "বিছানায় শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছোট শিশুর মতো কেঁদেছেন উনি—আমরা আর এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে রান্নাঘরের দরজায় খিল এঁটে বসেছিলাম।" রশচিন ঠিক করল যদি প্রয়োজন হয় তো সারারাতই অপেক্ষা করবে সে। সোফায় বসে প্রহর গুনতে লাগলো সে দূরের ঘড়ির শব্দটার তালে তালে। টক্ টক্ করে প্রতিটি সেকেণ্ড কেটে

যাচ্ছে নির্মমভাবে, অনিবার্যভাবে, প্রতিমুহূর্তে কালের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে—তার দয়িতার মুখে বলিরেখা এঁকে, চুলে রুপোলির ছোপ লাগিয়ে।......রশচিনের মনে হল কাতিয়াও যদি না ঘুমিয়ে থাকে তো নিশ্চয় এই একই কথা ভাবছে ঘড়ির আওয়াজটা শুনতে শুনতে। তারপর তার কানে এল কাতিয়ার পায়ের শব্দ—ক্ষীণ, বিচলিত, যেন ওর চটিজুতোর একটা থেকে হীল খসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ও নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে। তারপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। রশ্চিনের কেমন যেন ভয় করতে লাগল, দেয়াল ভেদ করে যেন সে কাতিয়ার ভাবনার নাগাল ধরতে পেরেছে। দরজা ক্যাঁচ করে উঠল। খাবারঘরে প্রবেশ করেছে কাতিয়া। সাইড বোর্ডের একটা পাল্লা খুলে ফেলেছে, ঝনঝন করে উঠেছে কাঁচের গ্লাসগুলো। রশচিন খাড়া হয়ে উঠল, যে কোনো মুহূর্তে ছুটে যাবে সে কাতিয়ার কাছে। ক্যাঁচ্ করে আবার দরজাটা খুলল কাতিয়া। 'কে তুমি? লিজা?' উটের লোমের ড্রেসিং গাউন পরেছিল কাতিয়া। এক হাতে একটা মদের গ্লাস, অন্য হাতে একটা ছোট্ট শিশি। এই পথই শেষে বেছে নিয়েছে সে সকল দুঃখ জয় করবার, নিঃসঙ্গতার বোঝা এড়াবার জন্য, অবধারিত কালচক্রের হাত থেকে, সবকিছু থেকেই মুক্তি পাবার জন্য!...... ধূসর চোখের সঙ্গে তার লম্বা মুখখানিকে দেখাচ্ছিল পথহারা শিশুর অসহায় মুখের মতো। তাকেই যে আজ নিয়ে যাওয়া দরকার চীনের প্যাগোডায়।......ভাদিম পেত্রোভিচ বলল কাতিয়াকে : 'আমার সমস্ত জীবন আমি সঁপে দিলাম তোমায়!' কাতিয়াও বিশ্বাস করে গ্রহণ করল তাকে, ভেবেছিল রশচিনের মমতায়, রশচিনের প্রেমে তার সব একাকীত্ব ঘুচে যাবে, জীবনের বাকী সময়টুকু একেবারেই গলে মিশে যাবে রশচিনের সমবেদনার আর্দ্রতায়।......

হা ভগবান, হা ভগবান! বরাবর রশ্চিন জেনে এসেছে কাতিয়া এক মুহূর্তও তাকে ছেড়ে চলে যায় নি—এমন-কি যখন ঘৃণার সেই কঠিন সীসের পাতটা তার মাথার খুলিকে চেপে ধরেছে প্রবল আক্রোশে, তখনও নয়, লড়াইয়ের সেই ভয়ানক দিনগুলোতেও নয়। উন্মত্ত চীৎকারে গলা ফাটিয়ে সে যখন লাল-ফৌজের সৈনিকটির কোটের মধ্যে বেয়নেট চালিয়ে দেয় তখন তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল কাতিয়ারই ছায়ামূর্তি, যেন বাহু দুটো প্রসারিত করে অনুচ্চারিত কণ্ঠে প্রাণভিক্ষা চাইছিল সে, আর রশচিনও সেই দুরপনেয় প্রেতমূর্তিটাকে ভেদ করেই চালিয়েছিল বেয়নেট। তারপর টুপি খুলে মুছতে গিয়েছিল বেয়নেটের ফলা।......

গির্জার অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। রোদ-পোড়া চেহারার একদল ক্যাডেট আর অফিসার বেরিয়ে এলেন গির্জা থেকে। ডাকসাঁইটে জেনারেলরা মন্থর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন বাইরে, চোখে তাঁদের দস্তুর-মাফিক কঠোরতাভরা দৃষ্টি, সামরিক অর্ডার আর ক্রুশ-চিহ্নে অলঙ্কৃত তাঁদের ইস্তিরি-করা ধোপদুরস্ত উর্দি : লম্বা পাতলা গড়নের ওই 'কার্তিক'টি যিনি দাড়ি পাট করে আঁচড়ে মাথার টুপিটা একদিকে হেলিয়ে দিয়েছেন কাপ্তানের মতো, উনি হলেন এরদেলি; নোংরা ফার-টুপি পরা উস্কো-খুস্কো চেহারার লোকটি হলেন রগচটা মারকভ; থ্যাবড়া-

নাক, গাঁট্টাগোঁট্টা, শুয়োর-চোখো খাটো লোকটি হলেন কুতেপভ; আর মোম-চর্চিত পাকানো গোঁফওয়ালা লোকটি হলেন কসাক বোগায়েভ্স্কি। ও'দের পিছন পিছন কথা বলতে বলতে হে'টে আসছেন দেনিকিন আর মুখচোরা রোমানভ্স্কি। রোমানভ্স্কির সুন্দর মুখখানা বুদ্ধিমানের মতো—ফৌজের লোকেরা ওকে ডাকে 'প্রহেলিকা' বলে। প্রধান সেনাপতি আসামাত্র সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল; বার্চগাছের নীচে দাঁড়িয়ে যারা সিগারেট টানছিল তারা সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দেনিকিন আর এখন আগের মতো বেসামরিক পোশাক আর ক্ষয়ে-যাওয়া বুট-পরা সেই হাঁপানীগ্রস্ত বুড়োটি নন; ঝোলাঝুলি-সম্বলহীন হয়ে ফৌজের পেছন পেছন ঘুরতে হয় না তাঁকে। শিরদাঁড়াটি এখন তাঁর বেশ সোজা; এমন-কি কেতাদুরস্ত পোশাকও পরেছেন। চকচকে সাদা দাড়ি দেখলে পিতৃবৎ সম্ভ্রম জাগে। চোখ আর আগের মতো কোটরগত নয়, একটা কঠোর সিক্ততা ছড়িয়ে আছে তাতে—মনে হয় যেন ঈগলের চোখ। দেনিকিন অবশ্য কর্নিলভ নন, কিন্তু জেনারেলদের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা আর ব্যবহারিক বুদ্ধিই সবচেয়ে বেশি। দু'আঙুল টুপির কিনারায় ছুঁয়ে তিনি মর্যাদাসহকারে গির্জার ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠে বসলেন রোমানভ্স্কির পাশে।

ঢিলেঢালা-মার্কা তেপ্লভ্ ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে এসে হাজির হল রশ্চিনের কাছে। বাঁ হাতটা ঝোলা ব্যান্ডেজের মধ্যে, কাঁধের ওপর চাপানো একটা ইস্তিরি-করা ঘোড়সওয়ারী লম্বাকোট। সাবাথের কৃপায় দাড়িটা সাফ করেছে আজ, মেজাজও ভারি শরীফ।

"টাটকা খবর কিছু পেলে হে রশচিন? জার্মান আর ফিন্রা তো পিতার্সবুর্গ প্রায় নিয়েই নিল আর কি! অভিযান চালাচ্ছেন ম্যানারহিম—ম্যানারহিমকে মনে নেই? উ'চুদরের জেনারেল, চমৎকার মানুষটি, আর লড়েনও হিম্মত দিয়ে।......ফিনল্যাণ্ডে তো প্রত্যেকটি সোশালিস্টকে কোতল করেছেন উনি। আর এদিকে বলশেভিকরা, ভেবে দেখ, মস্কো থেকে পালিয়ে আসছে ঝোলাঝুলি নিয়ে আর্খানগেল্স্ক্ হয়ে।......সত্যি ঘটনা, মাইরি বলছি! লেফটেন্যাণ্ট সেদেল্নিকভ্ বলেছে আমাদের। এইমাত্র এসেছে সে নভোচেরকাস্ক্ থেকে। বলে কি জানো—ওখানকার মেয়েগুলো চমৎকার।......একেকজনের জন্য দশ-দশটা করে।......" হাঁটুতে হাঁটু-ঠেকা রোগা রোগা পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়ালো তেপ্লভ; হাসতে হাসতে তার কণ্ঠার উ'চু হাড়টা উপরে উঠে এল উর্দির গলাবন্ধ ছাড়িয়ে।

নভোচেরকাস্কের সুন্দরীদের বর্ণনায় উৎসাহ দেখালো না রশচিন, তাই তেপ্লভও কথা ঘুরিয়ে শুরু করল রাজনৈতিক খবরাখবর। সুদূর স্তেপ অঞ্চলের ফৌজী সৈন্যরা তো এই সব খবর গলাধঃকরণ করেই বে'চে আছে।

"গোটা মস্কো শহরটাতেই নাকি মাইন পেতে রেখেছে ওরা—ক্রেমলিন প্রাসাদ, গির্জাঘরগুলো, থিয়েটার-হল, সেরা সেরা বাড়ি, এমন কি পুরো রাস্তা একেকটা, কিছুই বাদ নেই—সকোলনিকি পর্যন্ত টানা হয়েছে ইলেকট্রিকের তার—

সেখানে নাকি এক রহস্যময় বাড়ি আছে, 'চেকা'র লোকেরা দিন-রাত্তির পাহারা দিচ্ছে সেটিকে।......বুঝতে পেরেছ তো, আমরা এগিয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে বুম্-বুম্-বুম! গোটা মস্কো শহর উড়ে যাবে আসমানে!" (রশচিনের দিকে ঝুঁকে স্বর নীচু করে বলল) "ব্যাপারটা সত্যি, দিব্যি গেলে বলছি! কম্যান্ডার-ইন-চীফও ব্যবস্থা করেছেন অবশ্য ঃ বিশেষ স্কাউট পাঠানো হয়েছে মস্কোতে এই সব তার-টারের খোঁজ-খবর করবার জন্য; আমরা যখন মস্কোর দিকে এগোব তখন যাতে কোনো বিস্ফোরণ না ঘটে সেই চেষ্টা করবে ওরা। তা নয় হোলো, কিন্তু মস্কোতে গিয়ে যা ফাঁসির হিড়িক লাগিয়ে দেব না রেড স্কোয়ারে? ওরে ব্যাস্! একেবারে খোলাখুলি, ড্রাম বাজিয়ে......

রশচিন ভ্রূকুটি করে উঠে পড়ল।

"তুমি বরং তোমার ঐ মেয়ের গল্পই কর, তেপ্লভ। সেই ভাল হবে।"

"ও, এ সব কথা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না তোমার!"

"না, হচ্ছে না।"

তেপ্লভের বোকা-বোকা লালচে-বাদামী চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রশ্চিন। তেপ্লভের লম্বাটে মুখটা একদিকে বেঁকে গেল।

"ওঃ হো, লাল ফৌজের নিমকের কথা এখনও ভুলতে পারো নি দেখছি।"

"কি বললে?"—চমকে উঠে ভুরু উঁচিয়ে প্রশ্ন করল রশচিন ঃ "কি কথাটা বললে এখুনি?"

"গোটা রেজিমেন্ট যা বলছে আমিও তাই বলেছি। লাল ফৌজের মধ্যে কী কাজ করেছ তার ফিরিস্তি দেবার সময় হয়েছে তোমার।"

"শয়তান কোথাকার!"

ভাগ্যিস্ তেপলভের হাতটা ব্যাণ্ডেজে বাঁধা ছিল, আর সবাই ওকে ধরে নিয়েছিল পঙ্গু বলে, নয়তো আজ আর ঘুষির চোটে বাঁচতে হতো না তাকে। ওকে আঘাত করার বদলে রশচিন পেছনদিকে গুটিয়ে নিল হাতটা। তারপর সাঁ করে ঘুরেই শক্ত কাঠ হয়ে কাঁধজোড়া উঁচু করে সে কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

লম্বাকোটটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল তেপলভের কাঁধ থেকে। হ্যাঁচ্কা টানে সেটাকে সামলে নিয়ে সে তাকিয়ে রইল রশচিনের সোজা পিঠটার দিকে। মুখে তার তিক্ত একটা হাসি। ঠিক সেই সময় এলেন ক্যাপ্টেন ফন মেক, সঙ্গে ভ্যালোরিয়ান ওনোলি, যার কাছছাড়া তিনি কখনো হন না। ওনোলি হল সিমফারোপোলের এক তামাক-ব্যবসায়ীর ছেলে—তরুণ বয়েস, গায়ে মেচেতার দাগ, উজ্জ্বল বড়ো বড়ো চোখ দুটো স্বপ্নালু, পরনে জীর্ণ, দাগভর্তি, ছাত্রসুলভ একটা ঝোলাকোট, কাঁধের পটি দুটো কমিশন-বিহীন অফিসারের।

"ব্যাপার কি হে, ঝগড়া করেছ নাকি দুজনে?"—কর্কশ গলায় বলল ফন মেক, সামান্য বধির হলে লোকের যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে।

তেপলভ তখনো রাগে ফুঁশছিল, কর্ণেল রশচিনের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল সব সবিস্তারে বলল সে ঝোলা গোঁফটায় তা দিতে দিতে।

ওনোলি বলল, "ক্যাপ্টেন, আপনি যে দেখছি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। আমি তো গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা গোয়েন্দা।"

"যেতে দাও ভাল্কা!" ফন মেক চোখ মটকালেন সজোরে—ফলে মুখের বাঁদিকটা কুঁচকে গেল আগাগোড়া ঃ "জেনারেল মারকভ ওকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তা তো জানো? ওকে ঘাঁটাতে হলে একটু নরম রাস্তা ধরতে হবে। তবে হ্যাঁ, যা খুশি বাজি রেখে বলতে পারি রশ্চিন হচ্ছে বলশেভিক, ও হচ্ছে একটি উকুন......'

উত্তর ককেশাসের এদিকটা মে মাসের শেষ দিক পর্যন্ত মোটামুটি ঠান্ডাই ছিল। দু'পক্ষই তৈরি হচ্ছিল চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য। ভলান্টিয়ারদের আশা ছিল প্রধান প্রধান রেল জংশনগুলো দখল করে ওরা ককেশাসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, আর শ্বেত কসাকদের সাহায্যে সমগ্র এলাকাটা মুক্ত করবে লাল বাহিনীর কবল থেকে। কুবান ও কৃষ্ণ-সাগরীয় প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তৈরি হচ্ছিল তিনটি ফ্রন্টে লড়াই দেবার জন্য ঃ জার্মানদের সঙ্গে, শ্বেত কসাকদের সঙ্গে, আর সদ্য পুনরুজ্জীবিত "দেনিকিন দল"-গুলোর সঙ্গে।

লাল ককেসীয় বাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগই প্রাক্তন জারতন্ত্রী ট্রান্স-ককেসীয় বাহিনীর প্রবীণ যোদ্ধা, বহিরাগত বসবাসকারী আর ভূমিহীন কসাক তরুণ; সংখ্যায় তারা প্রায় এক লাখ হবে। ওদের প্রধান অধিনায়ক আভতোনমভ্‌কে কুবান-কৃষ্ণসাগরীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সন্দেহ করত একচ্ছত্র ক্ষমতালোলুপ বলে, আর গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সেও অনবরত ঝগড়া করত। তিখরেৎস্কায়াতে এক বিরাট জনসমাবেশে সে প্রকাশ্যেই কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে জার্মান গোয়েন্দার দল, 'প্ররোচক দালাল' বলে অভিহিত করেছিল। জবাবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি আভ্‌তোনমভ ও তার অন্তরঙ্গ অনুগামী সরোকিনকে 'চিহ্নিত' করে দস্যু ও জনশত্রু হিসাবে, তাদের নিন্দাবাদ করে, চিরকলঙ্কের পাত্র করে তোলে।

এই সব কলহের ফলে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল ফৌজ। যে-সময় ভলান্টিয়ার বাহিনীকে একবারে মুঠোর মধ্যে পেয়ে তারা তিনটি ইউনিটের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে পারত ওদের বিরুদ্ধে, ঠিক সেই সময়টায় লাল ফৌজের মধ্যে চলছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। হরদম সভাসমিতি হচ্ছিল, বরখাস্ত হচ্ছিল কম্যান্ডাররা। ফৌজের পক্ষে তখন যেটুকু করবার যোগ্যতা ছিল তা হল বীরত্বের সঙ্গে বিপর্যয়ের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া—এর চেয়ে বেশি কিছুর সামর্থ্য তার ছিল না।

অবশেষে মস্কো থেকে নির্দেশ আসার ফলে স্থানীয় কর্তাদের একগুঁয়েমি রোখা সম্ভব হল। রণাঙ্গনের পরিদর্শক নিযুক্ত হল আভ্‌তোনমভ্‌। ফৌজের উত্তর আঞ্চলিক গ্রুপের অধিনায়কত্ব দেয়া হল কর্নেল কাল্‌নিন নামে একজন গোমড়া-

মুখো ল্যাটভিয়ানের হাতে। সরোকিন যেমন ছিল তেমনি পশ্চিম আঞ্চলিক গ্রুপের অধিনায়কই রয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময়ে কর্নেল দ্রজ্‌দভ্‌স্কি তিন হাজার বাছাই-করা অফিসারের একটি ফৌজী-দল সঙ্গে নিয়ে এসে যোগ দিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনীতে। গ্রামাঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে এসে জুটতে লাগল ঘোড়সওয়ার কসাকরা। পেত্রোগ্রাদ থেকে, মস্কো থেকে, সারা রাশিয়া থেকে এসে হাজির হল অফিসাররা, একা একা অথবা দল বেঁধে;—কপোলকল্পিত এক 'তুষার অভিযানের' গুজব শুনে বড়ো উৎসাহিত হয়েছিল তারা। আতামান ক্রাস্‌নভ কিছুটা সাবধানতার সঙ্গেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা সরবরাহ করতে লাগলেন। দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল ভলান্টিয়ার বাহিনী; সেনাপতি ও আন্দোলনকারীদের কুশলী প্রচারের গুণে, স্থানীয় সোবিয়েত শাসকদের আনাড়ির মতো কাজকর্মের ফলে, এবং উত্তর দিক থেকে 'প্রত্যক্ষদর্শীরা' এসে যেসব বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করত তারই কল্যাণে ভলান্টিয়ারদের মনোবল ছিল রীতিমত চাঙ্গা।

মে-মাসের শেষ দিকটায় স্থানীয় লাল বাহিনী ভলান্টিয়ারদের ধ্বংস করার চেষ্টা ত্যাগ করল। ভলান্টিয়াররা এবার আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে তর্গোভায়া-তে কর্নেল কাল্‌নিনের উত্তর-আঞ্চলিক গ্রুপের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো।

"কি হল, গান বন্ধ করলে যে দোস্তরা?"

"গেয়ে গেয়ে গলা বলে ভেঙে গেল!"

"দেখি, পাইপটা ধরাবার জন্য যদি একটুকরো কয়লা পাওয়া যায়।"—বলল ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন। শিবির-আগুনের পাশেই বসেছিল সে। রেলওয়ের বেড়ার তক্তাগুলো নির্বিবাদে পুড়ে যাচ্ছিল আগুনে। পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে তেলেগিন বসল ওদের গান শুনবার জন্য।

রাত অনেক হয়ে গেছে। রেল লাইনের পাশে পাশে সমস্ত আগুনের কুণ্ডই প্রায় নিভে গেছে। রাতের হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা। আকাশে ঘন হয়ে ছেয়ে আছে অগণন তারা। বেগুনি-বাদামী রঙের বিধ্বস্ত ভাঙা মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে আগুনের আলোয়, রেলওয়ে বাঁধের একেবারে উপরে। গাড়িগুলো এসেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে, উত্তর মেরু অঞ্চলের জলাভূমি থেকে, তুর্কিস্থানের মরুভূমি থেকে, ভল্‌গা থেকে, উক্রেইন থেকে। প্রত্যেকটা বগির গায়ে লেখা "অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।" কিন্তু এ-সব শর্তটর্তের মেয়াদ অনেকদিন হল ফুরিয়ে গেছে। অনেক জল-ঝড়-সওয়া এই গাড়িগুলো তৈরি হয়েছিল শান্তির সময়ে যাতে কাজের ধকল সইতে পারে সেইভাবে,—কিন্তু আজ? অ্যাক্সেলের দাঁড়ে তেল নেই, গাড়ির দু'পাশ ভেঙে তুবড়ে গেছে। তারকাখচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ভবিষ্যতের গর্ভে ওদের জন্য রয়েছে নানা চমকপ্রদ দুঃসাহসী অভিযান। গোটা একেকটা ট্রেন যথাসর্বস্ব নিয়েই হয়তো লাইন-চ্যুত হয়ে যাবে;

কিংবা লাল ফৌজের বন্দীদের নিয়ে ঠাসা দু'একটা গাড়ি হয়তো জানলা-দরজা আষ্টেপৃষ্ঠে তক্তা-আঁটা অবস্থায় হাজার হাজার মাইল পথ চলে যাবে, গাড়িগুলোর গায়ে খড়িমাটি দিয়ে লেখা থাকবেঃ 'টেঁকসই মাল, ধীরগামী ট্রেনে লওয়া চলিবে'। অন্য গাড়িগুলো টাইফাস-আক্রান্ত রোগীদের কবরে পরিণত হবে, ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া মৃতদেহ চালান দেবার জন্য বরফের বাক্স হয়ে দাঁড়াবে সেগুলো। এদের মধ্যে অনেকগুলো গাড়িই আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে।...... সাইবেরিয়ার জংগলে ওদের দেয়াল, দরজা খসিয়ে নিয়ে বেড়া, ঘরের চালা ইত্যাদি বানানো হবে।......আধ-পোড়া ভাঙাচোরা অবস্থায় অবশিষ্ট কয়েকখানা গাড়ি হয়তো অনেক অনেক মাস পরে ফিরে আসবে সেই জায়গায় যেখানে তাদের "অবিলম্বে ফেরত পাঠাইবার" কথা; মরচে-ধরা সাইডিং-এর লাইনে পড়ে থাকবে তারা মেরামতের প্রতীক্ষায়।

"মস্কোতে ওরা কী বলে, কমরেড তেলেগিন?—এই ঘরোয়া লড়াই শেষ হতে আর কতো দেরি?"

"যখন জিতবো, তখনই শেষ হবে।"

"দেখতে পাচ্ছেন তো......আমাদের ওপর কত ভরসা করে ওরা......"

জলে-রোদে-পোক্ত পাণ্ডুর চেহারার কয়েকজন দাড়িওয়ালা লোক অলস-ভংগীতে শুয়েছিল শিবির-আগুন ঘিরে। ঘুম দেবার ইচ্ছা কারুরই ছিল না, কিন্তু কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনাতেও মন দিতে চাইছিল না কেউ। ওদের একজন তেলেগিনের কাছে হাত পাতলো একটুখানি ঘরে-তৈরি তামাক চেয়ে।

"কমরেড তেলেগিন—এই চেকগুলো কারা? কোথা থেকে এলো এরা? এদের কথা তো আগে শুনেছি বলে মনে হয় না..."

ইভান ইলিয়িচ ওদের বুঝিয়ে বলল যে চেকরা হল আসলে অস্ট্রীয় যুদ্ধ-বন্দী, জারতন্ত্রী সরকার ওদের মধ্যে থেকেই একটা আর্মি কোর তৈরি করতে শুরু করেছিল ফ্রান্সে পাঠাবার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বিফল-মনোরথ হয়।

"আর সোবিয়েত গভর্নমেণ্টও এখন ওদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে দিতে পারছে না, কারণ ওরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লড়তে চায়......আমরা দাবি করছি ওরা অস্ত্রত্যাগ করুক বলে, আর ওরাও তাতে একেবারে ক্ষেপে যাচ্ছে..."

"তার মানে কি এই যে ওদের সংগেও আমাদের লড়তে হবে, কমরেড তেলেগিন?"

"এখনই ঠিক কিছু বলতে পারছে না কেউ।...তেমন পরিষ্কার কোনো খবর তো পাইনি।...ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য মনে করি না যে আমাদের লড়তে হবে। ...ওদের তো মাত্র চল্লিশ হাজার লোক..."

"একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া যাবে।"

শিবির-আগুনের পাশে আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। যে লোকটি তামাক চেয়েছিল, তেলেগিনের দিকে নজর বুলিয়ে সে আবার কথা বলতে আরম্ভ করল, শুধু খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করাই ওর পরিষ্কার উদ্দেশ্য।

"জারের আমলে আমাদের পাঠিয়েছিল সারাকামীশ্-এ। তুর্কিদের সঙ্গে আমরা যে কেন লড়াই করছিলাম আর কেনই-বা মরছিলাম সে কথা কেউ একটিবারও বলেনি আমাদের। আর সে কী সাংঘাতিক পাহাড় সেখানে। চাদ্দিকে তাকিয়ে খালি বলতে ইচ্ছে হবে, কি কুক্ষণেই জন্মেছিলাম!...আর এখন তো সবই বিলকুল আলদা; এ হল আমাদের নিজেদের লড়াই, একেবারে জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই...... সবকিছুই এখন পরিষ্কার—কেন লড়ছি, কিভাবে লড়ছি, সবকিছু..."

"আমার কথাই ধরো না কেন—সবাই আমাকে ডাকে চের্তোগনভ বলে,"—আরেকজন সৈনিক বিড়বিড় করে বলে উঠল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সে আগুনের শিখার এত কাছে ঘেঁষে বসল যে তার দাড়িতে আগুন ধরে যায়নি কেন সেই এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ভয়ংকর মুখাকৃতি লোকটির, কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে কালো চুল, আর রোদে-পোড়া মুখটার মধ্যে জ্বলছে একজোড়া গোল-গোল চোখ।

"দুবার আমি দূরপ্রাচ্যে গিয়ে থেকেছি, বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবার দরুণ বারে বারে জেল খেটেছি।...তো, ওইরকমভাবেই একবার আমায় তো ওরা ব্যারাকে পুরল, তারপর সৈনিকের সার্টিফিকেট হাতে গুঁজে দিয়ে পাঠিয়ে দিল যুদ্ধে।...ছ'ছবার জখম হয়েছি...এই দেখ।"—গালের মধ্যে আঙুল পুরে মুখটা একদিকে টেনে দেখালো ও, একসারি ভাঙা দাঁতের গোড়া। "মস্কোতে গিয়ে একটা হাসপাতালে ঢোকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম—তারপর দেখা হল বল-শেভিকদের সঙ্গে।...আমার সব দুঃখকষ্টের এবার একটা আসান হল। ওরা আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সামাজিক অবস্থাটা কি?' আমি বললাম, 'উত্তরাধিকারের সূত্রে খেতমজুর, তবে বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষের কোনো পাত্তা নেই।' ওরা হাসলো। একটা রাইফেল আর একটা হুকুমনামা দিল আমার হাতে—বুঝে দেখ, আমার মতো লোকের হাতে! সে সময়টা আমরা শহরে টহল দিয়ে বেড়াতাম—বুর্জোয়াদের খোঁজে।...বড়সড়ো এককেটা বাড়িতে ঢুকে পড়তাম, বাড়ির মালিকরা অবশ্য ঘাবড়ে যেতো।...গোপন অন্দিসন্ধিগুলো সব নজর করে দেখতাম : ময়দাটা, চিনিটা...ভয় পেয়ে শুয়োরগুলো নিজেদের মধ্যে কিচিরমিচির করতো, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মরে গেলেও একটা কথা বলতো না।...মাঝে মাঝে রাগে একেবারে পাগল হয়ে যেতে হত—শালারা তোরা মানুষ তো নোস্, এককেটা তেলের কুপো! কথা বলতে মুখ সরে না তোদের? গাল দিতে পারিস না? দয়া চাইতে পারিস্ না? শালাদের যতই গাল দাও না কেন, কথাটি বলবে না।......ভাবতাম ব্যাপার-খানা কি?......দেখেশুনে ক্ষেপে উঠতে হয়—সারা জীবন তো মুখ বুজে রইলাম, ওই চালিয়াৎ শয়তানগুলোর জন্য খেটে মরলাম, রক্ত ঢাললাম ওদের জন্য।...অথচ আমাদের ওরা মনিষ্যি জ্ঞান করে না!...ওই তো ওইরকমই হয় বুর্জোয়াগুলো! সেই তখন থেকেই শ্রেণী-বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলছি আমি। তা বেশ কথা...একবার হল কি, ব্যবসাদার রিয়াবিন্‌কিন-এর বাড়ি দখল করবার জন্য পাঠানো হল আমাদের। আমরা ছিলাম চারজন লোক, আর লোকটার মনে খানিকটা ঈশ্বরের

ভয় ঢোকাবার জন্য সঙ্গে মেশিনগানও রেখেছিলাম একটা। বাড়ির সামনের দরজাটায় তো টোকা মারলাম। কিছুক্ষণ বাদে একটি ছোটখাটো ফিটফাট চেহারার পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। বেচারী মেয়েটির মুখখানি তো আমাদের দেখেই শুকনো হয়ে গেছে। খালি এদিক-ওদিক পা টিপে টিপে হাঁটে আর কাঁদে 'উহু-হু' করে...ওকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে আমরা হল ঘরটার ঢুকলাম—থামওয়ালা প্রকাণ্ড কামরাটা, মাঝখানে টেবিল, ঘিরে বসেছে রিয়াবিন্‌কিন আর তাঁর অতিথিরা—প্যানকেক খাচ্ছেন তাঁরা। শ্রোভটাইডের উৎসব সেদিন—তাই সবাই মদে চুর।...আর একদিকে তখন দেশের মজুররা না খেতে পেয়ে মরছে!...... আমি তো গায়ের জোরে মেঝের ওপর রাইফেল ঠুকে চিৎকার করে উঠলাম। ওরা যেমন ছিল তেমনি বসে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। তখন রিয়াবিন্‌কিন ছুটে এল আমাদের কাছে। ফুর্তিতে লাল হয়ে উঠেছিল সে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল তার; চেঁচিয়ে বলল ঃ 'প্রিয় কমরেডরা! আমি বরাবরই জানতাম তোমাদের ইচ্ছে আমার বাড়িটা দখল করা, স্থাবর-অস্থাবর যা আছে তাও এই সঙ্গে দখল করতে চাও তোমরা! বেশ, তা এই প্যানকেকটুকু শেষ করতে দাও; আর তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসে পড় আমাদের সঙ্গে। এতে লজ্জার কি আছে—সবই তো জনসাধারণের সম্পত্তি!' টেবিলের দিকে আঙুল দেখাল সে...আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ খালি একবার এ-পা একবার সে-পা করতে লাগলাম। তারপর রাইফেলগুলো আগের মতোই আঁকড়ে ধরে বসলাম আর ভুরু কুঁচকে দেখতে থাকলাম। এদিকে রিয়াবিন্‌কিন্ তখন আমাদের জন্য ভদ্‌কা ঢালতে শুরু করেছে। আমাদের প্লেটগুলো সে ভরে দিল প্যানকেক আর যতো রকম এটা-সেটা খাবার দিয়ে...আর সারাক্ষণ কেবল বক্‌বক্ করতে আর হাসতে লাগল।...এমন সব কথা বলছিল লোকটা, এমন ঠাট্টা করছিল!—সিধেসিধি মুখের ওপর ভ্যাংচাচ্ছিল সাধারণ মানুষকে।...ঘরের আর-আর সমস্ত অতিথি তো হাসিতে ফেটেই পড়ছিল, আমরাও না হেসে পারি নি। ভদ্রলোকদের নিয়ে সবরকম কেচ্ছাই শোনা গেল, তর্কাতর্কিও কম হয়নি, আর আমাদের গৃহকর্তা মশাইও যখন দেখছিলেন কেউ একটু বেশিরকম বেলেল্লা হয়ে পড়ছে অমনি তার গেলাসে আরও বেশি করে ঢেলে দিচ্ছিলেন ভদ্‌কা ঃ আমরা সবাই বড়ো বড়ো গেলাস নিয়ে বসেছিলাম—ছোট কিছুর ব্যাভারই হয়নি সেদিন। তারপর ওরা যখন শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে শুরু করল, আমরাও রাইফেলগুলো সরিয়ে রাখলাম এক কোণে। 'ওহে চেরতোগোনভ, তুমিই কি-না শেষে সারা হলঘর হোঁচট খেয়ে বেড়াতে লাগলে থামের গায়ে মাথা ঠুকে?'—নিজের মনেই শুধোলাম নিজেকে। সবাই একসাথে গলা মিলিয়ে গান গাইতে শুরু করলাম আমরা। সন্ধ্যের দিকে মেশিনগানটা বসালাম বাড়ির দরজার ওপর, যাতে কেউ এসে মাথা গলাতে না পারে। দু'দিন ধরে একটানা মদ খেয়েছিলাম একবারও না থেমে। সারাটা জীবন গাধার খাটুনি খেটে সেদিন আমি সুদে আসলে সব উশুল করে নিচ্ছিলাম আর কি। কিন্তু রিয়াবিন্‌কিন্‌টা আমাদের কলা দেখাল, ধূর্ত ব্যবসাদার হতভাগাটা! আমরা

যখন ফ্র্তি করছি ও সেই ফাঁকে সমস্ত হীরাজহরত, সোনা, টাকাপয়সা আর অন্য দামী জিনিস সরিয়ে ফেলল নিরাপদ জায়গায়—ওই ঝি-টাই তাকে সাহায্য করেছিল। ঘরের দেয়ালগুলো আর আসবাবপত্র ছাড়া তখন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না দখল করার মতো।...আমরা যখন ফিরতির মুখে, রিয়াবিন্‌কিন্‌ আমাদের বিদায় জানিয়ে বলল (অবশ্য তখনও সবাই নেশায় চুর হয়ে আছে) ঃ 'প্রিয় কমরেডরা, সবই নিয়ে যাও তোমরা, সব, সব—আমার কোনো আফশোষ নেই তাতে। আমি তো জনতারই সন্তান, জনতার কাছেই ফিরে যাচ্ছি এখন।...' ঠিক সেই দিনই লোকটা চম্পট দিল দেশ ছেড়ে। আর এদিকে আমাকে তো টেনে আনা হল 'চেকা'র সামনে। আমি জানালাম ওদের ঃ 'আমারই দোষ, আমাকে গুলি করে মারুন!' ওরা আমাকে যে গুলি করে মারেনি তার একমাত্র কারণ হল ওদের মতে আমি তখনও যথেষ্ট শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠিনি। আমি কিন্তু এখনও ভেবে আনন্দ পাই যে একটিবার অন্তত খুশিমত মজা লুটে নিয়েছিলাম। অন্তত একটুখানি সুখের কথাও তো রয়ে গেল মনে..."

"বুর্জোয়াদের মধ্যে শয়তানের অভাব নেই ঠিক কথা, তবে আমাদের মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে।"

কথাটা যে বলল, ধোঁয়ার আড়ালে সে খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে; সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে। যে-লোকটি তেলেগিনের কাছে তামাক চেয়েছিল সে বলল ঃ

"সবাইকে তো আর তা বলে রোখা যাবে না, চোদ্দ সালের যুদ্ধে রক্তের গন্ধ পেয়েছে যে তারা।"

"সে-কথা বলছি না আমি'—ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল স্বরটা ঃ "যারা দুশমন তারা দুশমনই; রক্তপাতও ঘটাতে হবে। আমি বলছিলাম সত্যিকারের বদ লোকদের কথা।"

"আর তোমার নিজের পরিচয়টা?"

"আমি? আমিও তো ওই বদমায়েশদেরই দলের।" শান্তকণ্ঠে জবাব দিল সে।

সবাই চুপ করে গেল কথাটা শুনে, পোড়া কয়লার গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তেলেগিনের শিরদাঁড়ায় যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। ঠাণ্ডা রাত। শিবির-আগুনের পাশে ছটফট করছিল কয়েকজন, টুপির ওপর গাল রেখে শুয়ে পড়েছিল তারা।

তেলেগিন উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিল, তারপর সমান করতে লাগল উর্দির ভাঁজ। ধোঁয়াটা এখন কমে এসেছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল সে "বদ লোকটিকে"—আগুনের ও-পাশটায় হাঁটু আড়াআড়ি ভাঁজ করে বসে আছে। সোমরাজের ডাল চিবোচ্ছিল লোকটা। পোড়া কয়লার গনগনে আগুনের আভা এসে পড়েছে তার লম্বাটে পাতলা মুখটার ওপর, খানিকটা নারীসুলভ কোমলতা রয়েছে চেহারার মধ্যে, কয়েক গুচ্ছ পাতলা চুলও এসে পড়েছে গালের ওপর।

একটা জীর্ণ টুপি ঠেলে দিয়েছে মাথার পেছন দিকে, সরু কাঁধের ওপর ঝুলছে একটা সামরিক লম্বাকোট। কোটের নীচে কোমর পর্যন্ত আর কোনো আবরণ নেই গায়ে। শার্টটা পড়ে ছিল এক পাশে, একটু আগে বোধহয় উকুন বাছছিল সেটা থেকে। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে সে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলল, তারপর শিশুসুলভ একটা ধীর হাসিতে ভরে ফেলল মুখটা।

তেলেগিন তাকে চিনতে পেরেছিল। ওর নিজের কোম্পানিরই লোক—মিশ্‌কা সলোমিন। এলেৎস্‌ এলাকার চাষীঘরের ছেলে, লাল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। ককেশাসে এসেছে সিভার্স-এর ফৌজের সঙ্গে।

এক মুহূর্তের জন্য তেলেগিনের চোখে চোখ মিলতেই সে নামিয়ে নিল দৃষ্টি, যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে,—ইভান ইলিয়িচের তক্ষুনি মনে হল মিশ্‌কা সলোমিন তো আবার কোম্পানির মধ্যে কবি আর কড়া মদখোর হিসেবে নাম কিনেছে! তবে মাতলামি করতে তাকে কেউ বড়ো একটা দেখেনি। মিশ্‌কা অলসভাবে তার কোটটা টেনে নামালো কাঁধ থেকে, তারপর গায়ে চড়াতে শুরু করল শার্টটা। রেলের বাঁধ ধরে ধরে ইভান ইলিয়িচ ততক্ষণে প্যাসেঞ্জার গাড়ির দিকে উঠে গেছে। রেজিমেন্টের কম্যান্ডার সার্গি সার্গিয়েভিচ্‌ সাপোঝ্‌কভ যে-কামরাটায় থাকতো তার জানলায় তখন প্রহরীর মতো জ্বলছিল একটা তেলের বাতি। বাঁধের উঁচু জায়গাটা থেকে আকাশের তারাগুলোকে আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, নীচে শিবির-আগুনের মুমূর্ষু শিখাগুলো তখন লালচে একেকটি বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

"ভেতরে এসো হে তেলেগিন, প্রচুর গরম জল রয়েছে"—জানলা দিয়ে মুখ ঝাড়িয়ে বলল সাপোঝ্‌কভ। ওর দাঁতের ফাঁকে বাঁকা নলচেওয়ালা একটা পাইপ।

দেয়ালে-বসানো তেলের বাতিটা থেকে একটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়ছিল জরাজীর্ণ সেকেণ্ড-ক্লাস কামরাটায়—হুকের ওপর ঝুলছে কয়েকটা রাইফেল, এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে কেতাবপত্র, সামরিক মানচিত্র। গায়ে একটা ময়লাটে ক্যালিকো শার্ট আর কাঁধে পাতলুনের ফিতে চড়িয়েছে সাপোঝ্‌কভ। তেলেগিন ঢুকতেই তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও।

"পান-টান করবে নাকি কিছু?"

বাঙ্কের এক কিনারায় বসল ইভান ইলিয়িচ। খোলা জানলা দিয়ে রাতের ঠান্ডা হাওয়া আসছিল—সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা 'কোয়েল' পাখির গলা। পাশের গাড়িটা থেকে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে বেরিয়েছিল একজন সৈনিক, আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ভারি ভারি পায়ে সে জানলার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কোমল সুরে বাজছিল একটা বালালাইকা। খুব কাছেই কোথায় যেন মোরগ ডেকে উঠল—রাত দুপুর গড়িয়ে গেছে।

"কি ডাকল? মোরগ?"—কেতলি নাড়াচাড়া বন্ধ করে সাপোঝ্‌কভ বলে উঠল। চোখদুটো জ্বলে উঠেছে তার, শীর্ণ গাল দুটোর ওপর জেগে উঠেছে লাল দগ্‌দগে ছোপ। পিছনের আসনটার ওপর হাতড়াতে হাতড়াতে প্যাঁশনেটা

খ্ঁজে বের করল সে, তেলেগিনকে ভালো করে দেখবার জন্য চোখে এ'টে নিল [illegible]টা।

"কী ব্যাপার—রেজিমেন্টের মধ্যে জ্যান্ত মোরগ এল কি করে?"

"রিফিউজি এসেছে আবার—কমিসারকে রিপোর্ট করেছি। কুড়ি গাড়ি বোঝাই মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চা। এ এক জঘন্য ব্যাপার!"—মগের চা নাড়তে নাড়তে বলল তেলেগিন।

"কোথা থেকে এল?"

"প্রিভল্নায়া থেকে। প্ররো এক ট্রেন ঠাসা হয়ে আসছিল, কিন্তু মাঝপথে কসাকরা হামলা করে ওদের ওপর। সবাই ভিনদেশী, ভয়ানক গরীব। গাঁয়ের লোকদের নিয়ে একটা ফৌজী দল তৈরি করেছিল দ্ব'জন কসাক অফিসার, রাতে হামলা চালিয়ে তারা গ্রামের সোবিয়েত ভেঙে দিয়েছে, কয়েকজন লোককে ফাঁসিও দিয়েছে।..."

"অর্থাৎ এক কথায় সেই একই বস্তাপচা গল্প,"—প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করল সাপোঝ্কভ। মদে একেবারে চ্বর হয়ে আছে মনে হল,—তেলেগিনকে ডেকেছিল সে স্রেফ মনের বোঝা হাল্কা করে সব খ্বলে বলবার জন্য।...ইভান ইলিয়িচের মনে হচ্ছিল সারা শরীরটা যেন তার ক্লান্তিতে ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু গদী-আঁটা আসনে বসে চায়ের বাটিতে চুম্বক দিতে এত আরাম যে সে আর নড়লো না সেখান থেকে—যদিও সার্গি সার্গিয়েভিচের সঙ্গে আলাপে তার বিশেষ কোনো লাভ নেই জানতো সে।

"তোমার বউ কোথায় তেলেগিন?"

"পিতার্সব্র্গে।"

"অদ্ভুত ছোকরা দেখছি। শান্তির সময় হলে তোমাকে মানাতো ঘর-গেরস্ত-করা খাঁটি সংসারী লোক হিসেবে, সঙ্গে সতীসাধ্বী গৃহিণী, লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে দ্বটি, আর একটি গ্রামোফোন।......কোন্ দ্বঃখে লাল ফৌজে এলে হে? মারা পড়বে, তা জেনো..."

"আগেই তো বলেছি তোমাকে।..."

"পার্টির মধ্যে ঢোকার ফিকিরে এ-সব চাল ধরোনি তো?"

"যদি আদর্শের প্রয়োজনে তা করতে হয়, তা হলে নিশ্চয়ই পার্টিতে যোগ দেব।"

ঝাপ্সা কাঁচের আড়ালে সাপোঝ্কভের চোখজোড়া কুঁচকে গেল। বলল ঃ "তিন তিনবার আমায় যদি গরম জলে সেদ্ধও করো তব্ব আমায় কমিউনিস্ট বানাতে পারবে না।"

"অদ্ভুত যদি কেউ থাকে, সে তুমি, সার্গি সার্গিয়েভিচ্।"

"মোটেই না। সোজা কথা হল আমার মাথায় ডায়ালেকটিক্স্ ঢ্বকবে না। আমি হলাম আসলে একটি ব্বনো, যে কোনো সময়ে জঙ্গলের দিকে ছ্বটে যাবার জন্য তৈরি। হ্বম্! তুমি তা হলে আমাকে অদ্ভুত ভেবেছ!"

মনে হল একটা পরিতৃপ্তির আওয়াজ করল সে মুখ দিয়ে। "সেই অক্টোবর থেকে আমি সোবিয়েতের পক্ষে লড়াই করছি। হুম্। ক্রপৎকিন পড়েছ তুমি?"

"না, পড়িনি।"

"সে তো বোঝাই যাচ্ছে।...সবকিছু এমন বিরক্তিকর, বুঝলে হে বুড়ো... বুর্জোয়াদের দুনিয়াটা তো নরকের ইতরামি আর একঘেয়েমিতে ভরা। আর আমরা যদি জিতি তা হলে কমিউনিস্ট দুনিয়াটাও হবে একঘেয়ে, শুধু তাই নয়, নেহাৎই আটপৌরে—কেবল ভালোমানুষিতা আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমি।...কিন্তু বুড়ো ক্রপৎকিন ছিলেন ভারি চমৎকার লোক......কেবল কবিতা, স্বপ্ন আর শ্রেণীহীন সমাজের ভাবনা।...বড়ো উঁচু-নজরের খানদানী আদমি ছিলেন তিনি। বলতেনঃ 'মানুষকে নৈরাজ্য স্বাধীনতা দিয়ে দাও, দুনিয়ার সবচাইতে বড়ো পাপ—বড়ো-বড়ো শহরগুলোর শেকল আল্‌গা করে দাও, দেখবে শ্রেণীহীন মানুষ কেমন করে খোলা আকাশের নীচে সহজিয়া স্বর্গ গড়ে তোলে। তুলবেই তো, কারণ মানুষের মূল প্রবৃত্তিই যে প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম...' হাঃ—হাঃ!"

সাপোঝ্‌কভ তীব্রকণ্ঠে হেসে উঠল যেন অদৃশ্য কোনো প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ করে; ওর প্যাঁশনে-জোড়া নেচে উঠল নাকের গোড়ার উঁচু হাড়টার ওপর। হাসতে হাসতেই সে মাথা নিচু করে আসনের তলা থেকে বার করল মদ-ভর্তি একটা টিনের ক্যানেস্তারা। পেয়ালায় খানিকটা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল, তারপর এক-টুকরো চিনির দলা ভেঙে নিল মট্ করে।

"আমাদের এই রুশ বুদ্ধিজীবীগুলোর ট্রাজেডিটা কি জানো তো? আমরা বেড়ে উঠেছিলাম ভূমিদাসপ্রথার শান্তিময় পক্ষপুটে; তারপর যখন বিপ্লব এল, আমরা যে শুধু ভয়ে আধমরা হয়ে গেলাম তাই নয়, শিরোঘূর্ণন জাতীয় রোগও দেখা গেল আমাদের মধ্যে।...ভয়-কাতুরে এই মানুষগুলোকে সত্যিই এতটা বিশ্রী রকম ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত হয়নি, তাই না? আরামের কুঞ্জবনে বসে আমরা পাখির ডাক শুনতাম আর নিজেদের মনেই বলতাম ঃ 'আচ্ছা, সবাইকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবার একটা উপায় খুঁজে পেলে বেশ হ'ত না এই সময়?' এই ধরনের লোকই তো আমরা।...পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু বড়ো চালাক লোক, তারা হল বুর্জোয়াদের একেবারে ক্ষীরাংশটুকু। কড়া নিয়মে বাঁধা তাদের কাজকর্ম—বিজ্ঞান ও শিল্পকে উন্নত করো, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও ভাব-বাদের ঘুমপাড়ানি মোহজাল।......ওখানকার বুদ্ধিজীবীরা জানে তারা কি জন্য বেঁচে আছে। আর এখানে—রাম বলো! কার সেবা করছি আমরা? আমাদের কর্তব্য কাজটা কি? একদিকে আমরা হলাম 'স্লাভোফিল'-দের সঙ্গে হরিহর-আত্মা * —ওদেরই

---

* স্লাভোফিল (স্লাভ-প্রেমিক)—উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়ার এক বিশেষ চিন্তাজগতের প্রতিনিধিত্ব করত এরা। রাশিয়ার নেতৃত্বে স্লাভ-জাতি যাতে ঐক্যবদ্ধ হয় তারই জন্য এরা ওকালতি করত। এরা ছিল (পশ্চিম-ভক্ত) 'অক্‌সিডেণ্টোফিল্'-দের উল্টো। এরা বলতো যে রুশ জাতির বিকাশের এক

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বর্তেছে আমাদের ওপর। 'স্লাভোফিলবাদ' কাকে বলে জানো তো? সেরেফ রুশ জমিদারদের ভাব-বাদ। অন্যদিকে দেখ, আমাদের টাকা-পয়সা সব আসে দেশের বুর্জোয়াদের পকেট থেকে—ওদের খেয়েই বেঁচে আছি আমরা। আর এত সব সত্ত্বেও আমরা নাকি জনসাধারণের সেবা করছি...... জনসাধারণ, সত্যিই! হাস্যরস আর গম্ভীর রসের এ এক রীতিমত খিচুড়ি! জনসাধারণের দুঃখকষ্টে কেঁদে কেঁদে আমরা এত চোখের জল ফেলেছি যে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আমাদের। আর চোখের জলই যদি ফুরিয়ে গেল তবে আর কিসের জন্য বাঁচব বল! আমরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতাম, মুঝিকরা কন্‌স্তান্তিনোপলে গিয়ে সেন্ট-সোফিয়ার গম্বুজে উঠবে, চুড়োর ওপর বসিয়ে দেবে অর্থোডক্স গির্জার ক্রুশ। মুঝিকদের হাতে ইহ-ভূমণ্ডলটা তুলে দেবার স্বপ্ন দেখতাম আমরা। আর শেষে কি-না আমাদের মতো উৎসাহী, স্বপ্নদ্রষ্টা, ক্রন্দন-বিগলিতদের মুখের ওপরেই ওরা শাবল তুলে ধরল?......এমন অত্যাচারের কথা কেউ কবে শুনেছে? আর কী সাংঘাতিক ভয়ে ভয়েই না দিন কেটেছে! তারপর, বন্ধু, শুরু হল সাবোতাজ।......বুদ্ধিজীবীরা চাইল বেরিয়ে আসতে, জোয়াল থেকে কাঁধ খুলে নিতে—'আমি পারব না! তোমরা যা করবার হয় নিজেরা করো!...' আর তাও এমন সময় যখন রাশিয়া এসে দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত সংকটের মুখে।......প্রকাণ্ড ভুল করল তারা, সে ভুলের আর চারা নেই। এই ভদ্দরলোকেরা মানুষ হয়েছেন অতি যত্নে, কেতাবের বাইরে কখনো বিপ্লবের কথা ভাবতে পারেন না।......কেতাবে অবশ্য বিপ্লবটাকে ভারী মনোমুগ্ধকর ব্যাপার মনে হতো।......কিন্তু এখন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি,—সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছে ফৌজ ছেড়ে, অফিসারদের মেরে ফেলছে, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে, প্রাসাদ পোড়াচ্ছে, রেলের কামরায় ব্যবসাদারদের বৌয়ের পেছন পেছন তাড়া করছে, লুকোনো জায়গা থেকে টেনে বার করছে কানের দুল......না হে, মাফ করো! এ সব লোকদের ঘাঁটিয়ে কাজ নেই আমাদের, কেতাবে তো বাবা এদের কথা লেখা হয় নি কোনো দিন।...এখন তা হলে কী করব আমরা? বাড়িতে বসে বসে কেঁদে ভাসিয়ে দেব? দুর্ভাগ্য যে কাঁদার অভ্যাসটাও আমরা খুইয়েছি।......আমাদের স্বপ্নই যখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তখন আর বেঁচে থাকার মতো কিছুই তো রইল না। তাই আমরা শুধু ভয়ে আর বিরক্তিতে বালিশে মাথা গুঁজেই কাটালাম, কিছু কিছু লোক পালিয়ে গেল বিদেশে, আর যারা একটু বেশি উৎসাহী তারা ধরল অস্ত্র।...... ভদ্রঘরের কলঙ্ক সব......

"আর মানুষও তো শতকরা সত্তর ভাগই অশিক্ষিত, ওরা জানে না কিভাবে ওদের ঘৃণা প্রকাশ করবে, ওরা পারে শুধু রক্ত আর বিভীষিকার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে। 'আমাদের বিক্রী করেছে!' বলে ওরা, 'আমাদের জীবন নিয়ে জুয়ো খেলেছে!

নিজস্ব ধারা রয়েছে যা পশ্চিম ইয়োরোপের জাতিগুলোর বিকাশের ধারা থেকে স্বতন্ত্র।

ওদের মুখ-দেখার আয়না ভেঙে গুঁড়ো করো, ভাঙো সব কিছু!' বুদ্ধিজীবীদের ছোট্ট একটি দল শুধু মাথা ঠিক রেখেছে—কমিউনিস্টরা। জাহাজ যখন ডুবতে থাকে, লোকে তখন কি করে? যা কিছু বাড়তি জিনিস সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাই না? প্রথম কাজ যা কমিউনিস্টরা করল তা হচ্ছে পুরনো রুশীয় ভাববাদকে বস্তাবন্দী করে ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া। এ সবই সেই 'বুড়ো লোকটির' কাজ, একেবারে খাঁটি রাশিয়ান লোকটি। আর দেশের লোকও সহজাত জৈব প্রবৃত্তিতে বুঝে ফেলল ঃ এরাই আমাদের আসল লোক, ভদ্দরলোকেরা নয়—এরা আমাদের গলা জড়িয়ে ধরে প্যান্‌প্যানানি গাইবে না, শোষকদের কোনো ওজরেই কান দেবে না। ......এই জন্যই তো আমি রয়েছি এদের দিকে; অবশ্য ক্রপৎকিনের সাজানো বাগানে মানুষ হয়েছি আমি, কাঁচের ঘুলঘুলির নীচে, স্বপ্নের আবহাওয়ায়...আমার মতো আরও অনেকেই আছে। নাক সিঁটকিও না তেলেগিন, তুমি তো এখনও মায়ের পেটেই রয়েছ, হালকা স্বভাবের আদিম মানুষটি।...আমাদের কারু-কারুকে, বুঝেছ, ইচ্ছে করেই ভেতরটা একেবারে উল্টে বাইরে নিয়ে আসতে হবে, এইভাবে যখন প্রত্যেকটি আঘাতের চেতনায় আমরা নিজেদের স্পর্শকাতর করে তুলতে পারব তখন আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব ইচ্ছাশক্তির একটা সরল রূপের মধ্যে—সেটি হল ঘৃণা।......ঘৃণা না থাকলে লড়াই চলে না।......মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব সবই করছি আমরা, মানুষের জন্য একটা লক্ষ্যস্থল ঠিক করছি, আর তাদের টেনে নিয়ে চলেছি সেই দিকে। কিন্তু আমরা তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন। আর দুশমনরা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। চেকদের কথা শুনেছ তো? এখুনি কমিসার এসে পড়বেন, তাঁর মুখেই শুনতে পাবে সব।......জানো আমার ভয়টা কিসের? আমি ভয় পাই—সমস্ত জিনিসটাই হয়তো আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়াবে। আর একমাস কি দু'মাস, বড়োজোর ছ'মাস টিঁকতে পারব আমরা, এর বেশি নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ভাই। শেষ পরিণতি হবে আবার জেনারেলদের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেওয়া। আর এই সব গোলমালের মূলে হল স্লাভোফিলরা, খেয়াল কোরো কথাটা। যখন চাষীদের মুক্তি শুরু হল, তখন আমাদের চীৎকার করে বলা উচিত ছিল ঃ 'বাঁচাও! আমরা ধ্বংস হতে চলেছি! আমাদের দরকার জোর চাষ-আবাদ, যেমন করে হোক শিল্পোন্নয়ন, সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।......একজন নতুন পুগাচেভ *, কিংবা স্তেংকা রাজিন † আসুক—যতোক্ষণ না ভূমিদাসপ্রথা এবারে সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে

---

* এমেলিয়ান ইভানোভিচ পুগাচেভ (আনুমানিক ১৭৩০-১৭৭৫)—দন অঞ্চলের কসাক নেতা। ১৭৭২-৭৫ সালে সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে কৃষক-যুদ্ধ হয় তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

† স্তেপান তিমোফিয়েভিচ্ রাজিন (?-১৬৭১)—দন এলাকারই কসাক নেতা; সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে ১৬৬৭-৭১ সালের কৃষক-যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

মিলিয়ে যাচ্ছে।' এই আওয়াজই ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল জনতার মধ্যে, ঠিক ঐ রাস্তাতেই যাতে বুদ্ধিজীবীরা ভাবে, সেইরকম তালিম দেওয়া উচিত ছিল তাদের।......কিন্তু আমরা তখন আনন্দাশ্রুর বিলাস-বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলাম ঃ 'অহো, কি বিশাল এই রুশভূমি, সকল দেশের সেরা! মুক্তবায়ুর মতো স্বাধীন দেশের মুঝিকরা, তুর্গেনিভের মানস-কন্যাদের প্রাসাদ আবাসে কারুর কলুষস্পর্শ পড়ে নি, রহস্যময় এদেশের মানুষের আত্মা,—অর্থলোলুপ পাশ্চাত্যের মতো নয়......।' আর এই ধরনের সব স্বপ্নকেই আমি এখন লাথিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।......"

সাপোঝকভ আর বলতে পারল না। জ্বালা ধরেছে ওর মুখে। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল ও আসলে যা বলতে চেয়েছে তা প্রকাশ করতে পারে নি। তেলেগিন হাঁ করে বসে ছিল ওর কথার তোড়ে হতভম্ব হয়ে, হাঁটুর ওপর রাখা মগের মধ্যে চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। করিডোরে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল, বিশাল-বপু কেউ এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। কামরার দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে নাতিদীর্ঘকায় একজন চওড়া-কাঁধ লোক, প্রশস্ত কপালের ওপর লেপটে আছে কালো চুল। বাতিটার নীচে এসে নিঃশব্দে বসল সে, হাঁটুর ওপর রাখল প্রকাণ্ড বাহুদুটো। জলে-রোদে পোক্ত মুখের ওপর অল্প-অল্প ভাঁজ পড়েছে কাটা দাগের মতো, গভীর চোখের কোটর আর সামনে-ঝুলে-পড়া ভুরুর ছায়ায় চোখজোড়া সহসা নজরেই পড়ে না। লোকটি হল কমরেড গিম্‌জা, রেজিমেণ্টের বিশেষ বিভাগের অধিকর্তা।

"আবার মদ ধরেছে তো?" কোমল অথচ গম্ভীর গলায় বলল সে ঃ "একটু সাবধান হও, কমরেড।......"

"মদ? নিকুচি করেছে! দেখতে পাচ্ছ না চা খাচ্ছি দু'জনে মিলে?" বলল সাপোঝ্‌কভ।

গিম্‌জা আসনে স্থির হয়ে বসেই গম্‌গমে ভারি গলায় বলে উঠল ঃ

"মিছে কথা বলে আরও খারাপ করে দিচ্ছ ব্যাপারটা। তোমার কামরার মধ্যে তো বেশ গন্ধ পাচ্ছি মদের, মাইলখানেক দূর থেকেও পাওয়া যায় গন্ধটা। মালগাড়িতে বসে সৈন্যরাও উশখুস্‌ করছে, ওরাও তো গন্ধ পেয়েছে।......তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে এ নিয়ে যেন এর আগে যথেষ্ট গোলমাল পোয়াতে হয় নি আমাদের! তার ওপরে আবার ঘাঁটিয়ে তুলেছ তোমার ওই রাবিশ-মার্কা দর্শনের কথা--তাই পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমার এখন রঙ ধরেছে।"

"বেশ তো, মাতাল হয়েছি......এবার গুলি করে মারো আমায়?"

"অনায়াসেই তোমায় গুলি করে মারার ব্যবস্থা করতে পারি, সে তুমিও ভালো করেই জানো; মারছি না যে তার কারণ হল তোমার লড়াইয়ের ক্ষমতা।......"

"তামাক ছাড়ো তো খানিকটা"—বলল সাপোঝ্‌কভ।

রাজকীয় ভঙ্গীতে গিম্‌জা পকেট থেকে একটা সুতীকাপড়ের থলি বের করল। তারপর তেলেগিনের দিকে ঘুরে গম্ভীর ভারি গলায় বলতে শুরু করল ঃ

"রোজই সেই এক ব্যাপার ঃ গত হপ্তায় তিনটে শয়তানকে গুলি করে মেরেছিলাম আমরা—আমি নিজেই সওয়াল করেছিলাম ওদের......নোংরা চীজ, সব স্বীকার করেছে। আর ইনি তখন মদ গিলে মাতাল না হয়ে পারলেন না!......আজই একটা ঘাঘু দালালকে গুলি করে মেরেছি, দেনিকিনের চরদেরই একজন—ঘাসবনে লুকোতে দেখে ইনি নিজেই তাকে ধরেছেন......তো ইনিও অবশ্য মদ না খেয়ে পারলেন না, সেই সঙ্গে শুরু করলেন দর্শন। তালগোল-পাকানো এক কিম্ভুত জিনিস শোনাচ্ছিলেন এতক্ষণ—আমি জানলার বাইরে দাঁড়িয়েই শুনেছি, মনে হচ্ছিল যেন পচা অখাদ্য গিলছি। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ কখন ওকে বিশেষ দপ্তরে পাঠিয়ে দিত ওর এই 'দর্শনের' জন্য। লোকটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপার ঘটলেই দু'দিন শরীর খারাপ করে থাকে, আর রেজিমেণ্ট পরিচালনা করতে পারে না......"

"তুমি তো আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথীকে গুলি করে মেরেছ!"

ভুরু কুঁচকে বলল সাপোঝকভ। ওর নাকের ফুটো তখন কাঁপছিল।

গিম্‌জা কোনো জবাব দিল না, যেন শুনতেই পায় নি ওর কথা। মাথা নিচু করল তেলেগিন। গিম্‌জার মুখের দিকে স্বেদাক্ত নাকটা সজোরে ঘুরিয়ে বলে চলল সাপোঝকভ ঃ

"বেশ তো, দেনিকিনের চরই না-হয় হল। কিন্তু ও আর আমি যে একসঙ্গে 'দর্শনের সান্ধ্যবাসরে' নিয়মিত যেতাম। শ্বেতরক্ষীদের দলে ঢুকেছিল কেন তা শয়তানই জানে। বোধহয় একেবারে মরীয়া হয়ে।......আমিই তো ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম তোমার কাছে......এতেই কি আমার যথেষ্ট কর্তব্য করা হয় নি? গর্তের ধারে যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হল তখন বুঝি আমার ধেই-ধেই করে নাচা উচিত ছিল? পেছন পেছন গেলাম, দেখলাম......"

স্থির দৃষ্টিতে ও গিম্‌জার চোখের কালো কোটরের দিকে চেয়ে রইল। "আমার কি মানুষের মতো অনুভূতিও থাকতে নেই? না-কি নিজের জ্বালায় নিজেই পুড়ে মরব?"

গিম্‌জা প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে জবাব দিল ঃ

'না, তা চলবে না।...অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু তোমার মনের সব কিছু মনের মধ্যেই চেপে যেতে হবে। ঠিক তোমার মতো এই ধরনের অনুভূতি থেকেই তো প্রতিবিপ্লবের জন্ম হয়।"

অনেকক্ষণ একটানা নিস্তব্ধতা। বাতাসটা থম্‌থমে। অন্ধকার জানলার বাইরে এখন পূর্ণ নৈঃশব্দ্য। গিমজা নিজের জন্য একটু চা ঢেলে নিয়ে, কাল্‌চে একখানা রুটির মস্তবড়ো টুকরো ভেঙে ধীরে ধীরে চিবোতে শুরু করল, সত্যি-সত্যি খিদে পেলে লোকে যেমন করে থাকে। তারপর সে চাপা গলায় বলতে আরম্ভ করল চেকদের কথা। খবরটা অস্বস্তিকর। পেন্‌জা থেকে ভ্লাদিভস্তক্‌ অবধি সমস্ত ট্রেনগুলোতে চেকরা উঠে পড়েছে। সোবিয়েত সরকার এদিকে নজর দেবার সময় পাবার আগেই, রেলপথ ও শহরগুলোকে ওরা সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। পশ্চিম

রাশিয়ার সৈন্যবাহী ট্রেনগুলো আগেই পেন্‌জা থেকে সরে পড়েছিল, তারপর সীজ্‌রানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারা শহরটা দখল করে, এবং এইভাবে এগিয়ে যেতে থাকে সামারার দিকে। চমৎকার শৃঙ্খলা তাদের মধ্যে, হাতিয়ারও ভালো, যোদ্ধা হিসেবে তারা সাহসী, সমর্থ। সমস্ত জিনিসটা সামান্য একটা বিদ্রোহের ব্যাপার, না, এর পেছনে কোনোরকম বৈদেশিক প্রভাব রয়েছে তা এখন পর্যন্ত বলা দুষ্কর। বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য মনে হয় দু'রকম ব্যাপারই থাকতে পারে। সে যাই হোক, একটা নতুন রণাঙ্গন যে তৈরি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,— এ রণাঙ্গন বারুদের রেখার মতো ছড়িয়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভল্‌গা পর্যন্ত, ভয়ঙ্কর বিপদ্‌পাতের আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে সর্বত্র।

জানলার বাইরে কেউ এসেছে মনে হল। কথা বন্ধ করে গিম্‌জা ভুরু কুঁচকে পিছন ঘুরল।

গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ঃ

"কমরেড গিম্‌জা, এদিকে আসুন।......"

"কী ব্যাপার?"

"গোপনীয়।"

চোখের একেবারে কোটরের ওপর ভুরুজোড়া টেনে গিম্‌জা একমুহূর্ত বসে রইল, হাত দুটো ডুবে গেছে আসনের গদীতে। তারপর ঝট্‌কা দিয়ে উঠে বাইরে চলে গেল সে—যাবার সময় দু' কাঁধই ঘেঁষে গেল দরজার দু'পাশের চৌকাঠে। গাড়ির সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটায় বসে সামনের দিকে ঝুঁকলো সে। ঘোড়সওয়ারী লম্বা কোট পরা একটি দীর্ঘকায় মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়ার রেকাবের ঝন্‌ঝন আওয়াজ করে। লোকটা যেই হোক, গিম্‌জার একেবারে কানের কাছে মুখ এনে তাড়াতাড়ি কী যেন বলল ফিস্‌ফিস্‌ করে।

গিম্‌জা বেরুবার পর, সাপোঝ্‌কভ ঘন ঘন পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল আর জানলা দিয়ে হরদম থুতু ফেলতে শুরু করল কুটিল ভঙ্গীতে। প্যাঁশনেটা খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল।

"সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল সব প্রশ্নের সোজা জবাব দেওয়া। ঈশ্বর আছেন কি নেই? নেই। নরহত্যা চলে কি না? চলে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য কি? বিশ্ব-বিপ্লব। এই তো ভাই, সহজ, কোনোরকম জটিল আবেগ-অনুভূতির বালাই নেই......"

হঠাৎ থেমে গিয়ে সে টান-টান হয়ে কান পেতে শুনল। সমস্ত গাড়িটা কেঁপে উঠেছে—দেয়ালের গায়ে গিম্‌জার ঘুষির আওয়াজ। কর্কশ ক্রুদ্ধ গলায় হেঁকে বলছে সে ঃ

"মিথ্যে কথা যদি কিছু বলে থাক আমার কাছে, কুত্তীর বাচ্চা......"

সার্গি সার্গিয়েভিচ্‌ তেলেগিনের জামার হাতাটা খিম্‌চে ধরে বলল ঃ

"শুনলে তো ওর কথা? ব্যাপারটা কি জান? আমাদের কম্যান্ডার-ইন-চীফ্‌ সরোকিন সম্পর্কে খারাপ খারাপ সব গুজব শোনা যাচ্ছে চারিদিকে।...ওই লোকটি হল

বিশেষ বিভাগেরই একজন কমরেড, সদর দপ্তর থেকে সদ্য ফিরেছে। এখন তো বুঝতে পারছ গিম্‌জা কেন অমন মাথায় ঘা-ওয়ালা ভালুকের মতো করছে?......"

ভোরের আকাশের তারা এতক্ষণে ম্লান হয়ে এসেছে। গাড়িগুলোর মধ্যে আবার মোরগটা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত শিবিরের ওপর শিশির পড়ছে। তেলেগিন তার নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে বুটজুতো জোড়া খুলে ফেলল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে দিল বাঙ্কের ওপর, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল স্প্রিংগুলো।

একেক সময় তেলেগিনের মনে হয়েছে, তার জীবনে ক্ষণিকের জন্য যেটুকু সুখ এসেছিল, সবুজ স্তেপ-প্রান্তরের বুকে তা যেন সামান্য স্বপ্নের মতোই, ঘূর্ণ্যমান চাকার তালে তালে এগিয়ে চলেছে।...এক সময় তার জীবনটা ছিল শান্তিময়, সাফল্যভরা ঃ ছাত্রজীবন, পিতার্স্বুর্গের সেই অপার অগাধ পরিসর, নিজের কাজের তাড়া, ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপে তার ফ্ল্যাটটিতে যে-সব বদ্ধপাগলদের সে পুষতো তাদের সেই নিরুদ্বেগ ভাবনাহীন আড্ডা। ভবিষ্যৎকে তখন মনে হত বুঝি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবেই নি কোনো দিন। মাথার ওপর দিয়ে এক-এক করে বহু বছর কেটে গেছে নির্ঝঞ্ঝাট অলস গতিতে। ইভান ইলিয়িচ জানতো, তারই মতো আরও হাজারটা লোক যেমন করেছে সেও তেমনি বিচারবুদ্ধিসহকারে তার ভবিষ্যতের ইতিকর্তব্য সমাধা করবে, এবং তারপর যখন তার চুলে পাক ধরবে, পিছনপানে ফিরে সে তার কাজের হিসেব-নিকেশ নিতে গিয়ে দেখবে যে এক দীর্ঘপথ সে অতিক্রম করে এসেছে কোনো বিপজ্জনক চোরাবালিতে পা না বাড়িয়ে। তারপর এল দাশা, ওর ছাঁপোষা গদ্যময় জীবনের বেড়া ভেঙে প্রবেশ করল সে প্রতাপ-মণ্ডিতা হয়ে, তার মেঘ-মেদুর চোখের দ্যুতিতে এক ভীতিপ্রদ আনন্দের ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু তখনও, ওর অন্তরের অন্তস্তলে মুহূর্তের জন্য উঁকি দিয়েছিল ছোট্ট একটু সন্দেহ ঃ হয়তো ওর ভাগ্যে সুখ নেই! যা হোক্, এ সন্দেহকে ও মন থেকে তাড়িয়ে দেয়, ওর বাসনা ছিল যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাশার সঙ্গে ও সুখের নীড় বাঁধবে। তারপর যখন সাম্রাজ্যের প্রাসাদ-হর্ম্য ভেঙে পড়ল, যখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা, যখন পনের কোটি লোক যন্ত্রণা ও ক্রোধে অধীর হয়ে গর্জে উঠেছে, তখনও ইভান ইলিয়িচ কল্পনা করে চলল—ঝড় তো শেষ হবেই, দাশার দুয়ারের সামনের আঙিনাটাও নিশ্চয়ই বর্ষণের পর আবার শান্তির পরিবেশে ঝল্‌মল্‌ করে উঠবে।

তারপর,—সেই ইভান ইলিয়িচ এখনও আগের মতো আবার সৈন্যবাহী ট্রেনের একখানি বাঙ্ক দখল করে চলেছে—তার পেছনে লড়াই গতকালের, সামনে লড়াই আগামীকালের। এখন বেশ পরিষ্কার যে অতীতে আর ফিরে যাওয়া চলবে না। এখন তার ভাবতে লজ্জা করে, এক বছর আগে সে কামেনভো-অস্ত্রভ্‌ স্ত্রীটের সেই ফ্ল্যাটটা সাজানোর ব্যাপার নিয়ে মিছিমিছি কতো হৈ-চৈই না করেছিল, দাশার জন্য মেহগনি কাঠের খাটটা এনেছিল নেহাৎ ওর মরা বাচ্চাটির সেবায় লাগবে বলেই বুঝি।

দাশাই প্রথম জড়িয়ে পড়ে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। 'সামার পার্কের' কাছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'লাফানে গুণ্ডারা', মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল মরা শিশুটির ঃ দাশার কাছে বিপ্লবের অর্থ হল এই! ক্ষুধা, অন্ধকার, আর নানা-রকমের হুকুমনামা যার প্রতিটি ছত্র ঘৃণা আর রোষে ভরা—দাশার কাছে বিপ্লব এইসব অর্থই বহন করে এনেছে! বিপ্লব বলতে দাশা বুঝেছে ছাদের ওপর বাতাসের অবিশ্রান্ত শোঁসানি। হিম-জমা জানলার শার্সিতে তুষার-ঝড়ের ঝাপটায় সে শুনেছে বিপ্লবের কণ্ঠস্বর—'আমাদের-কেউ-নয়-এরা-আমাদের-কেউ-নয়!' পিতার্সবুর্গের এক মেঘলা বসন্ত-দিনে ইভান ইলিয়িচ বাড়ি ফিরল শরীফ মেজাজে। ভিজে বাতাস বইছিল, কার্নিশ বেয়ে ঝরছিল জল। জীর্ণ পাইপগুলো থেকে ঝুপ্-ঝুপ্ করে পড়ছিল বরফের কণা। ইভান ইলিয়িচের কোটের বোতাম খোলা। দাশার দিকে ও তাকিয়ে রইল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে। ওর দৃষ্টির সামনে যেন কুঁকড়ে গেল দাশা। শাল দিয়ে থুতনি অবধি ঢেকে রেখেছিল সে। বলল : "ইচ্ছে হয়, ইভান, দেয়ালে ঠুকে ঠুকে থেঁতলে ফেলি মাথাটা, যাতে ভুলতে পারি সবকিছু, চিরকালের মতো।......তখন হয়তো তোমার সঙ্গিনী হতে পারব আবার। রোজ রাতে ওই ভয়ানক বিছানাটায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া, আর রোজ সকালে উঠে একেকটা অভিশপ্ত দিনের মুখ দেখা—এ আর সইতে পারছি না আমি।...একেবারেই পারছি না সইতে।...ভেবো না যে আমি ভালো ভালো জিনিস আর এটা-সেটার কাঙাল হয়ে উঠেছি।......আমি চাই একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে।...উচ্ছিষ্টে ভক্তি নেই আমার।......তোমাকে আমি আর ভালবাসতে পারছি না, আমায় ক্ষমা করো!"

কথা শেষ করেই দাশা ঘুরে দাঁড়াল।

চিরকালই দাশা আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে একটু কঠিন। কিন্তু আজ সে রীতিমত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

"কিছুদিনের জন্য আমাদের আলাদা হয়ে থাকাই বোধহয় ভাল, দাশা।"—বলল ইভান ইলিয়িচ।

তারপর, পুরো শীতকালটার মধ্যে সেই প্রথম সে লক্ষ্য করল দাশার ভুরুদুটো কেমন আনন্দে উঁচু হয়ে উঠেছে, চোখে একটা অদ্ভুত আশার আলো; ওর পাংশু শীর্ণ মুখের ওপর একটা বেদনাময় কম্পনের রেখা খেলে গেল...

"আমারও মনে হয় আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল, ইভান......"

তারপর থেকে রুবলেভের মারফত ইভান সমানে দরখাস্ত করে এসেছে লাল-ফৌজে ভর্তি হবার জন্য। অবশেষে মার্চ মাসের শেষে একটা সৈন্যবাহী ট্রেনে চেপে সে রওনা হল দক্ষিণের দিকে। 'অক্টোবর' স্টেশনে ওকে বিদায় দিতে এসে আকুলভাবে কাঁদছিল দাশা, ওর কামরার জানলাটা যখন দাশার পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তখন সে শাল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কতো শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে ইভান ইলিয়িচ, কতো যুদ্ধ, কতো ঝড়ঝাপ্টা গেছে তার ওপর দিয়ে, কতোবার অবসন্ন

হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু তবু সে ভুলতে পারেনি অশ্রুসিক্ত সেই প্রিয় মুখখানির কথা—স্টেশনের নোংরা দেয়ালের সামনে অসংখ্য নারীর ভিড়ের মধ্যে জেগেছিল সেই একখানি মুখ। দাশা তাকে বিদায় দিয়েছিল এমনভাবে যেন এই বুঝি তাদের শেষ দেখা। তন্নতন্ন করে ইভান খুঁজতে চেষ্টা করেছে নিজের মধ্যেকার খুঁতটা—কেন সে দাশাকে হারালো। দাশা যে তাকে ভালোবাসতে পারল না তার কারণ অবশ্য শেষ অবধি খুঁজলে তার নিজের মধ্যেই পাওয়া যাবে নিশ্চয়— এ কথা তো ঠিক যে দাশাই একমাত্র নারী নয় যে সন্তান-হারা হয়েছে। আর বিপ্লবের ফলেই যে ও বিমুখ হয়ে গেছে তাও হতে পারে না...বিপ্লবের এই কঠিন, আলোড়নময় দিনগুলোতে বরং আরও কাছাকাছি এসেছে এমন দম্পতির নমুনা ইভানের একাধিক জানা আছে। তাহলে ওর দোষটা কি হল?

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগ ঢেউ দিয়ে ওঠে ওর মনে : বেশ তো, ওগো প্রিয়ে, আমি যেমন নেচেছিলাম তেমনি আর কাউকে খুঁজে-পেতে নিয়ে নাচাও এবার! সারা দুনিয়াটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে আর উনি আছেন ওঁর নিজের ভাবনা নিয়ে। এ হচ্ছে নিছক আত্ম-বিনোদনের চেষ্টা—সাদা ফ্যান্সি রুটি খাবার অভ্যেস, অথচ রাই-ভুষির রুটি পেটে রাখতে পারে না এমনি এক স্ত্রীলোকের খেয়াল ছাড়া এ আর কিছু নয়।

আর এ সব কিছু যদি সত্যি হয়—আর সত্যি তো বটেই—তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে ইভান ইলিয়িচ নিজেই সর্বগুণে অলংকৃত একটি রত্নবিশেষ, ওকে না ভালোবাসা হল অপরাধ। আর তা যদি হয়—ইভান ইলিয়িচ সঙ্গে সঙ্গে সতর্কভাবে যাচাই করে দেখে......'আমার মধ্যে তাহলে এমন কী বিশেষত্বটা রয়েছে? শারীরিকভাবে স্বাস্থ্যবান—মানলাম। প্রতিভা আর সৌন্দর্যের দিক থেকে লক্ষ্যনীয় কিছু?—কই না তো, পাশের লোকটির মতোই সাধারণ। বীর কেউকেটা ব্যক্তি? পুরুষ হিসেবে আকর্ষণীয়? না, না...এই সাধারণ, ভদ্র নাগরিক যেমন হয়, আরো হাজারটা লোকের মতো।......' জীবনের জুয়াখেলায় ওর ভাগ্যে পড়েছিল পয়মন্ত ঘুঁটি; লাবণ্যময়ী নারী, ওর চেয়েও যার বহুগুণ বেশি উত্তাপ আর ধী-শক্তি, ওর চেয়েও অনেক উঁচুতে যার স্থান, সে যে কেমন করে ওর প্রেমে পড়ল তার হদিশ নেই, আর কেনই-বা সরে দাঁড়াল তারও হদিশ নেই।

নিজেকে ও প্রশ্ন করেছে, কারণটা কি তাহলে এই যে এ-যুগের পক্ষে ও নেহাতই ক্ষুদ্রাবয়ব?—এমন-কি যখন ও লড়াই করছে তখনও নিতান্ত সাদাসিধেভাবেই লড়ছে, লড়াইটা যেন তার কাছে বুক-কিপিং অথবা ফাইলে নাম টোকার মতো একটা মামুলি জিনিসমাত্র! এমন লোক সে অনেক দেখেছে যারা ভালো হোক্ মন্দ হোক্ জোর করে স্বীকৃতি পেয়েছে, রক্তাক্ত লড়াইয়ের ময়দানে বিশাল দৈত্যের মতো বুক ফুলিয়ে হেঁটেছে।...'ইভান ইলিয়িচ, দুশমনকে কেন তুমি সারা প্রাণমন দিয়ে ঘৃণা করতে পারো না, অন্ততপক্ষে মরণের ভয়ে সত্যি সত্যি শিউরে ওঠো না কেন?'

এই সবের ফলে ইভান ইলিয়িচ একেবারে মুষড়ে পড়ে। ও যে রেজিমেন্টের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, বুদ্ধিমান, আর সাহসী সে-সম্পর্কে

ওর কোনো চেতনাই নেই। সবরকম বিপজ্জনক কাজকর্মের ভার দেয়া হয় ওরই ওপর, আর সে-গুলো ও পালনও করে চমৎকার কৃতিত্বের সঙ্গে।

সার্গি সার্গিয়েভিচের সঙ্গে আলাপে গভীর চিন্তার উদ্রেক হয়েছে ওর মনে। হাল্কাস্বভাবের ওই কম্যাণ্ডারটিও তাহলে অকথ্য যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পায় নি।......আর মিশা সলোমিন...চেরতোগনভ্...এবং আরও অনেকে যাদের সঙ্গে ওর নেহাতই পথের সাক্ষাৎ, তারা? সময়ের সঙ্গে তারা সবাই তাল রেখে এগিয়ে চলেছে, বিপুলতা নিয়ে, পারিপাট্যহীন কর্কশতা নিয়ে, আত্মিক নিপীড়নের দ্বারা বিকৃতরূপ হয়ে। ব্যথাকে ভাষা দেবার মতো শব্দ নেই ওদের মুখে, হাতের রাইফেল ছাড়া আর কিছুই নেই...কেউ কেউ উগ্র লাম্পট্যের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ খুঁজেছে, কিন্তু তারপরেই এসেছে উগ্রতর আত্মধিক্কার।...এই তো তোমার রাশিয়া—এই তো বিপ্লব...

"কমরেড কম্যাণ্ডার—উঠুন!"

তেলেগিন উঠে বসল বাঙ্ক্‌টার ওপর। স্তেপের দিকচক্রবালে সোনার পিণ্ডের মতো স্থির হয়ে ছিল সূর্যটা, তারই আলো উঁকি দিচ্ছে গাড়ির জানলায়। স্তেপভূমির রং এখন হাঁসের ছানার নরম পালকের মতো। সৈনিকটির লালদাড়ি-ভরা মুখখানা দেখাচ্ছিল ভোরের সূর্যের মতোই লাল টকটকে। ইভান ইলিয়িচকে আরেকবার ধাক্কা দিয়ে বলল সে :

"রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার এখুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।"

সাপোঝ্‌কভের কামরাটিতে এখনও জ্বলছে সেই ভ্যাপসা-গন্ধওয়ালা তেলের বাতিটা। ভেতরে রয়েছে ঃ গিম্‌জা; কমিসার সকলোভ্‌স্কি—কালোচুল, ক্ষয়-রোগীর মতো চেহারা, কালো চোখ দুটোতে অনিদ্রার জ্বালা; দু'জন ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার; কয়েকজন কোম্পানী কম্যাণ্ডার এবং সৈনিক কমিটির প্রতিনিধি একজন, —লোকটির মুখে ফুটে উঠেছে একটা বিদ্রোহের ভাব, প্রায় মর্মাহতের ভাবই বলা চলে।...সবাই ধূমপান করছিল। সার্গি সার্গিয়েভিচের পরনে এখন টিউনিক, কোমরের বেলটে পিস্তলের খাপ। কম্পিত হাতে সে একটা টেলিগ্রাফের ফিতে ধরে আছে :

"...শত্রু অতর্কিতভাবে স্টেশন দখল করিয়া লওয়ার ফলে আমাদের সৈন্য-বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সম্মুখে এখন দুইটি বিপদ..."

সাপোঝ্‌কভ যখন ঘ্যাঁসঘেঁসে গলায় পড়ছিল এই কথাগুলো ঠিক সেই সময় কামরার দরজায় এসে দাঁড়াল ইভান ইলিয়িচ।

"......বিপ্লবের নামে অনুরোধ, শ্বেত দস্যুদের সহৃদয় করুণার কবলে ছাড়িয়া দিলে যে-হতভাগ্য জনসাধারণের উপর নামিয়া আসিবে অনিবার্য মৃত্যু, হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের বন্যা, তাহাদের নামে অনুরোধ, আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে নূতন সৈন্যদল পাঠাইয়া দিন!"

"কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের হুকুম না পেলে আমরা কি করতে পারি?"—চেঁচিয়ে বলল সকলোভ্‌স্কি ঃ "আর একবার চেষ্টা করে দেখি তার-মারফত যোগাযোগ করা যায় কিনা।"

"যাও তাহলে, তাই চেষ্টা করো",—একটা অলক্ষুণে ধরনের জোর দিয়ে গিম্‌জা বলল কথাটা। (সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে)। "কি করতে হবে আমি বলছি আপনাদের—চারজন লোককে নিন, এই তেলেগিনকেও সঙ্গে নিন, তারপর ট্রলিতে চেপে ছুটে চলে যান সদর দপ্তরে। হুকুম না নিয়ে ফিরবেন না যেন। সাপোঝ্‌কভ্‌, কম্যান্ডার-ইন-চীফ সরোকিনকে একটা চিঠি লিখে দাও তো।"

একটা ঘেসো ঢিবির চুড়োয় দাঁড়িয়ে একজন ঘোড়সওয়ার; হাতের আড়াল থেকে সে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল রেল লাইনের দিকটা—ধুলোর একটি মেঘ এগিয়ে আসছিল সেদিক থেকে।

মেঘটা যখন একটা কাটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে, ঘোড়সওয়ারটি প্রথমে তার সামনের পা দিয়ে ঘোড়াটাকে স্পর্শ করল, তারপর রেকাবটা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাদামী রঙের রোগা মর্দা ঘোড়াটা ঝাঁকড়া-মাথা দুলিয়ে ঘুরে নেমে গেল ঢিবি থেকে। ঢিবিটার নিচে দু'দিকেই ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর অফিসারদের একটা পল্টন ইতস্তত ছড়িয়ে শুয়ে আছে টাটকা তৈরি মাটির স্তূপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে।

জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে ফন মেক বলল—"একটা ট্রলি।" ঘোড়াটার হাঁটুর ওপর চাবুকের বাঁট দিয়ে গুঁতো মেরে সে হুকুম করল শুয়ে পড়বার জন্য। একগুঁয়ের মতো ঘোড়াটা প্রথমে খুর দিয়ে মাটি ঘষল, কানদুটো নাড়লো, তারপর অবশ্য বশ মেনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুয়ে পড়ল—মুখের বন্ধনীটা মাটি স্পর্শ করেছে। রোগা ঘোড়াটার একপাশ ক্রমাগত ফুলে উঠছিল আর চুপসে যাচ্ছিল।

ফন মেক তখন ঢিবিটার ওপরে গিয়ে রশ্‌চিনের পাশে বসেছে। ঠিক সেই সময় কাটা পাহাড়ের আড়াল থেকে আবার দৃষ্টিপথে এল সেই ট্রলিটা—এখন পরিষ্কার দেখা গেল গ্রেটকোট-পরা ছ'জন লোককে বসে থাকতে।

"লালগুলো এসেছে!" ফন মেক বলল : "ওই রকমই আন্দাজ করে-ছিলাম!" বাঁ দিকে মাথা ঘুরিয়ে হুকুম করল সে : "স্কোয়াড!" ডান দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে বলল : "প্রস্তুত হও! চলন্ত জিনিসটার ওপর দ্রুত গুলি চালাতে হবে। ফায়ার!"

ঢিবিটার আশেপাশের বাতাস একটা প্রচণ্ড আর্তনাদে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, মনে হল যেন একটা কলপ-দেওয়া সুতীর কাপড় পড়্‌পড়্‌ করে চিরে ফেলা হল। ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে দেখা গেল একটি লোক ট্রলি থেকে ছিটকে পড়েছে, একদম গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে রেল লাইনের পাশের ঢালু জমি বেয়ে, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে ঘাসগুলো।

দ্রুত-বিলীয়মান ট্রলিটা থেকে পাঁচজন লোক একসঙ্গে গুলি চালাল—তিনটে রাইফেল আর দুটো রিভলবারের গুলি। আর মাত্র একমিনিট বাদেই ট্রলিটা আরেকটা কাটা পাহাড়ের আড়ালে সিগন্যাল-বাক্সের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ফন মেক তার ঘোড়ার চাবুকটা সাঁই-সাঁই করে ঘুরিয়ে পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল ঃ

"ওরা যে সরে পড়ল! কাক মেরে হাত মক্শো করছিলে নিশ্চয়! ছি-ছি-ছি-ছি!"

রশ্চিনের খ্যাতি ছিল পাকা হাতের টিপের জন্য। ট্রলির একফুট সামনে রাইফেলের নিশানা ঠিক করে ও লক্ষ্য করতে লাগল ঢ্যাঙা, চওড়া-কাঁধ, দাড়িগোঁফ-কামানো লোকটিকে—ওই লোকটিই নিশ্চয় কম্যান্ডার। "ঠিক তেলেগিনের মতো দেখতে!" মনে মনে বলল সে : "ও-ই যদি হয় তাহলে যে কী বিশ্রী ব্যাপার হবে!"

রশ্চিন গুলি করল। লোকটার টুপি উড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ট্রলিটাও অদৃশ্য হয়ে গেল দ্বিতীয় কাটা পাহাড়টার আড়ালে। ফন মেক তার চাবুকটা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

"বেজন্মাগুলো! একপাল বেজন্মা! তোমরা তো বন্দুক-ছুঁড়নেওয়ালা নও মশাইরা, তোমরা হলে একদল জারজ।"

বলতে বলতে চোখদুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে—যেন কোনো নিদ্রা-হীন খুনীর চোখ। তাঁকে ক্রমাগত গালাগালি করতে দেখে অফিসাররা অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে পাৎলুনের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বিড় বিড় করে বলল :

"কথাগুলো একটু ভেবে চিন্তে বোলো ক্যাপ্টেন, তোমার চেয়েও উঁচু পদের লোক এখানে রয়েছেন।"

আর এক রাউন্ড নতুন কার্তুজ পরাতে গিয়ে রশ্চিন টের পেল তার হাত-দুটো কাঁপছে। কেন কাঁপছে? লোকটাকে ইভান তেলেগিন বলে মনে হয়েছে নিছক সেই কারণে? বাজে কথা! তেলেগিন তো মস্কোতেই রয়েছে, তাই না?

কম্যান্ডার সকলোভ্স্কি আর তেলেগিন গ্রাম কাউন্সিলের দোতলা-বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। তেলেগিনের মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা। সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, গ্রাম কাউন্সিলের এই বাড়িটাও একটা গির্জেঘরের সামনে, চত্বরটা পাথর-বাঁধানো নয়, এককালে সেখানে মেলা বসত। দোকানঘর-গুলোর ওপর এখন তক্তা-আঁটা, জানলা ভাঙা, গরাদেগুলো চুরি হয়ে গেছে। গির্জে-ঘরটাকে সামরিক হাসপাতাল বানানো হয়েছিল, গির্জের প্রাঙ্গণে তারের ওপর টাঙানো সৈনিকদের কিছু কাপড়-চোপড় হাওয়ায় উড়ছিল পত্পত্ করে।

গ্রাম কাউন্সিলের সামনের হলঘরটায় কম্যান্ডার-ইন-চীফ সরোকিনের সদর দপ্তর—এখানে ওখানে পড়ে আছে সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজপত্র। সিঁড়ির গোড়ায় একটা কাঠ-বাঁকানো চেয়ারে বসেছিল একজন লাল বাহিনীর লোক, দুই হাঁটুর মাঝখানে রাইফেলটি রেখে সে চোখ মুদে গুন্গুন্ করে গাইছিল স্তেপ-প্রান্তরের গান। চোয়ালের হাড়দুটো উঁচু, আর পিছন দিকে ঠেলে-দেওয়া লাল ফিতে-বাঁধা টুপিটার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল এক গুচ্ছ চুল—'ঝানু' মিলিটারির লোকদের যেটা সুনিশ্চিত পরিচয়।

"কমরেড সরোকিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই", দ্রুতকণ্ঠে বলল সকলোভ্স্কি : "কোথায় উনি?"

সৈনিকটি চোখ খুলল। একঘেয়ে তন্দ্রাতুর অবসাদে নিষ্প্রভ চোখদুটো। বেয়াড়াগোছের থ্যাবড়া-নাক। সকলোভ্স্কিকে সে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল—ওর মুখ, ওর কাপড়-চোপড়, ইস্তক বুটজোড়া। তারপর দেখল তেলেগিনকে, ওই একইরকম ভাবে। অধৈর্য হয়ে কমিসার এগিয়ে গেল তার দিকে।

"উত্তর দাও কমরেড, দয়া করে। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই খুব জরুরি প্রয়োজনে।"

"কর্তব্যরত শান্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই", কপাল-ঢাকা চুলওয়ালা যুবকটি বলল।

"উঃ ভগবান! এমন একেকটি কেতা-কানুনওয়ালা শুয়োরকে সদর দপ্তর-গুলোয় না রাখলে যেন ওদের চলে না!"—খেপে গিয়ে বলল সকলোভ্স্কি : "শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আর্জি করছি কমরেড : কমরেড সরোকিন কি ভেতরে আছেন?"

"বলতে পারি না।"

"তাহলে চীফ-অব-স্টাফ কোথায়? তিনি কি অফিসে?"

"হ্যাঁ—অফিসেই আছেন।"

সকলোভ্স্কি ইভান ইলিয়িচের জামার হাতা ধরে সিঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। শান্ত্রীটা কিন্তু চেয়ার ছেড়ে না উঠেই, একপাশে ঝুঁকে পড়ল। দুই হাঁটুর মাঝখান থেকে টেনে বার করল রাইফেলটা।

"কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?"

"কোথায়? চীফ-অব-স্টাফের কাছে!"

"পাস আছে সঙ্গে?"

ট্রলিতে চেপে তারা ছুটে এসেছে কোন্ কাজের তাড়ায়, শান্ত্রীর কাছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমিসারের মুখ দিয়ে বিলক্ষণ গাঁজলা উঠে এল। শান্ত্রীটা আগাগোড়া চুপ করে তার কথাগুলো শুনল—কেবল তার চোখজোড়া একবার মেশিন-গানের ওপর, একবার দেয়ালে টাঙানো নির্দেশনামা, হুকুম, নোটিশ ইত্যাদির ওপর ঘুরতে লাগল।

অবশেষে সে বিরক্তিভরে বলে উঠল : "আপনাদের মতো শিক্ষিত লোক, আপনাদের অন্তত ভালো করে জানা উচিত ছিল! যদি সঙ্গে পাস থাকে তাহলে যেতে পারবেন, যদি না থাকে তাহলে কুকুরের মতো গুলি করে মারতে বাধ্য হব।"

মেনে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না তখন—অবশ্য চত্বরটার উল্টো দিকে নিশ্চয়ই কোথাও পাস বিলি হচ্ছিল, কিন্তু সেখানে গেলেও নিশ্চয়ই তাদের বলা হত যে কম্যাণ্ডাণ্ট সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছেন। সকলোভ্স্কি বড়ো হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল নাভি পর্যন্ত চেরা শার্ট গায়ে একটি হ্রস্বকায় মূর্তি চত্বর ছেড়ে দরজার ভেতরে একদৌড়ে ঢুকে গেল প্রচণ্ড বুটের আওয়াজ করতে করতে।

"মিত্‌কা—সাবান বিলি করা হচ্ছে......"

শান্ত্রীটা যেন এক দমক ঝোড়ো বাতাসে চেয়ার থেকে ছিটকে গেল। প্রবেশ-পথের দিকে এগিয়ে গেল সে এক লাফে। সকলোভ্স্কি আর তেলেগিন এবার দোতলায় উঠে গেল বিনা বাধায়। সিল্কের ব্লাউজ-পরা ফুটফুটে কয়েকটি প্রাণী ওদের একবার ডানদিকের রাস্তা, একবার বাঁদিকের রাস্তা দেখিয়ে দেবার পর অবশেষে ওরা এসে পোঁছুলো চীফ-অব-স্টাফের অফিস-কামরায়।

সেখানে চমৎকার পোশাক-পরা একজন মিলিটারির লোক ছেঁড়া একটা সোফার ওপর সম্পূর্ণ গা এলিয়ে দিয়ে মনোযোগসহকারে নিজের হাতের নখগুলো পরীক্ষা করছিলেন। ওদের তিনি অভ্যর্থনা করলেন মাত্রাতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে, খুব সাবধানে 'প্রোলেতারিয়ান' কায়দা বজায় রেখে—হরদম ব্যবহার করছিলেন 'কমরেড' কথাটা, কিন্তু তাঁরা মুখে সম্বোধনটা শোনাচ্ছিল হুবহু 'কাউণ্ট' সকলোভ্স্কি আর 'প্রিন্স' তেলেগিনের মতো। ওরা কী উপলক্ষ্যে এসেছে সব কথা ভাল করে শোনার পর অসংখ্যবার মাফ চেয়ে তিনি হাঁটু পর্যন্ত ফিতে-বাঁধা উঁচু ট্যান বুট-জোড়া মস্‌মস্ করতে করতে অন্য ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘরে ফিস্‌ফিসানির আওয়াজ শোনা গেল, তারপর ঝপ্ করে বন্ধ হয়ে গেল দূরের একটা দরজা—তারপর সব নিস্তব্ধ।

সকলোভ্স্কি যখন তেলেগিনের দিকে চাইল ওর চোখদুটো যেন জ্বলছে।

"এসবের কিছু মাথামুণ্ডু বুঝেছ? কোথায় এলাম আমরা? শ্বেতরক্ষীদের সদর দপ্তর নাকি?"

হাড্ডিসার কাঁধদুটো উঁচু করে যেন বিস্ময়ের ঘোরে সে ওইভাবেই স্থাণুর মতো হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাশের ঘরে আবারও ফিস্‌ফিসানির শব্দ। তারপর হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, চীফ-অব-স্টাফ প্রবেশ করলেন এবার। কোঁচকানো ভুরু, মধ্যবয়েসী, ভারি-গড়নের লোক, প্রকাণ্ড কপালের ওপর থেকে বাকী চুল-গুলোও পশ্চাদপসরণ করছে; পরনে সৈনিকের মোটা উর্দি, প্রকাণ্ড পেটটির ওপর চেপে রয়েছে একটি ককেশীয় কোমরবন্ধ। তেলেগিনের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে এক নজর দেখে নিয়ে, সকলোভ্স্কির দিকে মাথাটি ঝুঁকিয়ে তিনি ডেস্কের ধারে বসলেন। লোমশ হাতখানা সামনের দিকে ছড়িয়ে রাখলেন বৈশিষ্ট্যসূচক ভঙ্গীতে। কপালটা তাঁর ঘেমে উঠেছে, পেট পুরে সদ্য পান-ভোজন করে উঠলে যেমনটি হয়। ওরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অনুভব করতে পেরে তিনি তাঁর সুশ্রী, মাংসল মুখটার মধ্যে কঠিনতর একটা গাম্ভীর্যের ভাব আনলেন।

"ডিউটিতে যে কমরেডটি রয়েছেন তাঁর কাছে এইমাত্র শুনলাম যে আপনারা খুব জরুরি প্রয়োজনে এসেছেন, কমরেডস্",—একটা শীতল-কঠিন গাম্ভীর্যের ভাব এনে বললেন তিনি, "আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনারা সোজা-সুজি তার করার সহজ পথটা বেছে নিতে পারলেন না কেন—না রেজিমেন্টের কম্যান্ডার, না আপনি স্বয়ং, কমরেড কমিসার।..."

"সোজা পথে আপনাকে আমি তিন-তিনবার পাবার চেষ্টা করেছি,"—বলল সকলোভ্স্কি। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে সে তার জেব থেকে টেলিগ্রাফের

ফিতেটা বার করে চীফ-অব-স্টাফের নাকের কাছে ধরল ঃ "আমাদের কমরেডরা যখন ওদিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন কি করে আমরা চুপ করে বসে থাকি...ফৌজী সদর দপ্তর থেকে আমরা তো কোনো হুকুম পাইনি। এদিকে সাহায্যের জন্য আমাদের কাছে আকুলভাবে আবেদন জানানো হচ্ছে। 'সর্বহারার মুক্তি' নামের রেজিমেন্টটা প্রায় ধ্বংস হতে চলল, ওদের পেছনে রয়েছে দু'হাজার উদ্বাস্তু।..."

তাচ্ছিল্যভরে একবার ফিতেটার দিকে তাকিয়ে চীফ-অব-স্টাফ সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের ওপর, প্রকাণ্ড কালির দোয়াতটাকে ঘিরে কুঁকড়ে পড়ে রইল সেটি।

"আমরা ভাল করেই জানি কমরেড, 'সর্বহারার মুক্তি' রেজিমেন্টটার ঘাঁটির কাছেই এখন যুদ্ধ চলছে।...আমি আপনাদের উৎসাহ, আপনাদের বিপ্লবী আবেগের তারিফ করছি।" (শব্দগুলোকে যেন হাতড়ে খুঁজছিলেন তিনি) "কিন্তু আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, ভবিষ্যতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করবেন না...বিশেষ করে শত্রুর এই ধরনের অভিযানগুলো যখন নিতান্তই সাময়িক প্রকৃতির।......এক কথায়, সবরকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে, এবার আপনারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে নিজের নিজের কাজে ফিরে যেতে পারেন।"

বলতে বলতে মাথাটা সোজা করলেন তিনি। চোখের দৃষ্টি কঠিন এবং শান্ত। তেলেগিন বুঝেছিল আর কোনো কথা বের হবে না তাঁর মুখ থেকে। সে উঠে পড়ল। সকলোভ্স্কি কিন্তু স্থির হয়েই বসে রইল, যেন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

"এই ধরনের জবাব নিয়ে আমি রেজিমেন্টের কাছে ফিরে যেতে পারব না," তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল সে ঃ "সৈন্যরা আজই একটা সভা ডেকেছে, আজই গোটা রেজিমেন্ট বীরের মতো ছুটে যাবে 'সর্বহারা'দের সাহায্য দেবার জন্য।...এই আমি আপনাকে বলে রাখছি কমরেড, সভায় আমি আক্রমণ চালানোর পক্ষেই কথা বলব।..."

চীফ-অব-স্টাফ একেবারে লাল হয়ে উঠলেন। চওড়া কেশবিরল কপালটা চক্‌চক্ করে উঠল। সশব্দে চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফৌজী পাতলুনটা ঝুলে পড়েছে থলির মতো। কোমরবন্ধে হাতদুটো গুঁজলেন।

"আপনার কাজের জন্য আপনি ফৌজের বিপ্লবী আদালতে কৈফিয়ত দেবেন, কমরেড! মনে রাখবেন এটা উনিশ-শো-সতের সাল নয়!"

"আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না, কমরেড!"

"চুপ করুন!"

আবার খুলে গেল দরজাটা। এবারে ঢুকলেন দীর্ঘকায়, সহজেই নজরে পড়ার মতো দোহারা চেহারার একজন লোক। পরনে খুব মিহি কাপড়ের নীল সিরকাশিয়ান টিউনিক। কপালের ওপর এসে পড়েছে কালো চুল, গোঁফজোড়া ঝুলে পড়েছে, আর সুন্দর মুখটার ওপর হালকা লালের ছোপ পড়েছে,—প্রচুর মদ্যপান আর পর-নির্যাতনে আসক্তি থাকলে যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে। ঠোঁট-দুটো আর্দ্র আর লাল, কালো চোখের তারা দুটো বিস্ফারিত। টিউনিকের বাঁ-

দিকের হাতাটা দুলিয়ে তিনি সিধে চলে এলেন সকলোভ্স্কি ও তেলেগিনের সামনে। একটা বন্য দৃষ্টিতে তাকালেন ওদের মুখের দিকে। তারপর তিনি ঘুরলেন চীফ-অব-স্টাফের দিকে, রাগে তাঁর নাকের ফুটো কাঁপছে।

"আবার সেই সাবেকী হুকুমতের চাল ধরেছ! এভাবে লোকের কাছে 'চুপ করুন!' বলে চেঁচাবার মানেটা কি? ওঁদের যদি গলতি হয়ে থাকে, তবে ওঁরা গুলি খেয়ে মরবেন।...কিন্তু আপনার এই জেনারেল-মার্কা মেজাজ আমি বরদাস্ত করব না..."

চীফ-অব-স্টাফ চুপচাপ মাথা নিচু করে হজম করে গেলেন তিরস্কারটা। জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর—এ যে স্বয়ং কম্যান্ডার সরোকিন।

"বসুন আপনারা কমরেডস্, শুনছি আমি আপনাদের কথা,"—জানলার নিচের কাঠটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে বললেন সরোকিন।

সকলোভ্স্কি আবার তাদের আসার কারণটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল ঃ ভারনাভ রেজিমেন্টের কাছেই 'সর্বহারা' রেজিমেন্টের ঘাঁটি, ওদের অবিলম্বে সাহায্য দেবার জন্য ভারনাভ রেজিমেন্টকে অনুমতি দিতে হবে। বিপ্লবী কর্তব্য তো বটেই, তা ছাড়া সাধারণবুদ্ধিতে দেখতে গেলেও এ-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে ঃ 'সর্বহারা'রা যদি অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে ভারনাভ রেজিমেন্টও মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সরোকিন সামান্য এক মুহূর্তের জন্যই জানলার কাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপরেই তিনি এক দরজা থেকে আরেক দরজা অবধি পায়চারি করতে শুরু করলেন আর মাঝে মাঝে ছোটখাটো দু'একটা প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগলেন। যখনই তিনি সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার ঘন চুল ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। সৈন্যরা তাঁকে ভালবাসতো তাঁর উদ্দীপনা আর সাহসের জন্য। তিনি জানতেন কেমন করে সভায় বক্তৃতা দিতে হয়। তখনকার দিনে সামরিক বিজ্ঞানের বদলে এই ধরনের গুণ থাকলেও চলে যেত। সরোকিন একসময় ছিলেন কসাক অফিসার, ক্যাপ্টেনের পদে। য়ুদেনিচের অধীনে ট্রান্স-ককেসিয়ায় লড়াইও করেছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর কুবানে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের গ্রাম পেত্রোপাভ্লোভ্স্কায়ায় একটি গেরিলা ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলেন। একাতেরিনোদার অবরোধের সময় এই ব্যাটালিয়নটি সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে। অবিলম্বেই তাঁর গ্রহ একেবারে তুঙ্গে উঠে গেল। মান-যশের ঠেলায় তাঁর মাথাটি গেল বিগড়ে। মনের পাশব প্রবৃত্তিগুলো এখন ফেনিয়ে উঠে উছলে পড়তে লাগল—লড়াইয়েরও কমতি নেই, মদ-ফূর্তিরও শেষ নেই। আর চীফ-অব-স্টাফও এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে সুন্দরী মেয়েরা তাঁকে সবসময় ঘিরে রাখে, বিলাস আর লাম্পট্যের সব রকম উপচারে তাঁকে যেন ডুবিয়ে রাখা হয়।

"আমার স্টাফের কাছ থেকে কী জবাব পেয়েছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সকলোভ্স্কি কথা বন্ধ করল। নোংরা দলা-পাকানো একটা রুমাল দিয়ে উত্তেজনাভরে কপালটা মুছল সে।

চীফ-অব-স্টাফ এবার প্রশ্নটির উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে এলেন।

"আমি জবাব দিয়েছিলাম যে 'সর্বহারার মুক্তি' রেজিমেন্টের সাহায্যের জন্য আমরা সব রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছি। তাছাড়াও আমি বলেছিলাম, ফৌজের সদর দপ্তরের হুকুমের মধ্যে বাগড়া দিচ্ছে ভারনাভ রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর—এ জিনিসটা কোনোক্রমেই বরদাস্ত করা চলে না, আর তাছাড়া, মিছেমিছি আতংকও ছড়ানো হচ্ছে।"

"এভাবে জিনিসটাকে দেখা ঠিক হয়নি কমরেড," সরোকিন বললেন অপ্রত্যাশিত নরম সুরে ঃ "শৃঙ্খলা আমাদের মানতে হবে নিশ্চয়ই...কিন্তু তোমার ওই শৃঙ্খলার চেয়েও হাজারগুণ জরুরি জিনিস থাকতে পারে তো!...জনতার ইচ্ছা বলে একটা বস্তু আছে! বিপ্লবী আবেগকে রীতিমত উৎসাহ দিতে হবে, এমন-কি যদি তা তোমার বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যায় তবুও।...ভারনাভ রেজিমেন্টের অভিযান যদি কোনো কাজে না আসে তাতেই বা কী! হলই-বা তা ক্ষতিকর! কীই-বা ঘোড়ার ডিম হবে তাতে! বিপ্লব তো চলছে এখন। আজকালকার দিনে যদি ওদের চটাও ওরা সিধে মিটিং ডাকবে—আমি তো জানি এই মাথাগরম লোকগুলোকে, চীৎকার করে বলতে থাকবে ওরা—এক ঢোঁক মদের জন্য আমি ফৌজটাকে ডোবাচ্ছি।"

চুল্লীটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সকলোভ্স্কির দিকে তিনি যে-দৃষ্টিতে তাকালেন, মনে হল যেন রাগে জ্বলছে তাঁর চোখদুটো।

"রিপোর্ট দাখিল করো!"

সংগে সংগে তেলেগিন পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ডেস্কের ওপর রাখল।

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে কম্যান্ডার-ইন-চীফ একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর কলমটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লিখতে শুরু করলেন ঃ

"পূর্ণ সামরিক শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হইয়া বিপ্লবী কর্তব্য পালনের জন্য ভারনাভ রেজিমেণ্টকে আমি হুকুম দিতেছি।"

কিন্তু কাগজটা যখন তিনি চীফ-অব-স্টাফের সামনে এগিয়ে ধরলেন, চীফ-অব-স্টাফ পেছিয়ে গেলেন এক পা। এতক্ষণ তিনি একটা ব্যঙ্গের হাসির সংগে সরোকিনকে লক্ষ্য করছিলেন। পেছনে হাত গুটিয়ে তিনি বললেন ঃ

"তুমি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারো কিন্তু এই হুকুম আমি গ্রহণ করতে পারছি না।..."

কথা শেষ হবার আগেই ইভান ইলিয়িচ ছুটে এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরল সরোকিনের হাতের কব্জীটা—রিভলবার তোলার আগেই যথাসময়ে বাধা দিতে পারা গেছে। সকলোভ্স্কি চীফ-অব-স্টাফকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। চারজনেই রীতিমত হাঁপাতে লাগল। সরোকিন এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে রিভলবারটা পকেটে গুঁজলেন। তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে

গেলেন। যাওয়ার সময় দরজাটা এমন জোরে বন্ধ করে গেলেন যে খানিকটা চুণ-বালির আস্তর খসে পড়ল।

দরজাগুলোয় একের পর এক দুম-দাম করে আওয়াজ হতে লাগল, কম্যান্ডার-ইন-চীফের ক্রুদ্ধ পায়ের শব্দ ক্রমেই দূরে মিলিয়ে গেল।

চীফ-অব-স্টাফ এবার সান্ত্বনার সুরে ভারিগলায় বলতে শুরু করেছেন ঃ

"আমি আপনাদের বলছি কমরেডস্—এই হুকুমনামাটার ওপর যদি আমি সই দিতাম তাহলে আর দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকতো না।"

"দুর্ভাগ্য কেন?"—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল সকলোভ্স্কি।

অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকালেন চীফ-অব-স্টাফ।

"আন্দাজ করতে পারছেন না আমার বক্তব্যটা?"

"না।"

সকলোভ্স্কির চোখের কোণাদুটো কেঁপে উঠল।

"আমাদের ফৌজের কথাই বলছি..."

"হ্যাঁ, কী হয়েছে?"

"একজন রেজিমেন্টের কমিসারের কাছে সামরিক গোপন-তথ্য প্রকাশ করার কোনো অধিকার নেই আমার। আপনি তো তা নিজেই জানেন কমরেড, তাই না? এইরকম আচরণের জন্য আপনিই তো প্রথম আমায় গুলি করে মারার ব্যবস্থা করবেন।...কিন্তু এর মধ্যেই তো আমরা অনেকখানি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। বেশ, তাহলে আসুন।...সব দায়িত্ব কিন্তু আপনারই থাকল..."

দেয়ালে একটা মানচিত্র টাঙানো ছিল, ছোট ছোট নিশান আঁটা রয়েছে তাতে। চীফ-অব-স্টাফ এগিয়ে গেলেন সেই মানচিত্রটার দিকে। সকলোভ্স্কি আর তেলেগিনও ততক্ষণে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চীফ-অব-স্টাফ টিউনিকের নিচে তাঁর কাঁধের হাড় দুটো কুঁচকে রইলেন—একেবারে ঘাড়ের কাছে দুটো মুখ থেকে গরম নিঃশ্বাস পড়ছে, স্পষ্টতই তেমন আরামবোধ করছিলেন না তিনি। যাই হোক, পকেট থেকে একটা নোংরা দাঁত-খোঁচানি বের করে তিনি সেটির চিবোনো দিকটা মানচিত্রের ওপর ধরলেন। তারপর দক্ষিণের দিকের ত্রিবর্ণ পতাকাগুলো থেকে শুরু করে ঘন জমাটবাঁধা লাল পতাকাগুলো পর্যন্ত কাঠিটা বুলিয়ে নিয়ে বললেন ঃ

"এই সব জায়গা দিয়ে শ্বেতরক্ষীরা রয়েছে।"

"কোথায়? কোন্ জায়গায়?"

সকলোভ্স্কি মানচিত্রটার উপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে অবাক চোখদুটো বুলিয়ে নিল সেটার গায়—"ও, এটি তো তর্গোভায়া..."

হ্যাঁ—তর্গোভায়াই বটে। এ-জায়গাটা যখন হাতছাড়া হবে, শ্বেতরক্ষীদের কাছে রাস্তা তখন প্রায় পরিষ্কার।..."

"বুঝতে পারছি না। আমরা ভেবেছিলাম শ্বেতরক্ষীরা অনেক মাইল দূরে ...উত্তর দিকে রয়েছে..."

"আমরাই তেমনটি ভেবেছিলাম কমরেড কমিসার—কিন্তু শ্বেতরক্ষীরা যে ভেবেছিল অন্যরকম। বিভিন্ন তরফ থেকে এখন তরগোভায়ার ওপর আক্রমণ চলেছে। শ্বেতরক্ষীদের এরোপ্লেন রয়েছে, ট্যাঙ্ক রয়েছে। এ তো কর্নিলভের দল নয়।...ভেতরের দিকের লাইনগুলোতে কাজ করছে তারা, ইচ্ছেমতো আঘাতও করতে পারছে। ওদের হাতেই এখন গিয়ে পড়েছে আক্রমণের উদ্যোগ......"

"দ্মিত্রি শেলেস্তের লৌহ ডিভিশনটা তো এখন তরগোভায়ার উত্তরে," বলল তেলেগিন।

"গুঁড়ো হয়ে গেছে......"

"আর ঘোড়সওয়ার ব্রিগেডটা?"

"গুঁড়ো......"

সকলোভ্স্কি গলা বাড়িয়ে দিল আরো ভাল করে মানচিত্রটা দেখবার জন্য।

"দারুণ আত্ম-সংযম আপনার, কমরেড," বলল সে ঃ "আপনি তো দেখছি আগে থাকতেই তরগোভায়ার পতনটা মেনে নিয়েছেন স্বচ্ছন্দে। এ ডিভিশনটা গুঁড়ো, সে-ডিভিশনটা গুঁড়ো!......" চীফ-অব-স্টাফের দিকে ঘুরে বলল সে ঃ "আর আমাদের ফৌজটির কি অবস্থা?"

"উচ্চতম কর্তৃপক্ষের হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছি। কমরেড কালিনিনই জানেন তাঁর মতলবটা কী। আপনার কি মনে হয়?—সদর-দপ্তর কি টেবিলে ঘুষি মেরে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আক্রমণের হুকুম আদায় করে নিতে পারে? যুদ্ধ তো আর মিটিং নয়, সেটি জানবেন।"

চীফ-অব-স্টাফ একটা সূক্ষ্ম হাসি হাসলেন। সকলোভ্স্কি দম বন্ধ করে তাঁর প্রশান্ত স্থূল মুখটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। এ দৃষ্টির সম্মুখে চীফ-অব-স্টাফ কিন্তু ঘাবড়ালেন না।

"এই রকমই অবস্থাটা, বুঝেছেন কমরেডস্,"—ডেস্কের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন তিনি ঃ "আর এই জন্যই ফ্রণ্ট থেকে একটা ইউনিটকেও সরাবার অধিকার আমার নেই, তা সে যতোই যুক্তিসঙ্গত আর জরুরি মনে হোক্ না কেন। চূড়ান্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি আমরা। সুতরাং আপনি সিধে ফিরে চলে যান নিজের ইউনিটে। এতক্ষণ আপনাকে যা যা সব বললাম সবই একান্ত গোপনীয়। ফৌজের মধ্যে পূর্ণ শান্তি বজায় রাখতে হবে। আর 'সর্বহারার মুক্তি' রেজিমেণ্টটার ভাগ্য নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, এইমাত্র আমি ভালো খবর পেয়েছি......"

চীফ-অব-স্টাফের ভুরুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর বঁড়শির মতো নাকটার গোড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি বিদায় দিলেন অতিথিদের। সকলোভ্স্কি আর তেলেগিন বেরিয়ে এল অফিস থেকে। সামনের ঘরে ডিউটি-রত অফিসারটি তখন

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নখ পরিষ্কার করছিলেন। বিদায়ী অতিথিদের দিকে তাকিয়ে তিনি সবিনয়ে মাথাটা নোয়ালেন।

"শুয়োর কোথাকার!" —ফিসফিসিয়ে বলল সকলোভ্স্কি।

যখন ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তেলোগিনের জামার হাতটা ধরে সকলোভ্স্কি বলল ঃ

"কি হে—কেমন মনে হল ব্যাপারটা?"

"কেতা-কানুনের দিক থেকে দেখতে গেলে লোকটা ঠিকই বলেছে। কিন্তু আসলে এ হ'ল সাবোতাজ, নির্ঘাৎ।"

"সাবোতাজ? না হে, তা নয়......ও আরো বড়ো কিছুর তালে রয়েছে। যাই, ফিরে গিয়ে গুলি করি মারি লোকটাকে!"

"থামো, সকলোভ্স্কি! বোকার মতো কোরো না!"

"বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়, জেনে রেখো তা; এখানে কতগুলো বেইমান জুটেছে!" বিড়বিড় করে বলল সকলোভ্স্কি ঃ

"গিম্‌জা তো রোজই খবর পাচ্ছে—সদর-দপ্তরে মাতলামি-হুল্লোড় চলে। কমিসারদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে সরোকিন। একটু গালাগাল দেবার চেষ্টা করেই দেখ না! ফৌজের কাছে সরোকিন হল সাক্ষাৎ ভগবান, সম্রাট বিশেষ। ওর সাহসের জন্য সবাই ওকে ভক্তি করে, নিজেদের লোক বলে মনে করে। আর জানো তুমি, এই চীফ-অব-স্টাফটি কে? এ হল বেলিয়াকভ, জারের আমলের কর্ণেল। তা হলেই বুঝতে পারছো যোগাযোগটা কোথায়? যাক, চলে এস এখন।......কি মনে হয়, ফিরে যেতে পারব তো?"

ডেস্কের ওপরে হাত-ঘণ্টিটা টিপলেন চীফ-অব-স্টাফ, সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি-রত লোকটি দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল একেবারে বিনয়াবনত ভঙ্গীতে।

"কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ কী অবস্থায় আছেন একবার খোঁজ নিয়ে এস তো।"—সামনের কাগজ-পত্রগুলোর দিকে কড়া নজরে চোখ বুলোতে বুলোতে বললেন বেলিয়াকভ।

"কমরেড সরোকিন খাবার-ঘরে আছেন। অবস্থা—সামান্য তুরীয়।"

নিজের মুখটা প্রগাঢ় অর্থপূর্ণ হাসিতে ভরে তুলবার আগে লোকটি অপেক্ষা করতে লাগল চীফ-অব-স্টাফের মুখের কাষ্ঠহাসিটির জন্য।

"জেনা রয়েছে তাঁর সঙ্গে।" বলল সে।

"খুব ভাল কথা! এবার তুমি যেতে পারো।"

এরপর বেলিয়াকভ গেলেন যোগাযোগরক্ষাকারী দপ্তরে। সেখানে কয়েকটা টেলিফোন-লিপি দেখলেন, নির্ভুল চমৎকার হাতে কয়েকটি কাগজে নাম সই করলেন, তারপর বেরিয়ে গিয়ে করিডোরের শেষপ্রান্তে একটা দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। যে-ঘরের সামনে ওই দরজাটা, সেই ঘর থেকে তখন আল্‌তো-হাতে ছোঁয়া গীটারের তারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। চীফ-অব-স্টাফ পকেট থেকে

রুমাল বের করে মোটা লাল গর্দানটা মুছলেন, তারপর দরজায় টোকা দিয়ে সাড়া পাবার অপেক্ষা না রেখেই ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

কামরার মাঝখানটায় খবরের কাগজ-পাতা একটা টেবিল—উচ্ছিষ্ট ডিশ আর মদের গেলাস এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে তাতে। টেবিলের সামনে বসে আছেন সরোকিন, তাঁর সিরকাশিয়ান টিউনিকের চওড়া হাতাটা গুটিয়ে রেখেছেন। সুন্দরপানা মুখটা তখনও আঁধার হয়ে আছে। ভিজে কপালের ওপর এসে পড়েছে এক গুচ্ছ কালো চুল। বিস্ফারিত চোখে তিনি বেলিয়াকভের দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন। তাঁর পাশে একটা টুলের ওপর বসে ছিল জেনা, পায়ের ওপর পা তুলে; তার মোজার গার্টার দুটো ও সেই সংগে লেসের একটু আঁচলাও দেখা যাচ্ছিল। গীটারের তারে আঙুল বুলোচ্ছিল সে। নীল-চোখো তরুণী মেয়েটির ঠোঁট দুটো ভিজে, উগ্রভাবে রং ঘসেছে তাতে। টিকালো একরোখা নাক, মাথার সুন্দর চুল এলো-খোঁপা করে বাঁধা। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে যে অসুস্থ রেখাদুটি প্রায় নজরেই পড়ে না, সেগুলোই তার কোমল মুখশ্রীতে একটা ক্ষুদে বন্যজন্তুর ভাব এনে দিয়েছে, মনে হয় বুঝি হিংস্র দাঁত লুকানো আছে সে মুখের আড়ালে। পাসপোর্টের পরিচয় অনুসারে ও ওম্স্কের লোক, একজন রেলকর্মচারীর মেয়ে; কিন্তু কেউ অবশ্য তা বিশ্বেস করে না—এমন-কি তার যে আঠারো বছর বয়েস আর নাম জেনাইদা কানাভিনা, তাও কেউ বিশ্বেস করে না। কিন্তু মেয়েটি চমৎকার টাইপ করতে জানে, ভদ্‌কা খেতে, গীটার বাজাতে, আর তোফা গানও গাইতে পারে। সরোকিন তাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন, যদি সে সদর-দপ্তরের মধ্যে শ্বেতরক্ষীদের পচা-গলা নোংরামি ছড়ায় তাহলে নিজের হাতে তাকে গুলি করে মারবেন। আর তাই কারো কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

"বাঃ—বা! বেশ মজার লোক দেখছি!"—মাথা নেড়ে গোঁ-গোঁ করে বললেন বেলিয়াকভ। নিরাপত্তার খাতিরে দরজার একেবারে গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। "কী বিপদেই ফেলেছিলে আমাকে ভেবে দেখতো! দু'জন লোক এসেছে—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির লোক,—মিটিং করার ভয় দেখাচ্ছে তারা, আর তুমি কিনা চট্ করে ওদের দলে ভিড়ে গেলে? তার চেয়ে সোজা 'মর্স্'-টেলিগ্রাফের যন্ত্রটার কাছে গিয়ে একাতেরিনোদারে তার পাঠালেই পারতে?—ওরাও সংগে সংগে পাঠিয়ে দিত ছোট্ট ফুটফুটে একটি ইহুদীকে, তোমার স্টাফ গড়তো সে, বিছানায় তোমার শয্যাসঙ্গিনী হত, তোমার সংগে পায়খানা অবধি যেত, আর তোমার প্রত্যেকটা ভাবনার ওপর নজরও রাখতো সেই সংগে! ওঃ, কী ভয়ানক হতো তা হলে! কম্যান্ডার-ইন-চীফ সরোকিনের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের দিকে ঝোঁক রয়েছে...... বেশ তো, যাও না তাহলে। তাই করো! গুলি করেই মারো না হয় আমাকে, কিন্তু নিচু-পদের কর্মচারীদের সামনে তোমার ঐ রিভলবারের তড়পানি আমি বরদাস্ত করবো না। এর পরে আর কী করে শৃংখলা থাকতে পারে, বলতে পারো? কী ঘোড়ার ডিম থাকবে তাই বলো!"

চীফ-অব-স্টাফের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই সরোকিন তাঁর প্রকাণ্ড

শক্ত-সমর্থ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বোতলের গলাটা ধরতে গেলেন, কিন্তু শূন্য বাতাস ছাড়া হাতের মুঠোয় আর কিছু এল না। সামান্য খিঁচুনিতে তাঁর মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, গোঁফ জোড়া ফুলে উঠল। অবশেষে বোতলটা কোনো রকমে ধরতে পেরে তিনি দু' গ্লাস মদ ঢেলে নিলেন।

"বসে এক ঢোঁক খেয়ে নাও তো।"

জেনার লেস্-বোনা অন্তর্বাসটার দিকে একবার তির্যক দৃষ্টি হেনে বেলিয়াকভ টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন।

"অমন চালাক-চতুর লোক না হলে বহু আগেই তোমার নিকেশ করতাম। শৃঙ্খলা......আমার শৃঙ্খলা হচ্ছে লড়াই। তোমাদের যে-কোনো কেউ একটু চেষ্টা করেই দেখ না মানুষকে ক্ষেপাতে পারো কি না! আমিই ওদের নেতৃত্ব দিতে পারি, শুধু একটু সময় দিতে হবে আমায়! আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না, আমি একাই ওই শ্বেত-রক্ষী জঞ্জালগুলোকে গুঁড়িয়ে সাফ করব......সারা দুনিয়া কেঁপে উঠবে......"

নাকের ফুটো দিয়ে গভীরভাবে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন সরোকিন, রগের ওপর বেগুনি শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করতে লাগলো।

"কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাদ দিয়ে আমি একাই কুবান এলাকা সাফ করব—দন আর তেরেক্‌ও।......একাতেরিনোদারে ওরা খুব বড়ো গলায় চেঁচায়, ওরা আর ওদের কমিটিগুলো।......শুয়োর, কাপুরুষের দল! সবুর করো একটু, ঘোড়ায় চেপে এই লড়াইয়ে নামছি।......আমি হচ্ছি ডিক্টেটর......আমিই ফৌজকে চালিয়ে নিয়ে যাব!"

মদের গেলাসটার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন তিনি, এক ঝটকায় বেলিয়াকভ সেটাকে উল্টে ফেলে দিলেন।

"যথেষ্ট গিলেছ, আর নয়!"

"আঃ-হা, তুমিই যে দেখছি এখন হুকুম করছ আমায়?"

"বন্ধু হিসেবে অনুরোধ করছি।"

সরোকিন আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। ছোট-ছোট নিঃশ্বাস ফেলে তিনি এদিক-উদিক তাকাতে লাগলেন। চোখ জোড়া ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে জেনার ওপর এসে স্থির হয়ে রইল। জেনা তখন গীটারের তারগুলোর ওপর আঙুল চালাচ্ছিল। অলসভাবে ভুরু টেনে টেনে সে গাইতে লাগল: "রাতের বুকে জেগেছে হাওয়া......"

শুনতে শুনতে সরোকিনের রগের শিরা দুটো আরো প্রচণ্ডভাবে দপ্‌দপ্ করতে থাকে। উঠে পড়ে তিনি জেনার মাথাটা এক গুঁতোয় পেছন দিকে বাঁকিয়ে লুব্ধভাবে ওর ঠোঁটের ওপর অজস্র চুমো খেতে লাগলেন। গীটারের তারে তখনও জেনা টোকা মেরে যাচ্ছিল, অবশেষে সেটা ওর হাঁটু বেয়ে নিচে খসে পড়ল।

"চমৎকার হচ্ছে,"—আর্দ্র গলায় বললেন বেলিয়াকভ: "আহা, সরোকিন, সরোকিন, কেন জানিনা, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি!"

শেষ অবধি জেনা অবশ্য নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল। গীটারটা তুলবার জন্য যখন ও ঝুঁকে পড়েছে, ওর সারা মুখটা তখন লালে লাল। সুন্দর চুলের জটের ফাঁক দিয়ে ওর চোখ-জোড়া জ্বলছিল। ফুলে-ওঠা ঠোঁটের ওপর একবার জিভের ডগাটা বুলিয়ে নিল ও।

"যাঃ! বড়ো ব্যথা দিয়েছ!"

"শোনো হে কমরেডস, একটা বোতল আমি অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি..."

বেলিয়াকভের গলা দিয়ে বাকি কথাগুলো আর বেরুলো না। আঙুলগুলো চাগিয়ে তাঁর হাতখানা যেমন ছিল তেমনি শূন্যে উঁচোনো রইল। জানলার বাইরে একটা গুলির আওয়াজ হয়েছে, কয়েকটি কণ্ঠের গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। জেনা তার গীটারটা নিয়ে যেন দমকা হাওয়ার মতোই ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেল। জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন সরোকিন। তাঁর মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন।

"তুমি যেও না কিন্তু, আমিই দেখছি ব্যাপারখানা কি", তাড়াতাড়ি বললেন চীফ-অব-স্টাফ।

সদর দপ্তরের চৌহদ্দির মধ্যে হৈ-হট্টগোল আর বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি তো নিত্যকার ব্যাপার। মোটামুটি দু'টো দল নিয়ে সরোকিনের ফৌজটি গড়ে উঠেছে: কুবান এলাকার কসাক দল,—যাদের কেন্দ্রটিকে সরোকিন নিজের হাতেই তৈরি করেছেন এক বছর আগে; আর উক্রেনীয় দল,—যারা উক্রেনীয় লাল বাহিনীগুলোরই হতাবশিষ্ট অংশ। এই বাহিনীগুলোই এক সময় জার্মানদের চাপে পড়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। কুবানের কসাকদের সঙ্গে উক্রেনীয়দের ঝগড়া বহুদিনকার। 'বিদেশের' মাটিতে যখন লড়তে হয়, উক্রেনীয়রা নাকি তখন বড়ো একটা জান-প্রাণ দিয়ে লড়তে চায় না, গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে যাবার সময় ওরা নিজেদের জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে কোনোরকম কসুরই করে না।

হল্লা আর মারামারি রোজই লেগে আছে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যেন একটু বেশি রকমের গুরুতর। তীব্র চীৎকার করে কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। লাল ফৌজের কয়েকটি দল সচকিতভাবে ছুটে আসছিল বেড়া ও বাগানের আড়ালে-আড়ালে। স্টেশনের দিক থেকে বেপরোয়ারকমের গুলির আওয়াজ আসছিল। সদর দপ্তরের একেবারে জানলার নিচে চত্বরটার মাঝে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে একজন আহত কসাক। পাগলের মতো আর্তনাদ করছে সে।

এদিকে সদর দপ্তর ঘাঁটিতে তখন দারুণ আলোড়ন চলছে। সকালের দিকে যে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা একেবারে নিশ্চুপ হয়েছিল, এখন তা থেকে স্রোতের ধারার মতো খবর বেরুচ্ছে—প্রত্যেকটা খবরই আগের খবরটার চেয়ে চমকপ্রদ। এত ডামাডোলের মধ্যে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই যে, সসিকা-উমান্‌স্কায়া লাইন ধরে শ্বেতরক্ষীরা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে; আতঙ্কগ্রস্ত লাল সেনাদলগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে তারা। একেবারে সম্মুখের ইউনিটগুলো ফৌজী সদর দপ্তরে এসে পড়েছে, স্টেশনে ও গ্রামে লুটপাট চালাচ্ছে তারা। কুবান সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করেছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

আঙিনা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন সরোকিন প্রকাণ্ড একটা দুর্দান্ত বাদামী ঘোড়ার পিঠে চেপে। তাঁর পেছনে সিরকাশিয়ান উর্দি-পরা পঞ্চাশজন অনুচর—কাঁধের উপর পত্‌পত্‌ করে উড়ছে তাদের হুডের প্রান্ত, প্রত্যেকের হাতে খাপ-খোলা বাঁকা তলোয়ার। সরোকিন তাঁর ঘোড়ার পিঠে এমনভাবে এঁটে বসে আছেন যে দেখলে মনে হয় তিনি ঘোড়াটিরই অংগবিশেষ। মাথায় টুপি দেননি, যাতে সবাই তাঁকে চট্‌ করে চিনতে পারে। সুন্দর মাথাটা পেছনে হেলিয়ে রেখেছেন, বাতাসে ফরফর করে উড়ছে তাঁর চুল, উড়ছে কোটের হাতা আর প্রান্ত। এখনও মদের ঘোর কাটেনি, কিন্তু পাণ্ডুর মুখের মধ্যে দৃঢ়তার ছাপ। তাঁর অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর খুরের নীচে ছিটকে উঠছে ধুলোর মেঘ।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে দু'একটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। সরোকিনের অনুবর্তীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সৈনিক প্রবল চীৎকার করতে থাকে, একজন ঘোড়া থেকে পড়ে যায়, কিন্তু সরোকিন একবার ফিরেও তাকান না। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়ে আছে ওই জায়গাটায়, যেখানে ইতস্তত ছড়ানো মালগাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একদল ধূসর সৈনিকের জটলা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

দূর থেকেই চিনতে পারা গিয়েছিল সরোকিনকে। অনেকে ট্রেনের ছাদের ওপর উঠে বসল। ভীড়ের মধ্যে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে ওরা চেঁচাতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্যও গতি শ্লথ না করে সরোকিন ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন স্টেশনের বেড়া ডিঙিয়ে, তারপর রেলিং-এর ধার বরাবর ছুটে গেলেন, একদম ভীড়ের মাঝ-খানটায়। সংগে সংগে তাঁর লাগাম রুখে ধরা হল। মাথার ওপর হাত তুলে চীৎকার করে বললেন তিনি :

"কমরেডস্‌, সহযোদ্ধা, পালোয়ান ভাইসব! কী ব্যাপার হয়েছে? কেন গুলি ছোঁড়া হচ্ছে? কিসের জন্য এত আতংক? কে তোমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে শুনি? কোথায় সেই বেজম্মাটা?"

"আমাদের সংগে বেইমানি করা হয়েছে!"—আতংকভরা একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"কম্যাণ্ডাররা আমাদের বেচে দিয়েছে! দুশমনকে ঘরে ঢুকিয়েছে তারা!" অনেকগুলো কণ্ঠ এবার মুখর হয়ে উঠল। হাজার হাজার মানুষের বিশাল ভীড় ছড়িয়ে পড়ছিল রেল-লাইন ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, মালগাড়ির ওপর ঠেলে উঠছিল লোক, চীৎকার করে বলছিল :

"আমাদের বেচে দেয়া হয়েছে...ফৌজ একদম সাবাড় হয়ে গেছে।......নিপাত যাক কম্যাণ্ড! খুন করো কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকে!"

একটা আর্তনাদ শিস্‌ কেটে চলে গেল, যেন কোনো নরকের হাওয়া বইছে। সরোকিনের অনুচরদের ঘোড়াগুলো ফোঁস ফোঁস করে পেছিয়ে গেল। সরোকিনের দিকে ধেয়ে এল একসারি বিকৃত মুখ, নোংরা হাত। সরোকিন তখন বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন, তাঁর সুকঠিন কাঁধের পেশীগুলো অবধি ফুলে উঠল চীৎকারে :

"চোপরাও! তোমরা তো বিপ্লবী ফৌজ নও...তোমরা হচ্ছ একদল ডাকাত, একপাল শুয়োর।......কোন্ বদমাইশগুলো গুজব ছড়াচ্ছে দেখিয়ে দাও একবার।... কোথায় সেই শ্বেতরক্ষী দালালগুলো!"

হঠাৎ ঘোড়াটাকে দাবড়ে নিয়ে তিনি একেবারে ভীড়ের মাঝখানে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দেখিয়ে বললেন :

"ওই একটিকে দেখা যাচ্ছে!"

যাকে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল, জনতা অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল—লম্বা, রোগা চেহারার লোক, নাকটা প্রকাণ্ড। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে লোকটা হাতদুটো ছড়িয়ে এক-পা পেছিয়ে গেল। সরোকিন তাকে সত্যি-সত্যিই চিনতেন কিনা, অথবা প্রথম যে-লোকটার দিকে তাঁর চোখ পড়েছিল তাকেই শিকার বানিয়েছিলেন কিনা, তা আর কোনোদিনই জানা যাবে না।...জনতা রক্ত চাইছিল। বাতাসে সাঁই করে বাঁকা তলোয়ারটা ঘুরিয়ে সরোকিন লম্বা লোকটার ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দিলেন এক কোপ। তীব্রবেগে ছিটকে বেরিয়ে এল রক্ত, সরোকিনের ঘোড়ার মুখটা ভিজে গেল।

"বিপ্লবী ফৌজ এই ভাবেই জনতার শত্রুকে শাস্তি দেয়!"

সরোকিন আবার তাঁর ঘোড়াটাকে দাবড়ে নিয়ে গেলেন রক্তাক্ত তলোয়ারটা শূন্যে ঝকমকিয়ে। মুখটা তাঁর পাংশু হয়ে গেছে, দেখলে ভয় করে। ভীড়ের মধ্যে তিনি ছুটতে লাগলেন গালাগাল, শাসানি আর সেই সঙ্গে ওদের প্রবোধ দিতে দিতে।

"কোথাও আমাদের ফৌজ উৎখাত হয়নি...শ্বেতরক্ষীদের স্কাউট আর গোয়েন্দারাই গুজব ছড়াবার চেষ্টা করছে।...ওরাই তোমাদের উস্কাচ্ছে লুটপাট করবার জন্য, ওরাই শৃঙখলা ভাঙছে।...কে বলেছে যে আমরা মার খেয়েছি? তোমরা নিজের চোখে হারতে দেখেছ? জানোয়ার সব? কমরেডস্, আমিই তোমাদের বরাবর লড়াইয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি—তোমরা তো আমাকে জানো। জানো আমার দেহে ছাব্বিশটা আঘাতের দাগ রয়েছে! আমার হুকুম, এখুনি লুটপাট বন্ধ করো তোমরা! সবাই গাড়িতে ফিরে যাও! আজই তোমাদের নিয়ে আমি আক্রমণ চালাবো। যারা ভীরু, যারা বেইমান তাদের ওপর এবার ক্রুদ্ধ দেশবাসী চরম শোধ নেবে।..."

জনতা কান পেতে শুনল কথাগুলো। কম্যান্ডার-ইন-চীফকে একটিবার দেখবার জন্য তারা উৎসাহের আতিশয্যে একজন আরেকজনের কাঁধে চড়ে বসল। সামান্য দু'একটি কণ্ঠে গররাজির ভাব প্রকাশ পেলেও, বেশির ভাগই যে লড়াইয়ের জন্য উৎসুক সেটা বোঝা গেল। চারিদিকেই এক কথা : "যা বলেছেন ঠিক কথাই বলেছেন! আমাদের উনি নেতৃত্ব দিন তাহলে! আমরা ওঁর পেছনে রয়েছি।..." কোম্পানি কম্যান্ডাররা এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, এবার তারা গুঁড়ি মেরে ফিরে এল। সৈন্যরাও নিজের নিজের সারিতে গিয়ে সামিল হল। সরোকিনের টিউনিকের বুকটা ছেঁড়া, কাটা ঘায়ের দাগ দেখাবার জন্য তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন জায়গাটা।...মুখটা

তাঁর মৃতের মতো ফ্যাকাশে। আতঙ্কের ভাবটা তখন কমে এসেছে। এগিয়ে-আসা শত্রুসৈন্যদলের মোকাবিলা করবার জন্য মেশিনগানবাহী ফৌজীদলগুলোকে পাঠানো হল। এখন যে-সব টেলিগ্রাম যাওয়া-আসা করতে লাগলো তাদের সুরে দৃঢ় প্রত্যয়ের আভাস।

কিন্তু পশ্চাদপসরণ রোধ করার আর কোনো উপায়ই এখন ছিল না। তিমাশেভ্‌-স্কায়া রেল স্টেশনের কাছাকাছি এলাকার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে প্রতি-আক্রমণ শুরু করতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গেল। ভিসেল্‌কি আর করেনভ্‌স্কায়ার দিকে লাল ফৌজ দুটি সারিতে ভাগ হয়ে অভিযান চালাল। আর যেখানেই লড়াইয়ের অনিশ্চিত দোদুল্যমানতার অবস্থা সেখানেই দেখা গেল সরোকিনকে, তাঁর বাদামী রঙের মাদী ঘোড়াটার পিঠে চেপে সৈন্যদের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। একমাত্র তাঁর উদ্দীপ্ত সংকল্পের বলেই যেন পরাজয়ের বন্যাকে তিনি রোধ করেছেন, বাঁচিয়েছেন কৃষ্ণসাগরের উপকূলভূমিকে। উত্তর ককেসীয় প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পক্ষে তখন সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে সরোকিনের অধিনায়কত্বকেই সরকারীভাবে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

॥ ছয় ॥

দেনিকিনের ফৌজ যখন তাদের 'দ্বিতীয় কুবান-অভিযানে' ব্যাপৃত হয়, মে মাসের শেষদিকের সেই দিনগুলোতেই আর এক নতুন বিপদ এসে দেখা দিল রুশ সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রের সামনে। তিনটে চেক ডিভিশন উক্রেনীয় রণাঙ্গন থেকে সরে যাচ্ছিল পূবের দিকে—প্রায় একই সময় তারাও ওম্‌স্ক থেকে আরম্ভ করে পেন্‌জা পর্যন্ত প্রত্যেকটি সৈন্যবাহী ট্রেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল।

'হস্তক্ষেপকারী শক্তিবর্গ' সোবিয়েত ইউনিয়নের ওপর এক-এক করে যে হামলাগুলো চালাচ্ছিল, এই বিদ্রোহ হল তারই প্রথম আঘাত। ১৯১৪ সালেই রাশিয়ার চেক প্রবাসীদের নিয়ে এই চেক ডিভিশনগুলো গড়া হয়েছিল, পরে যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে থেকেও লোক সংগ্রহ করা হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর এই চেক ডিভিশনগুলো দেশের মাটিতে বৈদেশিক সংস্থা হিসাবেই রয়ে যায় আর ঘরোয়া ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ চালিয়ে যেতে থাকে।

রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণে ওদের সাহায্য পাওয়া বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। চেকরা তখনও এই ধারণা পোষণ করত যে ভবিষ্যতে রাশিয়াই চেকজাতিকে অস্ট্রিয়ানকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে। চেক কৃষকরা খৃষ্টের জন্মদিনে সৎকার করবে বলে হাঁস পুষতো, আর বলত : 'একজন রুশের জন্য একটি করে হাঁস।' এইভাবে বলাটা ওদের দস্তুরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জার্মান আক্রমণের চাপে পড়ে চেক ডিভিশনগুলো পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে। জায়গা বদলি করে ফ্রান্সে যাবার জন্যে তৈরি হতে থাকে তারা। সেখানে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সারা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করে দেবে : তারা চেকদের মুক্তি কামনা করে, অস্ট্রিয়ান ও জার্মানদের পরাজিত করার মধ্যে তাদেরও অংশগ্রহণের অধিকার আছে।

চেক সৈন্যদলগুলো তখন ভ্লাদিভস্তকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পথে জার্মান যুদ্ধবন্দীরা আর হাঙেগরিয়ানরাও এসে মিলল ওদের সঙ্গে। হাঙেগরিয়ানদের বড়ো ঘেন্না করতো চেকরা। এই দুই দল যখন এক জায়গায় এসে মিলছিল, সাময়িক বিশ্রামের সেই অবসরগুলোতে তাদের মন কষাকষি চরম আকার ধারণ করতে লাগল। শ্বেতরক্ষীদের দালালরা চেকদের কানে-কানে গুজব ছড়াতে লাগল—বলশেভিকদের হীন মতলব আছে, চেকদের নিরস্ত্র করে বলশেভিকরা জার্মানদের হাতে তাদের তুলে দিতে চায়।

১৪ই মে তারিখে চেলিয়াবিন্‌স্ক্ রেল স্টেশনে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল চেক ও হাঙেগরিয়ানদের মধ্যে। চেলিয়াবিন্‌স্কের সোবিয়েত কর্তৃপক্ষ চেকদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত প্রকৃতির কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল। গোটা সৈন্যবাহী ট্রেনটাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্র হাতে। লাইন বরাবর অন্যান্য জায়গায় যেমন এখানেও তেমনি—চেলিয়াবিন্‌স্ক্ সোবিয়েতের হাতে লাল-ফৌজের লোক যারা ছিল তাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি। তাই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল তারা। সৈন্যদের

মধ্যে চেলিয়াবিন্‌স্কের ঘটনার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। তারপর যখন আগুনে ঘি ঢালার মতো এই ঘটনার পরে পরেই আবার প্রজাতন্ত্রের উচ্চতম সামরিক সংসদের সভাপতির তরফ থেকে একটা বেইমানী হুকুমনামা প্রচারিত হল তখন তো শুরু হল রীতিমতো বিস্ফোরণ। হুকুমনামাটি ছিল এইরকম ঃ

"চেকদের নিরস্ত্র করিবার জন্য সমস্ত সোবিয়েতকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। এই হুকুম পালন করিতে গাফিলতি হইলে সোবিয়েতগুলিকে দায়ী করা হইবে। রেলপথের উপর কোনও চেককে সশস্ত্র অবস্থায় দেখিলে তাহাকে গুলী করিয়া মারিতে হইবে, কোনও সৈন্যবাহী-ট্রেনে একজন মাত্র সশস্ত্র চেক থাকিলেও আরোহী সমস্ত চেককেই গাড়ি হইতে নামাইতে হইবে এবং তাহাদের যুদ্ধবন্দী শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।"

কিন্তু চেকদের যেমন চমৎকার শৃঙ্খলাবোধ, সংহতি আর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, ওদের মেশিনগান আর কামানও তেমনি অপর্যাপ্ত—অথচ এদিকে সোবিয়েতগুলির হাতে যে-সব লাল ফৌজীদল রয়েছে তাদের না আছে যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, না আছে মাথার ওপর অভিজ্ঞ নেতৃত্ব। তাই ব্যাপার দাঁড়ালো উল্টো। সোবিয়েতরা চেকদের নিরস্ত্র না করে, চেকরাই বরং সোবিয়েতদের নিরস্ত্র করতে লাগল। এইভাবে তারা পেন্‌জা থেকে আরম্ভ করে ওম্‌স্ক পর্যন্ত সমগ্র রেলপথটার ওপরই কর্তৃত্ব কায়েম করে বসল।

প্রথম বিদ্রোহ শুরু হল পেন্‌জায়। চোদ্দ হাজার চেকের বিরুদ্ধে সেখানে সোবিয়েতরা পাঠালো পাঁচশো লালরক্ষী। লালরক্ষীরা রেলস্টেশন আক্রমণ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। পেন্‌জা থেকে চেকরা অভিযাত্রী বাহিনীর ছাপার মেশিনটা দখল করে নিয়ে গেল নোট ছাপাবার জন্য। বেজেনচুক ও লিপিয়াগির কাছাকাছি এলাকায় এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে তারা লাল রক্ষীদের হারিয়ে দিল। তারপর দখল করল সামারা।

এইভাবে গৃহযুদ্ধের সময় আর এক নতুন রণাঙ্গনের উদ্ভব হল—ভল্‌গা এলাকা, উরাল ও সাইবেরিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে দ্রুত বিস্তৃত হল এই নতুন রণাঙ্গনের পরিধি।

খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তার দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌ বুলাভিন। কামানের গোলার গুরুগুরু আওয়াজ কান পেতে শুনছিলেন তিনি। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। ম্রিয়মান সূর্যের আলো নিষ্করুণভাবে এসে পড়েছে নিচু ঘরগুলোর দেয়ালের ওপর। খালি দোকানঘরের ঝুলকালিমাখা জানলা, দরজার ওপরকার অব্যবহার্য সাইনবোর্ড আর চুণের গুঁড়ো ছড়ানো অ্যাস্‌ফালটের রাস্তার ওপর রোদ এসে পড়েছে।

ডানদিকে যেখানে ডাক্তারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেখানে একটা কাঠের শীর্ষ-ফলক মাথা জাগিয়েছিল, দ্বিতীয় আলেকজান্দারের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর যে বিবর্ণ নেকড়ার ফালিটা ঝুলত তাই জড়িয়ে আছে ওটার মাথায় পাশেই রয়েছে একটা

কামান। শহরের একদল মানুষ একমনে রাস্তার পাথর খুঁড়ে বের করছে। ওদের মধ্যে রয়েছেন পাদ্রী স্লভোখোতভ্; আইনজীবী মিশিন, যিনি হলেন সামারায় বুদ্ধি-জীবীদের গর্ব ও গৌরবস্থল; খাবার-দোকানের মালিক রোমানভ; জেম্‌স্‌তভোর প্রাক্তন সদস্য স্ত্রাম্‌বভ, আর সে-আমলের একজন কুলীন, পক্ককেশ কন্দর্পকান্তি জমিদার কুরয়েদভ্। একসময়-না-একসময় এঁরা সবাই দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচের কাছে চিকিৎসার জন্য আসতেন, ওঁর সঙ্গে বসে তাসও খেলতেন।...একটা নিচু খুঁটির ওপর বসে লাল বাহিনীর একজন সৈনিক ধূমপান করছে। রাইফেলটা সে দুই হাঁটুর মাঝখানে চেপে রেখেছে।

সামার্‌কা নদীর ওপার থেকে কামানের গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ আসছিল। জানলার শার্সিগুলো উঠছিল ঝন্‌ঝন্‌ করে। প্রত্যেকটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বিরক্তির সঙ্গে বিকৃত মুখভঙ্গী করে তাঁর পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছিলেন। তাঁর নাড়ীর গতি এখন মিনিটে ১০৫। অর্থাৎ পুরনো সমাজের ভাবগতি এখনও তিনি পুষে রেখেছেন নিজের মধ্যে। কিন্তু তাঁর মনের ভাবগুলোকে এখনই খোলাখুলি প্রকাশ করা নিতান্ত বিপজ্জনক, তাই এভাবে ছাড়া আর কোনোরকমভাবেই সেগুলো প্রকাশ করা যাচ্ছে না। রাস্তার ওপারে, ঠিক উল্টোদিকেই, লেডারের জুয়েলারী দোকানের ভাঙা কাঁচের জানলাটির ওপর কাঠের তক্তা আঁটা, তার ওপরে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে বিপ্লবী কমিটির হুকুমনামা—ওটি তাঁর দু'চক্ষের বিষ। প্রতিবিপ্লবীদের গুলি করে মারা হবে এই শাসানি দেয়া আছে ওতে।

নারকেল-ছোবড়ার উঁচু-কিনারাওয়ালা টুপি আর যুদ্ধের আগের ফ্যাশানে তৈরি তসরের জামা-পরা একটি অদ্ভুত ধরনের মূর্তি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছিল রাস্তা দিয়ে। দেয়াল ধরে ধরে গুঁড়ি মেরে আসছিল লোকটি, ক্রমাগত পিছন ফিরে ফিরে দেখছিল আর এমনভাবে লাফাচ্ছিল যেন তার কানের মধ্যে বুঝি কেউ গুলি চালিয়ে দিয়েছে। শনের নুড়ির মতো চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, লালচে দাড়িগুলো যেন তার লম্বাটে বিবর্ণ মুখটার সঙ্গে আঠা দিয়ে জোড়া।

লোকটি হলেন গভিয়াদিন, জেমস্‌ত্‌ভোর সেই সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌ যিনি এক-সময়ে দাশার মনের 'সুন্দর পশু'টিকে খুঁচিয়ে তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচের কাছেই আসছিলেন তিনি। যে-কাজ নিয়ে তিনি আসছেন সেটি নিশ্চয়ই এমন জরুরি কিছু যে ফাঁকা রাস্তা আর কামানের আওয়াজের ভয়টাকে পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করে চলে এসেছেন!

জানলার কাছে ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে গভিয়াদিন পাগলের মতো হাত নাড়তে লাগলেন; ইশারাটির মানে করা যায় এই রকম ঃ "ভগবানের দোহাই, আমার দিকে তাকাবেন না! পেছনে লোক লেগেছে।" পিছন দিকে একবার তাকিয়ে দেয়াল ধরে ধরে তিনি এগিয়ে এলেন। বিপ্লবী কমিটির ঘোষণাপত্রটি ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে এসে হঠাৎ রাস্তাটা পার হয়ে এদিকের ফটকটার আড়ালে ডুব মারলেন। মিনিটখানেক বাদে ডাক্তারের খিড়কির দরজায় শোনা গেল টোকা মারার শব্দ।

"ভগবানের দোহাই, বন্ধ করুন জানলাটা। আমাদের ওপর নজর রেখেছে ওরা।" খাবার ঘরটার দিকে যেতে যেতে ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্ করে চাপা গলায় বললেন গভিয়াদিন ঃ "পর্দাগুলো টেনে দিন। আচ্ছা, না, না, থাক, যেমন আছে ঐ ভাল! হ্যাঁ, দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে..."

"এ বান্দা তো আপনাদেরই সেবায় হাজির!"—বিদ্রূপভরা গলায় বললেন ডাক্তার। ময়লা, পোড়া-দাগ-লাগা অয়েলক্লথে মোড়া টেবিলটার একপাশে বসলেন তিনি ঃ "তা দাঁড়িয়ে কেন, বসতে আজ্ঞা হোক। কী বলবার আছে সব বলুন তাহলে।"

গভিয়াদিন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাতে। একটা পা নিচে গুটিয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ডাক্তারের কানে বর্ষণ করতে লাগলেন তাঁর ভাঙা গলার দমক-ভরা কথাগুলো ঃ

'দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্! 'সংবিধান-সভা' কমিটির এক গোপন বৈঠকে একটা প্রস্তাব এইমাত্র ভোটে পাশ হয়ে গেছে। আপনাকে জনস্বাস্থ্য বিভাগের আন্ডার-সেক্রেটারির পদটি দেয়া হবে।..."

"আন্ডার-সেক্রেটারি?" কথার মাঝখানে বলে উঠলেন ডাক্তার। ঠোঁটের কোণা-দুটো তিনি এমনভাবে দু'পাশে ঝুলিয়ে দিলেন যে তাঁর থুতনিটা ঘিরে ভাঁজ পড়ে গেল কয়েকটা। "বেশ, বেশ, তা কোন্ রিপাবলিকের আণ্ডার-সেক্রেটারি, শুনি?"

"রিপাবলিকের নয়, গভর্ণমেন্টের।...সংগ্রামের উদ্যোগটা এবার আমরা নিজেদের হাতেই তুলে নিচ্ছি। একটা ফ্রন্ট খুলছি আমরা।...কাগজের নোট ছাপবার জন্য একটা প্রেসও পাচ্ছি। চেকোস্লোভাকিয়ান ফৌজকে সামনে রেখে আমরা মস্কোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।...একটা সংবিধান সভাও গড়ে তুলছি। আমরা...আমরাই শুধু বুঝতে পারি এই ব্যাপারটা...আজ খুব জোর একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। এস্-আর ও মেনশেভিকরা দেখি সব পদগুলোই দখল করতে চায়। কিন্তু আমরা জেম্‌স্‌ত্‌ভোর লোকেরা গোঁ ধরলাম আপনাকে নিতেই হবে, শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হিসেবে আপনার নামই রয়ে গেল।...আমার যা গর্ব হচ্ছে তা আর কি বলব! আপনি তা হলে মেনে নিচ্ছেন তো?"

ঠিক এই সময়ে সামারকার ওপার থেকে এমন প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল যে টেবিলের ওপরের গেলাসগুলো পর্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। গভিয়াদিন হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে লাফিয়ে উঠলেন। উৎকণ্ঠ হয়ে বললেন ঃ

"ঐ বুঝি চেকরা এল!"

আবার একটা বিস্ফোরণ হল। মনে হল যেন পাশের বাড়িতেই কোথাও মেশিন-গানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন গভিয়াদিন। আবার বসে পড়ে পা'টা গুটিয়ে নিয়ে বললেন ঃ

"এ হল ওই লাল জানোয়ারগুলো।...গোলাঘরের ওপর মেশিনগান বসিয়েছে! ...কিন্তু চেকরা যে শহর দখল করে নেবে এতে কোনো সন্দেহই নেই...নেবেই, ওরা নেবেই..."

"মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"—ভারি গলায় বললেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ ঃ "একটু চা খান—ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয় এর মধ্যে।"

গভিয়াদিন চা খেতে রাজি হলেন না. ভূতে-পাওয়ার মতো একটানা ফিস্ ফিস্ করে বলেই চললেন ঃ

"গভর্ণমেন্টের মাথায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা সবাই দেশপ্রেমিক। সবচেয়ে সাচ্চা আর মানুষের মতো মানুষ ওঁরা।...ভল্স্কি—তাঁকে তো আপনি জানেনই—ৎভেরের ব্যারিস্টার, চমৎকার লোক।...কাপ্তেন ফরচুনেতভ...তারপর ক্রিমুশ্কিন—উনি তো আমাদেরই লোক, সামারায় মানুষ—উনি একজন খাঁটি মানুষ।......এবং এস্-আর যারা, তারা তো সবাই জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে।...ওরা আসলে চেরনভের পথ চেয়েই বসে আছে; তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।...চেরনভ এখন উত্তর দিকে বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত।...সমস্ত জায়গাতেই মিলিটারি চক্রগুলোর বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত।......সমস্ত জায়গাতেই মিলিটারি চক্রগুলোর মধ্যে আমাদের সঙ্গে অফিসারদের ঘনিষ্ঠ মিতালি গড়ে উঠছে।......কর্ণেল গাল্কিন মিলিটারির প্রতিনিধিত্ব করছেন।.....উনি নাকি দ্বিতীয় একজন দান্তন।......এক কথায় সব দিক দিয়েই আমরা এখন প্রস্তুত। শুধু অপেক্ষা করছি কখন অভিযানটা শুরু হয়। সমস্ত রকমের লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে চেকরা আজ রাতেই আক্রমণ চালাবে ঠিক করছে।......আমি এখন মিলিশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছি। বড়ো সাংঘাতিক বিপজ্জনক, আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ।......কিন্তু লড়াই তো আমাদের করতেই হবে......জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে।......"

সামরিক ব্যাণ্ডে খুব চড়া আর বেসুরো ধরনে 'ইণ্টারন্যাশনাল' বাজানো হচ্ছিল—জানলা দিয়ে তারই আওয়াজ ভেসে এল। চেয়ারের ওপর গাভিয়াদিন একেবারে গুটিসুটি হয়ে বসলেন, মাথাটা রাখলেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচের ভুঁড়ির ওপর। শনের নুড়ির মতো তাঁর মাথার চুলগুলোকে দেখাচ্ছিল পুতুলের পরচুলার মতোই নিষ্প্রাণ।

অতিকায় এক বজ্রগর্ভ মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। রাত হওয়ার সঙ্গে অবশ্য ঠাণ্ডা পড়ে নি। কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়েছে আকাশের তারা। নদীর ওপার থেকে কামানের আওয়াজ ক্রমেই প্রবল আর ঘনতর হয়ে উঠছে। প্রত্যেকটি বিস্ফোরণের সঙ্গে ঘরবাড়ি কেঁপে উঠছে। ছ'ইঞ্চি ব্যাসের বলশেভিক কামানগুলোও এবার গোলাঘরের আড়াল থেকে অন্ধকারের বুক চিরে জবাব দিতে শুরু করল। ছাদের ওপর থেকে মেশিনগানও খেঁকিয়ে চলেছে। নদীর ও-পারে শহরতলীতে যে লাল ফৌজী-ঘাঁটিগুলো ছিল সেদিক থেকে ভেসে আসছে বন্দুকের ক্ষীণ আওয়াজ। একটা কাঠের পুল মারফত শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তাদের।

প্রকাণ্ড মেঘটা সারা আকাশ ছেয়ে গুর্ গুর্ করে ডেকে উঠল। সূচীভেদ্য অন্ধকার। শহরে বা নদীর পাড়ে একমাত্র আলো যা দেখা যাচ্ছে তা হল কামানের অনল-শিখা।

শহরের লোকজন কেউ ঘুমোয় নি। রহস্যময় সব গোপন কক্ষে নির্বিবাদে সভা চালিয়েছে 'সংবিধান-সভার কমিটি।' অফিসারদের সংগঠন থেকে এসেছে স্বেচ্ছাসেবক। পুরো অস্ত্রশস্ত্র তৈরি রেখে বাড়ির মধ্যে বসে তারা আক্রোশে পাঁয়তারা কষছে। শহরের বাসিন্দারা ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে ঘন নৈশ অন্ধকারের মধ্যে। রাস্তার টহলদার পাহারাওয়ালারা মাঝে মাঝেই হাঁক দিয়ে পরস্পরকে সাড়া জানাচ্ছে। গোলমালের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে পুব-মুখো ট্রেনগুলোর তীক্ষ্ম বিষন্ন সিটি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকেরা দেখছিল, আকাশের বুক চিরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঝল্‌কে উঠছে বিদ্যুতের চমক। ভলগার ঘোলা জল ঝক্‌মক্‌ করে নেচে উঠছে। ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে জেটির ধারে বজরা ও স্টীমারের কালো-কালো অবয়ব-রেখা। নদীর অনেকটা উঁচুতে, লোহার ছাদের পাশে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা এলিভেটরের বিরাট আকৃতিটা, লুথারান গির্জার সোজা গম্বুজ, আর কনভেণ্টের ঘণ্টা-ঘরটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ঐ ঘণ্টা-ঘরটা তৈরি করার জন্য নাকি চাঁদা তুলেছিল সুজান্না নামে একজন মঠবাসিনী। একটু বাদে বিজুলির চমক আর রইল না। সবটাই ডুবে গেল অন্ধকারে।......

মেঘ কেটে গেছে। বাতাস উঠেছে। চিমনিগুলোর মধ্যে হু-হু করে কেঁদে ফিরছে হাওয়া। চেকরা এবার শুরু করল আক্রমণ।

ক্রিয়াঝ্‌ রেল-স্টেশন থেকে পাতলা সারি দিয়ে বেরিয়ে ওরা রেলওয়ে পুল পার হয়ে, চর্বির কারখানাগুলো ঘেঁষে এগিয়ে চলল নদীর পাড়ে শহরতলি এলাকার দিকে। এবড়ো-খেবড়ো মাটি, ক্ষেতের আল, বেগুনি উইলোর ছোট-ছোট ঝোপ ডিঙিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া রীতিমত দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

শহরের প্রবেশপথ বলতে মাত্র ঐ দুটো—একটা কাঠের পুল, আরেকটা রেলওয়ে-পুল। এলিভেটরের পেছন দিককার আঙিনা থেকে বলশেভিক গোলন্দাজরা প্রবেশপথ দুটোর ওপর সমানে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। এই প্রচন্ড অগ্নিবৃষ্টি আর বিস্ফোরণের ফলেই যা-হোক লাল ডিভিশনগুলোর মনোবল কিছু বজায় রইল, কম্যান্ডারদের সামরিক অভিজ্ঞতার ওপর তারা তেমন ভরসা করতে পারছিল না।

সকালে দিকে চেকরা একটা চালাকি খেলল। এলিভেটরের পাশে যে-সব কুঁড়েঘর ছিল সেখানে পোলিশ উদ্বাস্তুরা বউ-কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে থাকতো। চেকদের সে খবর জানা ছিল। এলিভেটরের ওপর যখন গোলাগুলি ফাটতে শুরু করে, পোলরাও তখন কুঁড়েঘর ছেড়ে এলোপাথাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে ছুটতে থাকে আশ্রয়ের খোঁজে। গোলন্দাজরা ওদের গালাগালি ক'রে, ডাণ্ডার ঘা কষিয়ে কামানের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। 'ছ'-ইঞ্চি' কামানগুলো যখন গর্জে উঠল, উদ্বাস্তুরাও দিগ্বিদিক হারিয়ে কানে-তালালাগা অবস্থায় পাগলের মতো ছুটতে লাগলো চার-

দিকে। এমন সময় হঠাৎ গোলাঘরগুলো থেকে একদল স্ত্রীলোক ছুটে বেরিয়ে এল চীৎকার করতে করতে ঃ

"ওগো মেরো না, 'পানি' গো—গুলি ছুঁড়ো না! অভাগাদের ওপর দয়া করো; বিনতি করে বলছি গো!"

চারিদিক থেকে তারা কামানগুলো ঘিরে ফেলল।

অদ্ভুত-চেহারার পোলিশ স্ত্রীলোকগুলো ওদের কামান-সাফ-করা ডাণ্ডা, কামানের চাকা ইত্যাদি চেপে ধরল দু'হাতে; গোলমালে হতভম্ব-হয়ে-যাওয়া গোলন্দাজদের হাত প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে 'স্ত্রীলোকগুলো' সমস্ত দেহের ভার দিয়ে ওদের চেপে ধরে ঝুলে পড়ল, হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামালো মাটির ওপর।

আসলে এই স্ত্রীলোকগুলির কাঁচুলির নিচে ছিল মিলিটারীর উর্দি, ঘাগরার নিচে ব্রীচেস......

একজন চেঁচিয়ে উঠল ঃ "এরা যে সব চেক দেখছি!" সঙ্গে সঙ্গে বক্তার মাথাটি গুঁড়ো হয়ে গেল রিভলবারের গুলিতে। কয়েকজন গোলন্দাজ ওদের পিটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল, বাদবাকি সবাই চোঁ-চাঁ দৌড়।...কিন্তু চেকরা ততক্ষণে কামানের চাকার তলা থেকে কাঠের ঠেকা সরিয়ে দিয়ে গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তেই পেছু হঠতে শুরু করেছিল। তারপর একসময় তারা গোলাঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল, মনে হল যেন মাটির গহ্বরের মধ্যে মিলিয়ে গেল তারা।

নিস্তব্ধ কামানের সারি, মেশিনগানগুলোও অকেজো। চেকরা এগিয়ে চলল আগের মতোই, সামারার শহরতলি দখল করে ওরা একেবারে ভলগার পাড় পর্যন্ত এসে পড়ল।

ভোর হওয়ার মুখে আকাশ একেবারে পরিষ্কার। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচের কামরার জানলাটায় চড়া রোদ এসে পড়েছে। পুরো সাজপোশাক গায়ে চড়িয়ে জানলার কাছে বসেছিলেন ডাক্তার। চোখদুটো বসে গেছে—রাতে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন নি। নোংরা জলের গামলা, ট্রে, আর পিরিচগুলোর মধ্যে সিগারেটের টুকরো জমেছে। একেকবার একটা ভাঙা চিরুণী বের করে কপালের কোঁকড়া পাকা চুলগুলোর মধ্যে চালিয়ে নিচ্ছেন ডাক্তার। কে জানে, যে-কোনো মুহূর্তে হয়তো মন্ত্রিত্বের কাজের ভার নেবার জন্য ডাক পড়বে তাঁর। হঠাৎ মনে হল, এ বাড়াবাড়ি, যেন একটু বেশিরকমই ভেবে ফেলেছেন তিনি।

জানলার ঠিক পাশে দ্ভরিয়ান্স্কায়া স্ট্রীট ধরে আহত সৈনিকরা সার বেঁধে চলেছে। ওরা যেন যাচ্ছে একটা মৃত শহরের মাঝখান দিয়ে। কেউ কেউ ফুট-পাতের ওপর বসে পড়ছে, দেয়াল ধরে ঝুঁকে রয়েছে। রক্তাক্ত পটি দিয়ে যেমন-তেমন করে বাঁধা ওদের ক্ষতস্থানগুলো। শূন্য জানলাগুলোর দিকে মাথা তুলে তুলে তাকাচ্ছে ওরা—এক গেলাস জল বা এক টুকরো খাবার চাইবে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

গতরাতের প্রচণ্ড ঝড়েও রাস্তা ঠাণ্ডা হয়নি, আজ আবার প্রখর রোদে তা তপ্ত হয়ে উঠেছে। নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছে কামান-গর্জনের নারকীয় সংগীত।

রাস্তায় সাদা ধুলো উড়িয়ে একটা গাড়ি চলে গেল সাঁ করে—ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল মিলিটারী কমিসারের বিকৃত মুখমণ্ডলটা, কালচে ঠোঁটজোড়া। গাড়িটা যাচ্ছিল উৎরাইয়ের দিকে। পরে খবর পাওয়া গেছে, কাঠের পুলের উপর দিয়ে যাবার সময় গাড়িটা নাকি গোলার আঘাতে উড়ে গেছে, সমস্ত আরোহীদের নিয়ে।

সময় যেন স্থাণুর মতো নিশ্চল, যুদ্ধ যেন আর ফুরোতে চায় না। সারা শহর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। 'সামাজিকা' মহিলারা এর মধ্যেই ধোপদুরস্ত সাদা পোশাক ধরেছেন, বালিশের নিচে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন তাঁরা। 'সংবিধান-সভা কমিটির' সভ্যেরা প্রভাতী চায়ের আসরে বসেছেন, ময়দা-কলের মালিক তাঁদের চা পরিবেশন করছেন। চোরা-কুঠরির ক্ষীণ আলোয় 'মন্ত্রীদের' মুখগুলো দেখাচ্ছে অপার্থিব পাঁশুটে ধরনের। এদিকে নদীর ওপারে তখন চেক কামানের নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ চলছে বুম্-বুম্ করে।

বেলা বারোটার সময় দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্ এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে। ঘরের মধ্যে তামাকের ধোঁয়ার নীল কুয়াশা আর সহ্য করা যাচ্ছিল না, হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্টে তিনি জানলাটা খুললেন। রাস্তায় এখন আর একটিও আহত সৈন্যকে দেখা যাচ্ছে না। অনেকগুলো জানলা সামান্য একটু করে খোলা —কোথাও পর্দার আড়াল থেকে একটা চোখ হয়তো উঁকি দিচ্ছে, কোথাও হয়তো মুহূর্তের জন্য একটা বিচলিত মুখ দেখা দিয়েই সরে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটি মাথা বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখন আর সত্যিসত্যিই একটি বলশেভিকও অবশিষ্ট নেই।...কিন্তু নদীর ওপারে তাহলে এমন ঘন-ঘন গোলাবর্ষণ হচ্ছে কেন? উঃ, আর কতক্ষণ এসব চলবে!

এমন সময় হঠাৎ যেন দৈবক্রমে একটি অফিসারকে দেখা গেল রাস্তার মোড়ে —লম্বা-লম্বা পা-ওয়ালা লোকটার পরনে বরফের মতো সাদা, কোমর-উঁচু টিউনিক। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে অফিসারটি এগিয়ে গেল রাস্তার মাঝখান বরাবর। উঁচু-বুটের চুড়োয় তলোয়ারটা ঠুকে যাচ্ছিল। দুপুরের সূর্যের মতো কাঁধের ওপরকার গিল্টি-করা স্কন্ধ-চিহ্নগুলো ঝকমক্ করছিল সাবেকী হুকুমতের আশীষ বহন করে।......

দীর্ঘকালের বিস্মৃত একটা কী যেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচের বুকের মধ্যে দোলা দেয়, এই মাত্র যেন মনে পড়ল রাগের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন তিনি।... দুর্বোধ্য এক উৎসাহের আতিশয্যে জানলা দিয়ে মাথাটা বের করে তিনি অফিসারটিকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বললেন :

"সংবিধান-সভা দীর্ঘজীবী হোক্!"

গোল-মুখো ডাক্তারের দিকে চোখ টিপে হেঁয়ালির সুরে জবাব দিল অফিসারটি :

"সে-সব পরে দেখা যাবে!"

সবগুলো জানলা থেকেই এখন এক-এক করে বেরিয়ে এল মাথা, সবাই অফিসারটিকে প্রশ্ন করতে লাগল :

"ক্যাপ্টেন! শুনুন! সত্যি? আমাদের শহর দখল করেছেন আপনারা? বলশেভিকরা কি চলে গেছে?"

দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্ তাঁর সাদা চুড়োওয়ালা টুপিটা পরে ছড়িটা হাতে নিয়ে একবার আয়নাটির দিকে নজর বুলিয়ে নিলেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। গির্জের উপাসনার পরে যেমন হয় তেমনি করে লোকে বেরিয়ে এল রাস্তায়। দূরে গির্জের ঘণ্টাও বাজছিল খুশিভরা সুরে। সোল্লাস চীৎকারে চারদিক মুখরিত করে গাদাগাদি ভীড় জমেছে রাস্তার মোড়ে। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচের জামার হাত চেপে ধরল তাঁরই একজন রুগী; পরপর তিনটি ভাঁজ পড়েছে মহিলাটির থুতনিতে, সযত্ন-সজ্জিত টুপির ফুলগুলোর মধ্যে কর্পূরের দলার গন্ধ।

"ঐ দেখুন ডাক্তার—চেক!"

রাস্তার কোণে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল দু'জন চেক সৈন্য, মেয়েরা তাদের ঘিরে ধরেছে। একজনের দাড়িটা কামানো, থুতনিটা নীলচে। আরেজনের প্রকাণ্ড একজোড়া কালো গোঁফ। অপ্রতিভভাবে হেসে তারা তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল বাড়িগুলোর ছাদে, জানলায় আর পথচারীদের মুখের ওপর।

তাদের দুরস্ত টুপি, উর্দির চামড়া-মোড়া বোতাম, বাঁ-হাতার ওপর সেলাই-করা প্রতীক-চিহ্ন, শক্ত ব্যাগ, কার্তুজের কেস্ আর দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারা—সবকিছু মিলিয়ে একটা উদ্দীপনা আর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করল ওরা। যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে দু'জন ছিটকে এসে পড়েছে দ্ভরিয়ান্স্কায়া স্ট্রীটের মধ্যে।

ভীড়ের মধ্যে কয়েকজন আপিস-কর্মচারী সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল :

"চেকদের জয় হোক! কাঁধে তুলে নাও ওদের!"

দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন বাতাস শুঁকতে শুঁকতে। যুৎসই একটা উল্লাসধ্বনি চেষ্টা করেও তিনি গলা দিয়ে বের করতে পারলেন না, আবেগে যেন কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ডাক্তার এগুলেন সেই গোপন অধিবেশনের জায়গাটিতে যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে এক গুরু দায়িত্বভার।

ময়দা কলের কুঠরিটাতে তখন শুধু তামাকের বাসি ধোঁয়ার গন্ধ, সিগারেটের টুকরো-ভরা ছাইদানি। সোনালি চুলওয়ালা একটি লোক ছাড়া জনপ্রাণী নেই, একেবারে ফাঁকা। লোকটি টেবিলের ওপর শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। এক গাদা কাগজের ওপর মাথাটি রেখেছে, কাগজগুলোর সারা পিঠ জুড়ে মানুষের মুখ আঁকিবুঁকি-করা। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ লোকটির কাঁধ ছুঁতেই সে ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে দাড়িভরা মুখটা উঁচু করল। ফিকে-নীল চোখজোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুম তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল সে।

"কি চাই?"

"সরকার বাহাদুর কোথায় গেলেন?" কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ : "তুমি এখন জনস্বাস্থ্য বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছ, খেয়াল রেখো।"

"ওঃ-হো—ডাক্তার বুলাভিন?" সোনালি-চুলো লোকটি বলল : "দূর ছাই, আমি তো...আচ্ছা কী হচ্ছে শহরে বলতে পারেন?"

"ঘটনা এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসেনি, তবে এই হয়ে এল বলে। দ্‌ভরিয়ানস্কায়া স্ট্রীটে এখন চেকরা টহল দিচ্ছে।"

লোকটি দাঁত বের করে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল :

"চমৎকার, চমৎকার! খুব ভালো কাজ হয়েছে সত্যি। যাহোক, আজ কিন্তু কাঁটায়-কাঁটায় বেলা তিনটের সময় সরকার বাহাদুর বৈঠকে মিলছেন। যদি এর মধ্যে কোনো অঘটন না ঘটে তাহলে আমরা সন্ধ্যের দিকেই নতুন কোনো ভালো জায়গায় গিয়ে উঠব।"

দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচের মনে কেমন একটা কুটিল সন্দেহ ছায়া মেলল। বললেন :

"মাফ করবেন, আমি কি কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সভ্যের সঙ্গে কথা বলছি? আপনি তো আভ্‌ক্‌সেন্তিয়েভ, তাই না?"

জবাবে সোনালি-চুলওয়ালা লোকটি এমন একটা অস্পষ্ট ভঙ্গী করল যার মানে দাঁড়ায় : 'যেমন বুঝছেন!' টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল লোকটি। বলল :

"আপনার স্থান হল রাস্তায়, ডাক্তার সাহেব। মনে রাখবেন, কোনোরকম বিশৃঙ্খলা আমরা বরদাস্ত করব না। আপনি তো বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একজন মুখপাত্র—যখন যান তো, ওদের উৎসাহটা একটু প্রশমন করে আসুন।...আর না-হলে" (চোখ টিপে বলে), "পরে ফ্যাসাদ বাধতে পারে।"

ডাক্তার বুলাভিন বেরিয়ে এলেন। সারা শহরটাই যেন এর মধ্যে রাস্তায় এসে জড়ো হয়েছে। অপরিচিত লোকেরাও একজন আরেকজনকে দেখে নমস্কার জানাচ্ছে—যেন ইস্টারের উৎসব। সম্ভাষণ বিনিময় হচ্ছে, টুকরো-টাকরা খবরও মুখে মুখে প্রচার হচ্ছে।

"বলশেভিকরা তো হাজারে-হাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামারকা নদীতে, ওপারে গিয়ে নাকি উঠবে তারা।"

"আর পালে পালে বেটাদের গুলি করে মারা হচ্ছে—"

"এক গাদা লোক তো জলে ডুবেই মরল!"

"ঠিক ঠিক, শহরের ঠিক বাইরেই সারা ভলগা একেবারে ছেয়ে গেছে মড়ায়।"

"আমি বলছি ভগবানকে সবাই ধন্যবাদ দিন! এতে কোনো পাপ নেই জানবেন।..."

"সত্যি কথা! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!"

"শ্‌নেছেন খবর মশাইরা? সেক্সটনকে নাকি ওরা ঘণ্টা-ঘর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে।"

"কারা দিয়েছে? বলশেভিকরা তো?"

"তা ছাড়া আর কারা? ও-সব ঘণ্টা টণ্টা নাকি বাজানো চলবে না।...ওইভাবেই নাকি ওরা পেছন ফেরার পথ বন্ধ করছে।...তা, তেমন তো আর কেউ-কেটা নয়—কোথাকার এক সেক্স্‌টন!"

"কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

"এই একট্‌ ওধারটা ঘ্‌রে আসি—একবার গোলাঘরগ্‌লো দেখে এলে মন্দ হত না, আস্ত আছে কিনা কে জানে।"

"পাগল হয়েছ? বলশেভিকরা এখনও জেটিতে রয়েছে যে!"

"এই যে দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ...এ দিনটির ম্‌খ তাহলে দেখতে পেলাম।... কোথায় যাচ্ছেন আপনি এমন গম্ভীর ম্‌খ করে?"

"এই,—ব্যাপার হল...ওরা আবার আমায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারি করে দিয়েছে কিনা!"

"অভিনন্দন গ্রহণ কর্‌ন, মাননীয় আণ্ডার-সেক্রেটারি সাহেব।"

"না, না, না, এখনও সময় হয়নি...যতক্ষণ না মস্কো দখল করা হচ্ছে..."

"ওঃ ডাক্তার সাহেব, এবার একট্‌ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!"

ভিড়ের মধ্যে চেকদের সোনালি স্কন্ধচিহ্নগ্‌লো যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। যা কিছ্‌ প্‌রনো, সব কিছ্‌র প্রতীক এই চিহ্ন। অফিসারদের একটা ফৌজীদল দৃঢ়পায়ে হে'টে চলে যাচ্ছে, ছোট ছেলেরা ওদের পিছন পিছন দাঁত বের করতে করতে চলছে, স্‌শ্রী মেয়েরা হেসে ওদের সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সাদোভায়া থেকে ভিড়টা ক্রমে দ্‌ভরিয়ান্‌স্কায়া স্ট্রীটে এসে পড়ল, সব্‌জ টালিওয়ালা অদ্ভুত জাঁকজমক-ঘেরা কুর্‌লিন প্রাসাদের পাশ কেটে চলে এল জনতা। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল......

"ব্যাপার কি? কী হয়েছে?"

"ও-বাড়ির আঙিনার মধ্যে বলশেভিকরা রয়েছে, অফিসার সাহেব—কাঠের গাদার আড়ালে ল্‌কিয়ে আছে, দ্‌'জন।"

"অ্যাঁ! এগিয়ে যান মশাইরা, এগিয়ে যান!"

"অফিসাররা সব গেলেন কোথায়?"

"ঘাবড়াবেন না মশাইরা, ঘাবড়াবেন না!"

"কয়েকজন 'চেকা'র লোককে ধরেছে ওরা!"

"দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ, সরে আস্‌ন একপাশে—কখন কি হয় বলা যায় না..."

গ্‌লি ছোঁড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা যেন দ্‌লে উঠল। বেগতিক দেখে লোকে ছ্‌টতে শ্‌র্‌ করল, কোথায় রইল ট্‌পি কোথায় রইল কী! দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ হাঁফাতে হাঁফাতে ছ্‌টে এসে দেখলেন দ্‌ভিরিয়ান্‌স্কায়া স্ট্রীটেই আবার ফিরে এসেছেন। যে-সব ব্যাপার ঘটছে তার জন্য নিজেকেই দ্‌ষতে ইচ্ছে

হল তাঁর—সব কিছুর জন্য যেন তিনি নিজেই দায়ী। চৌমাথার মোড়ে ফিরে এসে তিনি ভুরু কুঁচকে দেখলেন সেই কাঠের শীর্ষফলকটা, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মূর্তিটাকে সেটা আড়াল করে রেখেছে। হাতটা সামনে প্রসারিত করে তিনি ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে সজোরে ঘোষণা করলেন :

"যা কিছু রুশীয়, সবকিছুকে ধ্বংস করবার জন্য বলশেভিকরা তৈরি হয়ে আছে। তারা চায় রাশিয়ার মানুষ নিজেদের অতীত ইতিহাস ভুলে যাক্। এইখানেই দেখুন, মুক্তিদাতা জারের একটি নিতান্ত নিরীহ মূর্তি পড়ে রয়েছে। সরিয়ে দিন ঐ ঘৃণ্য তক্তাগুলো, নোংরা নেকড়ার ফালিগুলো।"

জনতার সম্মুখে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। চুড়ো-টুপিপরা কয়েকজন ফাজিল ছোকরা—সম্ভবত দোকানের কর্মচারী তারা—সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল:

"ভেঙে ফেলুন তক্তাগুলো!"

মূর্তিটার গা থেকে মড়মড় শব্দ করে তক্তাগুলো খুলতে শুরু করল ওরা। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্ এবার আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ভিড়টা এর মধ্যে পাতলা হতে আরম্ভ করেছিল। নদীর ওপার থেকে বন্দুকের শব্দ এখন আরও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। নদীর দিক থেকে হঠাৎ একটি লোক ডাক্তারের দিকে ছুটে এল। চোখের ওপর তার কালো চুলগুলো ঝুলে পড়েছে, পরনে ভিজে জব্‌জবে একজোড়া 'হোস' ছাড়া আর কিছুই নেই। চওড়া বুকটায় উল্কির দাগ। মেয়েরা চীৎকার করে ছুটে গেল দেউড়ির দিকে। হঠাৎ লোকটি ঘুরে গিয়ে ঢালু পাড় বেয়ে ভলগার দিকে দৌড়তে শুরু করল। আরও তিনজনকে দেখা গেল, তারপর এক এক করে আরও অনেকে ছুটে এল, আপাদমস্তক ভিজে, অর্ধউলঙ্গ; দারুণ হাঁপাচ্ছে তারা। চীৎকার উঠল :

"বলশেভিক্! খুন করো বেটাদের!"

শিকারীর বন্দুকের আওয়াজে ভড়কে গিয়ে কাদাখোঁচা পাখি যেমন পালাবার চেষ্টা করে, তেমনি অন্ধের মতো ঢালু পাড় বেয়ে তারা ছুটতে লাগলো পারঘাটার দিকে। প্রবল উত্তেজনায় দ্মিত্রি স্তেপানোভিচও দৌড়তে শুরু করলেন। অসুস্থ দুর্বল চেহারার একজন লোককে চেপে ধরলেন তিনি। লোকটার চোখে পাতা নেই একটিও, নাকটা বাঁকা। ডাক্তার বললেন :

"নতুন গভর্ণমেন্টের আমি একজন মন্ত্রী! এখানে একটা মেশিনগান এখনই চাই। এই মুহূর্তে যোগাড় করে আনো একটা—আমি তোমাকে হুকুম করছি!"

"আমি রুশ ভাষা জানি না!"—কষ্টকৃত উচ্চারণে জবাব দিলো অসুস্থ চেহারার লোকটি।

ডাক্তার তাকে একপাশে ঠেলে দিলেন। ব্যাপারটা ভয়ানক জরুরি। তিনি নিজেই এবার চললেন মেশিনগানওয়ালা একজন চেককে খুঁজে বের করতে।...... একটা বাড়ির দেউড়ির ওপর বাঁকা হয়ে ঝুলছিল লাল-তারা। সেটার নিচে আসতেই ডাক্তারের নজরে পড়ল আরেকজন বলশেভিক—গায়ের চামড়া তামাটে, মাথার চুল

কামানো, তাতারদের মতো দাড়ি। লোকটার মিলিটারি-উর্দি ছেঁড়া, কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। কেবলই এপাশ ওপাশ করছিল মাথাটা আর ছোট-ছোট দাঁতগুলো খিঁচোচ্ছিল কুকুরের মতো। মর্মান্তিক মৃত্যুভয়ের একটা ছাপ পড়েছে লোকটার সারা মুখে। জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর, বিশেষ করে মেয়েরা উন্মাদের মতো চেঁচাচ্ছে। ছাতা লাঠি উঁচিয়ে, মুষ্টিবন্ধ হাত নেড়ে শাসাচ্ছে জনতা।...... একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল দাঁড়িয়েছিলেন দরজার সিঁড়িতে। টাক-মাথার ওপর থেকে তাঁর প্রকাণ্ড টুপিটা প্রায় পিছলে পড়ছিল, ফুলো গলার নিচে মেডেলগুলো দ্রুত ওঠানামা করছিল। তাঁর ছ্যাঁতলা-পড়া হাতের ঘুষি সিধে এসে পড়ছিল বলশেভিকটির মুখের ওপর; আর সকলের গলা ডুবিয়ে দেবার জন্য তিনিই চেঁচাচ্ছিলেন সবচেয়ে বেশি।

"চালিয়ে যান মশাইরা! লোকটা হল কমিসার।...রেহাই দেবেন না একদম! আমার নিজের ছেলে বলশেভিক। আমার যে কী দুঃখ! আপনারা যদি পারেন তো তাকে ধরে আনুন মশাইরা, নিয়ে আসুন আমার কাছে।...নিজের হাতে তাকে খুন করব এইখানে দাঁড়িয়ে, আপনাদের সকলের সামনে।...হ্যাঁ, নিজের ছেলেকেই খুন করব আমি।...এটিকেও কিন্তু আপনারা ছাড়বেন না কখ্‌খনো..."

এ-ব্যাপারে বাধা দিতে যাওয়াটা বিশেষ কাজের হবে না, উদ্বিগ্নভাবে ভাবলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ, তারপর পিছন দিকে তাকাতে তাকাতে সরে গেলেন সেখান থেকে।...চেঁচামেচিটা ক্রমশই কমে আসছে। আহত কমিসারটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে লাঠিসোটা আর ছাতার ভিড় জমে গেছে।...এখন সব ঠাণ্ডা, শুধু কিল ঘুষির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।...অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলটি দরজার সিঁড়ি থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন; টুপিটা এবার নাকের ওপর এসে পড়েছে, মাথার ওপর হাতদুটো আস্তে আস্তে নাড়ছিলেন অর্কেস্ট্রার পরিচালকের মতো।

পিছন থেকে দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচকে এসে ধরল উকিল মিশিন। লোকটার মুখটা ফুলো-ফুলো, গলা অবধি বোতাম-আঁটা নোংরা জ্যাকেট গায়ে, প্যাঁশনের একটা কাঁচ খোয়া গেছে।

"মেরে ফেলল লোকটাকে। ছাতার বাঁট দিয়ে মারতে মারতেই মেরে ফেলল! বড়ো বিচ্ছিরি জিনিস এই জনতার আইন! ওঃ ডাক্তার, নদীর ধারে এখন নাকি ভয়ানক ব্যাপার চলছে শুনলাম..."

"সে ক্ষেত্রে আমাদের তো ওখানে যাওয়া দরকার দেখছি। তুমি জানতে যে আমি গভর্নমেণ্টে আছি?"

"হ্যাঁ, আর শুনে খুব খুশিও হয়েছি।"

গভর্নমেণ্টের নাম করে দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ ছ'জন অফিসারের একটি ফৌজীদলকে ধরলেন রাস্তায়। নদীর পাড়ে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে, সুতরাং ওদের সহায়তা চাই, এই কথা জানালেন ডাক্তার। প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়ে এতক্ষণে চেক টহলদার সৈন্য এসে গেছে। সুসজ্জিতা মহিলারা তাদের বুকে ফুল গুঁজে

দিচ্ছেন, রুশভাষায় কয়েকটা খুচরো কথাবার্তাও শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছেন, আর বিদেশীদের কাছে মেয়েরা যাতে প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠেন, শহরটা এবং গোটা দেশটাই যাতে তাদের ভালো লাগে তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ছেন; চেকরা অন্তরীণ হয়ে থাকার সময় যে-আতিথেয়তা রুশরা তাদের দেখিয়েছিল সেই তিক্ত আস্বাদকে এখন মিষ্টি প্রলেপ দিয়ে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

ভয়ানক দেরি করে এলেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ ঃ শহরতলী থেকে পালিয়ে সামারকা নদীর পাড়ে যে-সব লাল সৈন্য আশ্রয় নিচ্ছিল, ভলান্টিয়াররা এর মধ্যেই তাদের খতম করে দিয়েছে। যারা কোনোরকমে কাঠের পুলটা পেরিয়ে গিয়েছিল কিংবা তেরছা সারিতে সাঁতরে নদী পার হয়ে গিয়েছিল তারা মরি-বাঁচি করে বজরা কিংবা স্টীমারে উঠে ভলগার উজানে রওনা হয়ে গেছে। স্রোতের কিনারায় অলস ঢেউয়ের মধ্যে খাবি খাচ্ছিল কয়েকটা মৃতদেহ। আরও যে কত অসংখ্য দেহ স্রোতের টানে ভলগায় ভেসে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

পচা কাঠের একটা নৌকো উল্টে পড়ে আছে, তার ওপর বসে রয়েছেন গভিয়াদিন। জামার হাতায় একটা তেরঙ্গা ফিতে বাঁধা, শণের নুড়ির মতো মাথার চুল তাঁর ঘামে জবজবে। নিস্প্রভ চোখে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নদীর রৌদ্র-ঝলমল ঢেউয়ের দিকে, চোখের তারাদুটো সূঁচের ডগার মতো তীক্ষ্ম। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কড়া গলায় বললেন ঃ

"মিলিশিয়ার সহকারী অধিনায়ক, আমি খবর পেয়েছি এখানে নাকি অবাঞ্ছিত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে।......গভর্নমেন্ট চান......"

ডাক্তার কথা শেষ করতে পারলেন না, তাঁর চোখদুটো গিয়ে পড়ল গভিয়াদিনের হাতের ওককাঠের ডাণ্ডাটির দিকে। জমাট রক্ত আর চুলের গোছা লেগে রয়েছে তাতে। গভিয়াদিন বিড়বিড় করে বললেন ঃ "ওই আরেকজন চলল..." গলার স্বরটা এমন বুজে গেছে যে প্রায় শোনাই যায় না।

ক্লান্তভাবে নৌকো ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গভিয়াদিন। স্রোতের টানে যে চুল-কামানো মাথাটা একটেরে ভেসে আসছিল সেটাকে একটু ভালো করে দেখবার জন্য তিনি নদীর কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে পাঁচ-ছ'জন ছোকরা গভিয়াদিনের কাছে এল। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ তাঁর অফিসারদের দিকে ঘুরলেন। ওরা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ব্যাভেরিয়ান 'ক্ভাস' পান করতে শুরু করেছে। মাথায় রীতিমতো বুদ্ধি খেলিয়ে একজন শুঁড়ি তার মদের গাড়িটাকে টেনে এনেছে এইখানে, আর অফিসাররাও তার সদ্ব্যবহার করছে। লোকটার গায়ের এপ্রনটা এমন পরিষ্কার যে সহজেই নজরে পড়ে। অপ্রয়োজনে নিষ্ঠুরতা দেখানো বন্ধ করা উচিত এই মর্মে অফিসারদের সামনে রীতিমতো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন ডাক্তার। গভিয়াদিন আর ভাসমান নরমুণ্ডটার দিকে আঙুল দেখালেন তিনি। তুষার-শাদা উর্দি পরা, লম্বা পা-ওয়ালা সেই ঘোড়-সওয়ারদলের ক্যাপ্টেনটি তার বরফ-ঢাকা গোঁফটা চুমরে নিল একবার। তারপর

হাতের রাইফেলটা তুলে গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা।

দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ শহরে ফিরলেন এই মনোভাব নিয়ে যে তাঁর যা সাধ্যায়ত্ত সবই তিনি করেছেন। গভর্নমেণ্টের প্রথম বৈঠকে যোগ দিতে দেরি করলে চলবে না। উৎরাইয়ের দিকে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠবার সময় তাঁর বুটের গুঁতোয় ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হল। তাঁর নাড়ীর গতি তখন একশো-কুড়ির কম কিছুতেই নয়। এক রোমাঞ্চকর কল্পনা উপচে উঠছে তাঁর মস্তিষ্কে ঃ মস্কো অভিযান, মস্কোর হাজারটা গির্জায় সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি...কে জানে?—হয়তো রাষ্ট্র-পতির আসনটাই...কারণ বিপ্লবের তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই—একবার যখন পেছন দিকে হঠতে শুরু করেছে তখন তার রথের চাকার তলায় ওই সব এস্-আর আর এস-ডির দল পিষে মরতে বেশি সময় লাগবে না, ভুঁড়ি ফেঁসে যাবে ওদের। ...না মশাই মাফ করুন, বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে অনেক কচ্‌কচি করেছেন তিনি, আর নয়।

॥ সাত ॥

কাতিয়া দ্মিত্রেভ্না নিচু ড্রয়িংর্মটায় বসে চিঠি লিখছিল ছোট বোন দাশার কাছে। পাশে রয়েছে রবার-গাছের টব। চোখের জলে ভেজা র্মালখানা তার হাতের মধ্যে দলা পাকানো।

শার্সির ব্দ্ব্দ-আঁকা চিড়্-ধরা কাঁচে সজোরে এসে পড়ছে ব্ষ্টির ছাঁট, বাইরে বাতাসে দ্লে দ্লে উঠছে এ্যাকেসিয়া গাছগ্লো। স্দ্রে আজও সাগরের ওপর দিয়ে যে-বাতাস মেঘের দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই একই বাতাস এই ঘরের দেয়াল-মোড়া আল্গা কাগজগ্লোকেও ফরফর করে নাড়া দিচ্ছে।

"দাশা, দাশা," লিখে চলেছে কাতিয়া ঃ "আমি তোকে বলে বোঝাতে পারব না কী দার্ণ অস্খী আমি। ভাদিম মারা গেছে। কর্নেল তেৎকিন, যাঁর বাড়িতে আমি এখন রয়েছি, উনিই আমাকে খবরটা দিয়েছেন গতকাল। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম কে তাঁকে খবরটা দিয়েছে। উনি আমাকে ঠিকানা দিলেন ভ্যালেরিয়ান ওনোলি'র। ওনোলি হল কর্নিলভের দলের লোক, সবে ফ্রন্ট থেকে ফিরেছে। সন্ধ্যেয় তার হোটেলে গেলাম। নিশ্চয়ই প্রচুর মদ খেয়েছিল লোকটি। আমাকে তার কামরায় টেনে নিয়ে গিয়ে সে আমায় মদ খেতে অন্রোধ করল।...কী বিশ্রী ব্যাপার!...এখানকার লোকজন যে কেমন তা তুই ধারণাতেই আনতে পারবি না।...আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আমার স্বামী কি সত্যিই মারা গেছেন?' ওনোলি ছিল ভাদিমের সহকর্মী অফিসার, ওরই বন্ধ্, ওরা পাশাপাশি থেকে লড়াই করেছে।......রোজই ভাদিমের সঙ্গে দেখা-করত সে।......আমার দিকে তাকিয়ে উপহাস করে বলল ঃ "সে তো মরেই গেছে ওগো কন্যে, আর চিন্তা করে কি লাভ! আমি নিজের চোখে দেখেছি ওর ম্দার ওপর মাছির ঝাঁক।..." তারপর বলল ঃ "রশচিনকে আমরা সবাই সন্দেহ করতাম —ও যে মরে গেছে সে ওর ভাগ্যি!..." কিন্তু কোথায়, কখন, কিভাবে ভাদিম মারা গেল সে সম্পর্কে লোকটা কিছ্ই বলল না আমায়।......আমি অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, কাঁদলাম, তব্ নয়।...চেঁচিয়ে ধমকে বলল ঃ "কে কোথায় মরল সে-সব কি আর ছাই মনে আছে?" তারপর সে আমায় জানালো ভাদিমের বদলে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি কিনা।...উঃ দাশা! কী অসভ্য এই লোকগ্লো! আমি হোটেল ছেড়ে তখনই বেরিয়ে পড়লাম, মন তখন আমার একেবারে ভেঙে পড়েছে।......

"আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারি না দাশা, যে ভাদিম নেই।...কিন্তু খবরটা নিশ্চয়ই সত্যি—আমার কাছে মিথ্যে বলার কোনো কারণ ছিল না সে-লোকটির। কর্নেলও বলছেন খবরটা সত্যিই হবে।...ভাদিম যতদিন ফ্রন্টে ছিল, একটিমাত্র চিঠিই সে লিখেছিল আমায়—চিঠিটাও খ্বই সংক্ষিপ্ত, ভাদিমের মতো নয় মোটেই। ইস্টারের দ্' হপ্তা বাদে এসেছিল চিঠিটা। শ্র্তে কোনো সম্বোধনও ছিল না।

যা লিখেছিল হুবহু বলে যাচ্ছি ঃ 'তোমাকে টাকা পাঠাচ্ছি। আমি আর গিয়ে দেখা করতে পারছি না। যখন আমরা আলাদা হয়ে যাই সে-সময়কার কথাগুলো আমার মনে আছে।...জানিনা লোকে খুনীতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে সত্যিই নিজেকে বাঁচাতে পারে কিনা।...জানিনা কেমন করে আমি খুনী হয়ে দাঁড়ালাম। মন থেকে সব ভাবনা তাড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু না ভেবে যে উপায় নেই তা জানি, কিছু যে একটা করা দরকার তাও জানি। যখন সব ঝামেলা মিটে যাবে, অবিশ্যি যদি সত্যিই কোনো কালে মেটে, তাহলে হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের।"......

"ব্যস্ এইটুকুই। দাশা, তুই যদি জানতিস্ কেমন কেঁদেছিলাম চিঠিটা পেয়ে। ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল মরবার জন্যই। আমি কেমন করে ওকে রুখতে পারতাম বল্, কেমন করে ফিরিয়ে আনতাম ওকে? কেমন করে বাঁচাতে পারতাম? কী করার সাধ্য ছিল আমার? খালি বুকের কাছে ওকে টেনে রাখা...ব্যস্! এই তো?...কিন্তু শেষের দিকটায় তো ও আমার দিকে নজরই দিত না। বিপ্লব, বিপ্লব—বিপ্লব ছাড়া আর কিছু ও দেখতেও পেত না, ভাবতেও পারত না। উঃ বুঝতে পারি না কিছু, বুঝতে পারি না! বেঁচে থেকে আমাদের কারুর লাভ আছে কিছু? সবই তো ধ্বংস হয়ে গেছে......ঝড়ের পাখির মতো পাগলপারা হয়ে সারা রাশিয়া চুঁড়ে বেড়াচ্ছি আমরা। কেন? কি জন্য? যত রক্ত ঝরেছে, যত কষ্ট গেছে, যত পরীক্ষা গেছে মাথার ওপর দিয়ে, এ সবের বিনিময়ে কি আবার ঘর ফিরে পাব? সেই চমৎকার কামরা আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাসের আড্ডা ফিরে পাব?...আর কি কোনো কালে সুখের মুখ দেখব? যা অতীত তাকে আর ফিরে পাবনা, ভাঙা জিনিস কি আর জোড়া লাগে দাশা!... জীবনের আনন্দ আমাদের ফুরিয়ে গেছে, অন্যেরা এখন ভোগ করে নিক, আমাদের চেয়েও যারা শক্ত মানুষ, আমাদের চেয়েও যারা মহৎ..."

কাতিয়া কলম রেখে দলা-পাকানো রুমালটা দিয়ে চোখ মুছে নিল। শার্সি চারটের ওপর অঝোরে ঝরছিল বৃষ্টিজলের ধারা—সেই দিকে তাকিয়ে রইল খানিক-ক্ষণ। একটা এ্যাকোসিয়া গাছ অনবরত মাথা নিচু করে দুলছিল, যেন পাগলা হাওয়ায় কার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। কাতিয়া আবার লিখে চলল ঃ

"বসন্তের শুরুতেই ভাদিম চলে গেল ফ্রন্টে। আমার সারা জীবনটা যেন বুভুক্ষু হয়ে ওর জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। কী করুণ, কী ব্যর্থ, একেবারেই ব্যর্থ সেই প্রতীক্ষা!...মনে আছে, জানলার ধারে বসেছিলাম একদিন।......এ্যাকেসিয়ার ফুল সবে ফুটছে, মোটা মোটা কুঁড়িগুলো পাঁপড়ি মেলছে, উঠোনের মধ্যে একদল চড়ুই পাখি কী সোরগোলটাই না তুলেছে। আর আমি! এমন অভিমানে ভরে গেল মনটা আমার, এমন নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম যে কী বলব...এ পৃথিবীতে যেন আমার কোনো স্থানই নেই! লড়াই থেমে গেছে, বিপ্লবও থেমে যাবে। কিন্তু রাশিয়া আর আগের মতো হবে না। আমরা লড়ি, মরি, দুঃখ পাই। কিন্তু গাছগুলো তো গত বসন্তে যেমন এ-বসন্তেও তেমনি ফুলে ভরে উঠেছে, আগেও

এমনি আরও কতো বসন্ত চলে গেছে ওদের জীবনে। গাছ আর চড়ুইপাখি, গোটা প্রকৃতিটাই যেন আমার কাছ থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে এমন এক জীবন নিয়ে ব্যস্ত যার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ই নেই।......

"দাশা, আমাদের এত দুঃখবেদনা কেন? শুধু ব্যর্থতাই তার একমাত্র মর্ম হতে পারে না। তুই আর আমি, আমরা হলাম মেয়ে। আমাদের নিজেদের ছোট্ট দুনিয়াটাকেই শুধু আমরা চিনি। কিন্তু এই গণ্ডিটার বাইরে যা ঘটছে তাতে সারা রুশদেশটাকেই এখন বলা চলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। নিশ্চয়ই কোনো নতুন সুখের উদয় হবে এই অগ্নিকুণ্ডের শিখায়।...মানুষের যদি সে বিশ্বাস না থাকত তাহলে তারা কখনোই যেত না এই ঘৃণা আর হানাহানির মধ্যে।...সবই তো হারিয়েছি আমি।...আর কিসের জন্যই বা বাঁচব!...কিন্তু তবু যে বেঁচে রয়েছি তার কারণ ট্রেনের চাকার নিচে মাথা পেতে দিতে কিংবা কড়িকাঠে ফাঁসির দড়ি ঝোলাতে আমি লজ্জা পাই—ভয় নয়, লজ্জাই পাই।......

"কাল রস্তভ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যাতে কোনও স্মৃতির দংশন না সইতে হয়। ...একাতেরিনোস্লাভে যাচ্ছি। সেখানে আমার বন্ধুরা আছে।...আমাকে একটি খাবারের দোকানে চাকরি নিতে বলছেন এঁরা। হয়তো তুইও দক্ষিণের দিকে আসবি দাশা। পিতার্সবুর্গে এখন নাকি ভয়ানক অবস্থা শুনলাম......

"এখানেই তো একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর এত তফাৎ। মেয়েরা একবার যাকে ভালবাসে তাকে কখনো ছাড়তে পারে না, যদি দুনিয়া রসাতলে যায় তবুও।...কিন্তু ভাদিম তো আমায় ছেড়ে গেল।...যতদিন ওর আত্মবিশ্বাস ছিল ততদিনই ও আমায় ভালবেসেছে।...পেত্রোগ্রাদের সেই জুন মাসটির কথা মনে আছে তোর? সূর্যের নিচে কতো না সুখে গা এলিয়ে দিতাম আমরা?...সারা জীবনেও আমি উত্তরের সেই হাল্কা রোদের কথা ভুলব না। আমার কাছে ভাদিমের একটিও ফটো নেই, সামান্যতম স্মৃতিচিহ্নও নেই।......মনে হয় যেন সবই ছিল স্বপ্ন। আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না দাশা, যে সে নেই, একেবারেই পারছি না। মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব। কী করুণ, কী ব্যর্থ যে এই জীবন আমার......"

কাতিয়া আর লিখতে পারল না। ওর রুমালখানা একেবারেই ভিজে গেছে ...কিন্তু চিঠিপত্রে লোকে যা আশা করে, দৈনন্দিন জীবনের এটা-সেটা কথা তো লিখতেই হবে।...তাই এসব কথা সে লিখে যায় রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টির তালে-তালে, কলের পুতুলের মতো। না আছে মন, না আছে দরদ। খাবার জিনিসের দর, চড়া দামের কথা সে লিখল..."কিছু পাওয়া যায় না, সুতোগাছটি পর্যন্ত না। ...সামান্য একটা সূঁচের দাম হল গিয়ে পনেরো শো রুবল কিংবা দুটো জ্যান্ত শুয়োরের বাচ্চা।...পাশের বাড়ির মেয়েটা, বয়েস এই বছর সতেরো হবে, সেদিন রাতে ফিরে এল উলঙ্গ অবস্থায়, ছড়ে গেছে সারা গা—ডাকাতরা রাস্তায় ওর কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়েছে। ওরা কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই জুতোর খোঁজে বের হয়।..." জার্মানদের কথাও লিখল কাতিয়া, শহরের পার্কে তারা সামরিক

ব্যান্ডের আসর জমিয়েছে, রাস্তাঘাট সাফ করিয়ে নিয়েছে, কিন্তু শস্য, মাখন, ডিম এসব তারা সিধে চালান করছে জার্মানিতে।...সাধারণ মানুষ আর মজুররা ওদের ঘৃণা করে কিন্তু মুখে কিছু বলে না, কারণ কোনো জায়গা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে সে ভরসা তাদের নেই।

কর্নেল তেৎকিনই তাকে এসব কথা বলেছেন। "লোকটি বড় ভাল। কিন্তু হাজার হলেও অভাবী সংসারে একটা বাড়তি মুখ তো...ওঁর গিন্নীটি অবশ্য রেখে-ঢেকে কথা বলার ধার ধারেন না।" কাতিয়া আরো একটু জুড়ে দিল : "গত পরশুদিন আমি সাতাশ বছরে পা দিয়েছি, কিন্তু একবার যদি দেখতিস্ আমায়! যাক্ গে, ওসব কথা ভেবে কি হবে?...এ সবের আর কী দাম আছে এখন! কে আর ভাবছে আমার কথা বল্..."

আবার সে বের করল রুমালখানা।

কাতিয়া চিঠিটা দিল তেৎকিনের হাতে। সুযোগ পেলেই তিনি পিতার্স-বুর্গে পাঠিয়ে দেবেন কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কাতিয়া চলে যাবার পর অনেক দিন সেটা তাঁর পকেটে পকেটেই ঘুরেছে। উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা রীতিমত কঠিন কাজ। ডাক বাক্স চালু নেই। চিঠি পাঠাতে হলে বিশেষ দূতের মারফৎ পাঠাতে হয়—যে-সব দুঃসাহসী লোক নিয়ে যায়, এই কাজ-টুকু করে দেবার জন্য তাদের অনেক টাকাই পারিশ্রমিক দিতে হয়।

সামারা থেকে যে সামান্য কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কাতিয়া, যাবার সময় সবই বিক্রি করে চলে যায়, সঙ্গে রাখে শুধু একটি জিনিস—ফিরোজা পাথরের একটা আংটি। অনেক অনেকদিন আগে, যুদ্ধেরও আগে, সে এই আংটিটা পেয়েছিল পিতার্সবুর্গের এক সান্ধ্যবাসরে জন্মদিনের উপহার হিসেবে। সে সব যে কতোদিন আগেকার কথা, যৌবনের সাথী সেই রহস্যঘেরা শহরটাকে এখন কতো সুদূর মনে হয়, তার সঙ্গে কোনো মায়ার বাঁধনের কথা কাতিয়া এখন অনুভবই করতে পারে না।...দাশা, নিকলাই ইভানোভিচ্ আর কাতিয়া 'নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট'-এর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।...ফিরোজা পাথর-বসানো আংটিটা ওরা বেছে নিয়েছিল তখনই। কাতিয়ার আঙুলে সবুজের আভা যেন ঠিকরে পড়ছিল। এখন সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর একমাত্র সাক্ষী রয়ে গেছে এই আংটিটা।......

পর পর অনেকগুলো ট্রেন রস্তভ স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। ভিড়ের মধ্যে চেপ্টে ধাক্কাগুঁতো খেয়ে কাতিয়া অবশেষে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঢুকে পড়ল। জানলার ধারে জায়গা করে নিয়েছিল সে। সেলাই-করা জামাকাপড়ের বান্ডিলটা সে কোলের ওপর রেখে বসল। নিচু খোলা মাঠ, দনের জলাজঙ্গল, দিগন্তের ধোঁয়া, জার্মানদের দখল-এড়ানো বাতায়িস্ক-এর কুয়াশাঘেরা পটরেখা, সবই ছুটে যাচ্ছিল পেছনের দিকে। খাড়া-পাড় নদীর ঠিক কিনারায় জেলেদের গ্রামগুলো অর্ধেক ডুবে গেছে; কাদামাটির ঘর, ফলের বাগান, উলটোনো নৌকা; ছেলেরা মাছধরা জাল নিয়ে ছুটছে। তারপর দেখা যায় আজভ সাগরের দুগ্ধ-

ধবল জলবিস্তার, দূরে কয়েকটি নৌকার পাল কাত হয়ে আছে সাগরের বুকে। তাগানরগ কারখানার ঠান্ডা চিমনিগুলোও নজরে পড়ে। তারপর একে একে আসে স্তেপ, উঁচু উঁচু ঢিবি, পরিত্যক্ত খনি। খড়িমাটির পাহাড়ের নিচে ছড়িয়ে আছে বড় বড় গ্রাম। নীল আকাশের গায়ে বাজপাখি। ইঞ্জিনের শিটিগুলোকেও মনে হয় এই বিষণ্ন প্রান্তর-চিত্রের মতোই রোদনভরা।......বিমর্ষ চাষীরা যাচ্ছে...... স্টেশনে স্টেশনে জার্মানদের লোহার শিরস্ত্রাণ।

বুড়িমানুষের মতো কুঁজো হয়ে বসে কাতিয়া জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। নিশ্চয়ই ওর মুখটার মধ্যে অসাধারণ করুণ আর লাবণ্যময় একটা কিছু আছে যার ফলে সামনের আসনে বসা জার্মান সৈনিকটি ওর দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে, অথচ এই রুশ মেয়েটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। জার্মানটির চোখে নিকেল-রীমের চশমা, শীর্ণ ক্লান্ত মুখখানায় কাতিয়ার মতোই বিষাদের ছাপ।

"অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, গ্নেডিগে ফ্রাউ*, সে দিন এল বলে।" মৃদু স্বরে জার্মান ভাষায় বলল লোকটি : "জার্মানিতেও তাই হবে, সারা পৃথিবীতেই তাই হবে। আসল বিচারক যে সে আসবেই......তার নাম হল 'সোশিয়ালিৎস্‌মাস্‌'।......"

প্রথমে কাতিয়া বুঝতে পারেনি যে জার্মানটি তাকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলছে। সে শুধু তার বড়ো-বড়ো স্বচ্ছ নিকেল-রীমওয়ালা চশমাজোড়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। জার্মানটি বন্ধুভাবে তার দিকে মাথা নুইয়ে বলল :

"গ্নেডিগে ফ্রাউ কি জার্মান জানেন?"

"হ্যাঁ", বলল কাতিয়া।

"যখন কেউ প্রচণ্ড যাতনা ভোগ করে তখন তার একমাত্র সান্ত্বনা থাকে যে সে ভালো কাজের জন্যই দুঃখ সইছে।"—আসনের নীচে পা গুটিয়ে নিয়ে বলল জার্মানটি। ভুরু নামিয়ে সে চশমার ফাঁক দিয়ে কাতিয়াকে দেখতে লাগল। "মানুষের ইতিহাস আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। নিরুপদ্রব শান্তির একটা লম্বা অধ্যায় কাটিয়ে আবার আমরা সংকটের যুগে প্রবেশ করছি। এই হল আমার সিদ্ধান্ত। একটা বিরাট সভ্যতার মৃত্যু হচ্ছে—তারই পূর্বলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা। আর্য দুনিয়া এর আগেও এমনি একটা স্তর পেরিয়ে এসেছে। সে হল চতুর্থ শতাব্দীতে, যখন অ-সভ্য বিজাতীয়েরা রোম ধ্বংস করেছিল। রোমের পতনের সঙ্গে আমাদের এই যুগের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পান এমন অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। রোম আগেই ধ্বংস হয়েছিল খৃষ্টীয় মতবাদের ধাক্কায়। বিজাতীয়েরা তো শুধু রোমের মৃতদেহটাকেই বিকৃত করেছে। আধুনিক সভ্যতার রূপ পাল্‌টে দেবে সমাজতন্ত্র। তখন ছিল কেবল ধ্বংস, এবার হবে সৃষ্টি। খৃষ্টীয় ভাব-ধারার সবচেয়ে বিধ্বংসী অংশটুকু হল ঃ সাম্য, আন্তর্জাতিকতা আর ধনীর উপর দরিদ্রের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। রোম যখন বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন সেই রাক্ষুসে পরজীবীটিকে আহার জোগাচ্ছিল বিজাতীয়দের এইসব ভাব-

*গ্নেডিগে ফ্রাউ—মাননীয়া (সম্বোধনে)।

ধারাই। এইজন্যই রোমানরা খৃষ্টানদের ভয় করতো, তাদের ওপর অত্যাচার চালাতো। কিন্তু খৃষ্টীয় তত্ত্বের মধ্যে ছিল না কোনো সৃষ্টিশীল ভাবধারা, শ্রমিক-দের সংগঠিত করবার জন্য সে কিছুই করতে পারেনি। ইহজগতে সে শুধু ধ্বংসের কথা বলেই সন্তুষ্ট রইল আর বাদ-বাকি সবকিছু তুলে রাখল স্বর্গের স্তোকবাক্য দিয়ে। খৃষ্টীয় তত্ত্ব তো নিছক তলোয়ার,—ধ্বংস আর শাস্তির হাতিয়ার মাত্র। এমন-কি স্বর্গে কিংবা আদর্শ জীবনেও যে সে নতুন কিছুর প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিল তা নয়—রোমান সাম্রাজ্যের পুরোহিত শ্রেণী আর সরকারী রাষ্ট্রযন্ত্রকেই সে খাড়া-বাড়-থোড় করে হাজির করল। আর এই হল তার গোড়ার গলদ। রোম তার পাল্টা তুলে ধরল শৃঙ্খলার আদর্শ। কিন্তু সে-সময় 'বিশৃঙ্খলা' আর বিপ্লবময় ওলট-পালটের স্বপ্নই দেখছিল বিজাতীয়েরা, তারা ছিল সেই মুহূর্তটার অপেক্ষায় যখন রোমের শহর-প্রাচীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা। আর এলও সেই মুহূর্ত। নগরের পর নগর ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। পথের ধারে পড়ে ক্রুশবিদ্ধ শবদেহ গুঁড়িয়ে যেতে লাগল বিজাতীয়দের রথের চাকায়। রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই নেই তখন—ইউরোপ, এসিয়া মাইনর, আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আগুন জ্বলে উঠেছে। সারা দুনিয়ার খাণ্ডবদাহনে রোমানরা যেন দিশা-হারা পাখির মতো ডানা ঝটপটিয়ে বেড়াতে লাগল। বিজাতীয়েরা তাদের জবাই করছে, বনের হিংস্র পশু তাদের ছিঁড়ে কুটি-কুটি করছে, মরুভূমির মধ্যে অনাহার, অসহ্য গরম আর ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সে সময়কার একজন লেখকের বইয়ে পড়েছি, রোমের প্রিফেক্টের স্ত্রী প্রোবা কেমন করে তার দুটি মেয়েকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নৌকায় করে পালাচ্ছিলেন আর ঠিক সেই সময় আলারিস্ক ও তার জার্মান সাঙ্গোপাঙ্গরা জোর করে ঢুকছিল রোম নগরীতে। টাইবার নদীর বুকে ভেসে যেতে যেতে রোমের মেয়েরা দেখছিল আগুনের লেলিহান শিখা কেমন করে গ্রাস করছে সেই 'শাশ্বত নগরীকে'।...পৃথিবীর সে এক অন্তিম দশা..."

জার্মানটি তার থলিটি খুলে একেবারে তলা থেকে টেনে বার করল একটা মোটা নোটবই, হাতের ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে গেছে চামড়ার বাঁধাই। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে মৃদু হাসির সঙ্গে উল্টে যেতে লাগল পাতাগুলো। তারপর কাতিয়ার পাশে এসে বলল : "এই যে দেখুন। আমমিনিয়াস্ মার্সেলিনাসের এই কটা লাইন পড়লেই পরিষ্কার বুঝবেন রোমানদের পতনের আগে তাদের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছিল :

"তাহাদের লম্বা বেগুনি রঙের রেশমের পোশাক যখন বাতাসে উড়িত তখন তাহার আড়ালে দেখা দিত বিভিন্ন পশুর সাদৃশ্যে চিত্রিত করা দামী আঙ্গরাখা। সঙ্গে বিরাট একদল ভৃত্য লইয়া তাহারা যখন ঝড়ের বেগে সাঁজোয়া রথগুলি হাঁকাইয়া চলিয়া যাইত তখন বাড়িঘর এবং রাস্তাগুলি পর্যন্ত কাঁপিতে থাকিত। রোমান অভিজাত ব্যক্তিরা বিপণি, ভোজনালয় কিংবা প্রমোদ-কাননের সংলগ্ন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া কর্তৃত্বের সুরে দাবি করিত যে সবকিছুই তাহাদের ব্যক্তিগত ভোগের

জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া তাহারা পাথর-বসানো আংটি ও গলাবন্ধ পরিত, প্রকাণ্ড দামী চাদরে ঢাকিত দেহ; এইরূপ এক একটি চাদরের মধ্যে এক ডজন লোক অনায়াসে ঢুকিতে পারে। তাহার উপরে আবার পরিত নানা ধরনের অতিরিক্ত পোশাক যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের গরিমা জাহির করা। চেহারার মধ্যে একটা সাড়ম্বর রাজসিক ভাব ফুটাইয়া তুলিতে ভুলিত না তাহারা, বোধহয় সাইরাকিউজ-বিজেতা মহান্ মার্সেলাসের পক্ষেও এতখানি করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অবশ্য তাহারা দুঃসাহসী অভিযানে বাহির হইত, এই যেমন, অসংখ্য ভৃত্য, বাবুর্চি, মোসায়েব ও কুৎসিত-দর্শন বিকৃতচেহারার খোজাদের লইয়া ইতালির জমিদারিগুলিতে গিয়া বুনো মুরগি ও খরগোশ শিকার, ইত্যাদি। হঠাৎ যদি কোনোদিন কোনোক্রমে গ্রীষ্মের দুপুরে নৌকাবিহার করিতে গিয়া তাহারা লুক্রাইন হ্রদ অতিক্রম করিয়া ফেলিত তাহা হইলে তো আর কথাই নাই, পরে এই নৌকা-ভ্রমণের কথা বলিতে গিয়া তাহারা ইহাকে সীজার অথবা আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের সহিত তুলনা করিত। পাটাতনের উপর যে রেশমের পর্দা টাঙানো থাকিত তাহার ফাঁক দিয়া যদি কোনো গতিকে একটি মাছিও ঢুকিয়া পড়িত, অথবা উহার ভাঁজের মধ্য দিয়া যদি সূর্যের সামান্য একটু কিরণও আসিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহারা অশেষ দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া কপাল চাপড়াইত, ভাবিত ইহার চেয়ে বরং চির-অন্ধকারময় 'সিমারিয়ান' দেশে তাহাদের জন্মানো উচিত ছিল। একদল পরগাছা আর তোষামুদে থাকিত এই মহাব্যক্তিদের প্রিয় অতিথি হইয়া, গৃহস্বামীর মুখ হইতে যে-কোনো কথা খসিয়া পড়িলেই তাহারা সাগ্রহে বাহবা দিত। হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত তাহারা গৃহপ্রকোষ্ঠের প্রতিটি মার্বেলপাথরের থাম ও মোজায়িকের কাজ-করা মেঝে লক্ষ্য করিত। খাবার টেবিলে অস্বাভাবিক ধরনের বড়ো-বড়ো মাছ কিংবা মোরগ দেখিলে সকলের যেন বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না, ওজন করিয়া দেখিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আনা হইত দাঁড়িপাল্লা। অতিথিদের মধ্যে যাহারা একটু প্রকৃতিস্থ তাহারা সে সময় একটু ঘুরিয়া বসিলেও, পরগাছাদের দল সোরগোল করিয়া বায়না ধরিত এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার আইনজ্ঞদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা দরকার।'......

নোটবই বন্ধ করে জার্মানটি বলল :

"হ্যাঁ, ঠিক এমনি আরও অনেক কথাই রয়েছে...এই লোকগুলোই পরে দু'মুঠো অন্নের খোঁজে শহরের জীর্ণ রাস্তা আর ভগ্নাবশেষের মধ্যে মাথা কুটে বেড়াত। পূবদিক থেকে ঠিক সেই সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে আসছিল বৈদেশিক জাতিগুলো লুটতরাজ আর ধ্বংসলীলা চালিয়ে। বছর পঞ্চাশেকের মধ্যে আর রোম সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্র রইল না। অতবড়ো রোম শহরটা একেবারে ঘাস-জঙ্গলে ভরে গেল, প্রাসাদের পরিত্যক্ত আঙিনায় ছাগল চরে বেড়াতে লাগল। প্রায় সাত শতাব্দীর মতো ইউরোপ একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। আর তার একমাত্র কারণ, খৃষ্টধর্ম শুধু ধ্বংসই করতে জানত, কিন্তু শ্রমিককে সংগঠিত করবার মতো ধারণা তার ছিল না। গোটা 'শাস্ত্রীয় আজ্ঞা' খুঁজে আপনি শ্রম সম্পর্কে

একটি কথাও পাবেন না। ওগুলো লেখা হয়েছিল এমন লোকের জন্য যারা নিজেরা ফসল বুনতোও না, ফসল কাটতোও না, তাদের হয়ে ক্রীতদাসরাই ফসল কেটে-বুনে দিত। খৃষ্টধর্ম তাই সম্রাট আর দিগ্বিজয়ীদের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। শ্রম অসংগঠিতই রয়ে গেল, নীতিশাস্ত্রের কোঠায় তার কোনো স্থানই হল না। শ্রমের ধর্ম পৃথিবীতে এখন নতুন একদল 'বিজাতীয়ের' আবির্ভাব ঘটাচ্ছে, দ্বিতীয় এক রোমকে তারা ধ্বংস করবে। আপনি স্পেঙ্লারের বই পড়েছেন তো? উনি হলেন পুরোদস্তুর রোমান। তবে একটি কথা তিনি ঠিকই ধরেছেন ঃ 'তাঁর' ইউরোপের সূর্য সত্যি সত্যিই ডুবে গেছে। কিন্তু আমাদের সূর্যের উদয় হচ্ছে। দুনিয়ার মজুরশ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে কবরে ঢুকবেন সে সাধ্যি স্পেঙ্লারের নেই। মরবার সময় রাজহাঁসেরা নাকি গান গেয়ে ওঠে; স্পেঙ্লারের বাণী হল মুমূর্ষু বুর্জোয়া রাজহাঁসেরই মরণ-গান। তিনি ছিলেন বুর্জোয়াদের হাতের তুরুপ। খৃষ্টতত্ত্বের বিষদাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমাদের দাঁত হল ইস্পাতের।......খৃষ্টীয় ভাবধারাকে আমরা শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন দিয়ে প্রতিহত করছি।......বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগানো হয়েছে আমাদের। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, কে আমাদের অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করছে, আর কার বিরুদ্ধেই বা আমাদের অস্ত্র ধরতে হচ্ছে, তা আমরা বুঝি না? হ্যাঁ বুঝি ঠিকই, লোকে আমাদের সম্পর্কে যা ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশিই বুঝি।......আগে আমরা রুশদের ঘেন্না করতেই জানতাম, এখন তাদের কদর বুঝতে আরম্ভ করেছি, ওদের শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি।......"

লম্বা একটানা শিটি দিয়ে একটা বড়ো গ্রামের বুক চিরে চলে গেল ট্রেন : লোহার ছাদওয়ালা শক্ত বাড়ি, সারি সারি খড়ের গাদা, বেড়া-দেওয়া ফল-বাগিচা, দোকানের সাইনবোর্ড পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ট্রেনের পাশে পাশে ধুলোভরা রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল একজন চাষী, পরনে তার বেল্ট-খোলা সামরিক উর্দি, মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি। পা দুটো ফাঁক করে সে ছোট গাড়িটার ওপর দাঁড়িয়েছিল, হাতের মধ্যে জড়ানো ঘোড়ার লাগামজোড়া। চকচকে বড়ো ঘোড়াটা ছুটছিল ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টায়। ট্রেনের জানলাগুলোর দিকে ফিরে শাদা দাঁতগুলো সম্পূর্ণ মেলে চাষীটি কি যেন বলে উঠল তারস্বরে।

"এই হল গুলিয়াই-পলিয়ে। খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম।"—জার্মানটি মন্তব্য করল।

ভুল করে কাতিয়া 'থ্রু' ট্রেন ধরতে পারেনি—তাই বারে বারে গাড়ি বদল করতে হচ্ছে তাকে। হৈ-হল্লা, প্ল্যাটফর্মে বসে ট্রেনের প্রতীক্ষা, নতুন নতুন মানুষের মুখ, আর জানলার বাইরে ধীরে ধীরে উন্মোচিত দিগন্তপ্রসারী স্তেপভূমির দৃশ্যপট, যার বিশালতা কাতিয়া আগে কোনোদিন ধারণাই করতে পারেনি,—সব মিলে ওর মনটাকে দুঃখধান্দা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। জার্মানটি অনেক আগেই চলে গেছে, বিদায় নেবার সময় আন্তরিকভাবে ওর করমর্দন করেছে। ঘটনার অবধারিত গতি সম্পর্কে লোকটির ধারণা সুদৃঢ়, আর এই অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহে তার নিজের অংশ কতটুকু হবে তা সে নিখুঁতভাবেই হিসেব করে রেখেছে। তার নিরুদ্বেগ আশাবাদ কাতিয়াকে বিস্মিত ও বিচলিত করেছে। যাকে সবাই বলছে ধ্বংস, ভয়,

বিশৃঙ্খলা, লোকটির কাছে তাকেই মনে হয়েছে বহুপ্রতীক্ষিত এক নতুন যুগের অরুণোদয়!

সারা বছরটা কাতিয়া কেবল শুনেছে নিষ্ফল আক্রোশ আর নিবীর্য হতাশার দীর্ঘশ্বাস; বিকৃত মুখ আর মুষ্টিবদ্ধ হাত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি,—কেবল মনে পড়ে তার বাপের বাড়ির সেই মার্চ মাসের সকালটির কথা। কর্নেল তেৎকিন অবশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেন না, দাঁতে দাঁতও ঘষেন না, কিন্তু তাঁর নিজের বক্তব্য অনুসারে তিনি একটি 'ধর্মের ভাঁড়' বিশেষ, ন্যায়ের প্রতি নেহাৎই একটা স্বকল্পিত নির্বিচার মোহের বশে তিনি বিপ্লবকে আবাহন জানিয়েছেন।

কাতিয়ার আশে-পাশে যারা ছিল সবাই বিপ্লবকে দেখেছে রাশিয়ার সর্বনাশ, রুশ সংস্কৃতির সর্বনাশ, জীবনবিধ্বংসী, স্বতঃস্ফূর্ত এক ব্যাপক অভ্যুত্থান হিসেবে—ধর্মশাস্ত্রের উপসংহারের সেই অন্তিম ভয়ংকর দিনের আবির্ভাব হিসেবে বিপ্লবকে জেনেছে তারা। এক সময় এমন এক সাম্রাজ্য তারা দেখেছে যার চাল-চলন বুঝতে তাদের কষ্ট হয়নি, সবকিছুই মনে হয়েছে নির্ঝঞ্ঝাট, পূর্বনির্দিষ্ট। চাষীরা লাঙল চষত, খনিমজুররা কয়লা তুলত, কারখানায় তৈরি হত শস্তা দরকারী জিনিস, ব্যবসাদাররা বাজার গরম রাখত আর কেরানিরা মন-প্রাণ দিয়ে খাটত—মোটের ওপর সবকিছুই চলত ঘড়ির কাঁটার মতো স্বচ্ছন্দে। উপরের তলার মানুষরা তাদের বিলাসিতার আরাম আহরণ করত এরই ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ বলত এ এক অন্যায় ব্যবস্থা। কিন্তু স্বয়ং ভগবানেরই যখন এইরকম ইচ্ছে তখন আর কি করা যেতে পারে? তারপর হঠাৎ দেখা গেল সব ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো, সাম্রাজ্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা খোলা উইয়ের ঢিবি। সাদাসিধে ভদ্রলোকেরা হোঁচট খেয়ে খেয়ে চললেন, ভয়ার্ত বিবর্ণ চোখে তাঁদের ধাঁধা লেগে গেল যেন......

একটা ছোট মফঃস্বল স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ ধরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ নীরবতার মধ্যে। কাতিয়া জানলার বাইরে মুখটা বের করল। লম্বা একটা গাছের পাতা অন্ধকারে শিরশিরিয়ে উঠছে। তারা-ভরা আকাশ যেন নিঃসীম বিস্তারে ছেয়ে আছে অদ্ভুত এই অপরিচিত দেশটার ওপর।

খোলা জানলায় কনুই ভর করে ঝুঁকে রইল কাতিয়া। পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ, আকাশের তারা, আর মাটির উষ্ণ সুবাস তাকে মনে করিয়ে দিল আর একটি রাতের কথা। প্যারিসের কাছে একটা পার্ক......গুটিকত মানুষ এসেছে দুটো গাড়িতে চেপে, সবাই ওদের বন্ধুবান্ধব, সবাই পিতাসর্বুর্গের লোক।......লেকের মধ্যে যে জলটুঙ্গী সামারহাউসটা ছিল সেখানে সবাই রাতের আহার সেরে নিয়েছে। ভারী চমৎকার সেই জায়গাটি। রুপোলি মেঘের মতো লেকের জলে ঝুঁকে পড়েছে উইলো গাছগুলো—পাতায় পাতায় তাদের বাতাসের কান্না।

দলের মধ্যে একজনের পরনে সান্ধ্য পোশাক, মাথায় টুপি নেই। কাতিয়া তাকে চিনত না। লোকটি জার্মান, কিন্তু ফরাসী বলত চমৎকার, অনেকদিন হল রাশিয়ায় আছে। রোগা চেহারা, লম্বাটে মুখটায় স্নায়বিক অস্থিরতার চিহ্ন, প্রশস্ত ঢালু কপাল, মাথার চুল সেখান থেকে যেন পেছনে হটে গেছে, আর চোখের পাতা-

দ্বটো ভারী, গম্ভীর দৃষ্টি। টেবিলের সামনে চুপ করে বসেছিল সে। লম্বা লম্বা আঙুলের ফাঁকে মদের গেলাসটি ধরা। কাতিয়ার যখন কাউকে পছন্দ হয় তখন সম্পূর্ণ আবহাওয়াটাই যেন বেশ হৃদ্যতাভরা উষ্ণ একটা কোমলতায় ভরে ওঠে। লেকের সেই জুলাই রাতটি যেন তার অর্ধ-অনাবৃত কাঁধে আলতো ছোঁয়া দিয়ে যায়। মাথার ওপর লতাগাছগুলো, তারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় আকাশের তারা। যারা সেখানে জটলা করে বসেছিল সকলেরই মুখের ওপর এসে পড়েছে মোমবাতির উষ্ণ আভা, টেবিলক্লথের ওপরকার নিশাচর প্রজাপতিগুলো আর সদ্য পরিচিত সেই লোকটির চিন্তাচ্ছন্ন মুখখানা মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত। কাতিয়া অনুভব করতে পারছিল, চিন্তান্বিতভাবে ভদ্রলোক তারই দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয় আজ সন্ধ্যায় কাতিয়াকে বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে।

পার্কের শেষপ্রান্তে খোলা মাঠের মতো একফালি জায়গা। সেখান থেকে দেখা যায় প্যারিসের আলোকমালা। প্রকাণ্ড উঁচু-উঁচু গাছের পাতা-ছাওয়া চাঁদোয়ার নিচে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সেই ফাঁকা জায়গাটার দিকে। ওরা সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে বেড়াবে বলে। জার্মান ভদ্রলোকটি কাতিয়ার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে সে বলে : "আচ্ছা মাদাম, আপনার কি মনে হয় না যে সৌন্দর্য জিনিসটার মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যাকে বরদাস্ত করা যেতে পারে না; যাকে আস্কারা দেওয়া চলে না?" রুক্ষ শোনায় তার গলাটা, এমন পরিষ্কার-ভাবে সে কথাগুলো বলে যে মনে হয় কোনোরকম দ্ব্যর্থতার অবকাশ সে থাকতে দিতে চায় না। কাতিয়া ধীরে ধীরে হাঁটছিল। লোকটি ওর সংগে কথা কইছে, তাতে ওর বেশ ভালই লাগছিল; এমন মৃদুস্বরে কথা বলে লোকটি যে পাতা-ছাওয়া গাছের মর্মরধ্বনিটুকুও চাপা পড়ে না তাতে। কাতিয়ার বাঁ দিকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা সামনে বনপথটির দিকে তাকিয়ে থাকে জার্মানটি; শহরের রক্তিম আকাশ দেখা যায় পথেরই ও-প্রান্তে। "আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার। বাবার টাকা-পয়সা আছে বিস্তর, আর আমিও বড়ো-বড়ো ফার্মের কাজ করি; হাজারটা মানুষের সংগে কারবার করতে হয় আমাকে। জীবনে এত দেখেছি এত জেনেছি যা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। মাপ করবেন—আপনার হয়তো ভালো লাগছে না এই ধরনের আলাপ?"

জবাবে কাতিয়া শুধু নীরবে তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। দূরের আলোর মৃদু আভায় লোকটি দেখতে পায় ওর চোখদুটো আর হাসিমুখটা। আবার সে বলে চলে :

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমারা দুটো যুগের সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছি। একটা হল গরিমা আর মহিমামণ্ডিত, কিন্তু তা ক্ষয়ের পথ ধরেছে। আরেকটি জন্ম নিচ্ছে জলুষহীন একঘেয়ে কারখানা-মহল্লায়, মেশিনের একটানা ঝনঝনানির মধ্যে। এ যুগের নাম হল জনতার যুগ, গণ-মানবের যুগ, ব্যক্তি মানুষের সব রকম ভেদাভেদ এখানে এসে খেই হারিয়েছে। মানুষ এখানে মেশিন-চালানো একজোড়া দক্ষ হাত ছাড়া আর

কিছুই নয়। এখানকার আইনকানুন আলাদা, সময়ের হিসেব আলাদা, এখানে এক আলাদা সত্য। আপনি তো মাদাম, পুরনো যুগের ভগ্নাবশেষটুকু আঁকড়ে রয়েছেন। আপনার মুখ দেখে তাই আমার এত করুণা হয়! নতুন যুগে কিন্তু এসবের কোনো দাম নেই, ঠিক যেমন দাম নেই অব্যবহার্য, অননুকরণীয় কোনো কিছুর যা শুধু অচল ভাবাবেগগুলোকে উস্কে তুলতেই পারে—এই যেমন ধরুন, প্রেম, আত্মত্যাগ, কাব্য, আনন্দাশ্রু।......সৌন্দর্য! কী এর যৌক্তিকতা? সৌন্দর্য শুধু মানুষকে বিচলিতই করতে পারে। একে সহ্য করা যায় না। এই আমি আপনাকে বলে রাখছি, ভবিষ্যতে দেখবেন সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে রীতিমত আইন পাশ হবে। 'কনভেঅর' পদ্ধতির নাম শুনেছেন হয়তো? আমেরিকা থেকে সদ্য বেরিয়েছে এই নতুন কায়দাটা। দ্রুত ধাবমান কনভেঅর 'বেলটের' সামনে বসে কাজ করার যে দার্শনিক তত্ত্ব, তা জনতার মধ্যে ছাড়িয়ে দিতে হবে।......কনভেঅরের সামনে বসে যদি কেউ এক মুহূর্তও অন্য-মনস্ক হয় তবে তা হবে গুরুতর অপরাধ, মনে হবে এর চেয়ে বুঝি চুরি-ডাকাতিও ভাল।......এখন ভাবুন তো একবার : কারখানাগুলোর লোহাঘেরা হলঘরের মধ্যে হঠাৎ যদি কোনো সচল, চিত্তচাঞ্চল্যকর সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে ফলটা কি দাঁড়াবে? বেল্টের গতি ওলট-পালট হয়ে যাবে, পেশীগুলো কাঁপতে থাকবে, হাত-গুলো হয়তো দেরি করে ফেলবে এক সেকেণ্ড, কিংবা এক সেকেণ্ডেরও সামান্য ভগ্নাংশ হয়তো এদিক-ওদিক হয়ে যাবে......ক্রমে সেই এক সেকেণ্ড দেরির ফলে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে, তারপর কয়েক ঘণ্টার দেরি থেকেই সর্বনাশ।......আমার কারখানা থেকে যে মাল বেরুতে শুরু করবে তা হয়তো আর-আর কারখানার মালের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না।...নিচু কোয়ালিটির মালের জন্য আমার কারবারটিরই সর্বনাশ হয়ে যাবে...কোথাও হয়তো কোনও ব্যাঙ্ক ফেল পড়বে...স্টক এক্সচেঞ্জের বাজারে হঠাৎ মন্দা দেখা দেবে...কেউ-বা হয়তো গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করবে।... আর এই সবকিছুর মূলে হল একটি কুহকিনী সুন্দরী নারী যে-কিনা স্কার্ট দুলিয়ে চলে গিয়েছিল কারখানা ঘরের মাঝখান দিয়ে।"

কাতিয়া হেসে ফেলল। কনভেঅরের কথা সে জন্মেও শোনেনি। কোনোদিন কোনো ফ্যাক্টরিতে পা মাড়ায়নি সে। যেটুকু জানতো তা হল: কারখানার ওই ধোঁয়াভরা চিমনিগুলো এমন বিশ্রী যে প্রাকৃতিক দৃশ্যটাকেই মাটি করে দেয়। জনতার মধ্যে মানবতার যে প্রকাশ তাকে কাতিয়ার অত্যন্ত ভাল লাগতো, বুলভারগুলোতে মানুষের ভীড় ভালবাসত সে, সামান্যতম অনিষ্টকরও কিছু সে দেখেনি এর মধ্যে। লেকের ধারে বসে যারা কাতিয়ার সঙ্গে খানা খেল, তাদের মধ্যে ওর দু'জন সোশাল-ডেমোক্রাট বন্ধুও আছে। সে-দিক দিয়ে নিশ্চয় ওর বিবেকবুদ্ধি বেশ পরিষ্কারই আছে বলতে হবে। বনপথের কবোষ্ণ অন্ধকারে মাথা উঁচু করে চলতে চলতে সঙ্গীটি যে-সব কথা বলছিল ওর কাছে তা অবশ্য একেবারে নতুন, শুনে ঔৎসুক্যও জাগে— ঠিক যেমন এক সময় ওর কাছে নতুন আর ঔৎসুক্যজনক মনে হতো কিউবিস্ট ছবি-গুলোকে—যা দিয়ে ও ড্রয়িংরুম সাজাতো। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেয় ওর দর্শনের কচকচি নিয়ে মাথা ঘামাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।......

"সুন্দরী মেয়েরা নিশ্চয় আপনাকে খুব ভুগিয়েছে, তাই বুঝি আপনি এত ঘেন্না করেন ওদের?" বলল কাতিয়া। আরেকবার মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠল বটে, কিন্তু সে ভাবছিল একেবারে অন্য কথা......অন্যকিছুর কথা যা এই রাতটির মতোই আঁধার-ঘেরা, অস্পষ্ট, কুসুমে পল্লবে মধুগন্ধা এই রাতটির মতোই যা সুবাসস্নিগ্ধ; গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে এ-রাতের তারাগুলো ঢেলে দিচ্ছে আলো, মুকুলিত প্রেমের মাধুরীস্পর্শে তন্দ্রা এনে দিচ্ছে ওর চোখে। সে প্রেম এই নব-পরিচিত মানুষটির জন্য নয়,—কিংবা হয়তো-বা তারই জন্য,—সে-ই তো ওর মনে জাগিয়ে তুলেছে কামনা। কিছুক্ষণ আগেও যে জিনিসটিকে মনে হয়েছে কষ্টসাধ্য, এমন-কি অসম্ভবই, সেই জিনিসটিই শেষে এত সহজে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল!...

প্যারিসের সেই দিনগুলোতে আরও কত কী যে ঘটতে পারত কে জানে?... কিন্তু এক নিষ্ঠুর আঘাতে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।...বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।...কাতিয়ার সঙ্গে সেই জার্মানটির আর দেখা হয়নি কখনো।......লোকটি কি জানতো যে যুদ্ধ আসন্ন? নাকি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিল সে? মনে আছে কাতিয়ার, কিছুক্ষণ বাদে পাথরের রেলিং-এর থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটি। ওখান থেকে প্যারিসের আলো দেখা যাচ্ছিল দিগন্তের কালো রেখায় ঝলমলে মুক্তাবিন্দুর মতো। জার্মানটি তখনো একইভাবে যেন একটা সুকঠোর নৈরাশ্যের সঙ্গে বলে চলেছিল আসন্ন ঝড়ের অনিবার্যতার কথা। এই ভাবনা যেন ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসেছিল লোকটিকে—সবকিছুই ব্যর্থ, রাতের এই সৌন্দর্য, কাতিয়ার এই মোহিনী-মায়া, সবই।

কাতিয়া তাকে কী বলেছিল ওর মনে নেই, কিন্তু বোকার মতো আজে বাজে কিছু বলে বসেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতেই বা কি আসে-যায়? পাথরের থামটার ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল লোকটি, কাতিয়ার কাঁধে তার গালের ছোঁয়া এসে লাগছিল প্রায়। কাতিয়া জানতো সে-রাতের বাতাস যেন ভরে গেছে ওরই সুগন্ধির সৌরভে, ওর কাঁধ ওর চুলের সুবাসে।...লোকটি তার প্রকাণ্ড হাত-খানা যদি ওর কাঁধের ওপরও রাখতো তবুও নিজেকে ও সরিয়ে নিত না নিশ্চয়ই—অন্তত এখন তো তাই মনে হয়।...কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না।...

বাতাসের ঝাপটা লাগছে কাতিয়ার গালে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অতীত থেকে আবার সে ফিরে এল বর্তমানে। ইঞ্জিন থেকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত কয়লার ফুলকি। স্তেপ পার হচ্ছে ট্রেনটা। জানলার কাছ থেকে সরে এল কাতিয়া, কিছুই আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এখন। এক কোণে গিয়ে বসল জড়োসড়ো হয়ে। ঠাণ্ডা হাতদুটো ঘষে নিল একবার।

হঠাৎ মনে একটা তীব্র দংশন অনুভব করল কাতিয়া। তাই তো, এসব কী ভাবছে সে? মাত্র এক হপ্তাও হয়নি ভাদিমের মৃত্যুর খবর পেয়েছে, অথচ এর মধ্যেই সে এমন একটা কাজ করতে পারল যা বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও খারাপ।... এমন এক মানুষকে নিয়ে সে দিবাস্বপ্নের জাল বুনছিল যে কোনোকালেও তাকে ভালোবাসেনি!...নিশ্চয়ই জার্মানটি আর বেঁচে নেই...রিজার্ভ সৈন্যের অফিসার

ছিল সে। মরে গেছে, মরে গেছে......সবাই মরে গেছে, সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে প্যারিসের শহরতলীর সেই রাতটির মতো, চিরদিনের মতো, চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে, আর ফিরবে না কোনোদিনও।

বুক থেকে ঠেলে ওঠা কাতর আর্তস্বরটাকে চাপা দেবার জন্য কাতিয়া সজোরে ঠোঁট এঁটে রাখে। চোখ দুটো বোজে। বুকটাকে যেন খান্‌খান্‌ করে দিচ্ছে একটা তীব্র অন্তর্বেদনা।...নোংরা কামরাটার মধ্যে লোকজন খুব বেশি নেই, একটা মোমবাতির দপ্‌দপে ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছে তাদের সবাইকে। উঁচুতে তোলা হাত, ঝাঁকড়া দাড়ি, উপরের তাক থেকে ঝুলেপড়া জুতোহীন পায়ের কম্পিত কালো ছায়া পড়েছে দেয়ালে। অনেক রাত হয়ে গেছে, অথচ কারো চোখে ঘুম নেই। চাপা গলায় কথাবার্তা চলছে।

"সবচেয়ে ওঁচা জায়গাগুলোর মধ্যে এই হল একটি, সে-কথা আপনাকে বলেই দিচ্ছি......"

"কি বললেন? এখানেও নিরাপদ নয় বলছেন?"

"মাপ করবেন,—কী কথাটা বললেন? এখানেও ডাকাতি চলছে নাকি? আশ্চর্য কথা! জার্মানরা কেন ঠেকাচ্ছে না? যাত্রীদের সুখ-সুবিধা দেখাই তো ওদের কাজ...দেশটাকে দখল করেছে যখন, আইন শৃঙ্খলা তো ওদের বাঁচাতে হবেই।"

"কিছু মনে করবেন না মশাইরা। আমাদের জন্য জার্মানদের কোনো মাথাব্যথাই নেই জানবেন।...নিজের নিজেরটাই আগে সামলান দাদারা...আপনারাই তো আগে শুরু করেছিলেন! আজ্ঞে হ্যাঁ! আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়ে গেছে খুন-ডাকাতির বীজ...দেশের লোক তো সব শুয়োরের পাল কিনা......

কে যেন শক্ত গলায় জবাব দিল ঃ

"উচিত হল গোটা রুশ সাহিত্যটাকেই ধ্বংস করা, প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা। রুশ সাহিত্যই আমাদের ডুবিয়েছে। সারা রাশিয়া খুঁজলেও একটি সৎ মানুষের দেখা পাবেন না।...ফিনল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম একবার। সেখানে একটা হোটেলে আমার গালোশ-জোড়া ভুল করে ফেলে চলে যাই।...সঙ্গে সঙ্গে গালোশ দুটো ওরা একজন ঘোড়সওয়ারের হাতে পাঠিয়ে দেয় আমাকে দেবার জন্য। অথচ জিনিসটা তো ছিল শতছিদ্র!...একেই বলে সজ্জন জাত। আর কমিউনিস্টদেরও কেমন ঠাণ্ডাটি করেছে ওরা দেখুন—বলতে গেলে সারা রুশ জাতটার সঙ্গেই মোকাবিলা করেছে! আবো শহরের বিদ্রোহ দমাবার পর ফিনরা সেই শহরের রেডগার্ড অধিনায়কটিকে ধরে অত্যাচার করে পুড়িয়ে মেরেছে। বলশেভিকটা এমন চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল যে নদীর এপারে থেকেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল নিশ্চয়।"

"হায় খোদা, তাহলে শৃঙ্খলা-টিঙ্খলা কিছু দেখতে পাব মনে হচ্ছে?"

"একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। এই সবে কিয়েভ ছেড়ে এসেছি। সেখানে তো দিব্যি বড়ো বড়ো দোকান, কাফে, গানবাজনা...মেয়েরাও বাইরে হীরা-জহরত পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেই তো বলে সত্যিকারের জীবন! ভাল দর

দিয়ে সোনা কিনছে মহাজনরা, বাজার গরম রেখেছে ওরা।...রাস্তাগুলো বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। এমনি আরো কত কী...চমৎকার শহরটা যা হোক...”

“আর এখানে তো একজোড়া পাতলুনের কাপড় কিনতে বছরের আদ্ধেক মাইনে উজাড়। ফাটকাবাজগুলো গলা কাটতে বসেছে আমাদের।...বেটাদের নিজেদের কপাল চকচক করছে, বুঝলেন, নীল সার্জের স্যুট পরে ওরা...কাফেতে বসে অর্ডারী মাল বিক্রি করে। সকালে উঠে হয়তো দেখলেন গোটা শহরটায় এক বাক্স দেশলাই খুঁজে পাচ্ছেন না। হপ্তাখানেক বাদে মাল চলে এল, এক বাক্সের দাম একটি রুবল। আবার হয়তো দেখলেন ছুঁচ পাওয়া যাচ্ছে না।—আমার গিন্নীর জন্মদিনে তো এবার একজোড়া ছুঁচ আর একগুলি সুতো উপহার দিয়েছি। আগে তো ফি বছরে দিতাম হীরার দুল।...বুদ্ধিজীবীরাই মাঝখান থেকে খতম হয়ে যাচ্ছে, লোপ পেয়ে যাচ্ছে বিলকুল...”

“ফাটকাবাজগুলোকে নির্মমভাবে গুলি করে মারা দরকার।...”

“রাখুন মিস্টার কমরেড। এখানে ওসব বলশেভিক বুলি ঝাড়বেন না!”

“কিয়েভের খবর কি? হেৎমান কি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে নাকি?”

“এই যদ্দিন জার্মানরা টিঁকিয়ে রেখেছে তাকে। উক্রেইনের গদীর উপর নাকি আরেকজন দাবি তুলেছেন—তিনি হলেন ভাসিলি ভিশিভান্নি। হাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশের লোক, তবে উক্রাইনী আচকান এঁটে ঘুরে বেড়ান।”

“ঘুমোবার সময় হল যে, মশাইরা, এবার মোমবাতিটা নিভিয়ে ফেলা যাক্।”

“বাতি নেভাবেন কি রকম? ট্রেনটা কি বাড়ি পেয়েছেন নাকি?”

“বাতিটা নেভালে একটু নিরাপদে থাকা যাবে, এই আর কি।...চলতি ট্রেনের জানলাগুলো তো আবার মাঠ থেকে দেখা যায় কিনা?”

সবাই চুপ করে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রেলের চাকার খটাং খটাং আওয়াজটা যেন এবার আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট শোনা যেতে থাকে। ইঞ্জিনের ফুল্‌কি স্তেপের অন্ধকার আকাশে গড়িয়ে যাচ্ছে। বিরক্তির চরম সীমায় এসে কে যেন খ্যান্‌খেনে গলায় বলে উঠল :

“কে বলেছে বাতি নেভাতে হবে?” (সাড়াশব্দ নেই। একটা অস্বস্তিকর ভুতুড়ে আবহাওয়া) “হ্যাঁ বাতি নিভিয়ে তারপর মালপত্র হাতড়ানোর ফন্দি আর কি! কে বলেছিল কথাটা তাকে একবার খুঁজে বার করুন তো, দিন কামরার বাইরে ছুঁড়ে!”

অসোয়াস্তির সঙ্গে দাঁত চোষে কে যেন। ভয়ার্ত কণ্ঠে একজন বলে ওঠে :

“গেল হপ্তায় ট্রেনে চেপে যাচ্ছিলাম। এক ভদ্রমহিলার দুটো বাণ্ডিল চুরি হয়ে গেল—জানলা দিয়ে বঁড়শির মতো বাঁকা লাঠি গলিয়ে, ব্যস্...”

“ওরা সব মাখ্‌নোর লোক, না হয়েই পারে না!”

“মাখ্‌নোর লোকরা কি আর দুটো বাণ্ডিল চুরি করে হাত নোংরা করবে? ওদের কাজ হচ্ছে ট্রেন লুঠ করা।”

“রাতে আর ওদের কথা নিয়ে আলোচনা নাই-বা করলেন মশায়রা।”

একটার পর একটা গল্প হতে লাগলো—ভয়াবহতার দিক থেকে একটা কাহিনী আরেকটা কাহিনীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন সব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে যা শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে-অঞ্চলটার মধ্যে দিয়ে এখন ট্রেনটা ঢিমেতেতালায় এগিয়ে চলেছে সে-অঞ্চলটা স্রেফ চোর-ডাকাতের আড্ডা। এও পরিষ্কার যে জার্মানরা এসব ব্যাপারের মধ্যে মাথা গলাতে চায় না মোটেই, আগের স্টেশনেই জার্মান শান্ত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আশেপাশের গ্রাম-গুলোতে পুরুষেরা দিব্যি বীভার কোট গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েরা পরে সিল্ক আর মখমলের জামা। এমন একদিনও যায় না যেদিন গুলিগোলা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ থাকে,—হয় মেশিনগানের বুলেট এসে পড়ে ট্রেনের ওপর, নয়তো গাড়ির পেছন-দিকের দু'চারটে বগি খুলে নিয়ে লাইনের ওপর আলগা ছেড়ে দেয়া হয়, কিংবা যখন পুরোদমে ট্রেন চলছে তখন হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে যায় আর কামরার মধ্যে ঢোকে দাড়িওয়ালা একদল লোক, হাতে তাদের কুড়ুল আর করাতে-কাটা বন্দুক; বলে : হাত তোলো! রুশদের অবশ্য তারা শুধু কাপড় খুলে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেয়, কিন্তু ইহুদিদের হাতে পেলে...

"ইহুদি? ইহুদি আবার কী করল এর মধ্যে?"—আর্তনাদ করে উঠলেন নীল সার্জের স্যুট-পরা একজন মুণ্ডিত-শ্মশ্রু ভদ্রলোক। ইনিই একটু আগে কিয়েভ শহর নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। "যে কোনো ব্যাপারেই ইহুদিদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হবে?"

আর্ত চীৎকার করে ভুতুড়ে আবহাওয়াটাকে একটা চূড়ান্ত রূপ দিলেন ওই ভদ্রলোক। প্রত্যেকের গলাই মিইয়ে গেছে। কাতিয়া আবার চোখ বুজলো। চুরি করার মতো কোনো জিনিস ওর কাছে নেই—খালি ওই ফিরোজা পাথরের আংটিটা। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা ভয় ওকে পেয়ে বসেছে, স্নায়ুগুলো ওর দুর্বল হয়ে পড়ছে। বুকটা ভয়ানক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে, তাই নিজেকে চাঙ্গা করবার জন্য ও প্যারিসের সেই অচরিতার্থ রাতটির কথা ভাববার চেষ্টা করে আবার। কিন্তু নির্জন শূন্যতার বুকে ও শুনতে পায় শুধু চাকার অবিরাম ছন্দ : "কা-তেং-কা, কা-তেং-কা, কা-তেং-কা, ভেবো না, সব খতম, সব খতম..."

হঠাৎ ট্রেন থেমে যায়, যেন পাথরের কোনো দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। ব্রেকগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে চীৎকার করে ওঠে, শিকল কাঁচ সব ঝন্‌ঝন্‌ করে, উপরের তাক থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'চারটে ভারি বাক্স। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কেউ ভয়ে ঢোঁক পর্যন্ত গেলে না। আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে যাত্রীরা এদিক ওদিক তাকায়, কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে। কথাবার্তার কী প্রয়োজন—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা গোলমালের মধ্যে পড়া গেছে।

অন্ধকারের মধ্যে রাইফেলের কয়েকটা আওয়াজ হল। নীল সার্জের স্যুট-পরা দাড়ি-চাঁছা ভদ্রলোকটি ছুটে বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে, লুকোবার একটা জায়গা খুঁজে বের করবার জন্য এদিক উদিক ঢুঁড়তে লাগলেন। লাইনের পাশে

পাশে উঁচু করে মাটি ফেলা হয়েছিল, তারই ধার দিয়ে গাড়ির জানলা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছিল একদল লোক। দুম্-দুম্......চোখ ঝল্সে গেল, কানে তালা লেগে যায় আর কি।......একটা ভয়ংকর গলা শোনা গেল : "জানলা থেকে সরে দাঁড়াও!" সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতবোমা ফাটলো। দুলে উঠল গাড়িটা। যাত্রীদের দাঁতকপাটি লাগার উপক্রম, ঠকঠক করে কাঁপছিল তারা।...গাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একদল লোক। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দরজা খুলে হাতবোমা উঁচিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ন'দশজন। ভিড়ে ওদের রাইফেলে রাইফেলে ঠোকাঠুকি, ঘোঁত ঘোঁত করে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই।

"তল্পিতল্পা গুটিয়ে এবার বাইরে চলে এস তো!"

"গা-গতর একটু তোলো মশাইরা, নয়তো......"

"মিশ্‌কা, বুর্জোয়াগুলোর ওপর ছাড়্ তো হাতবোমা!"

যাত্রীরা বিষম ঘাবড়ে যায়। কটা-চুলো গুণ্ডা ধরনের এক পাঁশুটে চেহারার ছোকরা হাতবোমা উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে আসে, এক মুহূর্ত মাথার ওপর হাতটা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

"যাচ্ছি গো যাচ্ছি, যাচ্ছি আমরা!" ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলে ওঠে যাত্রীরা। আর একটিও উচ্চবাচ্য না করে ওরা গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে পড়ে ট্রেন ছেড়ে—কেউ সঙ্গে নেয় সুটকেস, কেউ কেউ আবার শুধু একখানা কেতলি কিংবা বালিশ সম্বল করে বেরোয়।...চোখে প্যাঁশনে-আঁটা একটি ভদ্রলোকের দাড়িগাছ একপাশে ট্যারা হয়ে গেছে, কিন্তু তবু এই ডাকাতদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর মুখে এক ঝিলিক হাসি ফোটে।

রাতের হাওয়াটা বড়ো ঠাণ্ডা। স্তেপের আকাশে তারার দল যেন মনোরম এক চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে। পাঁজা করে রাখা কতকগুলো পচাকাঠের রেল-স্লিপারের ওপর কাতিয়া তার বাণ্ডিলটা নিয়ে বসল। শুরুতেই ওরা যখন খুন-খারাপি আরম্ভ করেনি, তখন হয়তো আদৌ মারবে না ওদের। নিজেকে কাতিয়ার এমন দুর্বল মনে হতে লাগল যেন কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার পর এইমাত্র সে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। এখানে এই স্লিপারগুলোর ওপর ঘুমোনোও যা, একাতিরোনোস্লাভের রাস্তায় রাস্তায় খালি পেটে ঘুরে বেড়ালেও তো সেই একই কথা হত, ভাবলো সে। কাঁধে যেন ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগছে। একবার হাই তুলল সে। ঢ্যাঙা একদল চাষী ট্রেনের মধ্যে মালপত্র-রাখা তাকগুলো থেকে বাক্স-পেঁটরা টেনে নামাচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে জানলার বাইরে। প্যাঁশনে-আঁটা ভদ্র-লোকটি এবার হাঁ-হাঁ করে ছুটে যেতে চেষ্টা করলেন ট্রেনের কামরার দিকে—"ও মশাই, মশাই, ভগবানের দোহাই একটু সাবধানে ছুঁড়বেন, ওর মধ্যে আমার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে যে, বড্ড নরম জিনিস..."

অন্যরা সবাই হিস্‌হিস্ করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিল, ওয়াটারপ্রুফ জামাটা ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঘোড়সওয়ারী ফৌজীদল অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে এল রেকাবের টুং টাং আর

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে। দলের চেয়ে কয়েক কদম আগে-আগে জিনের ওপর দোল খেতে খেতে আসছিল লম্বা টুপিপরা বলিষ্ঠকায় একজন লোক। যাত্রীরা সবাই একজোট হয়ে দাঁড়াল। রাইফেল আর তলোয়ার উঁচিয়ে ফৌজী দলটা গাড়ির পাশে সামিল হল। লম্বা টুপিপরা জাঁদরেল লোকটি এবার ঝঙ্কার-ভরা গলায় প্রশ্ন করল :

"কোনো ক্ষতিটতি হয়নি তো, জওয়ানরা?"

"না, না! মালপত্তর খালাস করছি আমরা। গাড়ি পাঠিয়ে দিন।" কয়েকটা গলা একসঙ্গে জবাব দিল।

উঁচু টুপিপরা লোকটি ঘোড়ার মাথা একদিকে ঘুরিয়ে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল।

"দেখি আপনাদের কাগজপত্র কি আছে!" হুকুম করে সে ঘোড়াটাকে এমন-ভাবে নাচাতে থাকল যে ঘোড়ার মুখ থেকে ফেনা ছিটকে পড়তে লাগল যাত্রীদের ভয়-বিহ্বল চোখের উপর। "ভয় পাবেন না। আপনারা এখন আতামান মাখনোর গণ-ফৌজের জিম্মায় রয়েছেন। আমরা শুধু অফিসার আর সেপাইদের গুলি করে মারব।" গলার মধ্যে শাসানির সুরটা এবার উঁচু পর্দায় ওঠে : "—আর যারা সাধারণ লোকের ঘাড়ে পা দিয়ে মুনাফা কামায় তাদেরও খতম করব।"

ওয়াটারপ্রুফ-পরা ভদ্রলোকটি প্যাঁশনেটা নাকের ওপর ঠিক করে বসাতে বসাতে আবার এগিয়ে এলেন।

"মাপ করবেন, যে-ধরনের লোকদের কথা আপনি উল্লেখ করলেন তেমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই—এ আমি আপনাকে হলপ করে বলতে পারি। এখানে সবাই শান্তিপ্রিয় নাগরিক। আমার নাম হল অব্রুচেভ, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক...'

তিরস্কারের সুরে জাঁদরেল লোকটি এবার বলল : "অধ্যাপক! তা অধ্যাপকই যদি তো এই শুয়োরের পালের মধ্যে ঢুকেছেন কেন? সরে দাঁড়ান একপাশে! ওঁর গায়ে কিন্তু তোমরা হাত তুল না, জওয়ান সব, উনি অধ্যাপক মানুষ।"

গাড়ি থেকে একটা মোমবাতি আনা হল। শুরু হল কাগজপত্র পরীক্ষা। যাত্রীদের দলে বাস্তবিকই কোনো অফিসার বা সেপাই ছিল না। নীল-সার্জের স্যুটপরা সেই গোঁপ-দাড়ি-চাঁছা ভদ্রলোকটি ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন—উনিই ছিলেন মোমবাতিটার সবচেয়ে কাছে, কিন্তু ওঁর পরনে এখন আর নীল সার্জ নয়, চাষীদের মতো একখানা ছেঁড়া-খুকড়ি কোট আর সেপাইদের চুড়ো-টুপি। এসব উনি পেলেন কোথায় কে জানে! নিশ্চয় ওঁর সুটকেসেই ছিল। ইয়ার-বন্ধুর মতো তিনি গোমড়া-মুখো ডাকাতগুলোর পিঠ চাপড়ে বললেন : "আমি একজন গাইয়ে, আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খুশি হলাম, দোস্তরা। আমি হলাম আর্টিস্ট মানুষ, আমাদের আর্টিস্টদের কাজ হল জীবন নিয়ে চর্চা করা।"

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছিলেন, এমন সময় ওদের একজন হেঁয়ালি করে বলল : "কোন্ পদের আর্টিস্ট আপনি তা একটু বাদেই যাচাই হয়ে যাবে। তাই অতো খুশি হয়ে না উঠলেও বোধহয় চলবে।"

চাকায় লোহার বেড়-লাগানো ছোট ছোট গাড়ি এসে জড়ো হল। মাখনোর লোকেরা সুটকেস, ঝুড়ি, বস্তা সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল সেগুলোর উপর, তারপর একেবারে মালপত্রের উপর গিয়ে চড়ে বসল। চালকরা তাদের দস্তুর মাফিক বুনো হাঁক ছাড়তেই জোর কদমে ছুটতে শুরু করল সুপুষ্ট ঘোড়াগুলো—একেকটা গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তিন তিনটে ঘোড়া। চালকদের শিসের সঙ্গে আর ঘোড়ার খুরের তালে গাড়িগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল স্তেপের প্রান্তরে।

ঘোড়সওয়ারী ফৌজীদলটাও এবার ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল। মাখনোর সাঙ্গোপাঙ্গদের কয়েকজন তখনও ট্রেনের কামরাগুলোর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিল একটি প্রতিনিধি দলকে অর্থাৎ হাত তুলে যারা সম্মতি জানিয়েছিল তারাই হল প্রতিনিধি—ওদের উদ্দেশ্য ডাকাতদের কাছ থেকে হুকুম আদায় করে আবার নিজেদের রাস্তায় যেমন চলছিল তেমনি চলতে শুরু করা। আষ্টেপৃষ্ঠে হাতবোমা ঝুলিয়ে কটা-চুলো সেই ছোকরাটি এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওর টুপির ফাঁক দিয়ে ক'গাছি চুল বেরিয়ে এসে এক-দিকের একটা চোখ সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে। অন্য চোখটা নীল আর উদ্ধত, চঞ্চল-ভাবে কেবলই এদিক উদিক ঘুরছে।

"ব্যাপারটা কী শুনি?" প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল সে : "যাবে? কোথায় যাবে? কেমন করে যাবে? হতভাগা গাধাগুলো! ইঞ্জিন-ড্রাইভারটা যে ইঞ্জিন ছেড়ে চম্পট দিয়েছে সে খবর রাখো? এতক্ষণে বোধহয় স্তেপের ওধারে মাইল দশেক রাস্তা পেরিয়ে পগার পার। এই রাত্তিরে তোমাদের আমি একলা ছেড়ে দিতে পারি না, কে জানে কোন্ বাউণ্ডুলে পাজীলোকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে স্তেপে।...এ্যাটেনশন্ হয়ে যাও তো দয়া করে! (রেল-রাস্তার উঁচু পাড় থেকে নেমে এল সে ভারি বেল্টটা আঁটতে আঁটতে। মাখনোর দলের বাকি লোকেরা ওর পিছন পিছন রাইফেল কাঁধে নেমে এল)। "চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়াও!...মালপত্র তুলে নিয়ে স্তেপের দিকে চলো!..."

কাতিয়ার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ছোকরাটা সামনে ঝুঁকে পড়ল, হাতটা ওর কাঁধে ছুঁয়ে বলল : "কেঁদো না লক্ষ্মীটি। তোমায় আমরা কিচ্ছু বলব না।... বান্ডিলটা তুলে নিয়ে সারির বাইরে চলে এস দিকি, আমার পাশে পাশে চল..."

হাতে বান্ডিল নিয়ে, কপাল অবধি শালটা টেনে কাতিয়া সমতল স্তেপের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। ওর বাঁ দিকে উস্কোখুস্কো চুলওয়ালা সেই যুবকটি, হরদম ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে-চলা বন্দীদের নির্বাক দলটার দিকে। দাঁতের ফাঁকে আস্তে একটা শিস্ দিয়ে কাতিয়াকে জিজ্ঞেস করল : "তুমি কে? কোথা থেকে আসছ বল তো?"

জবাব না দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিল কাতিয়া। ওর মনে এখন ভয় নেই, উদ্বেগও নেই, আছে শুধু একটা ঔদাসীন্যের ভাব—যেন সবকিছুই ঘটে যাচ্ছে ওর স্বপ্নের মধ্যে। যুবকটি আবার জিজ্ঞেস করল একই প্রশ্ন।

"ও, তুমি বুঝি নিজেকে খাটো করতে চাও না? ভেবেছ ডাকাতের সঙ্গে আবার কী আলাপ করবে! খুব খারাপ, বুঝলে হে ক্ষুদে লেডি! এসব খানদানী চাল-চরিত্তির ছেড়ে দিতে হবে। সময় যে পালটে গেছে..."

পিছন ঘুরে হঠাৎ সে রাইফেলখানা খসিয়ে নিল কাঁধ থেকে। বন্দীদের দল থেকে আলাদা হয়ে পিছনে সরে যাচ্ছিল একটা অস্পষ্ট মূর্তি। তার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় হেঁকে উঠল সে ঃ "এই শুয়োর! পেছনে পড়ে যাচ্ছিস যে। গুলি করে সাবড়ে দেব!"

মূর্তিটা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। চাপা গলায় আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসল ছেলেটি।

"পালিয়ে যেন যেতে পারত আর কি, গাধাটা! প্রকৃতির কাজটা সেরে আসতে চাচ্ছিল বোধ হয়, তাই হবে। এই হল জীবন, বুঝলে গো ক্ষুদে ভদ্রমহিলা— তুমি তো আমার সঙ্গে কথাবাত্তাই কইবে না ভেবেছ, কিন্তু মুখ বুজে থাকলে যে আরও খারাপ লাগবে।...ঘাবড়িও না, মাতাল হইনি আমি।...মাতাল হলে বড়ো বিচ্ছিরি হয়ে যাই।...যাক, তাহলে আমাদের পরিচয়টা হয়ে যাক!" টুপির ডগায় দু' আঙুল ছুঁয়ে বলল সে ঃ "মিশ্‌কা সলোমিন! লাল ফৌজের একজন পলাতক সৈনিক। স্বভাবটাই খুব সম্ভব ডাকাতের মতো। বদ মানুষ। সে তুমি ঠিকই ধরেছ..."

কাতিয়া বলল ঃ "কোথায় চলেছি আমরা?"

"গাঁয়ের দিকে, রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে। ওরা তোমাদের সওয়াল-টওয়াল করবে, খোঁজখবর নেবে—কয়েকজনকে গুলি করে মারবে, বাদবাকি ছেড়ে দেবে। তুমি জোয়ান মেয়ে—তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই।...তা'ছাড়া আমি তো রয়েছি তোমার সঙ্গে।"

"মনে হয় আপনাকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।" তির্যক চোখে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল কাতিয়া।

ও ভাবতে পারে নি যে ওর এই সামান্য কথায় ছেলেটির অতোখানি লাগবে। সোজা হয়ে সে হঠাৎ ফোঁস্ করে খানিকটা নিঃশ্বাস টেনে নিল। তারার আবছা আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, লম্বা মুখখানার মধ্যে অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বলল "কুত্তী কাঁহাকা!" কিছুক্ষণ চুপচাপ এগিয়ে চলল ওরা। হাঁটতে হাঁটতেই মিশকা একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে আগুন ধরাল।

"তুমি হয়তো নিজের পরিচয় ঢাকবার জন্য মিথ্যে বলতে কসুর করবে না, কিন্তু আমি ধরতে পেরেছি তুমি কে। তুমি হলে অফিসার লোকের ঘরণী।"

"হ্যাঁ, তাই।" জবাব দিল কাতিয়া।

"স্বামীটি নিশ্চয়ই শ্বেতরক্ষী দলে। তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি মারা গেছেন।..."

"লোকটি যে আমার বুলেটে মরেনি সে-কথা অবশ্য হলপ করে বলতে পারি না।"

।

দাঁত বের করে হাসল মিশকা। চট্ করে এক নজর ওর দিকে তাকাতেই কাতিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ার যোগাড়। মিশকা ওর কনুইটা চেপে ধরল। কাতিয়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

মিশকা বলে চলেছে : "ককেসীয় ফ্রণ্ট থেকে আমি এসেছি।......মাত্র চার হপ্তা হল এখানে আছি। শ্বেত ডাকাতগুলোর সঙ্গে সেই গোড়া থেকেই লড়ছি আমি। এই যে রাইফেলটা দেখছ, এর কতো অসংখ্য বুলেটই না খানদানী আদমিদের হাড্ডিতে বিঁধেছে!"

আবার কাতিয়া মাথাটা নাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর মিশকা হাসতে হাসতে বলল :

"উমান্‌স্কায়া গাঁয়ে সত্যি সত্যিই আমরা গোল পাকিয়ে বসেছিলাম। আমাদের সেই ভারনাভ রেজিমেণ্টটি তো একেবারে ছত্রখান হয়ে গেছে। কমিসার সকলোভ্‌স্কি মারা যাবার পর কম্যাণ্ডার সাপোঝ্‌কভ সামান্য কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন, দলের সবাই তখন জখম।......আর আমি করলাম কি, জার্মান ফ্রণ্টের মধ্যে দিয়েই পালিয়ে চলে এলাম বুড়ো মাখনোর দলে। এখানে অবিশ্যি মজা অনেক বেশি। মাথার ওপর কর্তাগিরি ফলাবার কেউ নেই—জনতার ফৌজ তো! আমরা হলাম গেরিলা, বুঝলে গো ক্ষুদে ভদ্রমহিলা, আমরা ডাকাত নই। নিজেরাই নিজেদের কম্যাণ্ডার বেছে নিই...আবার দরকার পড়লে নিজেরাই তার নিকেশ করি—কিছু না, রিভলবারটি বের করে নাও, দুম্ দুম্ চালিয়ে দাও—ব্যস্ কম্যাণ্ডারের ইতি! শুধু একটিমাত্র লোক রয়েছে আমাদের সকলের মাথার ওপর—সে হল বুড়ো নিজে।......ভেবেছ ট্রেন লুট করে আমরা মদেই সব খরচা করে উড়িয়ে দেব? আজ্ঞে না, তেমন কিছু করা চলবে না। সব মালপত্তর বুঝিয়ে দিতে হবে সদর দপ্তরে। ওরাই বিলিব্যবস্থা করবে—কিছু যাবে চাষীদের ঘরে, কিছু ফৌজে। ট্রেন্‌গুলো হল আমাদের রসদের ডিপো। আর আমরা, অর্থাৎ জনতার ফৌজ, কিংবা বলতে পারো জনতা নিজেই, এখন জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে সামিল। ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়াচ্ছে আর কি! জমিদারদের সিধে কোতল করছি, আর পুলিশ হেৎমান অফিসাররা যতো আড়ালে থাকে ততোই ওদের মঙ্গল—আমাদের হাতে পড়লে গলায় তলোয়ারের কোপ। অস্ট্রিয়ান আর জার্মানদের ছোট ছোট ফৌজী-দলগুলোকে আমরা হটিয়ে দিচ্ছি একাতেরিনোস্লাভ অবধি। এই ধরনের ডাকাত হলাম আমরা।"

স্তেপের আকাশের অগণন তারা যেন আর ফুরোতে চায় না। কিন্তু অনেক দূরে, দিগন্তের যে-দিকটা লক্ষ্য করে ওরা হেঁটে চলেছে সে-দিকটার আকাশ ফিকে সবুজ হয়ে আসছে। কাতিয়া ক্রমেই ঘন ঘন হোঁচট খেতে আরম্ভ করেছে, দীর্ঘশ্বাসও চাপতে পারছে না মাঝে মাঝে। কিন্তু মিশকার যেন কোনো খেয়ালই নেই—হাঁটছে তো হাঁটছেই, হাজার হাজার মাইল বোধ হয় সে এমনি হেঁটে যেতে পারে পিঠে বন্দুকটি ঝুলিয়ে। কাতিয়ার এখন একমাত্র ভাবনা : মনের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতাটাকে কিছুতেই প্রকাশ হতে দেয়া চলবে না, বড়ো বড়ো বাত-ঝাড়নেওলা এই নাক-

সিঁটকোনো লোকটিকে কোনোমতেই এমন সুযোগ দেয়া হবে না যাতে সে ওকে দয়া দেখাবার অজুহাত খুঁজে পায়।......

"আপনারা সবাই একই পদের—খারাপ লোক।" বলল কাতিয়া। হাঁফ ছাড়বার জন্য একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে শালটা ঠিক করে নিল, তারপর সোমরাজ-লতা আর মেঠো ইঁদুরের গর্তগুলো আবার ডিঙোতে শুরু করল। বলল : "আপনারা খুন করবেন বলেই কি আমরা ছেলে পেটে ধরি? যে-কোন খুনই পাপ, তা সে যাই বলুন না কেন।"

"ও সব আমাদের জানা আছে! মেয়ে মানুষের বুলি—সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুনে আসছি।"—অনায়াসেই কথাগুলো বেরিয়ে এল মিশকার মুখ থেকে। "আমাদের কমিসার জিনিসটা আমাদের বোঝাতেন এইভাবে : 'সব কিছুই বিচার করতে হবে শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে......' যখন বন্দুক তুলে ধরছ, আসলে তখন তুমি শত্রুশ্রেণীকেই নিশানা করছ, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়। বুঝেছ তো ব্যাপারটা? এখানে দয়ামায়ার কোনো প্রশ্ন নেই, দয়া দেখানোর মানে স্রেফ বিপ্লব-বিরোধিতা। ওর চেয়েও বড়ো জিনিস রয়েছে, বুঝলে বাছা......"

হঠাৎ ওর গলার স্বরটা পালটে গেল একদম—কেমন যেন শূন্যগর্ভ, নিজের কথা যেন নিজেই শুনছে মনে হল।

"চিরকাল তো রাইফেল কাঁধে নিয়ে ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে ঘুরে বেড়াব না। সবাই বলে মিশকা গোল্লায় গেছে, ও একটা মাতাল, খানাখন্দের মধ্যে পড়ে কোন্‌দিন অক্কা পাবে। সেটা হয়তো সত্যি, কিন্তু পুরো সত্যি নয়।......মরবার তাড়া নেই আমার, বলতে-কি মরবার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্রও নেই।......যে বুলেটে আমি খতম হব সে বুলেট এখনও পয়দা হয়নি।"

কপাল থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে দিল সে।

"আজকের দিনে মানুষ কি তাহলে শুধু একটা ফৌজী কোট আর রাইফেলের সমষ্টিমাত্র, ব্যস্‌? আরে না না, তা নয়!......ভগবান জানেন আমি কী চাই।...... আমি নিজে তো জানি না।......নিজেকে শুধোই অনেক সময়—টাকার আণ্ডিল হবার ইচ্ছে? না। আমার মধ্যে যে মানুষটা রয়েছে সে কষ্ট পায়......বিশেষ করে এই সময়টা—যখন আমরা বিপ্লব করছি, ঘরোয়া যুদ্ধ চালাচ্ছি। পায়ে যে আমার ঘা ধরে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা সইছি, জখমে কষ্ট পাচ্ছি, এসব কেন?—শ্রেণী চেতনার জন্যই তো! নিজের শ্রেণীর জন্যই তো! মার্চ মাসে মনে আছে আদ্ধেকটা দিন বরফের গর্তেই কাটিয়ে দিলাম, মাথার ওপর সামনে চলছিল মেশিনগানের গুলি।......লড়াইয়ের ময়দানের কথা যদি বল তা হলে অবশ্য আমি সত্যি সত্যিই বীর, তাই না? কিন্তু আমার নিজের চোখে,—একটু আড়াল থেকে রয়ে সয়ে দেখলে—আমি কী? মদের নেশায় আধ-খ্যাপা, সারা দুনিয়ার ওপর আর নিজের ওপর হাড়ে-চটা একটা লোক, কথায় কথায় বুটের খাপ থেকে বার করছি ছুরি-চাকু।......"

মিশকা আবার শিরদাঁড়া সোজা করে রাতের তাজা হাওয়ায় দম নিল একবার।

মুখটা ওর বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, অনেকটা মেয়েলি ধরনের। গ্রেটকোটের পকেটে হাত দুটো একদম চালান করে দিয়েছে। কথা বলছে যেন কাতিয়ার সঙ্গে নয়, সামনেই যেন কোনো অশরীরী ছায়ামূর্তি রয়েছে, তারই সঙ্গে কথা বলছে সে।

"লেখাপড়া......ও সবের নাড়ীনক্ষত্র জানা আছে আমার......মনটা আসলে আমার জংলীর মতো।......আমার ছেলেপিলেরা অবশ্য লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু আমি এখন যা, বরাবর তা-ই রয়ে যাব—মানে বদ লোক আর কি! এই আমার কপালের লেখা।......ওরা তো বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কতো কতো বই লেখে—কী চমৎকার সব কথা লেখে! কেন, আমাকে নিয়ে কেউ একটা বই লিখতে পারে না? ভেবেছ বুদ্ধিজীবীরা একাই বুঝি পাগলামি করতে পারে? আমিও ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনি......তারপর জেগে উঠে আবার নতুন করে তৈরি হই খুনখারাপি করবার জন্য।......"

অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে এল একদল সওয়ার। দূর থেকে ওরা চেঁচাচ্ছিল : 'থাম! থাম!' মিশকা রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে বলল : 'তোমরা থাম শালা! নিজেদের লোককে চিনতে পারছ না, না?" কাতিয়ার পাশ থেকে সরে ও ঘোড়সওয়ারদের দিকে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথাবার্তা হল ওদের মধ্যে।

বন্দীরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নভাবে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছিল। কাতিয়া মাটিতে বসে পড়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে রইল। পূবের আকাশে দেখা দিয়েছে ভোরের ফিকে সবুজ, এক দমক ভিজে হাওয়া বয়ে এল সেদিক থেকে—বাতাসে গোবর-ঘুঁটের ধোঁয়া, স্তেপ গাঁয়ের চিরাচরিত গন্ধ।

তেপান্তরের মাঠের অন্তহীন রাতের তারাগুলো এখন ম্লান হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাতিয়াকে আবার উঠতে হয়, আবার শুরু হয় যাত্রা। একটু বাদেই শোনা যায় কুকুরের ডাক। একে একে নজরে আসে খড়ের গাদা, পাতকুয়োর হাঁসকল, ঘরের ছাদ। মাঠের ওপর ঘুমন্ত হাঁসগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন বরফের চাঁই পড়ে রয়েছে। পুকুরের নিথর জলে প্রবাল-রঙা ভোরের আকাশ ছায়া মেলেছে। মিশকা হাঁটতে হাঁটতে ভুরু কুঁচকে বলে : "ওদের সঙ্গে যেও না তুমি, আমিই তোমার দেখাশোনা করব।"

"বেশ তো", জবাব দেয় কাতিয়া। মিশকার গলা যেন অনেকদূর থেকে ওর কানে ভেসে আসে।

কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কাতিয়া—এখন একটু শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারলেই হল।......

আধ-বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে কাতিয়া দেখতে পেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুল, তার ওপাশে সবুজ খড়খড়ি, তাতে ফুলপাতা-পাখী আঁকা। জানলার ঝাপসা কাঁচে নখের ডগা দিয়ে টোকা মারল মিশকা। কুটিরের সাদা দেয়ালের গায়ে দরজা, ধীরে ধীরে সেটি খুলে গেল। ঝাঁকড়া-চুলো একজন চাষী

মাথা বের করে উঁকি দিল একবার। দাঁত বের করে হাই তুলতে গিয়ে লোকটার গোঁফের ডগা উঁচিয়ে উঠল। "যদি ইচ্ছে করেন তো ভেতরে আসতে পারেন" বলল সে। কাতিয়া টলতে টলতে ঢুকল ঘরটার মধ্যে। অসংখ্য মাছি ভড়কে গিয়ে ভন্‌ভন্‌ করে বেড়াচ্ছিল চারদিকে। পার্টিশনের আড়াল থেকে ভেড়ার চামড়ার একটা কোট আর বালিশ নিয়ে এল চাষীটি। কাতিয়াকে ঘুমোতে বলেই সে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। একটু বাদে কাতিয়া বুঝতে পারল যে ও বেড়ার পেছনে একটা বিছানায় শুয়ে পড়েছে, মনে হল যেন মিশকা ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথার নীচে বালিশটা গুছিয়ে দিচ্ছে। তারপরেই ও গাঢ় ঘুমে অচেতন, কিছুই আর মনে থাকে না।

স্বপ্নের মধ্যে ও শুনতে পায় চাকার আওয়াজ, যেন অনবরত খট্‌-খট্‌ খট্‌-খট্‌ করে চলেছে। অসংখ্য গাড়ি। উঁচু উঁচু মহলবাড়ির জানলায় রোদ লেগে তা ঠিকরে পড়ছে গাড়িগুলোর ওপর। পিঠ বাঁকানো টালির ছাদ!......প্যারিস! সুবেশা সুন্দরীরা গাড়িতে চড়ে যেন কোথায় চলেছে। লোকে চেঁচাচ্ছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছে। লেস্‌-লাগানো ছাতা দোলাচ্ছে মেয়েরা......গাড়িগুলো যেন ক্রমেই আরো, আরো জোরে ছুটে চলেছে। ও হরি! এরা যেন কার পিছু নিয়েছে! প্যারিসের রাস্তায়, একেবারে খোলা বুলভারে! ওই তো ওদের দেখা যাচ্ছে! ঝাঁকড়া লোমওলা ঘোড়াগুলোর ছায়া দেখা যাচ্ছে সবুজ ভোরের আলোয়। কোথাও যাবার উপায় নেই, কোথায় ও পালাবে! ঘোড়ার খুরের কী আওয়াজ! কী চেঁচামেচি! উঃ কী ভয়ানক......

কাতিয়া উঠে বসল। জানলার বাইরে চাকার খট্‌খট্‌ আওয়াজ, ঘোড়ার চিঁহি-চিঁহি ডাক শোনা যাচ্ছে। বেড়ার পর্দাহীন দরজার ফাঁকটা দিয়ে ও দেখল, অনেক মানুষ আসছে যাচ্ছে, পা থেকে মাথা অবধি তাদের লড়াইয়ের সাজ। নানা কণ্ঠের কথাবার্তা আর বুটের আওয়াজে বাড়িটা গম্‌গম্‌ করছে। টেবিল ঘিরে বসেছে একগাদা মানুষ, কিসের ওপর ঝুঁকে পড়েছে যেন সবাই। পাশের কামরাটা খিস্তিখেউড়ে জমজমাট। প্রশস্ত দিনের আলোয় ভরে গেছে চারদিক, জানলার ফোকর গলে, তামাকের ধোঁয়ার নীল কুয়াশা ভেদ করে কোনোরকমে ভিতরে ঢুকেছে দু'একটা ম্লান আলোর রেখা।

কাতিয়া বিছানায় বসে শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে চুলগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। গ্রামে নতুন একদল সৈন্য ঢুকেছে বলে মনে হল। ঘরের মধ্যে যারা ভিড় পাকাচ্ছিল তাদের উদ্বিগ্ন গুঞ্জনে এইটুকুই বোঝা গেল যে সাংঘাতিক জরুরি কিছু একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। কর্কশ গলায় কে যেন হাঁক দিয়ে উঠল : "গোল্লায় যাক হতভাগা! ডাক তো একবার জানোয়ারটাকে!"—চটাং চটাং কথা, কিন্তু মেয়েলি টান আছে তাতে।

চেঁচামেচি আর চিৎকারটা এবার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল উঠোনে আর রাস্তায়—তিন-ঘোড়ার ওয়াগন, জিন-আঁটা ঘোড়া আর সেপাই নাবিক সশস্ত্র চাষীরা সেখানে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে।

"পেত্রিচেঙ্কো......পেত্রিচেঙ্কো কোথায়? শিগগির খুঁজে নিয়ে এস তাকে!"

"তুই নিজে যা না, বেজম্মা! হেই, কর্নেলকে ডাকো তো একবার, ভাই! গেল কোন্ চুলোয় লোকটা! এই যে মহাপ্রভু বেহুঁশ মাতাল হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন গাড়িটার মধ্যে! দে বেটার মুখের ওপর এক গামলা জল ঢেলে।......হেই বেটা গামলা-ওলা, কুয়োর ওদিকে যা—কর্নেলকে জাগানো আমাদের কম্ম নয়।........হেই দোস্ত, শুধু জলে কাজ হবে না— নাকে আলকাতরা ঘষে দাও ওর।......ওই তো জেগেছে, জেগেছে।......ওকে বলো যে বুড়ো কত্তা খেপে টং হয়ে আছেন।......ওই যে উনি আসছেন, আসছেন......।"

জাঁদরেল চেহারার সেই উঁচু টুপি পরা মানুষটি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। এমন গাঢ় একটা ঘুম দিয়ে এসেছে যে ফুলো ফুলো চোখ দুটিকে লাল টকটকে গুঁপো মুখটার মধ্যে খুঁজে পাওয়াই ভার! গজ্‌গজ্ করতে করতে সে ভিড় ঠেলে একেবারে টেবিলের সামনে এসে বসে পড়ল।

"কী মতলব এঁটেছ শুনি, হতভাগা বেজম্মা? ফৌজটাকে বেচে দিচ্ছ তাই না? ওরা নিশ্চয় তোমায় ঘুষ দিয়েছে!"—তীক্ষ্ন কাংস্যকণ্ঠে যেন সে ছুঁড়ে মারল কথাগুলো।

"কী এমন ব্যাপার হয়েছে? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু—ব্যস্!" হেঁড়ে গলায় বলে উঠল কর্নেল, শুনলে মনে হয় যেন খালি পিপের মধ্যে থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

"কী ব্যাপার হয়েছে!......তাই তো, এমন আর কী ব্যাপার!" ধরা গলায় বলল বুড়ো : "তোমার ঘুমের ফাঁকে যে জার্মানরা ঢুকে পড়ল, এই তো ব্যাপার!"

"কি? আমি জার্মানদের ঢুকতে দিয়েছি? একটা কাকপক্ষীকেও ঢুকতে দিই নি।"

"বলি তোমার পাহারা ঘুম্‌টিগুলো কোথায়? সারা রাত ধরে মার্চ করে এলাম, অথচ একটা ঘুমটিও নজরে পড়ল না! কি করে ফৌজ ফাঁদে পড়ল শুনি?"

"চেঁচাচ্ছেন কেন? জার্মানরা কোথায় আছে তা আমি কি করে জানব? স্তেপ তো আর এত্তটুকুন জায়গা নয়।......"

"তোমারই দোষ, নচ্ছার পাজি!"

"হ্যাঁঃ, বললেন আর কি!"

"আমি বলছি তোমারই দোষ!"

"গায়ে হাত দেবেন না বলছি!"

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরটার মধ্যে। টেবিলের কাছ থেকে সভয়ে সরে গেল লোকজন। একটা ভারী নিঃশ্বাস আর ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। রিভলবার-ধরা একখানি হাত শূন্যে উঁচিয়ে ছিল। আরো অনেকগুলো হাত এসে চেপে ধরল সেই হাতটাকে। গুলি ছুটে গেল একটা। কানে হাত চাপা দিয়ে কাতিয়া বালিশে মাথা গুঁজল। ছাদ থেকে খসে পড়ল আস্তরের বালি। আবার শোনা গেল নানা কণ্ঠের গুঞ্জন, এবার যেন বেশ খুশি-খুশি ভাব। পেত্রিচেঙ্কো

দাঁড়িয়ে পড়তেই তার ভেড়ার চামড়ার টুপিটা ছাদ ছোঁয় আর কি! একদল হল্লাবাজ লোককে সঙ্গে নিয়ে সে গট্‌গট্‌ করে বুক ফুলিয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে।

জানলার বাইরে তখন হট্টগোল আর ব্যস্ততা। জিনের ওপর চেপে একদল লোক গাড়ির দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চাবুকের শব্দ, চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচানির সঙ্গে শোনা যাচ্ছে অশ্রাব্য গালাগালি। ঘরটা একদম খালি হয়ে গেছে এর মধ্যে। একটু আগেই যে-লোকটি ভারিক্কি চালে অথচ মেয়েলি সুরে হাঁক দিচ্ছিল তাকে কেন যে কাতিয়া তখন দেখতে পায়নি এবার তা বুঝল—আসলে লোকটি বেজায় খাটো। কাতিয়ার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে টেবিলের সামনে বসেছিল সে, কনুইয়ের নীচে একটা মানচিত্র।

লোকটির সোজা সোজা লম্বা বাদামি রঙের চুল, ছোট ছেলের মতো সরু ঘাড়টার ওপর এসে পড়েছে। কালো কোর্তার ওপর টোটার স্ট্র্যাপ আড়া-আড়িভাবে ঝোলানো, দু' দুটো রিভলবার আর একটা তলোয়ার চামড়ার বেলটে গোঁজা, চটকদার রেকাব-আঁটা বুট, টেবিলের নিচে পায়ে পা রেখে বসেছে। মাথাটা এপাশ ওপাশ দুলিয়ে, কাঁধের ওপর তেল-চকচকে চুলগুলো নাড়তে নাড়তে সে যেন কী লিখে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি, কলমের কালি একেবারে ছিটকে পড়ছে, কাগজ যাচ্ছে ফুটো হয়ে। কাতিয়াকে বিছানা ছেড়ে দিয়েছিল যে-চাষীটি সে এবার সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল। লালচে মুখটায় যেন মাপ চাইবার ভঙ্গি, চুলে লেগে আছে খড়-কাটির টুকরো। বোকার মতো চোখ পিট্‌পিট্‌ করে সে টেবিলের উল্টোদিকে একটা বেঞ্চিতে বসল। হাত দুটো টেবিলের নিচে গুটিয়ে নিয়ে সে খালি পা দুটো ঘষাঘষি করতে লাগল।

"সব সময় খালি ব্যস্ত আর ব্যস্ত, আর এদিকে আমি ভেবেছি নেস্তর ইভানোভিচ—আপনি হয়তো ডিনারের জন্য থেকে যাবেন। কাল একটা বাছুরও মেরেছিলাম......আপনি আসবেন, আগে থাকতেই আন্দাজ করে ফেলেছিলাম হয়তো।......"

"আমার সময় নেই......এখন আর ঝামেলা কোরো না তো......"

"ওহো!" (চাষীটি চুপ করে গেল, চোখের পিট্‌পিটুনিও বন্ধ হয়েছে। চোখ দুটো এবার যেন ভারি ভারি আর শেয়ানা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ ধরে সে কেবল লোকটির কলম চালানো লক্ষ্য করল)।

"নেস্তর ইভানোভিচ! আপনি কি আমাদের গাঁয়েই লড়াই দিতে চাচ্ছেন নাকি?"

"দেখা যাক্‌......"

"যুদ্ধের কথা অবশ্য কিছুই বলা যায় না।......আমি শুধু ভেবেছিলাম লড়াই যদি হয়ই নির্ঘাত, তাহলে গরু ভেড়াগুলো নিয়ে কি করা যায়।......আমরা কি ওগুলোকে খামারের মধ্যে ছেড়ে দেব?"

লম্বা-চুলো লোকটি কলম ছুঁড়ে ফেলে এবার তার ছোট ছোট আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে পড়তে লাগল কী লিখেছে এতক্ষণ। দাড়ি আর বগল

কুট্‌কুট্‌ করতে থাকায় চাষীটি এদিক চুল্‌কে নিল খানিকটা। তারপর যেন হঠাৎ কী মনে পড়েছে এমনিভাবে বলল :

"নেস্তর ইভানোভিচ, আমাদের ভাগের মালটা কী হল? কাপড় তো দিয়েছেন—অবিশ্যি কাপড়টা ভালই।......এক নজরেই চেনা যায়, ফৌজী কাপড়। ছ' গাড়ি মাল ছিল......।"

"কেন, ওতে কি কুলোচ্ছে না? মন ভরেনি? বড্ড কম হয়ে গেছে?"

"না না, কুলিয়ে তো গেছে।......কতখানি ধন্যবাদ যে দেব আপনাকে ভেবে পাচ্ছি না। সে কথা নয়। আপনি তো ভাল করেই জানেন—গাঁ থেকে আমরা চল্লিশ জন লোককে পাঠিয়েছিলাম আপনাদের কাছে, লড়াই করবে বলে। আমার নিজের ছেলেটিও গিয়েছিল। ও বলেছিল : 'বাবা, চাষীদের জন্যই আমি আজ রক্ত দিতে যাচ্ছি।' এতেও যদি না হয় তাহলে অবশ্য আমরা বুড়োরাও যাব লড়তে।......লড়ুন না আপনারা, আমরা তো যাচ্ছিই।......আর কাপড়ের কথা যে বলছেন, জার্মানরা যদি—ভগবান না করুন—আমাদের ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ে, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে, আপনিই বলুন? তখন আমরা কী করব? লড়াইয়ের হারজিতের কথা কি কেউ হলপ করে বলতে পারে?"

লম্বা-চুলো লোকটির পিঠ সোজা হয়ে উঠল। মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে সে টেবিলের কিনারা চেপে ধরল। নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রইল সে। চাষীটি আস্তে আস্তে বেঞ্চি ধরে ধরে সরে গেল ওর কাছ থেকে। টেবিলের তলা থেকে হাতটা গুটিয়ে নিয়েই চট্‌ করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

লম্বা-চুলো লোকটি যে চেয়ারে এতক্ষণ বসেছিল সেটি একদিকে হেলে পড়তেই এক লাথি দিয়ে সে সরিয়ে দিল আপদটাকে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এতক্ষণ বাদে কাতিয়া লক্ষ্য করল কালো আধা-সামরিক উর্দিপরা বেঁটে মানুষটির মুখখানা। লোকটিকে দেখাচ্ছিল ছদ্মবেশ-পরা পাদরির মতো। সবল ভুরুর নিচে দুটো গভীর কোটর, তার ভেতর থেকে জ্বলন্ত মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি ঠিকরে এসে পড়ল কাতিয়ার ওপর। ফ্যাকাশে মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, দাড়ি গোঁফ ভাল করে কামানো—খানিকটা মেয়েলি ধরনের হলেও, মুখটার মধ্যে কেমন যেন একটা ভোঁতা আর উগ্র ভাব, অনেকটা চোদ্দ বছরের ছেলের মতো। কিন্তু চোখ দুটো প্রবীণ লোকের মতোই বুদ্ধিদীপ্ত।

কাতিয়া হয়তো আরো বেশি কেঁপে উঠতো যদি ও জানতো যে স্বয়ং মাখনো এখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে। মাখনো দেখল, বিছানার ধারে বসে আছে একটি যুবতী, পায়ে ধুলোমাখা বুট, সিল্কের পোশাকটা যদিও কুঁচকে গেছে কিন্তু জেল্লা আছে, কালো শালটা বেঁধেছে চাষী মেয়েদের কায়দায় : সে বুঝে উঠতে পারল না এ আবার কোন্‌ পাখীটি উড়ে এল চাষীর কুঁড়েঘরে। উপরের চওড়া ঠোঁটটা তার কুঁচকে গেল হাসিতে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এক সারি ছরকুটে দাঁত।

কাটা কাটা কথায় জিজ্ঞেস করল : "তোমার মালিকটি কে?"

কাতিয়া কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে লাগল শুধু। মাখনোর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, তার বদলে যে ভাবটা ফুটে উঠল তাতে কাতিয়ার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবার জোগাড়।

"কে তুমি? বেশ্যা মেয়ে নাকি? সিফিলিস্ থাকলে কিন্তু গুলি করে মারব। অ্যাঁ? রুশভাষা বোঝো না? অসুখ-টসুখ আছে, না সুস্থ?"

"আমি বন্দী," এমনভাবে বলে কাতিয়া যে প্রায় শোনাই যায় না।

"কাজ জানা আছে কিছু? নখ-টখ কাটতে পারো? যন্ত্রপাতি দেব না হয়।"

"আচ্ছা বেশ," এবার আরও আস্তে জবাব দেয় কাতিয়া।

"কিন্তু ফৌজের মধ্যে লুচ্চামি করা চলবে না।......শুনতে পেয়েছ কি বললাম? থাকতে পারো। লড়াইয়ের পর রাতে ফিরে আসব আমি—আমার নখ-টখগুলো একটু কেটে দেবে আর কি।"

মাখনোর সম্পর্কে নানা রকম কিংবদন্তী বাজারে চালু। শোনা যায়, আকাতুইয়ের কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় সে বহুবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত একবার অবশ্য সে পালাতে পেরেছিল, কিন্তু একটা গুদামঘরের মধ্যে ধরা পড়ে যায়—ধরা পড়বার সময় সে সেপাইদের সঙ্গে লড়াই করে একখানি কুড়ুল মাত্র সম্বল করে। রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে খেয়ে যখন সে আধমরা, তখন তার হাতে আবার কড়া পড়ে। শিকল-বাঁধা অবস্থায়ই সে তিনটে বছর কাটিয়ে দেয় বেজীর মতো চুপচাপ, আর দিনরাত বৃথাই চেষ্টা করে কব্জি থেকে লোহার হাতকড়া খুলবার। সশ্রম কারাবাসের এই সময়টাতেই সে অ্যানার্কিস্ট আর্শিনভ-মারিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, তার সাগরেদ হয়।

নেস্তর মাখনো হল একাতেরিনোস্লাভ এলাকার গুলিয়াই-পলিয়ে গ্রামের লোক। ওর বাপ ছিল ছুতোর মিস্ত্রি। একেবারে বাচ্চা বয়েসে গ্রামের একটা ছোট দোকান ঘরে কাজ করত সে। সেখানে তার কপালে জুটত হরদম হাতে-দড়ি আর গলাধাক্কা। ওর নাম দেওয়া হয়েছিল "বেজী" কারণ ওর স্বভাবটা ছিল ভয়ংকর বুনো আর চোখদুটো বাদামি। দোকানের একজন বয়স্ক কর্মচারী একবার ওকে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিল বলে ও তার গায়ে গরম জল ঢেলে শোধ নেয়, ফলে ওই অতটুকু বয়েসেই তার চাকরিটি খোয়াতে হয়। তারপর একদল সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে শুরু করে নানা রকম উপদ্রব—তরমুজের খেত, ফলের বাগানে নিয়মিত হানা দেয় আর বখাটে ছেলেদের মতো বেপরোয়া দিন কাটাতে থাকে। তারপর অবশেষে ওর বাবা ওকে একটা ছাপাখানার কাজে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানেই নাকি সে প্রথম অ্যানার্কিস্ট ভলিনের নজরে পড়ে যায়, আঠারো বছর বাদে এই ভলিন লোকটিই মাখনোর প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপতি পরিষদের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ভলিনের নাকি ছেলেটিকে বেজায় পছন্দ হয়ে যায়, ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে অ্যানার্কিস্ট-তত্ত্বে দীক্ষা দেয় সে, পরে ওকে পাঠায় ইস্কুলে। এইভাবেই নাকি মাখনো ইস্কুলের শিক্ষক হয়। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সত্যি নয়। মাখনো কোনো জন্মেও ইস্কুল মাষ্টারি করেনি, আর ভলিনের সঙ্গেও খুব সম্ভব তার পরিচয় হয়েছিল অনেক

পরে, অ্যানার্কিজমের পাঠ নিয়েছিল সে আর্শিনভের কাছ থেকেই, কয়েদখানায় থাকতে থাকতে।

উনিশ শো তিন সালে মাখনো গুলিয়াই-পলিয়েতে ফিরে এসে আবার শুরু করল তার পুরনো ডানপিটেপনা, তবে এবার আর আগের মতো খেতখামার ফল-বাগানে ঢুকে চুরি ছ্যাঁচড়ামি নয়, এবার বড়োলোকদের মহলবাড়ি আর দোকানদার মহাজনদের গোলাঘর নিয়ে পড়ল সে : কখনো ঘোড়া চুরি করে, কখনো ভাঁটিখানা সাবাড় করে, মাঝে মাঝে একেকজন দোকানদারকে ভয় দেখিয়ে চিঠি দেয় 'অমুক জায়গায় পাথরের নিচে টাকা রেখে এস' বলে। সে সময় পুলিশের লোকের সংগে ওর অদ্ভুত গলাগলি ভাব, যেন ওরা সব এক গেলাসের ইয়ার।

মাখনোকে সত্যিসত্যিই সবাই ভয়ানক ভয় করত, কিন্তু চাষীরা কখনো ওকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেনি, কারণ উনিশ শো পাঁচ সালের বিপ্লব যতই কাছিয়ে আসছিল মাখনোও বেপরোয়া জুলুম চালাচ্ছিল জমিদারদের ওপর। তারপর যখন জমিদারী কাছারি পুড়তে লাগল, চাষীরা ছুটল জমিদারের জমিতে লাঙ্গল দেবার জন্য, মাখনো তখন সরে পড়ল শহরে, আরো বড় বড় কাজের ফিকিরে। ১৯০৬ সালের গোড়াতেই সে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বার্দিয়ান্স্কের সরকারী কোষাগার আক্রমণ করল, তিনজন কর্মচারীকে গুলি করে মেরে ক্যাশবাক্স দখল করল। কিন্তু তারই একজন সংগী নিমকহারামী করে ধরিয়ে দিল তাকে, ফলে আকাতুইয়ের কয়েদ-খানায় ঘানি টানতে হল।......

বারো বছর বাদে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় ছাড়া পেয়ে সে আবার এসে হাজির হল গুলিয়াই-পলিয়ে গ্রামে। অস্থায়ী গভর্নমেন্টের দুমুখো নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সেখানকার চাষীরা নিজেরাই জমিদারদের তাড়িয়ে দিয়ে জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। মাখনো ওদের মনে করিয়ে দিল তার অতীতের অবদানের কথা, তারপর জেলা জেম্স্ত্ভোর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হল। অবিলম্বেই সে ঘোষণা করল, 'স্বাধীন কৃষক হুকুমত'-এর পক্ষে সে সরাসরি কাজ করবে। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকে সে খোলাখুলি বলল, জেম্স্ত্ভোকে যারা সমর্থন করে তারা সবাই বুর্জোয়া আর ক্যাডেটের দল। তর্কাতর্কির উত্তেজনায় সে শাসন-কর্তৃপক্ষের একজন সভ্যকে গুলি করেই মেরে ফেলল, তারপর একসংগে সভাপতি ও জেলা কমিসার দুটি গদীই সে নিজে দখল করে বসল।

অস্থায়ী গভর্নমেন্ট তার কেশও স্পর্শ করতে পারল না। কিন্তু এক বছর বাদে যখন জার্মানরা এল, তখন মাখনোকে বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হল। কিছুকাল রাশিয়ার নানান্ জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে উনিশ শো আঠারো সালের গ্রীষ্ম-কালে সে মস্কোয় এসে হাজির হল। মস্কোতে সে সময় অ্যানার্কিস্টরা গিজগিজ করছে। এখানে এসে মাখনোর পরিচয় ঘটল অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সংগে : বুড়ো আর্শিনভ তখন কামলা-ধরা চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন বৈপ্লবিক ঘটনার গতি—ভাবছিলেন, ভাগ্যের কী এক দুর্বোধ্য খেয়ালেই না আজ বলশেভিকরা প্রাধান্য পেয়ে গেল! তারপর ভলিন,—("শৃঙ্খলার জননী") নৈরাজ্যতত্ত্বের সেই শক্তিমান প্রবক্তা

ও স্তম্ভ, যাঁর দাড়ি আর চুলে কোনোদিন চিরুণীর স্পর্শ পড়েনি; উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অধীর-স্বভাব ব্যারন; আর্তেন, তেপার, ইয়াকভ আলি, ক্রাস্নোকুৎস্কি, প্লাগ্সন, ৎসিন্ৎসিপার, চোর্নিয়াক এবং আরো অনেক কেউকেটা লোক যাঁদের কেউই বিপ্লবে কিছু সুবিধা করে নিতে পারেননি, তাই কপর্দকহীন অবস্থায় মস্কোতে পড়ে থেকে দিনের পর দিন শুধু একঘেয়ে সভা চালিয়ে যাচ্ছেন। রোজকার সভার আলোচ্য বিষয় মাত্র একটিই : "সংগঠনের পদ্ধতি ও আর্থিক ব্যাপারাদি"।...পরবর্তীকালে, এঁদেরই কয়েকজন মাখনোর নৈরাজ্যবাদী হুকুমতে নেতৃত্বের গদীতে বসেন, আর অন্যান্যরা লিয়ন্তিয়েভ স্ট্রীটে বলশেভিকদের মস্কো কমিটির অফিস বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চক্রান্তে অংশগ্রহণ করে।

মস্কোর কাফেগুলোতে যখন অ্যানার্কিস্টরা গড়াগড়ি দিয়ে দিন কাটাচ্ছে এমনি সময় মাখনোর আবির্ভাব তাদের সত্যিসত্যিই চাঙ্গা করে তুলল। মাখনো ছিল কাজের মানুষ, তার ওপর ভয়ানক একরোখা লোক। সিদ্ধান্ত হল, সে যাবে কিয়েভে, সেখানে গিয়ে হেৎমান স্করোপাদ্স্কি আর তার সেনাপতিদের গুলি করে সাবাড় করবে।

একজন অ্যানার্কিস্ট পার্শ্বচর সঙ্গে নিয়ে মাখনো উক্রেইনীয় রণাঙ্গনের বেলেনিখিনোতে গিয়ে পৌঁছলো। সায়েঙ্কোর মতো দুর্দান্ত কমিসার তখন নজর রাখছিলেন রাস্তাঘাটের ওপর, কিন্তু মাখনো তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হল। অফিসারের ছদ্মবেশ ধরে তৈরিও হয়েছিল মাখনো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী ভেবে কিয়েভে যাওয়া বাতিল করে দিল : স্তেপ প্রান্তরের মুক্ত হাওয়ার মায়া তাকে হাতছানি দিয়ে পেছনে ডাকছিল; তাছাড়া ষড়যন্ত্র, গোপন চক্রান্ত, এসব জিনিস তার ধাতে সয় না। সিধে গুলিয়াই-পলিয়ের দিকে রওনা হল সে।

নিজের দেশগ্রামে ফিরে এসে মাখনো পাঁচ ছ'জন বিশ্বাসী ছোকরা জোগাড় করল। কুড়ুল, ছোরা, করাত-চালানো রাইফেল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে জমিদার রেজনিকভের মহলবাড়ির কাছে একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিল ওরা। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোলো বাড়িটার দিকে, তারপর নিঃশব্দে মালিক ও তার তিনটি ভাইয়ের গলা কেটে, আগুন ধরিয়ে দিল বাড়িতে। মালিকের তিন ভাই-ই ছিল স্থানীয় পুলিশের কর্মচারী। যা হোক, এইভাবে মাখনো হাতালো সাতটা রাইফেল, একটা রিভলবার, কয়েকটা ঘোড়া, ঘোড়ার সাজ আর পুলিশী উর্দি।

মাখনো আর তার দলবল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রীতিমত হাতিয়ার-বন্দ্ হয়ে এবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খামারবাড়িগুলোর ওপর—চারদিক থেকে একসঙ্গে পোড়াতে শুরু করল সেগুলো। মাখনোর অনুচরদের সংখ্যাও দিনের পর দিন বাড়তে থাকলো। যতোদিন না সারা জেলাটা থেকে জমিদারদের ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়া যায় ততোদিন মাখনো কেবল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ালো। এরপর সে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসল যার ফলে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

সেদিন ছিল হ্রইটসান পরবের দিন। স্তেপ অঞ্চলের একজন ডাকসাইটে জমিদার মির্গরোদ্স্কি তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন হেৎমানের এক কর্নেলের সঙ্গে। আশেপাশের জমিদারদের মধ্যে যাদের ভয়ডর একটু কম তারা সাহস করে এই বিপদ-আপদের দিনেও স্তেপের রাস্তায় ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছিলেন বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে। জেলার সুদূর প্রান্ত থেকে, এমন-কি কিয়েভ থেকেও নিমন্ত্রিতেরা এসেছিলেন।

মির্গরোদ্স্কির মহলবাড়ি পাহারা দেবার জন্য সেপাইশান্ত্রীর কড়া ব্যবস্থা হয়েছিল। মালিকের ঘরের চিলেকোঠায় মেশিনগান বসানো হয়েছিল একটা, আর বরের সঙ্গে তার অফিসার ভাইরাও এসেছিল পার্শ্বচর হিসেবে—লম্বা চওড়া লোক সবাই, পরনে নীল তুর্কী পাজামা। পাজামাগুলোও সাবেকী কায়দায় এমন ঢোলা-ঢোলা যে মাটি ঝাঁট দিয়ে যায়। গায়ে তাদের লাল কাপড়ের জামা, মাথায় আস্ত্রাখান টুপি, তা থেকে সোনালি ঝালর নেমে এসেছে একেবারে কোমর অবধি। চওড়া মরোক্কো চামড়ার বুটে এসে ঠোকর খাচ্ছে পাশে ঝোলানো বাঁকা তলোয়ারগুলো।

কনেটি সদ্য ফিরেছে ইংলণ্ড থেকে। সেখানে মেয়েদের এক বোর্ডিং-এ থেকে সে পড়াশুনা শেষ করেছে। উক্রেইনীয় ভাষাও কিন্তু এর মধ্যে খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছে সে। তা ছাড়া, ছুঁচের কাজ-করা ব্লাউজ, পুঁতির মালা, চুলের ফিতে আর উঁচু লাল বুটজুতোও পরতে শিখেছে। ওর বাপ, সর্দার মিরগরোদ্স্কি, কিয়েভ থেকে সবে আনিয়েছেন ফারের ঘেরা-দেয়া একটা অর্ডারী মখমলের পোশাক—হেৎমান মাজেপ্পা-র সেই বিখ্যাত ছবিটার হুবহু অনুকরণ। পুরনো কেতায় যাতে বিয়ের উৎসবটা হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। একশো বছরের পুরনো মধুর শিরকা অবশ্য এই গোলমালের দিনে উক্রেইনে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু চর্বচোষ্যের বিপুল আয়োজনে যা কিছু প্রয়োজন তার কোনো কিছুরই ঘাটতি হয়নি।

স্তোত্রপাঠের পর বাগানের মধ্যে দিয়ে কনেকে নিয়ে যাওয়া হল পাথরের তৈরি নতুন গির্জাঘরে। সঙ্গিনী মেয়েরা সবাই সুন্দরী, অপ্সরার মতো। ওরা যখন গান গেয়ে গেয়ে কনেকে নিয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কসাকদের প্রাচীন লোক-গাথারই কোন্ এক নায়িকা বুঝি প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে আবার। বরের বন্ধুরা বেড়ার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে : "আহা-হা! উক্রেইনের বুঝি সেই সাবেকী আমল আবার ফিরে এল রে!" বিয়ের মন্ত্র পড়ার পর নব-দম্পতি যখন গির্জার প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়াল, ওদের গায়ে মুঠো মুঠো ওট্স্ ছুঁড়ে দিতে লাগল সবাই। মাজেপ্পার মতো পোশাক-পরা মেয়ের বাপ এসে আশীর্বাদ করলেন তাদের, গ্রেঝিগোরিয়ের পুরনো ক্রুশমূর্তি হাতে নিয়ে। তারপর শুরু হল শ্যাম্পেন, সোল্লাস শুভকামনায় গেলাস ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে ভাঙল অনেক গেলাস। মোটরগাড়িতে চেপে নবদম্পতি স্টেশনমুখো রওনা হল। নিমন্ত্রিতেরা সব রয়ে গেল পানভোজন ফূর্তির জন্য।

বাড়ীর সামনের বড়ো আঙিনাটায় যখন রাত নেমে এল, সেপাই আর চাকর-

বাকরেরা মিলে তখন ঘূর্ণি নাচের হুল্লোড় লাগিয়ে দিয়েছে। বাড়ীর সমস্ত জানলাগুলোই আজ আলোয় ঝলমল। আলেকসান্দ্রভ থেকে আমদানি ইহুদি বাজনদারদের দল প্রাণপণে ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর করে বাজিয়ে চলেছে বেহালা আর ভেঁপু। মেয়ের বাপ এর মধ্যেই একবার দানবীয় 'হোপাক'-নাচ নেচে নিয়েছেন, এখন চালাচ্ছেন সোডাওয়াটার। খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলারা ঠাণ্ডা করে নিচ্ছেন দেহ, আর বরের বন্ধুরা সবাই ফিরে আসছে আহারের টেবিলে। ওরা সবাই কসাক অফিসার, কোমরে খটমট করছে তলোয়ার। গর্ব করে বলছে : সিধে মস্কো গিয়ে 'হতচ্ছাড়া' মস্কো-ওয়ালাগুলোকে একদম ঢিট করে এলে বেশ হত।

ফুর্তিবাজ দংগলটার মধ্যে ঠিক সেই সময় এসে হাজির হল একজন বেঁটে খাটো অফিসার—পরনে তার হেৎমান পুলিশের উর্দি। এমন দিনে জমিদার-বাড়িতে পুলিশ এসে দেখা দেবে এ আর বিচিত্র কি? বিনীতভাবে, নিঃশব্দে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল সে, বাজনদারদের দিকে তেরছা চোখে তাকাতে লাগল। লোকটির দেহের তুলনায় উর্দিটা যে একটু বেশিরকম বড়ো তা হয়তো কারুর কারুর নজরে পড়ে থাকবে। একজন ভদ্রমহিলা তো পাশের সংগিনীটিকে ভয়ে ভয়ে বলে বসলেন : "ও কে গা? দেখলে যে গা ছমছম্ করে!" অপরিচিত অফিসারটি চোখদুটো যথাসম্ভব নামিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর সেই জ্বলন্ত নারকীয় দৃষ্টি যেন কিছুতেই চাপা থাকছিল না। তবে বলা যায় না,—মদের ঝোঁকে তো কতরকম আজেবাজে সন্দেহই উঁকি দেয় মনে......

অর্কেস্ট্রায় মাজুরকা আর ওজলট্জের পালা শেষ হবার সংগে সংগে শুরু হল ট্যাংগোর ঐকতান। লাল জামাপরা দু'তিনজন নাচিয়ে তখনও কোনোরকমে টাল সামলে পায়ের ওপর খাড়া ছিল : এবার ওরা নাচের জুটি টেনে নিল মেয়েদের মধ্যে থেকে। মাথার ওপরকার আলোগুলো নিবিয়ে ফেলবার জন্য হুকুম দিল কে একজন। কোন্ এক সুদূর অতীত যুগের গহ্বর থেকে যেন ভেসে আসছিল সংগীতের মূর্ছনা—আর আধো-অন্ধকারে তারই তালে তালে যুগলমূর্তিগুলো যেন অচেতনপ্রায় হয়ে ঢলে ঢলে পড়ছিল তীব্র আনন্দময় মৃত্যুর কোলে।

এমন একটি মুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ। অতিথিরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে যে যেমন ছিল দাঁড়িয়ে রইল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেল সংগে সংগে। আধখোলা জানলাটার কাছে খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ-অফিসারবেশী মাখনো তখন দু' হাতে গুলি চালাচ্ছে লালকোর্তাওয়ালাদের লক্ষ্য করে। বরের বন্ধু ঢ্যাঙা লাল-মুখো একজন কর্নেল শূন্যে হাত ছুঁড়ে সশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলের গায়ে—ওর দেহের চাপেই টেবিলটা সম্পূর্ণ উলটে গেল। মেয়েরা শুরু করল কানফাটানো চীৎকার। পুরুষ অতিথিদের একজন তার খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সে কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।......খোলা তলোয়ার হাতে তিনজন ছুটে গেল মাখনোর দিকে। দুজনে সংগে সংগেই পড়ে গেল, তৃতীয়জন খরগোসের মতো সর্‌সর্ করে ছুটে পালাল জানলার দিকে। পুলিসের উর্দিপরা আরো দু'জন ভয়ংকর চেহারার লোককে এবার দেখা গেল

উলটো দিকের দরজার মুখে—টুপির ফাঁক দিয়ে কপালের ওপর যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ওদের চুলের গোছা। অতিথিদের ওপর তারাও গুলি চালাতে শুরু করল। মেয়েরা বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ছুটছে। একজনের পর একজন ধরাশায়ী হচ্ছে। বরের বাপ চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারছেন না। এমন সময় মাখনো তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে সিধে গলার মধ্যে চালিয়ে দিল বুলেট। অতিথিরা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির আঙিনা আর বাগানেও শোনা গেল বন্দুকের তীব্র নির্ঘোষ। খুব অল্প কয়েকজন মাত্র ঝোপের আড়ালে কিংবা পুকুর-পাড়ের ঘাসবনে লুকোতে পেরেছে। চাকরবাকর আর সেপাইরা পাইকিরিহারে কোতল হয়ে গেল। মাখনোর বাহাদুর ছোকরারা অনেকগুলো গাড়ি সাজিয়ে নিয়ে একেবারে সূর্য ওঠা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকল লুঠের জিনিসপত্র বোঝাই করার কাজে—নানা ধরনের মালপত্রের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। তারপর যখন সূর্য উঠল, গোটা বাড়িটাই তখন দাউ-দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে।

এই বেপরোয়া হামলার ফলে সারা গ্রামে যেন দারুণ সাড়া পড়ে গেল। চাষীরা সে সময়টা একদম পিষে গিয়েছিল—জার্মানদের অত্যাচারে, নতুন আমদানি-করা মালিকদের শোষণে, আর পুলিসী প্রতিশোধের নির্মম প্রত্যুৎপন্নতায়। চাষীদের বিশ্বাস করতে না পেরে জমির মালিকরা জমি ইজারা দেয়া বন্ধ করেছিল। চালু বছরের ফসল তো তাদের গোলায় তুলে দিতে হবেই, উপরন্তু গত বছরের ক্ষয়ক্ষতির মাশুল এবার ফসলী খাজনায় শুধতে হবে। কপাল চাপড়ে হা-হুতাশ করা ছাড়া চাষীদের আর কিছুই করবার ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে এল মাখনো, সন্ত্রাসের বিভীষিকা ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল সে। পল্লীতে পল্লীতে কুটিরে কুটিরে গুজব রটে গেল—চাষীদের হয়ে লড়তে পারে এমন এক বীরের আবির্ভাব ঘটেছে।

চাষীরা বুকে নতুন বল পেল। অসংখ্য জমিদার-বাড়ী পুড়ে খাঁক হয়ে গেল। স্তেপের প্রান্তরে গমের গাদায় লাগল আগুন। জার্মানি-গামী শস্যবোঝাই স্টীমার আর বজরার ওপর বেপরোয়া আক্রমণ চালালো গেরিলাদের ফৌজীদল। ক্রমে নীপারের ডান তীরে ছড়িয়ে পড়ল গণ্ডগোল। অস্ট্রিয়ান আর জার্মান সৈন্যদের ওপর হুকুম এল দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করতে হবে। হাজার হাজার পিটুনি ফৌজ পাঠানো হল গ্রাম এলাকায়। আর মাখনোও তখন তার ছোট্ট অথচ সুসজ্জিত দলটকে নিয়ে অস্ট্রিয়ান ফৌজের ওপর আগেভাগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাখনোর ফৌজে সে সময় কটিমাত্র প্রাণী। মোটে দুশো কি তিনশো দুঃসাহসী লোক গোটা ফৌজটার আসল প্রাণকেন্দ্র—আগাগোড়া এরাই টিঁকে আছে। এদের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণসাগরের নাবিক, লড়াই-ফেরত কিছু কিছু পাকা লোক যারা নানান্ কারণে দেশ-গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারে না, আর আছে ছোটখাটো নেতারা যারা নিজেদের দলবল নিয়ে মাখনোর ফৌজের সঙ্গে মিশে গেছে। সাতকুলে কেউ নেই এমন লোকও রয়েছে—তারা লড়াই ছাড়া আর কিছুই জানে না, জীবনে ফূর্তি লুটবার জন্যই তারা লড়ে।

ধীরে ধীরে মাখনোর ফৌজে এক এক করে এসে জোটে "যোদ্ধা" নামধারী

অ্যানার্কিস্টরা—নতুন একদল লুটেরা ডাকাত খেয়াল খুশিমতো ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে এ তল্লাটে সে-খবর তারা আগেই পেয়ে গিয়েছিল। খিদে পেটে ধুঁকতে ধুঁকতে তারা পায়ে হেঁটেই মাখনোর সদরদপ্তরে এসে হাজির হয়—এক পকেটে তাদের বোমা, অন্য পকেটে ক্রপৎকিনের রচনার একটি খণ্ড। বুড়ো কর্তাকে বলে অ্যানার্কিস্টরা :

"আপনার প্রতিভার কথা তো অনেক শুনেছি। দেখতে চাই তার কতোখানি খাঁটি।"

"বেশ তো, সাধ মিটিয়ে নাও," জবাব দেয় বুড়ো কর্তা।

ওরা বলে, "দেখুন, আপনি যদি সত্যিই এতবড়, তা হলে তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম থেকে যাবার কথা। কে জানে—হয়তো কপালের জোরে আপনি দ্বিতীয় এক ক্রপৎকিন হয়ে যাবেন।"

"কে জানে!" প্রতিধ্বনি করে বুড়ো কর্তা।

মাখনোর রসদবাহী গাড়ির পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে লাগল অ্যানার্কিস্টরা। তার সঙ্গে বসে চা পান করে ওরা, চমৎকার চমৎকার কথা শোনায়—আর শুনতেও মাখনোর এত ভালো লাগে সেগুলো—ইতিহাসের কথা, যশের কথা। ক্রমে ক্রমে ওদের দু'একজনের স্থান হতে লাগল দায়িত্বপূর্ণ হোমরা-চোমরা পদে। ওদের প্রত্যেকের গাড়ি বোঝাই থাকতো লুটের মালে : ব্রাণ্ডির পেটি, সোনাদানার ঝুড়ি, আর কাপড়ের গাঁট। চ্যাল্‌ডন, স্করোপিঅনভ্‌, য়ুগোলবভ্‌, চেরেদ্‌নিয়াক, এন্‌গারেৎস্‌, "ফরাসী ভদ্রলোক," এবং আরও অনেক ছিল এই ধরনের অ্যানার্কিস্ট। কোনো জায়গায় বেশ কিছুদিন ঘাঁটি গেড়ে থাকলেই ওরা সঙ্গে জুটিয়ে নিত এক দঙ্গল ফূর্তিবাজ বেশ্যা মেয়ে, তারপর শুরু করত "এথেনীয় নৈশ-লীলা"; বুড়ো কর্তাকে ওরা বুঝ দিত,—যৌন সমস্যার ব্যাপারে এইরকম দৃষ্টিভঙ্গিই দরকার, এতে করে অবরোধহীন মুক্ত জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় এবং এইভাবে একবার ঢালাও স্বাধীনতা পেয়ে গেলে তারপর সিফিলিস্‌ তো কোন্‌ ছার, কেউ আর তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। মাখনো তার অ্যানার্কিস্ট সাঙ্গোপাঙ্গদের বলত "বুকে-হাঁটা কেঁচো"। যখন তখন ভয় দেখাত ওদের গুলি করে সাবাড় করবে বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের কিছু বলত না,—হাজার হলেও কেতাব-পুঁথি পড়েছে ওরা, নামযশ কাকে বলে সে জ্ঞান ওদের টনটনে।

ফৌজের কোনো স্থায়ী সদরদপ্তর ছিল না। প্রয়োজনমাফিক তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আর সামরিক গাড়িতে করে প্রদেশের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়। যখনই হামলার বন্দোবস্ত হয় অথবা লড়াই আসন্ন হয়ে পড়ে, মাখনো তখন তার দূতদের পাঠিয়ে দেয় গ্রামগুলোতে, জনবহুল কোনো একটা জায়গাতে গিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তোলে সে নিজেই, তারপর সভার শেষে ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা গাড়ি থেকে গজকে-গজ উর্দির কাপড় আর ছিট-কাপড় বের করে বিলিয়ে দেয় ভিড়ের মধ্যে। একদিনের মধ্যেই দলে দলে চাষী গেরিলা ভর্তি হয়ে তার মূল বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। লড়াই শেষ

হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবকরা যে যার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে নিজেদের হাতিয়ার লুকিয়ে রাখে। তারপর যখন জার্মানদের গোলন্দাজ-বাহিনী 'শত্রুর' খোঁজে সশব্দে গাঁয়ের রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়, তখন ওরা যেন কিছুই জানে না এমনি গোবেচারা ভাব করে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদাস-ভাবে গা চুলকোয়। মাখনোকে খুঁজতে গিয়ে জার্মান আর অস্ট্রিয়ান বাহিনীর বেফজুল হয়রানিই হয়, ওকে যে পাওয়া যাবে না সে তো জানা কথাই—সর্বত্র বিরাজমান এই শয়তানটা যেন ফাঁকি দিয়ে সব সময় ওদের পেছন দিকেই রয়ে গেছে মনে হয়। পুরাকালের সেই তাতার-মোংগলদের মতোই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এমন লড়াই গেরিলারা সযত্নে এড়িয়ে চলে,—কেবল চেঁচামেচি, হুইস্‌লের আওয়াজ, গোলাগুলি ছোঁড়া ইত্যাদি ক'রে ঘোড়ার পিঠে কিংবা গাড়িতে ক'রে তারা বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, তারপর গিয়ে জড়ো হয় এমন একটি জায়গায় যেখানে তাদের উপস্থিতির কথা কেউ ভাবতেই পারে না—সেখান থেকে তারা আবার হয়তো শুরু করবে হামলা।

গ্রামটা এখন জনশূন্য। ফৌজের পিছনে পিছনে চলেছে মাখনো,—তিন-ঘোড়ায় টানা একটা বাগিগাড়িতে চড়ে। গাড়ির মেঝেতে কার্পেট পাতা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মোটাসোটা একটি চাষী মেয়ে কচি ডালের মুড়ো-ঝাঁটা দিয়ে ঘরের আঙিনা সাফ করছিল—স্কার্টটা উঁচুতে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে সে, কেঁদে কেঁদে মুখটা তার ফুলে ঢোল হয়েছে। খোলা জানলার কাছে বসে আছে বাড়ির কর্তা, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। ওই পাহাড়গুলোর অ.ড়ালেই অদৃশ্য হয়ে গেছে পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার সৈন্যের সারি, পাহাড়ের চূড়োয় এখন দেখা যাচ্ছে শুধু দুটো বায়ুকল—পরম নিশ্চিন্তে পাখা ঘুরিয়ে চলেছে তারা। নাঃ, মাখনোর সঙ্গে কথাবার্তার পরও সে যে আশ্বস্ত হতে পারেনি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কাতিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে কুয়োর কাছে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে কাপড়-জামা ঠিকঠাক করে নিল। বাড়ির কর্তা ওকে ডেকেছে প্রাতরাশের জন্য। দু'রকম সেদ্ধ-তরকারী আর খানিকটা দুধ খেয়ে নিল সে। এরপর কী করতে হবে, কী তার গতি হবে কিছুই সে জানে না বলে চুপচাপ বসে রইল জানলার কাছে। ভয়ানক গরম পড়েছে। রাস্তায় একদল মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, টাটকা গোবরের গাদা থেকে খুঁটে-খুঁটে কি খাচ্ছে। বেড়ার ওপাশে সূর্যমুখী ফুলের সোনালি মাথাগুলো নুয়ে পড়েছে, ফলের ভারে নিচু হয়ে গেছে চেরি গাছ। আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজপাখি। বাড়ির কর্তা গলা খাঁকারি দিয়ে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

"হ্যাঁ, ঘাগরাটাকে আরও তোল্ মাথার ওপরে, বেহায়া হতচ্ছাড়ি!"—কাঁদো-কাঁদো-মুখ মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল সে : "তোর গায়ে যদি ওরা হাত দিয়েও থাকে, সে আর বিচিত্র কী? তুই তো আর পয়লা নোস্!"

কান্নায় ফোঁস্-ফোঁস্ করতে করতে মেয়েটি ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে।

মোটা ফর্সা হাঁটুর নিচে নামিয়ে দিল স্কার্টটা। ঝাঁটাটার দিকে কয়েক মিনিট স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল কর্তা।

"ওদের মধ্যে কোন লোকটা করেছে বল্ তো? তুই আমায় বল্ আলেক্সান্দ্রা, ঘাবড়াবার কিছু নেই!"

"আমি তো জানোয়ারটার নাম জানিনে! আমাদের কেউ নয় সে।......চোখে চশমা আছে।"

"তাই বল্ ছুঁড়ি!" বেশ খুশি হয়েই যেন বলল এবার কর্তা : "চশমা...... তার মানে ওই অ্যানার্কিস্টদেরই কেউ একজন হবে।" কাতিয়ার দিকে ফিরে বলল : "এ হল আমার ভাইঝি আলেকসান্দ্রা......খড়ের জন্য গোলাবাড়িতে পাঠিয়েছিলাম ওকে।......গোলাবাড়ি কোথায় জানো তো? সকালে যখন ও ফিরল, জামাটামা ছিঁড়ে একাকার......ফুঃ!"

"পাঁড় মাতাল যে! রিভলবার তুলে শাসাচ্ছিল আমায়। আমি আর কী করতে পারতাম তখন?"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আলেকসান্দ্রা। ওর খুড়োমশাইটি তখন পা দাপিয়ে ওকে ধমকালো :

"যা বেরিয়ে যা! কী বলে যে বেঁচে আছি কে জানে!"

বোঁ করে ঘুরেই মেয়েটা দৌড়। লোকটি তখন আবার শুরু করেছে ফোঁস-ফোঁসানি আর গলা খাঁকারি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দূরের পাহাড়ের দিকে।

"কী করা যাবে? এই সব ডাকাতগুলোকে দুধকলা দিয়ে পুষতে কার ভাল লাগে, শুনি? ওদের গাড়ি আছে তো ঘোড়া দিতে হবে আমাদের......আর এক-নাগাড়ে মাইলের পর মাইল ছুটবেন তাঁরা, শয়তানের ঝাড় যতো!...ঘোড়া তো বাবা যন্তর নয়, ওর পেছনে যত্ন-আত্তি করতে হয়।......মাঝখান থেকে এখন সব ঘোড়াগুলোই আমাদের ঠুঁটো হয়ে পড়ে আছে। কী যে যুদ্ধ বেধেছে রে বাবা......"

টেবিলের উপর ঝুঁকে-পড়া বাতির চিমনিটা একবার টুন্‌টুন্ করে উঠল খাঁজের মধ্যে, জানলার শার্সিগুলোও একটুখানি কেঁপে উঠল। গরম বাতাস যেন এক দমক নিশ্বাস ছেড়ে চলে গেল। দূরের থেকে যেন মেঘের গুরু গুরু আওয়াজে কেঁপে উঠল মাটি। বাড়ির কর্তা তাড়াতাড়ি কোমর অবধি জানলার বাইরে ঝুঁকে পড়ে আর একবার লক্ষ্য করল পাহাড়ের চূড়োগুলোর দিকে—বায়ুকল দুটোর কাছেই দেখা যাচ্ছিল একজন ঘোড়সওয়ারকে, একাকী দাঁড়িয়ে আছে আকাশের পটে আঁকা রেখাকৃতির মতো। ভক্তির সঙ্গে আঙুলের মাথাগুলো একজায়গায় করে ঘরের কোণের ছবিটির দিকে চেয়ে গৃহকর্তা নিজের বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন।

"জার্মান গোলন্দাজারা নিশ্চয় আমাদের লোকদের ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করেছে। কী যে দিনকাল পড়ল, উঃ!" —রং-ওঠা জামাটার নিচে দিয়ে গা চুলকোতে চুলকোতে বলল সে।

ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার আগে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে সে এককোণে ছুঁড়ে দিল—খালি-পায়ের ডগা যেন তার কুঁকড়ে গেছে ভেতরের দিকে। দূর থেকে যেন

আরেকবার একটা গুরগুর্ আওয়াজ গাঁয়ের মাটি কাঁপিয়ে দিল। কাতিয়াও ঘরের মধ্যে আর বসে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এল দুপুরের রোদে। গুমোট হাওয়াটা গোবরের গন্ধে ভরে গেছে একেবারে।

ঠিক সেই সময় রাস্তায় এসে জুটল গতকালের ট্রেনযাত্রীদের একটা দল—ভয়ানক উদ্বিগ্ন তারা। সকলের সামনে রয়েছেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অব্রুচেভ মশাই, প্যাঁশ্নের ওপরের ফাঁকটা দিয়ে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। গায়ে চাপিয়েছেন একটা রবারের ম্যাকিনটশ্ আর পায়ে গালোশ্। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি এখন বিলক্ষণ নেতা ব্যক্তি, বাদবাকি সকলের আস্থাভাজন।

কাতিয়াকে ডেকে বললেন, "তুমিও এস আমাদের সঙ্গে!"

কাতিয়া গেল ওদের কাছে। সকলের উশ্কোখুশ্কো শীর্ণ চেহারা। দু'জন বয়স্কা মহিলা খুব কেঁদেছেন বোঝা গেল চোখ দেখে। ছদ্মবেশ-ধারী ফাটকাবাজটিকে আর দেখা যাচ্ছে না।

"আমাদের দলের একজন খসে পড়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না, নিশ্চয়ই গুলি খেয়ে মারা গেছে,"—ফুর্তির সঙ্গে বললেন অব্রুচেভ : "যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে আমাদের কপালেও অবশ্য তা-ই লেখা আছে; বন্ধুরা! সময় নষ্ট না করে আমাদের ঠিক করে ফেলতে হবে : যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা অপেক্ষা করব, না, আমাদের ওপর পাহারার বন্দোবস্ত দেখা যাচ্ছে না বলে সেই সুযোগে পায়ে হেঁটে রেলরাস্তার দিকে রওনা হব? জবাবের জন্য প্রত্যেক বক্তাকে এক মিনিট করে সময় দেয়া হল।"

সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কেউ বলল, খোলা মাঠের মধ্যে যদি ডাকাতরা ওদের হাতে পায়, তা হলে তো সর্বনাশ—নিঃসন্দেহে সবাইকে ওরা কোতল করবে। কেউ কেউ আবার বলল, পালাবার চেষ্টা করলে তবু বাঁচবার খানিকটা তো সম্ভাবনা আছে! এককে জনের আবার দৃঢ় বিশ্বাস জার্মানরা জিতবেই; তাই তারা ঝোঁক তুলল, যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাই করা যাক। পাহাড়ের ওপার থেকে আবার যখন গুরগুর্ আওয়াজটা ভেসে এল, তখন সবাই চুপ মেরে গেছে, পাহাড়ের দিকটা খুব ভাল করে নজর করে দেখছে তারা, কিন্তু কিছুই ঠাহর হচ্ছে না—বায়ুকলের পাখাগুলোই শুধু অলসভাবে ঘুরছে। অব্রুচেভ একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। দলের মধ্যে নানারকম মতের গরমিল, সবগুলোই তিনি এক এক করে জানিয়ে দিলেন বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে। মহিলা দুটি তাঁর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে রইলেন এমনভাবে যেন সাক্ষাৎ কোনো অবতারের মুখনিঃসৃত বাণী শুনছেন। কোনো মীমাংসায় পোঁছুতে না পেরে সবাই যে-যেমন দাঁড়িয়ে রইলেন শূন্য রাস্তাটার ওপর—মুরগি আর চড়ুইপাখির ভিড়ের মধ্যে। আশ্চর্য, এমন একটি লোকেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না যে তার দেশবাসী ভাইদের ওপর, রুশ ভাইদের ওপর দয়া দেখাতে পারে।......এমন একটি প্রাণীরও দেখা মিলল না! জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়েছিল ঘোমটা-খোলা একটি স্ত্রীলোক, হাই তুলে ফিরে গেল ভেতরের দিকে। রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হল গোঁয়ার-গোবিন্দ

চেহারার একটি চাষী, বেল্টের বাইরে শার্টটা ঝুলিয়ে দিয়েছে সে। বন্দীদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে একটিবারও না তাকিয়ে। পথের ধার থেকে একটা কাদার চাঁই তুলে নিয়ে সে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারলো কার একটা শুয়োরকে লক্ষ্য করে। আকাশে কয়েকটা বাজপাখি উড়ছিল, ওরাও যেন এই সর্বস্বান্ত অবাঞ্ছিত শহুরে লোকগুলোর দিকে উদাসীনভাবে চেয়ে দেখছিল উপর থেকে।

পাহাড়ের ওধার থেকে একটা ধুলোর মেঘ উঠছিল। হাওয়া-কলের পাশ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই লোকটি নজরের আড়ালে চলে গেল। বন্দী যাত্রীদের একজন বলল, জেলা পরিষদের অফিসেই আবার ফিরে যাওয়া যাক। সেখানেই তারা গত রাতটা কাটিয়েছে। অভিমত শোনার পর প্রথমেই চলতে শুরু করলেন সেই মহিলা দুটি, তারপর তিনঘোড়াওয়ালা একেকটা গাড়িকে যখন সিধে ছুটে আসতে দেখা গেল পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে, তখন বাদবাকিরাও পিছু নিলেন তাঁদের। পথে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু কাতিয়া আর রইলেন পদার্থবিদ্যার সেই অধ্যাপকটি—ম্যাকিনটশের নিচে হাত দু'খানি তিনি পালোয়ানের ভঙ্গিতে ভাঁজ করে রেখেছেন।

চারটি কি পাঁচটি গাড়ি হবে। হ্রদের পাড়টা ঘুরে ওরা একেবারে গাঁয়ের মধ্যে এসে পড়ল। আহত সৈনিকদের টেনে আনছিল ওরা। ওদের মধ্যে পয়লা-নম্বর লোকটি একটা কুঁড়েঘরের জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির চালক সে, বোতাম-খোলা চামড়ার-কোর্তাপরা দীর্ঘকায় একজন গেরিলা যোদ্ধা। চেঁচিয়ে বলল :

"নাদেঝ্দা—এই যে তোমার ঘরের লোককে এনেছি!"

গায়ের এপ্রনটা টেনে খুলে ফেলে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এল একটি স্ত্রীলোক। গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। রুগ্ন কাল্চে চেহারার একটি ছোকরা গাড়ি থেকে নেমে স্ত্রীলোকটির গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর মাথা নিচু করে কোলকুঁজো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল ঘরের ভেতর। এরপর গাড়িটা এসে দাঁড়াল পরের বাড়িটার সামনে· জমকালো পোশাক পরা তিনটি মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

"এই যে আমার পরীরা, তোমাদের মানুষটিকে নিয়ে যাও তো—খুব বেশি জখম হয়নি অবিশ্যি," খুশিভরা গলায় বলল গাড়ির চালক।

ঘোড়াগুলোকে এবার সে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল আস্তে আস্তে, শেষ জখমী লোকটিকে কোন্ আস্তানায় তুলবে তাই ভাবছিল সে। গাড়িতে বসে চোখ পিট্পিট্ করছিল মিশ্কা সলোমিন, রক্তাক্ত শার্টের ছেঁড়া টুকরো দিয়ে বাঁধা তার মাথাটা, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। চালক হঠাৎ ঘোড়াগুলোকে থামায়।

"আরে......কি আশ্চর্য! আপনি একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না, তাই না?"

কাতিয়ার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই তখন। উত্তেজনায় প্রায় খাবি খেতে খেতেই সে ছুটল গাড়িটার দিকে। গাড়ির উপর দু' পা অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে যে-লোকটি সে হল আলেক্সি ক্রাসিল্নিকভ—একটা হাত রেখেছে কোমরের ওপর আর অন্য হাতে লাগাম ধরে আছে। গালদুটো কোঁকড়া দাড়িতে

খানিকটা ঢাকা পড়েছে। চোখ দুটো যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে। কোমরবন্ধনীর মধ্যে হাতবোমা গোঁজা, চামড়ার জ্যাকেটের ওপর আড়াআড়িভাবে ঝুলছে মেশিন-গানের বেল্টটা, পিঠের ওপর ঘোড়সওয়ারী রাইফেল।

"একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না......আপনি এখানে কী বলে? কার ঘরে রয়েছেন আপনি? ওইটা? মিত্রোফানের বাড়ি? মিত্রোফান তো আমারই খুড়তুতো ভাই, ওরও পদবী ক্রাসিলনিকভ। দেখুন তো—মিশকা বেচারির কি হাল হয়েছে—শ্রাপনেলে মাথার অর্ধেকটাই উড়িয়ে নিয়ে গেছে!"

কাতিয়া গাড়ির পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। লড়াইয়ের পরেও আলেক্সির মেজাজ চড়েই আছে, উত্তেজনার ভাবটা এখনো কাটেনি। চোখ আর দাঁতগুলো যেন ঝিকিয়ে উঠছে......

"জার্মানগুলোকে আচ্ছারকম শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি।......বোকা হাঁদাগুলো......তিনবার ছুটে এসেছিল আমাদের মেশিনগানের মুখে। হতভাগা শয়তানগুলো এখন চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। বুড়ো কত্তা এখন যা-হোক কিছু উর্দি-টুর্দি পেলেন ফৌজের জন্য।......আরে এই! মিত্রোফান! গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এস তো! আহত এই বীরটিকে একবার ভেতরে জায়গা দাও। আর আপনি একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন না যেন। আপনার পক্ষে জায়গাটা ততো সুবিধের নয় কিন্তু......"

ঘণ্টাঘর থেকে মৃদু টুং টুং আওয়াজ আসছিল। সারা গাঁয়ে একটা চাঞ্চল্য—বেড়ার দরজায় আওয়াজ, খড়খড়ি টানার শব্দ, রাস্তায় ছুটে চলেছে মেয়েরা, চাষীরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে, যেন আকাশ থেকে এসে পড়ল রীতিমত একগাদা লোকের ভীড়; ওরা সবাই গান গাইতে গাইতে আর কথা বলতে বলতে স্তেপের দিকে চলেছে—মাখনোর বিজয়ী ফৌজকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য।

মিত্রোফানের বাড়ির উঠোনে আধ-মরা মিশকাকে টেনে আনছিল আলেক্সি ক্রাসিলনিকভ—ওকে সাহায্য করবার জন্য কাতিয়াও হাত লাগালো। তারপর ওরা দুজনে মিলে মিশকাকে ঠাণ্ডা ছায়ার মধ্যে এনে শুইয়ে দিল আলেকসান্দ্রার খাটে। কাতিয়া ওর ব্যাণ্ডেজ বদলাতে লেগে গেল, চুলের মধ্যে থেকে রক্ত-জমা নেকড়ার ফালি ছাড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। মিশকা দাঁতে দাঁত চেপে রইল—একটা আওয়াজও বের হল না তার মুখ থেকে। কাতিয়া যখন ওর মাথার খুলির ডান দিককার সাংঘাতিক জখমটা ধুয়ে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, আলেকসান্দ্রা তখন গামলাটা হাতে ধরে গোঙাচ্ছে আর টলছে! গামলাটা ছিনিয়ে নিয়ে আলেক্সি তাকে একপাশে ঠেলে দিল।

"একটা হাড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে ওদিকটা থেকে, দেখেছেন তো!" কাতিয়াকে বলল সে। "আলেকসান্দ্রা, মিছরি-তোলা চিমটেটা নিয়ে এস না......"

"ঘরে একখানাও নেই—সব ভাঙা!"

কাতিয়া হাড়ের ছোট কানিটা আঙুল দিয়ে তুলতে গেল। একটা টান দিতেই ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল মিশকা। নিশ্চয়ই ভাঙা টুকরো। আঙুল পিছলে যাচ্ছিল

কাতিয়ার, আরও ভেতরে তাই নখটা ঠেলে দিল সে। এবার বেরিয়ে এল জিনিসটা।

আলেক্সি একবার বড়ো একটা দম নিয়ে সশব্দে হেসে উঠল।

"এইভাবেই আমরা লড়ছি বুঝলেন—একেবারে চাষীদের কায়দায়!"

পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে মিশকার মাথাটা বাঁধল কাতিয়া। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে মিশকা, কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর সারা দেহ। একটা ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে চাপিয়ে শুয়ে পড়ল সে। হঠাৎ ওর চোখ খুলে যায়। আলেক্সি ঝুঁকে পড়েছে ওর ওপর।

"কি ব্যাপার হে?—বাঁচবো তা'হলে আমরা?"

"গতকাল এর কাছে খুব জাঁক করেছিলাম কিনা—এই তার পরিণতি।"—মৃত্যুর ম্লান হাসি মিশকার মুখে।

কাতিয়ার দিকে ফিরে তাকাল ও। হাত মুছে নিয়ে সে-ও এসে ঝুঁকে পড়েছিল ওর ওপর। ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল মিশকার :

"ওকে একটু দেখাশুনা কোরো, আলিওশা।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন।"

"ওর ওপর আমার একটু খারাপ নজরই ছিল।...যেমন করে হোক ওকে শহরে পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু, আলিওশা।"

আবার সে পাগলের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাতিয়ার দিকে। ব্যথা, জ্বর এসব এখন তার কাছে তুচ্ছ, নগণ্য বাজে জিনিস, নিতান্তই সাময়িক ঝামেলার মতো। মৃত্যুর যতোই মুখোমুখি হচ্ছে সে, উদগ্র আবেগ আর দ্বন্দ্বময় বাসনার একটা ঘূর্ণিঝড় যেন জাগছে তার মনে। এই মুহূর্তে আর নিজেকে মাতাল দুষ্ক্রিয়াসক্ত বলে মনে করতে পারছে না মিশকা, বরং মনে হচ্ছে ঝড়ের পাখির মতো ডানা-ঝাপটানো খাঁটি এক রুশ সন্তান সে, বীরত্বের কাজে সে অন্য কারুর চেয়ে কম যায় না, যে-কোনো বৃহত্তম কীর্তি আজ তার নাগালের মধ্যে......

"ওকে ঘুমোতে দাও," নিচু গলায় বলল আলেক্সি : "ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো শক্ত ছেলে, একবার ঘুমোলেই চাঙগা হয়ে উঠবে দেখো।"

আলেক্সির সঙ্গে কাতিয়া ঘরের বাইরে চলে এল। তখনও ওর মনে হচ্ছিল উত্তপ্ত স্তেপপ্রান্তরের সীমাহীন আকাশের নিচে, পোড়া গোবর-ঘুঁটের আদিম গ্রাম্য গন্ধের মাঝে এ যেন এক স্বপ্নজাগর। বহু শতাব্দীর স্তব্ধতার পর আবার যেন মানুষ এখানকার স্তেপভূমিকে শব্দমুখর করে তুলেছে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, মুক্ত বাতাসে মেলে ধরেছে ঝকঝকে দাঁতের সারি......কানায় কানায় ভরা জলপাত্র থেকে যেমন সহজে তৃষ্ণা মেটানো যায়, এখানে যেন তেমনি অনায়াসেই মেলে বাসনার পরিতৃপ্তি।

ভয় নেই কাতিয়ার মনে। ওর দুঃখে কারো দরদ উথলে উঠবে না এখানে, আপশোষ করার প্রয়োজন আজ ওর নিজের কাছেও ফুরিয়ে গেছে—ওর মনোকষ্ট যেন নিঃশব্দে নিদ্রামগ্ন হয়ে গুটিয়ে নিয়েছে আপনাকে। এখন কাতিয়া যেন নিশ্চিন্ত অনায়াসে সাড়া দিতে পারে যে-কোনো আত্মোৎসর্গের আহ্বানে, মহৎ

কাজের প্রেরণায়। যদি কোনো কণ্ঠস্বর আজ তাকে বলে : "মরো", তাহলে সে শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্মল চোখদুটিকে আকাশের দিকে মেলে ধরবে।

"ভাদিম পেত্রোভিচ আর নেই," বলল কাতিয়া, "মস্কোতেও আর ফিরব না আমি। ওখানে তো আমার কেউই রইল না এখন......কিছুই রইল না......জানি না আমার ছোট বোনটির কি দশা হয়েছে। ভেবেছিলাম কোথাও চলে যাব, হয়তো একাতেরিনোস্লাভেই..."

পা দুটো দুপাশে অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়ে আলেক্সি মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

"ভাদিম পেত্রোভিচের জন্য দুঃখ হয়"—মাথা নেড়ে বলল সে : "বড়ো ভালো লোক ছিলেন উনি।"

"ভালো"—চোখে জল এসে যায় কাতিয়ার : "অমন ভালো মানুষ আর হয় না।"

"তখন তো আমার কথা শুনলেন না আপনারা। আমরা অবশ্য নিজেদের পক্ষ হয়েই লড়ব, আপনারাও লড়বেন আপনাদের পক্ষে—এর মধ্যে গোলমেলে কিছু নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আপনারা লড়বেন কেমন করে শুনি? আপনারা কি মনে করেন কোনোকালেও আমরা হার স্বীকার করব? আজকে তো দেখলেন চাষীদের হিম্মত? তবু বলব, ভাদিম লোকটি ভালই ছিলেন..."

ফলের ভারে নুয়ে-পড়া চেরিগাছের একটা ডাল ঝুলে পড়েছিল ওয়াট্‌ল্‌-লতার বেড়ার ওপর। তাই দেখে কাতিয়া বলল ঃ

"আলেক্সি ইভানোভিচ, আপনি আমায় বলুন কি করতে হবে। বাঁচতে তো হবেই আমাকে..."

এই কথাগুলো বলতে গিয়ে মনে মনে ও শঙ্কিত হয়ে উঠল—শূন্যতার মধ্যে যেন ওর কথার খেই হারিয়ে গেছে। আলেক্সি চট্‌ করে কোনো জবাব দিল না।

"কি করবেন বলছেন? প্রশ্নটাও তেমনি! একেবারে হুবহু উঁচুতলার লোকের মতোই! কী কথা যে বললেন আপনি—আপনার মতো একজন শিক্ষিত মহিলা, এতগুলো ভাষা যাঁর দখলে, আর এইরকম সুন্দরী—আপনি কিনা শেষে একজন চাষীকে জিজ্ঞেস করছেন কি করবেন!"

তীক্ষ্ন বিদ্রূপের একটা ঢেউ খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে। কোমর-বন্ধনীতে ঝোলানো হাতবোমাগুলো আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল সে। কাতিয়া যেন আরও কুঁকড়ে গেল নিজের মধ্যে।

"শহরে তো অনেক কাজই জুটিয়ে নিতে পারেন"—বলল আলেক্সি ঃ "কোনো একটা পানশালা-টানশালায় গিয়ে নাচগান করতে পারেন। কিংবা কারো রক্ষিতা হয়েও থাকতে পারেন। ইচ্ছে করলে অফিসে ঢুকে টাইপিস্টের কাজও করতে পারেন। যা হোক একটা হিল্লে হয়ে যাবেই আপনার।"

কাতিয়ার মাথা নিচু হয়ে গেছে। ও বুঝতে পারছে আলেক্সি ওর দিকে

তাকিয়ে আছে, তাই মাথা তুলতে পারছে না, পাছে চোখাচোখি হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় আলেক্সি কেন অমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর মাথার দিকে। মিশকাও তাই করেছিল। ক্ষমা করা বা মিষ্টি কথা বলার সময় এখন নয়। কাতিয়া যখন ওদের পক্ষে যোগ দেয়নি তখন সে ওদের শত্রু। জানতে চেয়েছিল কেমন করে ও বাঁচবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিল এমন একজন সৈনিককে যে বিজয়ের উন্মাদনা নিয়ে সবে ফিরেছে লড়াইয়ের ময়দান থেকে, ঘোড়ার জিনের উষ্ণ উত্তাপ এখনো যার সর্বাঙ্গে......কেমন করে ও বাঁচবে! প্রশ্নটা এখন কাতিয়ার নিজের কানেই অর্থহীন ঠেকছে। বরং ও যদি জিজ্ঞেস করত কার সঙ্গে থাকবে ও, স্তেপের বুকে কোন্ গাড়িটার পিছু পিছু ও চলবে কোন্ মুক্তির সন্ধানে, তাহলে নিশ্চয় মিলত সাড়া, আন্তরিকতার ঔজ্জ্বল্যে চক্‌চক্ করে উঠতো লোকটির চোখ।......

কাতিয়া এ সবই বোঝে, তাই বুনো জন্তুর মতো ছটফট করতে থাকে। এতদিনে এই প্রথম সে একবার চেষ্টা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের।

"আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, আলেক্সি ইভানোভিচ। শুকনো মরা পাতার মতো যে আমি সারা দেশটা ঘুরে বেড়িয়েছি এ আমার নিজের দোষে নয়। কী ভালবাসব? কী নিয়ে থাকব?—কেউ তো আমায় তা শেখায়নি; তাই আমার কাছেও এ সব জিনিস আশা করবেন না। আগে আমায় শিখিয়ে দিন।" (আলেক্সি এবার হাতবোমাগুলো নাড়াচাড়া করা বন্ধ করেছে, তার মানে সে এখন কান খাড়া করে শুনছে) "আমি চাইনি, তবু ভাদিম পেত্রোভিচ যোগ দিয়েছিলেন শ্বেতরক্ষী ফৌজে। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে উনি যান। উনিই বরং আমায় গালাগাল করতেন আমার মনে ঘৃণা নেই বলে।......সবই বুঝতে পারি, আলেক্সি ইভানোভিচ, সবই দেখতে পাই। কিন্তু আমি তো...নির্লিপ্ত দর্শক মাত্র। বড়ো অসহ্য মনে হয়। আসলে এটিই আমার বড়ো সমস্যা। সেইজন্যই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কী করব, কেমন করে বাঁচব..."

কথা বন্ধ করে এবার সে আলেক্সি ইভানোভিচের দিকে পূর্ণ নিঃসংকোচ দৃষ্টিতে তাকায়। আলেক্সি চোখ পিট্‌পিট্ করে। ওর মুখের ভাবটা এখন একটু অপ্রস্তুত বোকা-বোকা ধরনের। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে সে। মাথার পেছনে হাতটা ওর আপনা থেকেই উঠে যায়, ভাবখানা যেন চুলকোতে যাচ্ছে। নাকটা একটু কুঁচকে নিয়ে বলল :

"আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা রীতিমত নাটকই। তবে আমাদের কাছে এসব জিনিস সহজ সরল। বাড়ির উঠোনে একটি জার্মানকে খুন করে ফেলেছিল আমার ভাই, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে দিল বাড়িটা......আমরা তাই চলে এলাম। কোথায় এলাম জানেন? আতামানের কাছে। কিন্তু আপনি তো ভদ্রঘরের মেয়ে...হ্যাঁ, তা আপনার পক্ষে কঠিন বই কি!..."

কাতিয়ার কৌশলে কাজ হয়েছে তাহলে। এদিকে যে-হতচ্ছাড়া সমস্যাটার সমাধান করা এই মুহূর্তেই দরকার বলে আলেক্সি ইভানোভিচের মনে হচ্ছে তা

হল : কাতিয়ার নেই ঘোড়া, নেই জমি—অথচ এই রকম হা-ঘরে একজন মানুষ তাহলে কার অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করবে?

কিন্তু কাতিয়ার মনে হয়, এইভাবে চেরিগাছের তলায় ওয়াট্‌ল্‌-বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করাটা বোকামির কাজ। এর চেয়ে ও বরং কালো চেরিফলের দুটো গুচ্ছ তুলে নিয়ে ঝুম্‌কোর মতো কানে পরিয়ে নিলে পারে। কিন্তু ও তা পারল না, ক্লাসিলনিকভের সামনে ঠায় দাঁড়িয়েই রইল। নীল আকাশের নিচে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা ওর বড়ো-বড়ো চোখদুটো যেন কৌতুকে ঝলমল করে উঠল।

"আপনাদের শহুরে লোকদের যদি আমাদের মতো চাষীদের ঘরে বসে খাওয়াতে হয়, তাহলে তো আপনাদেরও উচিত আমাদের মদত দেওয়া।"—অটল ভঙ্গিতে সজোরে উচ্চারণ করে করে কথাগুলো বলল আলেক্সি : "আমরা চাষীরা লড়ছি জার্মানদের বিরুদ্ধে; আমরা চাই স্বাধীন গ্রাম-সোবিয়েত। আমার কথাটা বুঝলেন তো?"

একদিকে মাথা ঝোঁকালো কাতিয়া। আলেক্সি যখন কথা বলে চলেছে, সেই ফাঁকে ও পায়ের ডগায় ভর করে উঁচু হয়ে বাঁ হাত দিয়ে দুটো চেরিফল পেড়ে নিল—ডান হাতটা তুলতে পারেনি কারণ ডান-বগলের নিচে জামার হাতাটা ছেঁড়া। ফলদুটোর একটাকে সে চালান করে দিল মুখের মধ্যে, আরেকটার বোঁটা ধরে ঘুরোতে লাগল।

"আমি যদি গাঁয়ের মেয়ে হতাম, তাহলে কিন্তু সহজ হয়ে যেত সবটা।"—মুখ থেকে আঁটি বের করে দিতে দিতে বলল কাতিয়া : "দেশের মাটি, রাশিয়া, জনসাধারণ—এ সব কথা আমি শুনেছি তো কতোবার, কিন্তু এগুলোর মানে যে কী তা কোনোদিন নিজে খোঁজ-খবর করে দেখিনি।" অন্য চেরিটা মুখের মধ্যে ফেলে সে আলেক্সি ইভানোভিচকে লক্ষ্য করতে লাগল—দেখল সূর্যের আলোয় সোনালি হয়ে উঠেছে ওর দাড়ি, জ্যাকেটটা বুকের কাছে খোলা, শক্ত সবল দুটো পা। হাতিয়ারগুলোও কম সাংঘাতিক নয়।

আলেক্সি ক্রমেই যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ছে। কাতিয়ার কথার প্রতিধ্বনি করে বলল : "জনসাধারণ, হ্যাঁ, জনসাধারণের মধ্যে অবিশ্যি খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়, তা হলেও আমাদের নিজস্ব যা আছে তা আমরা ছাড়তেও রাজি নই।" ওয়াট্‌ল্‌-বেড়ার একটা খুঁটি শক্ত করে চেপে ধরল সে,—কতখানি মজবুত তাই দেখছিল ঝাঁকুনি দিয়ে। "যদি সারা দুনিয়ার সঙ্গেও লড়তে হয় তবু আমরা লড়ব হন্যে হয়ে। আমাদের অ্যানার্কিস্ট বন্ধুদের কথাবার্তা যদি শুনতেন তা হলে সব বুঝতে পারতেন। আমি আর কী বলতে পারি?—ওরা এসব জিনিস বুঝিয়ে বলতে ওস্তাদ।......তবে......" (ভুরু কুঁচকে ও একবার কাতিয়াকে খুঁটিয়ে দেখে নেয়) "লোকগুলো বড়ো বদ, পাঁড় মাতাল, নেশাখোর...ওরা যেন আপনার ওপর নজর না দেয় সেটি দেখবেন......"

"বাজে বকছেন।" বলল কাতিয়া।

"বাজে মানে?"

"মানে আমি তো আর কচি খুকি নই; আমার কাছ থেকে ও ভাবে কেউ পার পাবে না।......"

"শুনে খুশি হলাম..."

কাতিয়ার ঠোঁট কেঁপে উঠল—হেসে আবার সে হাতখানা বাড়িয়ে দিল চেরিফল-বোঝাই একটা ডালের দিকে। উষ্ণ রোদ ওর সর্বাঙ্গে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, ভেদ করে যাচ্ছে ওর সমস্ত দেহ। এও যেন এক স্বপ্ন-জাগর।

"কিন্তু তা হলেও, এখানে বসে আমি কী করতে পারি আলেক্সি ইভানোভিচ?"—ফের জিজ্ঞেস করল কাতিয়া।

"বেশ তো, পড়াশুনার কাজ করুন।...বুড়ো কত্তা তো রাজনৈতিক বিভাগ খুলছেনই একটা। উনি নাকি এবার নিজস্ব একটা খবরের কাগজ বের করবেন।"

"আর আপনি?"

"আ—মি? (আবার আলেক্সি মন দিল খুঁটিটার দিকে, বেড়ায় ঝাঁকুনি দিল একবার) আমি হলাম লড়িয়ে লোক, মেশিনগান গাড়ির চালক। আমার জায়গা হল লড়াইয়ের ময়দানে।...আগে একবার চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিন একা-তেরিনা দ্‌মিত্রেভনা, চট্‌ করেই একটা কিছু ঠিকঠাক করে বসবেন না যেন। আমি আপনাকে মাত্রিয়োনার কাছে নিয়ে যাব—ও হল আমার ভাইয়ের বৌ। আপনি কিন্তু আমাদের পরিবারের সঙ্গেই থাকতে পারেন ইচ্ছে করলে..."

"মাখনো বলেছেন আজ সন্ধ্যেয় তাঁর নখ কেটে দিতে হবে।"

"কী বললেন?"

আলেক্সির হাতদুটো ছিটকে চলে গেল কোমরের কাছে, ওর নাকটা যেন তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছিল। "ওঁর নখ কাটবেন? তা আপনি কী জবাব দিলেন শুনি?"

"বললাম, আমি তো এখন বন্দী।"—কাতিয়ার গলার স্বর শান্ত।

"ভাল কথা। আপনাকে যদি ও ডেকে পাঠায় তো যাবেন, কিন্তু আমিও থাকবো সেখানে..."

ঠিক সেই সময় মোটা আলেকসান্দ্রা তার এপ্রনটা দোলাতে দোলাতে ছুটে বেরিয়ে এল কুঁড়েঘর থেকে।

"ওই যে ওরা এসে পড়ল! এসে পড়ল!"—চেঁচাতে চেঁচাতে সে ছুটল ফটকটা খুলবার জন্য।

দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল খুশিভরা গলায় চেঁচামেচি, বন্দুকের আওয়াজ, ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ শব্দ। মাখনো ফিরছে তার দলবলের আগে আগে। কাতিয়া আর আলেক্সি গিয়ে দাঁড়াল রাস্তায়। পথের ওপর জমেছে ধুলোর মেঘ। হাওয়া-কল দুটোর পাশ কাটিয়ে সহিস, তিনঘোড়াওলা গাড়ি, সবাই ডিঙিয়ে আসছে ঢিবিগুলো।

একেবারে সামনের ইউনিটটা এর মধ্যেই গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ছোট

ছেলেরা নাচানাচি করছে, মেয়েরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়াগুলোর গায়ে ঘাম ঝরছে, দু'পাশ ফুলে ফুলে উঠছে। মাখনোর লোকেরা সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল—মাথার টুপি পেছনে ঠেলে দিয়েছে ওরা, গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে অনেকে, সর্বাঙ্গ ঘাম আর ধুলোয় ভরা।

মাখনো তার ইরানী কার্পেট-ঢাকা গাড়িটায় চড়ে সামনে দিয়ে চলে গেল। গোলাবারুদের একটা বাক্সের ওপর বসে সে এপাশ-ওপাশ দুলছিল। ভেড়ার চামড়ার টুপিটা সে চেপে ধরেছে হাঁটুর ওপর। মুখটা ফ্যাকাশে আর আড়ষ্ট, শুকনো ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে।

মাখনোর পিছনের গাড়িটায় বসে আছে ছ'জন লোক—পরনে ছোট কোর্তা, ফেল্টের টুপি, স্ট্রয়ের তৈরি নৌকা-বিহারের টুপি মাথায়। দেখলেই মনে হয় এরা শহরের লোক। প্রত্যেকেরই লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল আর চোখে চশমা। এরা হল সব সদর-দপ্তর আর রাজনৈতিক বিভাগের অ্যানার্কিস্ট সদস্য।

॥ সাত ॥

শূন্য বাড়িতে একা-একাই পাঁচটা মাস কাটিয়ে দিল দাশা। ফ্রন্টে যাবার সময় ইভান ইলিয়িচ ওকে এক হাজার রুবল্‌ দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর কতদিন? ভাগ্যক্রমে এমনি সময়ে ওদের নিচের তলার ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে গেল—পিতার্সবুর্গের এক সরকারী কর্মচারী পরিবার নিয়ে ভেগে পড়লেন, তার বদলে ওই ফ্ল্যাটটিতে এলেন মাৎ নামে একজন বিদেশী করিৎকর্মা ভদ্রলোক। তিনি একধার থেকে কিনতে লাগলেন ছবি, আসবাবপত্র, এটা-সেটা যা হাতে পান তা-ই।

দাশা তার ডবল-বেডটা, কয়েকটা ছবি আর সেই সঙ্গে পোর্সিলিনের বাসন-পত্র কিছু বেচে দিল ভদ্রলোকের কাছে। স্মৃতিধন্য এইসব সামগ্রী কাছ-ছাড়া করতে কিন্তু এখন তার একটুও কষ্ট হল না। অতীতকে সে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে মন থেকে।

বিক্রির পয়সা থেকেই কোনোরকমে চালিয়ে গেল সে বসন্ত আর গ্রীষ্মের দিনগুলো। রোজই শহরটা একটু-একটু করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পিতার্সবুর্গ থেকে ট্রেনে মাত্র একঘণ্টার পথ পেরুলেই খাস লড়াইয়ের ময়দান—সেস্ত্রা নদীর ঠিক ওপারটায়। গভর্নমেণ্ট মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়েছে। শূন্য, ভাঙা জানলার ভেতর দিয়ে প্রাসাদগুলো যেন তাকিয়ে আছে নেভা নদীর জলের দিকে। রাস্তায় আলো জ্বলে না। বুর্জোয়াদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবার মতো যথেষ্ট আগ্রহ মিলিশিয়া-বাহিনীর আর নেই—বুর্জোয়ারা তো মোটের ওপর সাবাড় হয়ে যাবেই। সাংঘাতিক একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে আজকাল রাস্তাঘাটে। তারা জানলা দিয়ে ঘরে উঁকি মারে, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, দরজার হাতল ধরে টানাটানি করে। দরজায় এক-ডজন তালা-শেকল না মারলে তো সর্বনাশ! একটু পরে হয়তো শোনা যাবে চুপি-চুপি চলে বেড়াবার শব্দ, তারপরেই ঘরে এসে হাজির হবে অপরিচিত একদল লোক, চেঁচিয়ে বলবে : "হাত তোলো!" ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা ঘরের বাসিন্দাদের ওপর, বিদ্যুতের তার দিয়ে বাঁধবে ওদের, তারপর অবসর মতো বস্তাবন্দী করে টেনে নিয়ে যাবে মালপত্র।

শহরে কলেরা লেগেছিল। জাম-গাছে যখন জাম পাকার সময় তখন রোগটা যেন বিকট আকার ধারণ করল—রাস্তায় বাজারে যখন-তখন লোকে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করে। তার ওপর আবার নানা-রকমের কানাকানি গুজব আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। অবিশ্বাস্য ধরনের বিপদের আশঙ্কা করে সবাই। লাল ফৌজের সৈন্যেরা নাকি টুপির ফিতের ওপর পাঁচ-মুখো তারা-গুলো উলটো করে পরছে আজকাল—ওটা হল অ্যানার্কিস্টদের চিহ্ন। তার উপর আবার 'লেফটেন্যাণ্ট শ্মিট্' পুলের তালাবন্ধ উপাসনা-ঘরটার মধ্যে নাকি একটি 'সাদা মানুষ'কে প্রায়ই ঘুরতে দেখা যাচ্ছে,—এ ঘটনার মানে হল সমুদ্রের দিক থেকেই

বিপদের আশংকা। পুলের ওপর দাঁড়িয়ে লোকে কারখানার ঠাণ্ডা চিমনিগুলো আঙুল দিয়ে দেখায়—গোধূলি-রঞ্জিত আকাশের গায়ে সেগুলোকে মনে হয় যেন প্রেতের অংগুলি-ছায়া।

কারখানা সব বন্ধ হয়ে গেছে। মজুররা খাদ্য-সংগ্রহ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, অনেকে আবার গ্রামের দিকেও চলে গেছে। ফুটপাতের পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছে সবুজ ঘাসের শীষ।

রোজ-রোজ দাশা ঘর ছেড়ে বেরোয় না, বেরুলেও সে সকালের দিকেই বাজারটা ঘুরে আসে। ফিন্-গুলোর চোখের পর্দা নেই, এক বস্তা আলুর বদলে দুটো পাতলুন চেয়ে বসে। বাজারগুলোতে আজকাল লালফৌজের লোকের আনাগোনাটা বেড়ে গেছে, ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে ওরা বুর্জোয়া ব্যবস্থার এই শেষ উচ্ছিষ্টগুলোকে খেদিয়ে বেড়ায়—আলুর বস্তাওয়ালা ফিন্ আর খদ্দের ভদ্রমহিলাদের ওরা তাড়িয়ে বের করে দেয় বাজার থেকে। ভদ্রমহিলাদের হাতের পুঁটলির মধ্যে থাকে পুরুষদের পোশাক আর জানলার পর্দা। খাবার জোগাড় করাটা যেন দিনের পর দিন কঠিনই হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় মাঝে মাঝে ওই মাৎ নামে ভদ্রলোকটিই একটু যা সুরাহা করে দেন। পুরনো তৈজসপত্রের বদলে যখন-তখন ওঁর কাছ থেকে টিনের খাবার, চিনি ইত্যাদি জোগাড় করে নেয়া যায়।

ঝামেলার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দাশা যথাসম্ভব কম খাওয়া-দাওয়া করে। রোজ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে সে। হাতের কাছে সুতো থাকলে একটু সেলাই-টেলাইয়ের কাজ করে, আর নয়তো উনিশ শো তের-চোদ্দ সালের লেখা বই খুলে বসে—অর্থাৎ মন থেকে ভাবনা দূর করার জন্য যা-হোক একটা কিছু পেলেই হল। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই ও জানলার কাছে বসে বসে ভাবে—ভাবে মানে চিন্তার সূত্রটাকে ছেড়ে দেয় একটা কালো বিন্দুর চারদিকে ঘুরপাক খাবার জন্য। ইদানীং-কালে যে মানসিক বিপর্যয়, নৈরাশ্য আর যন্ত্রণা ও ভোগ করেছে, এখন মনে হয় বুঝি-বা ওর মস্তিষ্কেরই কোনো অসাড় পিণ্ড সেগুলো, অসুস্থতার উপসর্গবিশেষ। ও এত রোগা হয়ে গেছে আজকাল যে মনে হয় ষোলো বছরের একটি মেয়ে। ওর নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি আবার কিশোরী হয়ে গেছে সে, কিন্তু কিশোরী-সুলভ সেই উচ্ছল চঞ্চলতা আজ কোথায়?

গরমকালটাও কেটে যাচ্ছে। 'নিশীথ-সূর্য' ক্রমে দক্ষিণায়নে চলে যায়, ক্রনস্টাড্টের ওপারে অস্তাচলের লালিমা ক্রমেই মলিন হয়ে আসতে থাকে। পাঁচ-তলার ঘরের খোলা জানলা থেকে অনেকখানি জায়গা নজরে পড়ে—পরিত্যক্ত রাস্তা-গুলোর ওপর রাত্রির ছায়া নেমে আসছে, বাড়িগুলোর জানলা সব অন্ধকার। আলোর চিহ্নও নেই কোথাও। ক্বচিৎ শুনতে পাওয়া যায় পথচারীর পায়ের আওয়াজ।

এর পরে কী আছে কপালে?—দাশা ভেবেই পায় না—এ পংগু অবস্থা কবে ঘুচবে? শিগগীরই আসছে শরৎকাল, বৃষ্টি সংগে নিয়ে—বাড়ির ছাদে ছাদে আবার ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া সগর্জনে মাথা কুটবে। ঘরে জ্বালানি কাঠ নেই। গরম কোটখানাও বেচে দিয়েছে দাশা। হয়তো বা ইভান ইলিয়িচ ফিরে আসবে আবার।...

কিন্তু ফিরে এলেই বা কী! সেই একই যাতনার পুনরাবৃত্তি, বাতির সেই ঘোলাটে লাল আলো, সেই অর্থহীন জীবন।

উঃ, এ পঙ্গু অবস্থাটাকে কি কোনো শক্তি দিয়েই কাটিয়ে ওঠা যায় না! জ্যান্ত কবরখানার মতো এই বাড়িটা থেকে কি কোনোরকমেই মুক্তি পাওয়া যায় না! মরণোন্মুখ এই শহরটা থেকে পালিয়ে যাবার কি কোনো উপায়ই নেই! তা হলে হয়তো নতুন কিছুর স্বাদ পেতে পারতো সে।......সারা বছরের মধ্যে এই প্রথম দাশা "নতুন কিছুর" কথা ভাবতে পেরেছে! চিন্তার মধ্যে আজ নিজের নাগাল পেয়ে বিচলিত আর উত্তেজিত হয়ে ওঠে দাশা—দুঃখক্লিষ্ট নৈরাশ্যের কালো পর্দা ভেদ করে যেন হঠাৎ আলোকোদ্ভাসিত কোন্ এক দিগন্তের ইশারা জাগে ওর মনে, ভল্গার স্টীমারে বেড়াতে বেড়াতে ঠিক এমনি এক স্বপ্নের আবেশেই ও একদিন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

ইভান ইলিয়িচের কথা ভেবে এখন দাশার দুঃখ হয়। নতুন এক দরদের চোখে ও এখন ইভানকে দেখে, ভাইয়ের ওপর বোনের যে দরদ সেই চোখে। মমতাসিক্ত হয়ে ওঠে দাশার অন্তর যখন ও ভাবে ইভানের সেই অক্লান্ত যত্নের কথা, তার সংযত, নিরীহ সৎ প্রকৃতির কথা।

একদিন বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে ও খুঁজে-খুঁজে বের করল বেসনভের কবিতার তিনটি খণ্ড—যে-স্মৃতি সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গেছে তারই কয়েকটি পাতাকে যেন বুকে ধরে আছে এই তিন খণ্ড সাদা বই। অন্ধকার নেমে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশে যখন জানলার পাশ দিয়ে তীরের মতো উড়ে চলে যায় এক-ঝাঁক সোয়ালো পাখি, ঠিক তেমনি সময়ে বসে কবিতাগুলো পড়ল দাশা। ওগুলোর প্রতি ছত্রে যেন দাশারই মর্মবেদনা, ওরই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব ভাষা পেয়েছে, ওর কবরের ওপর একদিন যে কালো হাওয়া শিস্ কেটে বয়ে যাবে তারই কথা লেখা আছে ওতে।......অকূল ভাবনায় মগ্ন হয়ে দাশা কাঁদতে শুরু করে। পরদিন সকালে ও ন্যাপথালিন-দেয়া ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে টেনে বের করে ওর বিয়ের পোশাকটা। নতুন করে কাটছাঁট করতে শুরু করে। আগের দিনের মতো আজও এক ঝাঁক সোয়ালো পাখি উড়ে যাচ্ছে; আকাশে ম্লান সূর্য। নীরবতার মধ্যেই অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ, কোনো কিছু যেন ভেঙে ফেলা হচ্ছে এমনি আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে, তারপরেই যেন রাস্তার উপর হুড়মুড় করে ভারি জিনিস কিছু গড়িয়ে পড়ছে—গলি-টলির মধ্যে হয়তো কোনো কাঠের বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

দাশা অলস গতিতে সেলাই করে চলে। ওর আঙুল আজকাল এত রোগা হয়ে গেছে যে আঙুলস্তান্টা অবধি খসে পড়ছে নখ থেকে। একবার তো ছিটকে প্রায় জানলা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল আর কি। ওর মনে আছে এই আঙুলস্তান্টা নখে পরিয়েই ও একদিন কাতিয়ার ফ্ল্যাটের হলঘরটায় ট্রাঙ্কের ওপর বসে রুটি-মার্মালেড খাচ্ছিল। সে হল উনিশ-শো-চোদ্দ সালের ঘটনা। কাতিয়া তখন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে প্যারিস্ রওনা হচ্ছে। ওর মাথায় একটা খুদে টুপি,

তাতে বসানো আছে ছোট্ট একটি পালক তার করুণ স্বকীয়তাটুকু বজায় রেখে। দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়েই কাতিয়া একবার ঘুরে দাঁড়াল দাশার কথা ভেবে—দেখল দাশা বসে আছে ট্রাঙ্কটার ওপর। "আমার সঙ্গে চল্ না দাশা..." কিন্তু ও গেল না দিদির সঙ্গে। আর এখন......প্যারিসে যাবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি সে? প্যারিসকে দাশা জেনেছে কাতিয়ার চিঠির মারফত : সুগন্ধির কৌটোর মতো নীল, রেশমী আর সৌরভস্নিগ্ধ সে শহর।......সেলাই করতে করতে অজ্ঞাতসারেই দাশার আবেগকম্পিত বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। রাশিয়া ছাড়বে ও! কিন্তু ট্রেন নাকি পাওয়া যায় না, কাউকে নাকি বিদেশে যেতে দেওয়া হয় না।...হয়তো বা পায়ে হেঁটে চেষ্টা করা যায়, ন্যাপস্যাক কাঁধে ফেলে, বনবাদাড় মাঠঘাট পাহাড়-নদী ডিঙিয়ে একটার পর একটা দেশ পার হয়ে অবশেষে হয়তো গিয়ে পৌঁছনো যায় যেই মনোরম স্বর্গপুরীতে।...চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে দাশার। কী বোকার মতো ভাবছে সে!...যুদ্ধ যে আজ সব জায়গায়! প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কামান থেকে জার্মানরা গোলা ফেলছে প্যারিসের ওপর। স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন। একজন মানুষ নিরুপদ্রব সুখী জীবন নিয়ে থাকবে, তাতে বাধা দেওয়াটা কি উচিত? দাশা তাদের কোন্ ক্ষতিটা করেছে? আঙুলস্তান্‌টা আবার গড়িয়ে যায় আরাম-কেদারার নিচে, ওর চোখের জলে ঝিকমিকিয়ে ওঠে রোদ, সোয়ালোগুলো নিচু হয়ে উড়ে যায় করুণভাবে ডাকতে ডাকতে : ওরা তো ভালই আছে, সামান্য কিছু পোকা-মাকড় আর মশা হলেই ওদের চলে।......'যাব আমি—নিশ্চয় যাব!' ফুঁপিয়ে ওঠে দাশা।

ঠিক এমন সময় দরজার ওপর কে যেন পর পর অনেকগুলো ঘা মারে—যেন কোনো জরুরি তাগিদে। জানলার কাঠের ওপর সুঁচ-সুতো রেখে দাশা সেলাইয়ের কাপড়টা দলা পাকিয়ে তা দিয়ে চোখ মোছে, তারপর আরামকেদারার ওপর সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কে ধাক্কা দিচ্ছে দেখবার জন্য...

"দারিয়া দ্মিত্রেভনা তেলেগিন কি এখানে থাকেন?"

জবাব না দিয়ে দাশা কুলুপের ফুটোয় উঁকি মারে। ওদিক থেকেও তখন কে যেন ঝুঁকে পড়েছে উঁকি দেবার জন্য; সতর্ক কণ্ঠে কুলুপের ফুটো দিয়ে বলল সে : "তার নামে রস্তভ্ থেকে একটা চিঠি এনেছি...।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলে দাশা। একজন অপরিচিত লোক, ভাঁজ-পড়া সৈনিকের জোব্বাকোট গায়ে, মাথায় জীর্ণ চুড়ো-টুপি। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে আসে লোকটি। ভয় পেয়ে দাশা পিছিয়ে যায় হাত দুটো সামনে ছড়িয়ে। আগন্তুক তাড়াতাড়ি বলে :

"ভগবানের দোহাই...সত্যি করে বল তো দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তুমি আমায় চিনতে পারছ না?"

"না তো......"

"আমি হচ্ছি কুলিচক্, নিকানর য়ুরেভিচ্ কুলিচক্...ব্যারিস্টার সেম্যোরেৎস্কের কথা ভুলে গেছ তুমি?"

দাশা হাত দুটো নামিয়ে লোকটির রোগা, দাড়ি-গজানো, টিকলো-নাকওয়ালা মুখটার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে। সতর্ক চঞ্চল চোখদুটো ঘিরে অনেক-গুলো ভাঁজ পড়েছে চামড়ার,—তার মানে সাবধানে থাকাই অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে লোকটির। বাঁকা ঠোঁটদুটোর মধ্যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। বিপদের সন্ধান-পাওয়া বন্যজন্তুর মতো চেহারা মানুষটার।

"তুমি নিশ্চয়ই ভোলোনি দারিয়া দ্মিত্রেভ্না।...আমি ছিলাম তোমার দিদির আগের স্বামী নিকোলাই ইভানোভিচ স্মোকভনিকভের সহকারী।...আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে...মনে পড়ে সে কথা?" হঠাৎ হাসল লোকটি, তার সেই হাসির মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল যুদ্ধের আগের সেইসব বিস্মৃত দিনগুলোর খানিকটা স্মৃতি, সঙ্গে সঙ্গে দাশার মনে পড়ে গেল সব কিছু: সেই ফ্ল্যাটবাড়ি, সমুদ্র-সৈকত, উষ্ণ তন্দ্রাতুর উপসাগরের বুকে সূর্যের আলোর সেই কুহেলি, ওর নিজের সেই হুল-ফোটানো স্বভাব, পোশাক-আশাকে বালিকাসুলভ রুচি, প্রেমমুগ্ধ কুলিচক্ যাকে ও উদ্ধত কুমারীত্বের অহঙ্কারে ঘৃণাই করত,—সবই মনে পড়ে গেল ওর।...সমুদ্রের বালিয়াড়িতে উঁচু-উঁচু পাইনগাছগুলো দিন-রাত সুগভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছড়াতো তাদের সৌগন্ধ্য...সে কথাও মনে পড়ে।

"অনেকখানি বদলে গেছেন আপনি", কুলিচকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল দাশা। কুশলী হাতে ওর হাতটা ধরে কুলিচক্ চুম্বন করল। সৈনিকের কোট গায়ে থাকা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল সে এত বছর অশ্বারোহী দলেই কাটিয়েছে।

"এবার অনুমতি দাও—চিঠিটা তোমার হাতে তুলে দি'। আমায় তুমি অনুমতি দিলে অন্য জায়গায় গিয়ে বুটটা খুলে ফেলি।...মাফ করবে, চিঠিটা আমার বুটের মধ্যেই রয়েছে, তাই বলছিলাম......"

অর্থপূর্ণভাবে এদিক-উদিক চেয়ে সে দাশার পিছন-পিছন একটা খালি ঘরের মধ্যে এল। মেঝের ওপর বসে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে কাদামাখা বুটটা খুলতে লেগে গেল।

চিঠিটা কাতিয়ার। এই চিঠিটাই সে রস্তভে থাকতে কর্নেল তেৎকিনের হাতে দিয়েছিল।

প্রথম লাইনটা পড়েই দাশা আর্তনাদ করে নিজের গলাটা চেপে ধরল। ভাদিম মারা গেছে! চিঠির ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নেয় ও। তারপর আবার উৎসুকভাবে গোড়া থেকে পড়তে শুরু করে। একটা চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পড়ে ও, যেন সম্বিত হারিয়েছে। কুলিচক্ দাঁড়িয়ে থাকে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখে।

"নিকানর য়ুরেভিচ, আমার দিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

"না, দারিয়া দ্মিত্রেভনা। যে-লোকটি আমার হাতে চিঠি দেয় সে বলেছিল একাতেরিনা দ্মিত্রেভনা নাকি তার মাসখানেক আগেই রস্তভ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন......"

"হা ভগবান্! এখন তাহলে ও আছে কোথায়? কী ব্যাপার হল?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমার খোঁজ নেবার সুযোগ হয়নি।"

"আপনি ওর স্বামীকে চিনতেন? ভাদিম রশ্চিন নাম? মারা গেছেন... কাতিয়া লিখেছে—উঃ কী সাংঘাতিক!"

হতবুদ্ধি হয়ে কুলিচক ভুরু উঁচিয়ে রইল। দাশার সরু-সরু আঙুলের মধ্যে চিঠিটা কাঁপছিল, তাই দেখে কুলিচক নিজের হাতে কাগজটা টেনে নিল। লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার—কাতিয়াকে তার স্বামীর মৃত্যুর খবরটা দিয়েছে ভ্যালোরিয়ান ওনোলি। একটা বাঁকা বিদ্রূপে কুঁচকে গেল কুলিচকের ঠোঁটের কিনারা।

"চিরকালই জানতাম ওনোলিটার পক্ষে কোনো নোংরা কাজই অসাধ্য নয়।... ওর কথা অনুসারে রশ্চিন মারা গেছেন মে মাসে, তাই না?...অথচ আমার মনে হচ্ছে যেন মে-মাসেরও অনেক পরে আমি তাঁকে দেখেছি।"

"কবে? কোথায়?"

এবার কিন্তু কুলিচক তার শিকারী বাজের মতো নাকটা হঠাৎ উঁচিয়ে প্রখর সন্ধানী-চোখে তাকিয়ে রইল দাশার মুখের দিকে। শুধু একটি সেকেণ্ডের ব্যাপার। কিন্তু তাতেই দাশার উত্তেজনাদীপ্ত চোখ আর পরস্পরলগ্ন ঠাণ্ডা আঙুলের ভাষা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে: ও যদি কোনো লালফৌজী অফিসারের বউও হয় তবু কখনো বেইমানি করবে না তার সঙ্গে। আরেকটু কাছে এগিয়ে গিয়ে ও জিজ্ঞেস করল: "কামরায় আর কেউ নেই তো?" ("না, না", দাশা দ্রুত ঘাড় নেড়ে জানায়) "দারিয়া দ্মিত্রেভনা, আমি তোমাকে এমন একটা কথা বলব যার ফলে হয়তো আমার প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে, তবে এই শর্তে..."

"আপনি কি দেনিকিনের অফিসারদের কেউ?"

"হ্যাঁ।"

দাশা আঙুল মটকাতে মটকাতে করুণ চোখে তাকিয়ে দেখল জানলার বাইরে যেখানে আকাশের নীল মিলিয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে......

"আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই আপনার......"

"আমি তা ভাল করেই জানি। আর দিনকয়েকের জন্য তোমার এখানে থাকবার অনুমতিও চাইছি।"

বেশ দৃঢ় গলায় বলল সে, যেন খানিকটা শাসানির সুরও আছে। দাশা মাথা নেড়ে বলল:

"বেশ তো।"

"তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক তাহলে অবশ্য...ভয় নেই বলছ?" (লাফিয়ে পিছনে সরে গেল সে) "ভয় পাওনি তুমি?" (আবার এগিয়ে এল সামনে) "বুঝতে পারছি বিলক্ষণ...তবে ভয়ের কিছু নেই...আমি খুব সাবধানেই থাকি...রাতে ছাড়া বাইরে বেরুই না। আমি যে পিতার্সবুর্গে আছি সে কথা কাকপক্ষীও জানে না..." (টুপির আস্তরের ভেতর থেকে একটা ফৌজী পরিচয়-পত্র টেনে বের করল সে)

"দেখছ তো? ইভান স্ভিশ্চেভ। লাল বাহিনীর লোক। একেবারে খাঁটি। আমি নিজের হাতেই বাগিয়েছি জিনিসটা।... তাহলে তুমি ভাদিম পেত্রোভিচের খবরটা জানতে চাও? আমার মনে হয় কোথাও কোনো গোলমাল পাকিয়ে গেছে..."

বলতে বলতে সে দাশার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে।

"তাহলে তুমি আমাদেরই দলে, দারিয়া দ্মিত্রেভনা! তোমায় অজস্র ধন্যবাদ। সমস্ত বুদ্ধিজীবী, সমস্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত অফিসার-শ্রেণী আজ ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর পবিত্র পতাকার নিচে জমায়েত হয়েছে। ভলাণ্টিয়ার বাহিনী হল বীরের বাহিনী।...দেখবে তুমি—রাশিয়া বাঁচবেই, রাশিয়ার শ্বেত হস্তই তাকে বাঁচাবে—ভোঁতা নোংরা হাতের থাবা থেকে! যথেষ্ট ভাবালুতা আমরা এর আগে দেখিয়েছি। মেহনতী মানুষ! এই তো ট্রেনের ছাদে বসে হাজার-হাজার মাইল ঘুরে এলাম। মেহনতী মানুষও দেখলাম। বুনো জানোয়ার সব, বুঝলে, বুনো জানোয়ার ওরা! তোমায় আমি বলে রাখলাম, আমরাই এই ক'টি মাত্র বীর যারা সত্যিকারের রাশিয়াকে বুকে ধরে রেখেছি। তাভ্রিচেস্কি প্রাসাদের ফটকে আমরা বেয়নেট দিয়ে ঝুলিয়ে দেব আমাদের হুকুমত-নামা।"

ঝড়ের মতো কথা বলে চলেছে দেখে দাশা একেবারে হতভম্ব। কুলিচক তার নোংরা নখওয়ালা আঙুলটা দিয়ে যেন শূন্যে খোঁচা মারছে, ঠোঁটের কোণে জমেছে গাঁজলা। রেলগাড়ির ছাদে বাধ্য হয়ে তাকে একটানা মুখ বুজে বসে থাকতে হয়েছিল বলেই বোধহয় এখন বক্বক্ করে তার শোধটা তুলে নিচ্ছে।

"দারিয়া দ্মিত্রেভনা, তোমার কাছে আমি ব্যাপারটা গোপন করতে চাই না।... আমাকে এখানে, মানে এই উত্তর এলাকায় পাঠানো হয়েছে খোঁজখবর নেয়া ও লোক-সংগ্রহ করার জন্য। অনেকেই রয়েছে যাদের মাথায় আমাদের বাহিনী সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।...তোমাদের খবরের কাগজগুলো আমাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকুই লেখে যে আমরা হলাম শ্বেতরক্ষী ডাকাতের দল, আমরা নাকি মুষ্টিমেয় একদল লোক যাদের ওরা আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেবে।...অফিসাররা যে আমাদের দলে আসতে ভয় পাবে এতে আর আশ্চর্য কি!...কিন্তু সে যাই হোক, দন আর কুবানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কিছু জানা আছে তোমার? দন আতামানের ফৌজটা তো দিনের দিন বেড়েই চলেছে। ভরোনেঝ প্রদেশও পরিষ্কার—লালগুলো ভেগেছে। শিগগীরই স্তাভ্রোপলের পতন হবে। রোজই আমরা অপেক্ষা করছি ক্রাস্নভের জন্য—কখন উনি ভলগায় এসে জারিৎসিন দখল করেন।...জার্মানদের সঙ্গে উনি সমঝোতা করেছেন, সে অবশ্য সত্যি, কিন্তু ও নিতান্তই সাময়িক।...আমরা, দেনিকিনের লোকেরা, যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলেছি কুবানের দক্ষিণে। তরগোভায়া দখল করেছি, তিখরেৎস্কায়া, ভেলিকক্নিয়াঝেস্কায়াও দখল করেছি। সরোকিনকে তো একেবারে ছাতু করে দিয়েছি। গ্রামে গ্রামে ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর কী সম্বর্ধনা! বেলায়া গ্লিনায় রীতিমত খুনের বন্যা বয়ে গেছে, মৃতদেহের সমুদ্র যেন, ওর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তোমার এই বান্দাটির তো কোমর অবধি রক্তে ডুবে গিয়েছিল।"

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দাশা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কুলিচক উপহাসের হাসি হাসে।

"ভেবেছ এই বুঝি শেষ? এ তো সবে আমাদের প্রতিশোধের শুরু! সারা দেশে আগুন জ্বলে যাবে না! সামারা, ওরেনবুর্গ, উফা, গোটা উরাল অঞ্চলটাই এখন জ্বলছে। চাষীদের মধ্যে যারা একটু বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে তারা নিজেরাই গড়ে তুলছে শ্বেত ফৌজ। মধ্য ভলগার গোটা অঞ্চলটাই এখন চেকদের হাতে। সামারা থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত সারা দেশটা যেন এককাঠ্ঠা হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হতভাগা জার্মানগুলো না থাকলে এতদিনে লিট্ল্ রাশিয়াও খাড়া হয়ে উঠতো। উত্তর-ভলগা জেলার শহরগুলো তো বারুদের স্তূপ হয়ে আছে, একটু আগুনের ফুলকি পেলেই জ্বলে উঠবে দপ্ করে।...বলশেভিকদের আর একটি মাসও টিঁকতে দেয়া উচিত নয়, আমি হলে ওদের আর হাঁফ ছাড়বার সুযোগই দিতাম না।..."

উত্তেজনায় কাঁপছিল কুলিচক। ওকে আর এখন খুদে বুনো জন্তুর মতো দেখাচ্ছে না। ওর কাটা-কাটা নাকমুখের দিকে তাকিয়ে রইল দাশা, স্তেপ-প্রান্তরের হাওয়া লেগে পোক্ত হয়ে গেছে মুখখানা, লড়াইয়ের ময়দানে থেকে থেকে কঠিন হয়ে উঠেছে। দাশার নির্লেপ একাকীত্বের মধ্যে এবার যেন এক ঝলক উত্তপ্ত রক্তোচ্ছ্বসিত জীবনের সবল আবির্ভাব ঘটল। কপালের দুপাশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছিল দাশা, বুকটাও ভয়ানক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে। কুলিচক কথা বন্ধ করে যখন ছোট-ছোট দাঁতগুলো বের করে কাগজে তামাক জড়াতে শুরু করল, দাশা বলে উঠল:

"আপনারা নিশ্চয়ই জিতবেন। কিন্তু যুদ্ধ তো চিরকাল চলবে না...তখন কী হবে?"

"তখন?" নিঃশ্বাস নিয়ে সে চোখ দুটো ছোট-ছোট করে জবাব দিল: "তখন—জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ জিতে গেছি, শান্তি কংগ্রেস হচ্ছে, তাতে আমরা বিজয়ী বীরের মতো যোগ দিতে যাচ্ছি, আর তারপর—মিত্রশক্তির সমবেত শক্তি নিয়ে, সারা ইউরোপের শক্তি জড়ো করে রাশিয়ার পুনরুজ্জীবন, শৃঙ্খলা, আইনসঙ্গত আচরণ, পার্লামেণ্ট-পদ্ধতি আর স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন চলছে।...এ হল ভবিষ্যতের কথা...কিন্তু আপাতত..."

হঠাৎ কোটের নিচে বুকের ডান দিকটায় হাতড়াতে লাগল ও কিসের খোঁজে। সাবধানে কার্ডবোর্ডের একটা টুকরো বের করল, মাঝখানে দু'ভাঁজ-করা একটা সিগারেটের বাক্সের ঢাকনা। আঙুলের মধ্যে বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিল সেটা। আরেকবার দাশার মুখের দিকে কড়া নজরে তাকিয়ে বলল:

"কোনোরকম ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। বুঝতেই তো পারছ......এখানকার রাস্তাঘাটে যে-কোনো লোককে তল্লাশি করতে পারে।......আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই।"

কার্ডবোর্ডটার ভাঁজ খুলে একটা ছোট তেকোণা টুকরো বার করল সে, ভিজিটিং-কার্ড কেটে তৈরি করা হয়েছে জিনিসটা। উপরে লেখা রয়েছে দুটো

শব্দ : 'ও' আর 'কে'।......"একজায়গায় এটা লুকিয়ে রাখ দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা—পবিত্র জিনিস মনে করে এটাকে সাবধানে রাখা উচিত।......কি ভাবে এটা ব্যবহার করতে হবে তা তোমায় আমি শিখিয়ে দেব। মাফ করো আমায়—ভয় পাওনি তো?"

"না।"

"চমৎকার মেয়ে!"

প্রায় অজ্ঞাতসারেই, নিছক বাইরের একটা প্রবলতর ইচ্ছাশক্তির বশেই দাশা তথাকথিত "স্বদেশ ও স্বাধীনতা-রক্ষা সংঘ" নামে একটা সংঘের গুপ্ত চক্রান্তের জালের মধ্যে এসে পড়ল—দুটো রাজধানীতে এবং গ্রেট রাশিয়ার অন্যান্য অনেকগুলো শহরে এই সংঘ তখন ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াচ্ছিল।

দেনিকিনের সদর-দপ্তর থেকে গোপন কাজের ভারপ্রাপ্ত একজন চর হিসেবে কুলিচকের আচরণ কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত : মাত্র দু' একটি কথার পরই সে প্রায়-অপরিচিত একটি মহিলার কাছে এতগুলো কথা ফাঁস করে দিয়েছে; মহিলাটি আবার লালফৌজী অফিসারের স্ত্রী! কিন্তু একসময় কুলিচক যে দাশাকে ভালোবাসত! তাই একবার ওর ধুসর চোখদুটোর দিকে যখন কুলিচক তাকিয়ে রইল তখন আর অবিশ্বাস করার প্রশ্নই উঠল না, ওর চোখদুটোই যেন বলছিল : "আমায় বিশ্বাস করতে পারো!"

সে-সময় ধীরে-সুস্থে বিচার বিবেচনা করে মানুষ কাজকর্ম করতে পারত না, অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণাই তাকে পরিচালিত করত। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঘটনার স্রোত, উত্তাল মানব-সমুদ্র, প্রত্যেকেই মনে করছে ডুবন্ত জাহাজের সে-ই বুঝি কাণ্ডারী, তাই কাপ্তেন-বুরুজের সিঁড়িতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই হুকুম করছে রিভলবার ঘুরিয়ে—ডাইনে চলো! বাঁয়ে চলো! বন্দরে ভেড়ো! দরিয়ায় বাড়ো! সবই তখন ধোঁকা, রাশিয়ার সীমাহীন প্রান্তরে শ্বেতরক্ষীরা তখন আলেয়ার মতো নেচে বেড়াচ্ছে। ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠছে মানুষের মুখ। মরীচিকার ক্ষণিক ইশারায় ভুলছে তারা।

তাই তারা মনে করছে বলশেভিকরা বুঝি এখনই উৎখাত হয়ে যাবে—এর আর কোনো নড়চড় নেই; পৃথিবীর চার কোণ থেকে বৈদেশিক 'হস্তক্ষেপকারী'দের সৈন্যসামন্ত বুঝি এর মধ্যেই ছুটে এল শ্বেতবাহিনীকে মদত দিতে! রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ চাষী হয়তো 'সংবিধানী পরিষদের' জন্য আকুল হয়ে উঠেছে; অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের শহরগুলো এই বুঝি অপেক্ষা করছে শুধু একটুখানি ইঙ্গিতের অপেক্ষায়, তারপরেই তারা চুরমার করে দেবে সোবিয়েত-শক্তিকে, আবার পরের দিনই নতুন করে কায়েম করবে শৃঙ্খলা, সংবিধানী আইন!

সবাই দেখত এই স্বপ্ন : সমাজচারিণী মহিলারা যাঁরা পিতার্সবুর্গ থেকে দক্ষিণে পালাবার সময় একটিবার মাত্র অন্তর্বাস বদলাতেন কিংবা অধ্যাপক মিলিয়ুকভের মতো সর্বজ্ঞানী লোক যিনি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে বর্তমানের ঘটনাবলীকে যথাস্থানে সযত্নে নিক্ষেপ করে সব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে লক্ষ্য

করছিলেন ঘটনার অনিবার্য পরিণতি, এঁরা সবাই ভুলেছিলেন সেই মরীচিকার হাতছানিতে।

সান্ত্বনার এই মৃগতৃষ্ণিকায় যাদের দৃঢ় আস্থা, তাদের মধ্যে ছিল তথাকথিত "স্বদেশ ও স্বাধীনতা-রক্ষা সংঘের" লোকেরা। এই দলটাকে খাড়া করেছিলেন বোরিস সাভিনকভ, ১৯১৮ সালের বসন্তকালে আতামান কালেদিনের আত্মহত্যার ঠিক পরে পরেই,—রস্তভ থেকে যখন কর্নিলভের সৈন্যদের হটিয়ে নেয়া হয় সেই সময়। 'সংঘটা' ছিল আসলে ভলান্টিয়ার বাহিনীরই একটা গোপন সংগঠন গোছের।

সংঘের কর্তা ছিলেন সুচতুর সাভিনকভ, নিপুণ ছদ্মবেশে তিনি মস্কোর রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন রং-করা গোঁফ লাগিয়ে, ইংরেজদের মতো শুটিং-জ্যাকেট, বাদামী চামড়ার পটি আর খাকি-কোট পরে। 'সংঘ'কে হুবহু সামরিক কায়দায় গড়ে তোলা হয়েছিল : স্টাফ, ডিভিশন, ব্রিগেড, রেজিমেণ্ট, পাল্টা-গুপ্তচর, এবং আরো নানা রকম পদের ইউনিটে। অধ্যক্ষ পরিষদের কাজের ভার ছিল কর্ণেল পের্‌খুরভের হাতে।

সংঘের সদস্য সংগ্রহের কাজ চলত অত্যন্ত সংগোপনে। একজন সদস্য চারজনের বেশি সদস্যকে চিনতে পারত না, ফলে কোনোরকম বিপদ ঘটলে একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি লোক ধরা পড়ত না, অতিরিক্ত আর কাউকে ধরার কোনো সূত্রও পাওয়া যেত না। সদরদপ্তরের ঠিকানা আর নেতাদের নাম সম্পর্কে চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। যে-কেউ সদস্যপদের প্রার্থী হলে তার বাড়িতে এসে হাজির হত রেজিমেণ্ট বা ডিভিশনের কম্যান্ডার, নানা রকম প্রশ্ন করত তারা, কিছু টাকা পয়সাও দিত, তারপর তার ঠিকানাটা সাংকেতিক ভাষায় টুকে রাখত কার্ডে। এই সব কার্ড আবার সপ্তাহান্তে একবার করে সদর দপ্তরে পৌঁছত—তখন সেগুলোর গায়ে সদস্য-সংখ্যা ও তাদের ঠিকানা-জ্ঞাপক অনেকগুলো বৃত্তচিহ্ন থাকত। সংঘ-ফৌজের তদারকীর কাজ চলত বুলভারগুলোতে—বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা হয়তো বিশেষ ধরনে কোটের বোতাম আটকে আসত, কিংবা পূর্বনির্দিষ্ট কোনো বিশেষ জায়গায় রিবন লাগিয়ে আসত। যারা গুপ্তচরের কাজ করত তাদের দেয়া হত ভিজিটিংকার্ড কেটে বের-করা একটি তিনকোণা টুকরো, তাতে দুটি অক্ষরে লেখা থাকত সংকেতবাক্য আর শহরের ঠিকানা। পরিচয়-চিহ্ন হাজির করার সময় সেই তিনকোণা টুকরোটাকে ফের ভিজিটিং কার্ডটার সঙ্গে জুড়ে দেখা হত খাপ খায় কিনা। গুপ্তচরবৃত্তির জালটা কিন্তু সংঘ বেশ ভালোরকমই ছাড়িয়ে বসেছিল। এপ্রিল মাসে তাদের যে গোপন বৈঠক হয় তাতে তারা ধ্বংসমূলক কাজ বন্ধ করে সোবিয়েতের বিভিন্ন কর্মবিভাগে ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এইভাবে সংঘের সদস্যরা চুপিচুপি রাষ্ট্রযন্ত্রের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়ে দখল জমায়। কেউ কেউ মস্কো মিলিশিয়াতেও ঢোকে। তাদের নিজস্ব দালাল ক্রেমলিনের মধ্যে পর্যন্ত ছিল। উচ্চতর সামরিক সংস্থা, এমন-কি উচ্চতম সামরিক পরিষদের মধ্যেও তারা মাথা গলিয়েছিল। ক্রেমলিন বোধহয় ওদের ফাঁদের মধ্যে ভালমতোই জড়িয়ে পড়েছিল।

ফিল্ড মার্শাল আইখ্‌হর্ণের জার্মান ফৌজ তখন নির্ঘাৎ মস্কো দখল করে

নেবে বলেই মনে হচ্ছিল। সংঘের মধ্যে অবশ্য এমন জার্মান-প্রেমিকের সংখ্যা বড় কম ছিল না যারা জার্মান সঙ্গীনের অমিতপরাক্রম ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভরসাই করত না, কিন্তু তবু সাধারণ ঝোঁকটা ছিল 'মিত্রশক্তির' পক্ষেই। জার্মানরা কবে মস্কোতে প্রবেশ করবে সে তারিখটা অবধি ঠিক হয়ে গিয়েছিল—পনেরোই জুন। সংঘ তাই ক্রেমলিন ও মস্কো দখলে রাখার বাসনাটা ছেড়ে দিয়ে তার সামরিক ইউনিট হটিয়ে কাজানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করল। ঠিক হল যাবার সময় তারা মস্কোর আশেপাশে সেতু ও জলাধার উড়িয়ে দেবে; নিঝ্নি, কস্ত্রোমা, রীবিন্স্ক্ ও মুরোমে বিদ্রোহ ঘটাবে; চেকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা প্রাচ্য রণাঙ্গনও খুলবে যাতে উরাল অঞ্চল ও ভলগার সম্পদশালী এলাকাগুলো থেকে রসদের জোগান আসে।

কুলিচক দাশাকে যা-যা বলেছিল তার প্রত্যেকটি কথা ও বিশ্বাস করেছে : রুশ দেশপ্রেমিকরা অর্থাৎ কুলিচকের ভাষায় 'পবিত্র-আত্মার বীর-যোদ্ধারা' লড়াই করছে কেন? না, যাতে ঐ আলুওয়ালা ফিনগুলোর ধাষ্টামো আর সইতে না হয়, পিতার্সবুর্গের রাস্তায় রাস্তায় যাতে আবার উজ্জ্বল আলো জ্বলে ওঠে, কাতারে কাতারে প্রমোদবিলাসী ভদ্রবেশী মানুষ যাতে আবার ভিড় জমাতে পারে, যাতে মনে ক্ষণিকের বৈরাগ্য এলেই মানুষ পালক-গোঁজা টুপিটা মাথায় বসিয়ে প্যারিস্ রওনা হতে পারে......সামার পার্কে যাতে আর কোনোদিন 'লাফানে' গুণ্ডার উপদ্রব না ঘটে, দাশার মৃত সন্তানের কবরের ওপর যাতে বাতাসের গোঙানি আর শুনতে না হয়।

এক কাপ চা খেতে খেতে কুলিচক এত সব আশার কথা শুনিয়ে দিল দাশাকে। খিদেয় নেকড়ের মতো হন্যে হয়ে উঠেছিল সে, দাশার জমিয়ে-রাখা টিনের খাবার সে অর্ধেকই উড়িয়ে দিল; এমন-কি নুন দিয়ে শুধু-শুধু কাঁচা ময়দাও খেয়ে ফেলল খানিক। তারপর সন্ধ্যে নাগাদ চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল বাইরে, সঙ্গে নিয়ে গেল দরজার চাবি।......

দাশা শুয়ে পড়েছে। জানলার ওপর পর্দাটা টেনে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু ক্লান্তিকর নিদ্রাহীনতার মধ্যে অনেকক্ষণ সময় কাটালে যেমনটি হয়ে থাকে : নানা চিন্তা, এটা-ওটা কল্পনা, কতো স্মৃতি, হঠাৎ কিছুর আবিষ্কার, কিংবা তীব্র অনুশোচনা, সব যেন একের পর এক পাগলের মতো ভিড় করে আসতে থাকে ওর মনে।......দাশা খালি ছটফট করছে, পাশ ফিরছে, বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কখনো চিৎ হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে শুচ্ছে।......কম্বলটা যেন গায়ে বিঁধছে, গদির স্প্রিংগুলো যেন দুপাশ থেকে চেপে ধরছে ওকে, বিছানার চাদর যেন খসে পড়ছে হরদম......

এমন বিশ্রী রাতটা—যেন কাটতেই চায় না। দাশার মনের সেই অন্ধকার ছায়াটা আবার বুঝি প্রাণ পেয়েছে, মস্তিষ্কের কন্দরে কন্দরে তার বিষাক্ত শিকড় চালিয়ে দিচ্ছে আবার। কিন্তু কেন বিবেকের এই দংশন, কেন এই ভয়াবহ অপরাধের অনুভূতি? ভেবে যে থই পায় না সে!

অনেকক্ষণ বাদে, দিনের আলো যখন জানলার পর্দায় নীলাভ হয়ে ফুটে

উঠেছে, দাশা তখন দুশ্চিন্তার এই উদ্ভট গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে অবসন্ন হয়ে পড়ে, দুর্বল হয়ে অবশেষে ধীরমস্তিষ্কে যথাসম্ভব সততা আর সরলতা দিয়ে যাচাই করতে থাকে নিজেকে—বুঝতে পারে যে ওর আগাগোড়া সব কিছুই ভুল।

বিছানাতেই উঠে বসে চুলগুলো জড়িয়ে গিঁট বেঁধে নেয়। রোগা রোগা হাতদুটো হাঁটুর ওপর রাখে আর নিজেকে ছেড়ে দেয় ভাবনার সমুদ্রে।......নিঃসঙ্গ, স্বপ্নালু, প্রেমাবেগহীন শীতল এক জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে সে।...... সামার পার্কে 'লাফানে গুণ্ডারা' ওকে ভয় দেখিয়ে ভালই করেছিল—তবু সেটাও যথেষ্ট হয়নি—আরও সাংঘাতিক ভয় পাওয়া উচিত ছিল তার। আর এখন তো উধাও হওয়ার পালা......এখন বাতাসের ঝাপটায় নিজেকে সঁপে দিয়ে উড়ে যাও, হে আমার প্রাণ বিহঙ্গ, যেখানে তোমায় টেনে নিয়ে যাবে ঝড়, যেখানে ফেলবে নিয়ে তোমায়।......তোমার নিজের খুশি বলে কিছু নেই......আরও হাজার লক্ষের মধ্যে তুমিও একজন......আহা, কী শান্তি, মুক্তির সে কী আস্বাদ!

পুরো দু'দিন কুলিচক বাইরে বাইরেই রইল। ওর অবর্তমানে অনেক ক'জন লোক এসেছিল দাশার ঘরে। সবাই লম্বা, পরনে জীর্ণ কোর্তা, একটু অপ্রতিভ ভাব, কিন্তু সবাই অত্যন্ত ভদ্র। চাবির ফুটোর কাছে ঝুঁকে পড়ে ওরা সংকেতে কথা বলেছে আর দাশা তখন খুলে দিয়েছে দরজা। "ইভান স্ভিশ্‌চেভ্‌" বাড়ি নেই শুনেও মনে হল না ওদের কারো ফিরে যাবার তাড়া আছে। একজন তো হঠাৎ নিজের বাড়ি-ঘরদোরের দুরবস্থার কথাই শুরু করে দিল। আরেকজন ধূমপানের অনুমতি চেয়ে নামের আদ্যাক্ষর-লেখা একটা সিগারেট-কেস বের করল, তাতে রয়েছে কতকগুলো জঘন্য সোবিয়েত সিগারেট। "সেপাই আর ইতরজনতার" ডেপুটিদের উদ্দেশে নোংরা গালাগাল ঝাড়তে শুরু করল সে—ফরাসী কায়দায় লোকটা 'র' গুলোকে 'র্‌-র্‌' উচ্চারণ করে। আরেকজন আবার দাশাকে তার প্রাণের কথা খুলে বলতে আরম্ভ করল—ক্রেস্‌তভ্‌স্কি দ্বীপে নাকি তার জন্য একটা মোটর-লঞ্চ অপেক্ষা করছে, বেলোসেল্‌স্কি-বেলেজের্‌স্কি প্রাসাদের ঠিক সামনেই; সিন্দুক থেকে নাকি কিছু গয়নাপত্রও উদ্ধার করতে পেরেছে সে......তারপর ছেলেমেয়েগুলোর আবার হুপিং কাশি হয়েছে......কপালই মন্দ!

বড়ো-বড়ো চোখওয়ালা সুন্দরী এই তন্বীটির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করার সুযোগ পেয়ে ওরা সবাই যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে মনে হল। যাওয়ার সময় দাশার করচুম্বন করেছে ওরা। একটা জিনিস শুধু অবাক করেছে দাশাকে—এরা সবাই বোধহয় দারুণ গোবেচারা-প্রকৃতির চক্রান্তকারী, কোনো উদ্ভট নাটকের চরিত্রগুলো যেমন হয়ে থাকে হুবহু তেমনি।......সবাই খুব সাবধানে শব্দ বাছাই করে করে জিজ্ঞেস করেছে একটি কথা : "ইভান স্ভিশ্‌চেভ" খরচ-খরচা বাবদ কিছু টাকা-পয়সা এনেছে কি না। ওদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় ধারণা "মূর্খের মতো বলশেভিকদের এই খেলা" আর দুদিন বাদেই ফুরোবে। "পেত্রোগ্রাদ দখল করতে জার্মানদের তো আর এমন কিছু বেগ পেতে হবে না, মোটের ওপর!"

অবশেষে আবার কুলিচকের আবির্ভাব হয়। আগের মতোই শুকিয়ে-যাওয়া

চেহারা, নোংরা। মনে হয় কতো যেন কাজের ভিড়ে ডুবে আছে। আগেই খোঁজ নিল ওর অনুপস্থিতিতে কারা কারা খোঁজ খবর নিতে এসেছিল। দাশা আগাগোড়া সমস্তই বলল। শুনে দাঁত বের করল কুলিচক : "শয়তানের ঝাড়! টাকার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে......আঃ কী চমৎকার রক্ষীর কাজই না এঁরা করবেন! গদি-আঁটা চেয়ার থেকে তাঁদের অভিজাত পশ্চাদ্দেশখানি তুলবেন তাতে পর্যন্ত কুঁড়েমি! চান যে জার্মানরা এসে ওঁদের মুক্ত করুক : এই যে আসুন মান্যবরেরা—আপনাদের জন্য বলশেভিকদের আমরা বেঁধে রেখেছি, কোথাও কোনো গোলমাল নেই!...... অসহ্য! অসহ্য!......দু'লক্ষ অফিসার যারা বেঁচে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রকৃত বীর ক'জন? দ্রজ্‌দভস্কির তিন হাজার, দেনিকিনের আট হাজার, আর পাঁচ হাজার "স্বদেশ-রক্ষা সংঘের", ব্যস্‌ এই পর্যন্তই!......আর বাদবাকিরা কোথায়? ওরা বিক্রি করেছে নিজেদের, দেহমন সব বেচেছে লাল ফৌজের কাছে। কেউ কেউ বুট পালিশ করছে, কেউ সিগারেট বেচছে।......প্রায় গোটা জেনারেল স্টাফটাই তো বলশেভিকদের তরফে চলে গেছে......কলঙ্কের কথা......"

পেট পুরে ময়দা আর নুন খেয়ে আর খানিকটা গরম জল গলায় ঢেলে কুলিচক ঘুমোতে গেল। পরের দিন খুব ভোর থাকতে দাশাকে সে টেনে তুলল বিছানা থেকে। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে দাশা ছুটে গেল খাবার ঘরে। কুলিচক অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল টেবিলটার পাশে।

"এই যে!" দাশাকে দেখে অধীরভাবে বলে উঠল সে : "এবার বল তো—পারবে তুমি কঠিন কাজ করতে? বড়ো বড়ো আত্মত্যাগ, দারুণ কষ্ট সহ্য করা, এসব পারবে তুমি?"

"হ্যাঁ," বলল দাশা।

"এখানকার একটি প্রাণীকেও আমি বিশ্বাস করি না। খুব খারাপ-খারাপ খবর পেয়েছি। মস্কোতে একজনকে যেতেই হবে। তুমি পারবে?"

জবাবে দাশা শুধু ভুরুটা তুলে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগলো। কুলিচক ওর কাছে ছুটে এগিয়ে এসে ওকে টেবিলের পাশে বসালো, নিজেও এমন গা ঘেঁষে বসল যে ওর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকছিল দাশার। তারপর বলতে শুরু করল মস্কোতে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করবে ও, আর পেত্রোগ্রাদ সংগঠনের কোন্‌ খবর তাকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিতে হবে। ধীর অথচ কঠিন গলায় সে এমনভাবে কথাগুলো বলছিল যেন দাশার মনের মধ্যে প্রত্যেকটা কথা গভীরভাবে গেঁথে দিতে চায় সে। বলা শেষ হলে দাশাকে কথাগুলো আবার নতুন করে শোনাতে বলে। বাধ্য শিশুর মতো দাশাও তাই করে।

"চমৎকার! শেয়ানা মেয়ে দেখছি!" বলেই লাফ দিয়ে উঠল কুলিচক হাত-দুটো সজোরে রগড়াতে রগড়াতে : "তা তোমার ফ্ল্যাটটার কী গতি হবে? তুমি বরং হাউস-কমিটিকে জানিয়ে দাও যে মস্কো যাচ্ছ এক হপ্তার জন্য। আর দু'একদিন আমি এখানে থাকব, তারপর যাবার সময় চাবিটা রেখে যাবো কমিটির চেয়ারম্যানের হাতে। ঠিক হবে তো?"

এতখানি কাজের তাগাদায় দাশার মাথা যেন ঘুরতে থাকে। নিজেই অবাক হয়ে দেখে কোন্ সময় সে তৈরি হয়ে বসে আছে, বাধা দেবার সামান্যতম ইচ্ছেও তার হয়নি, যেখানেই পাঠানো হোক না কেন যাবার জন্য সে প্রস্তুত, যাই করতে বলা হোক সে করবে।......কুলিচক যখন ফ্ল্যাটের কথা তুলল ও তখন মেপ্‌ল্ কাঠের সাইড-বোর্ডটার দিকে একবার দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল......'কুৎসিত সাইডবোর্ডটা, দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—ঠিক যেন কফিন একটা।' ওর মনে পড়ে সোয়ালো পাখিরা কেমন নীল আকাশের দিকে ওকে হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধুলিমলিন খাঁচাটা ছেড়ে উড়ে গিয়ে অবাধ এক বনের পাখির জীবন—বুঝি বা সে কত আনন্দের!

"ফ্ল্যাট?" প্রতিধ্বনি করে দাশা : "হয়তো আর ফিরবই না কোনোদিন। আপনার যা খুশি করতে পারেন এটাকে নিয়ে।"

কুলিচকের অনুপস্থিতিতে এক ভদ্রলোক আসত—রোগামতো, মিশুক প্রকৃতির, মুখটা লম্বাটে, গোঁফজোড়া ঝুলে পড়েছে; সেই ভদ্রলোকই দাশাকে তুলে দিল ট্রেনের একটা কামরায়। গদিহীন কাঠখোট্টা আসন আর ভাঙা জানলাওয়ালা কামরাটা। দাশার ওপর ঝুঁকে পড়ে লোকটা ভরা গলায় ওর কানে-কানে বলল : "আপনি এত যে সব করলেন, এ আমরা ভুলব না।" তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। ট্রেনটা সবে ছেড়েছে এমন সময় কয়েকজন লোক ছুটে এল, জানলা দিয়ে তারা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। পোঁটলা-পুঁটলিগুলো ওরা দাঁতেই আঁকড়ে রেখেছিল। কামরাটা এবার ভরে গেল। কেউ কেউ মাথার উপরকার মাল-রাখা তক্তার উপর উঠল, কেউ কেউ সটান গুঁড়ি মেরে ঢুকল আসনের নিচে, সেখানে শুয়ে বেশ বহাল তবিয়তেই তারা দেশলাই জ্বেলে দিব্যি গিরস্তি তামাক টানতে শুরু করে দিল।

মন্থরগতিতে ট্রেনটা তার দীর্ঘ দেহখানা টেনে নিয়ে চলেছে কুয়াসাভরা জলা জমির উপর দিয়ে। বহুদিন আগেকার ঠাণ্ডা হয়ে-যাওয়া চিমনিগুলো মাথা উঁচিয়ে আছে এখানে-ওখানে। এঁদো পুকুরগুলো সবুজ শ্যাওলায় ভরে গেছে। দিগন্তের একপ্রান্তে জেগে উঠল পুল্‌কোভের মানমন্দিরটা : এখনও সেখানকার শান্তিময় পরিবেশে বসে আকাশের তারা গুনছেন একদল প্রবীণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাঁদের মধ্যে সত্তর বছরের বৃদ্ধ গ্লাজেনাপও রয়েছেন—সারা দুনিয়া ভুলেই গেছে তাঁদের কথা। এক এক করে পাইনগাছের চারা, বড়ো-বড়ো গাছ, গ্রীষ্ম কুটির, সবই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একজন সশস্ত্র পাহারাদারকে বসানো হল, ট্রেন থামলে যাতে আর লোক ঢুকতে না পারে। প্রচণ্ড হৈ-চৈ সত্ত্বেও কামরার ভেতরটা এবার একেবারে ঠাণ্ডা।

দু'জন লড়াই-ফেরতা সৈনিকের মাঝখানে কোনো রকমে গোঁজের মতো বসে আছে দাশা। উপরের তাকটা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে একখানি উৎসুক মুখ; লোকটি হরদমই আলাপ-আলোচনার মধ্যে ফোঁড়ন দিচ্ছে।

"হ্যাঁ, তারপর, তারপর?"—তাকের ওপর থেকে আওয়াজ এল, যেন হাসিই চাপতে পারছে না লোকটা : "আপনি কী করলেন তখন?"

দাশার উল্টোদিকে দু'জন স্ত্রীলোক বসেছিল মুখ বুজে, নিজেদের ভাবনায় ডুবে। ওদের মাঝখানে বসেছে রোগাপানা একচোখ-কানা একটি চাষী মানুষ, ইয়া গোঁফজোড়া তার, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথায় দিয়েছে স্ট্রয়ের টুপি, চটের বস্তা কেটে তৈরি করেছে গায়ের জামাটা, গলার কাছে বেঁধে রেখেছে ফিতে দিয়ে। বেল্টের মধ্যে গুঁজেছে একটা চিরুণী আর কপিং পেন্সিলের টুকরো, জামার বুকের মধ্যে গুঁজে রেখেছে এক বান্ডিল কাগজ।

দাশা প্রথমটায় ওদের আলাপ-আলোচনায় কান দেয়নি। কিন্তু একটু বাদেই সে বুঝলো কানা লোকটি নিশ্চয় দারুণ মজার কোনো ঘটনার কথা বলে চলেছে। এক এক করে সমস্ত মাথাগুলোই ফিরতে আরম্ভ করেছে তার দিকে, কামরাটাও বেশ চুপচাপ হয়ে এসেছে এর মধ্যে। রাইফেল-হাতে একজন সৈনিক বেশ জোর দিয়েই বলল :

"আমি জানি তোমরা কে—তোমরা সবাই পার্টিজান—মানে মাখনোর লোক।"

কানা লোকটা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গোঁফের তলায় খুব একটা শেয়ানা হাসি হেসে বলল :

"উঁহু—আসল শুয়োরটার কানই যে পাকড়াতে পারলে না ভায়া।"

গিঁট-পড়া হাতখানা একপাশ দিয়ে গোঁফের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে যেন হাসিটাকে আড়াল করার চেষ্টা করল সে। খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলে চলল :

"মাখনো......সে তো কুলাকদের দল......একাতেরিনোস্লাভের কাছাকাছি হল তার আড্ডা। সেখানে তো একশো একরের নিচে কাউকে জমিই চষতে হয় না ভাই। আমরা হলাম অন্য। আমরা লাল পার্টিজান।"

"তা, কী করা হয় আপনাদের শুনি?"—উপরের তাক থেকে আগ্রহভরা মুখে সেই সহযাত্রীটি জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের কাজের এলাকা চের্নিগভ অঞ্চল আর নেঝিন অঞ্চলের উত্তর দিকটা, বুঝেছেন তো? আমরা হলাম কমিউনিস্ট। জার্মানরা, পোলিশ জমিদার, হেৎমানের গাইদামাক আর নিজেদের গাঁয়ের কুলাকরা—আমাদের চোখে এরা সবাই এক।...... তাই আমাদের সঙ্গে মাখনোর লোকদের গুলিয়ে ফেলাটা ঠিক নয়, বুঝলেন?"

"আমরা ঠিকই বুঝেছি! ধানের চালের ভাত খাই তো—যাক্ গে, গল্পটা আগে শেষ করুন দেখি!"

"বেশ শুনুন তাহলে—ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম : জার্মানদের সঙ্গে সেই লড়াইটার পর তো আমরা দমে গেলাম একেবারে। কশেলেভ্ জঙ্গলের দিকে পিছু হটতে শুরু করলাম, ঢুকলাম গিয়ে একেবারে জঙ্গলের মাঝখানে। সেখানে নেকড়ে ছাড়া আর কোনো প্রাণীই থাকে না। সেখানে খানিক জিরিয়ে নিলাম। কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে লোকেরা আসতে লাগল আমাদের কাছে। ওরা বলল জীবন নাকি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জার্মানরা এবার দস্তুরমতো পার্টিজানদের খেদাতে লেগে গেছে। গাইদামাকদের পাঠানো হয়েছে জার্মানদের সাহায্য করবার জন্য। এমন একটি দিনও যায় না যেদিন তারা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে কাউকে-না-কাউকে

মারপিট না করে—সবই কুলাকদের ইশারায়। এই সব খবর শুনে আমাদের ছোকরারা তো সব খেপে টং, মাথার ঠিক থাকে না কারুর। এমনি সময় আরেকটা ফৌজী দল এসে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে। তখন বেশ বড়ো-সড়ো একটা আর্মিই তৈরি হয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে, সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিনশো লোক হবে। ছোট-লেফটেন্যাণ্ট গল্তাকে আমরা আমাদের গ্রুপটার কম্যাণ্ডার করে নিলাম—ভার্কিয়েভের গেরিলাযোদ্ধা ছিল লোকটা। তারপর মাথা ঘামাতে লাগলাম কোন্ দিকটায় প্রথম সামরিক তৎপরতা শুরু করা যায়। দেস্না নদীর পাড় বরাবর নজর-ঘাঁটি বসাবার একটা মতলব ভাঁজলাম আমরা, কারণ জার্মানদের যতকিছু সামরিক রসদ সব ঐখান দিয়েই চালান আসতো। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গেলাম। যে-সব জায়গায় স্টীমারগুলো পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে চলত সেই সব জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসলাম আমরা।"

"এ-হে-হে-হে! তারপর, তারপর?" উপরের তাকটা থেকে আওয়াজ এল।

"তারপর তো এল একটা স্টীমার। আমাদের পয়লা সারির লোকেরা চেঁচিয়ে ওঠে : 'থাম!' ক্যাপ্টেনটা শোনে না আমাদের হুকুম—সঙ্গে সঙ্গে গুরুম্ গুরুম্! স্টীমারটা অবশেষে পাড়ের দিকেই আসে, আমরাও চোখের পলকে উঠে পড়ি ডেকের ওপর। পাহারা বসিয়ে আমরা কাগজপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করি।"

"হ্যাঁ—ওই হচ্ছে ঠিক রাস্তা!" বলে সৈনিকটি।

"মাল বলতে স্টীমারটার মধ্যে ছিল শুধু ঘোড়ার জিন আর সাজ। দু'জন কর্নেলের হাতে ছিল মালের ভার—ওদের মধ্যে একজন থুত্থুরে বুড়ো, অন্য জন বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান। ঘোড়ার সাজের সঙ্গে অবশ্য একপ্রস্থ ওষুধপত্তরও ছিল। আর ঠিক ঐ জিনিসটিরই তখন আমাদের দরকার। আমি ছিলাম ডেকের ওপর, কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি দু'জন কমিউনিস্ট আমার দিকেই আসছে—ওরা হল বরোদিয়ান জেলার পিয়তর্ আর ইভান পেত্রভ্স্কি। মুহূর্তে বুঝে নিলাম ব্যাপারখানা কী, কিন্তু ওদের যে চিনতে পেরেছি তেমন কোনো ভাব দেখলাম না মুখে। বেশ কড়া সরকারী কায়দায় ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালালাম : 'আপনাদের কাগজপত্র......।' পেত্রভ্স্কি আমার হাতে তুলে দিল ওর ছাড়পত্রটা। ওর মধ্যে সিগারেটের কাগজের ওপর লেখা কয়েকটি ছত্র : 'কমরেড পিয়াভ্কা, চের্নিগভ ছেড়ে আমি ও আমার ভাই রাশিয়ার দিকে যাচ্ছি—আমাদের সঙ্গে কিন্তু অত্যন্ত কড়া ব্যবহার করবেন, যাতে অন্যদের নজরে না আসে ব্যাপারটা—চারদিকেই এখন ফেউ লেগেছে......।' ভালো কথা।......কাগজপত্র সব দেখা হয়ে গেলে পর আমরা ঘোড়ার সাজ, জিন, ওষুধপত্র সব নামিয়ে নিলাম স্টীমার থেকে, মায় পনেরো বাক্স মদও টেনে নামালাম আমাদের আহতদের পক্ষে টনিকের কাজ করবে বলে। তারপর ঝামেলা বাধল জাহাজের ডাক্তারটিকে নিয়ে, সে খুব বীরের মতো ভাব দেখাতে লাগল। 'ওষুধপত্রের সরঞ্জাম আমি হাতছাড়া করব না'—চেঁচাতে লাগল সে—'সমস্ত রকম আইনের বিরুদ্ধ কাজ এটা; আন্তর্জাতিক আইনেরও সম্পূর্ণ বিরোধী, সেটি আপনারা ভাল করেই জেনে রাখুন!' আমাদের জবাবও যেমনি ছোট তেমনি সাফ-সাফ : 'আমাদের নিজেদেরই আহত সৈন্য রয়ে

গেছে, সুতরাং তাদের জন্য ওষুধপত্র ছেড়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক না-হোক, মানবিক আইন তো ভঙ্গ করতে হচ্ছে না আমাদের!' ডজনখানেক অফিসারকে গ্রেপ্তার করে ডাঙায় এনে স্টীমারটাকে ছেড়ে দিলাম আমরা। বুড়ো কর্নেলটা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল, ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, এমন কি তার সামরিক কর্মজীবনেরও দোহাই পাড়লো। আমরা ভাবলাম: 'কী হবে বুড়োটাকে কষ্ট দিয়ে? আর তো বেশিদিন এমনিতেও বাঁচবে না।' হঠাৎ এক উদার ভাব এসে গেল সকলের মনে, ঝোঁকের মাথায় দিলাম তাকে ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে জঙ্গলের দিকে চলে গেল......"

উপরের তাকটা থেকে এবার প্রচণ্ড খুশির হাসি যেন ফেটে পড়ল। যতক্ষণ না সে হাসি থামে, কানা লোকটা চুপ করে সবুর করতে লাগল। তারপর আবার শুরু করল গল্প।

"অন্য লোকটা ছিল স্টাফ অফিসার। ওর সম্পর্কে আমাদের ভাল ধারণাই হল। প্রত্যেকটা প্রশ্নের চটপট্ উত্তর দেয়, কোনোরকম অসুবিধা বোধ করছে এমন ভাবও দেখায় না। আমরা তাই ওকেও ছেড়ে দিলাম। বাদবাকিদের নিয়ে ঢুকলাম জঙ্গলে। প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় ওদের প্রত্যেকটাকে গুলি করে সাবাড় করলাম।..."

দম বন্ধ করে দাশা তাকিয়ে রইল কানা লোকটির দিকে। মুখে গভীর ভাঁজের দাগ পড়ে গেছে, তবু লোকটার চেহারায় প্রশান্তির ছাপ। একটিমাত্র শেয়ানা, ধূসর-কালো চোখ, তারাটাও খুব ছোট। ট্রেনের পাশ কাটিয়ে-চলা পাইনগাছ-গুলোকে সে লক্ষ্য করে যাচ্ছে চিন্তিতভাবে। তারপর একটু বাদেই আবার শুরু করল গল্পটা:

"দেস্‌নার তীরে বেশিদিন থাকা গেল না। জার্মানরা আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আমরা দ্রজ্‌দভ্ জঙ্গলের দিকে হটে এলাম। চাষীদের মধ্যে লুটের মাল ভাগ করে দিয়েছিলাম। প্রত্যেকে এক মগ করে মদ টেনেছিলাম অবিশ্যি, তবে বাদবাকি সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম হাসপাতালে। আমাদের বাঁ দিকটায় তখন বিরাট একটা ফৌজীদল নিয়ে লড়ছিল ক্রাপিভিয়ান্‌স্কি, আর ডানদিকে লড়ছিল মারুনিয়া। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল চের্নিগভের দিকে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া যাতে হঠাৎ আক্রমণ করে জায়গাটাকে দখল করা যায়। ফৌজীদল-গুলোর মধ্যে একটু যদি ভালোরকমের যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতো!...সত্যিকারের কোনো যোগাযোগই ছিল না আমাদের মধ্যে, তাই যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জার্মানরা রোজই নতুন নতুন সৈন্য, গোলন্দাজ, আর ঘোড়সওয়ার-দল পাঠাতে লাগলো আমাদের মোকাবিলা করবার জন্য। আমাদের অস্তিত্বটাই ওদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। কারণ ওরা গ্রাম ছেড়ে সরে পড়লেই নতুন বিপ্লবী-কমিটি খাড়া হবে, অ্যাশ্ গাছের মগডালে ঝুলবে দু'একটা কুলাক। একদিন আমায় ওরা পাঠিয়েছিল মারুনিয়ার ফৌজীদলের কাছে—উদ্দেশ্য, কিছু টাকা ধার করা—আমাদের তখন টাকার ভয়ানক দরকার কি-না। গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে

আমরা যা কিছু নিতাম তার জন্য নগদ পয়সা দিতে হত, লুঠতরাজের শাস্তি ছিল ফাঁসির দড়ি। আমি তো যাহোক একটা গাড়ি জোগাড় করে রওনা হলাম কশেলেভ রনের দিকে। মারুনিয়া আর আমি নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-টালাপ করলাম। ও আমাকে ধার দিল এক হাজার কেরেন্‌স্কি রুব্‌ল।...ফিরতি পথে ঝুকভ্‌কা গাঁয়ের পাশের ঢালু পাহাড়ী রাস্তাটার মধ্যে সবে ঢুকেছি এমন সময় ঝুকভ্‌কা বিপ্লবী-কমিটিরই দু'জন টহলদার ঘোড়সওয়ার ছুটে এল আমার দিকে। 'কোথায় চলেছ হে—ওদিকে যে জার্মানরা রয়েছে!' 'কোন্‌দিকে?' 'ওই তো, ঝুকভ্‌কার মধ্যে প্রায় ঢুকেই পড়েছে ওরা!' ঘুরলাম পেছন দিকে...একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গাড়ি থেকে নামলাম। ওদের সঙ্গে বসে গবেষণা শুরু করলাম কী করা যায় এখন। জার্মানদের সঙ্গে এখন মুখোমুখি পুরো লড়াই দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওদের একটা গোটা সারিই এখন ছুটে আসছে, সঙ্গে কামানও আছে।..."

"এক সারি সৈন্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষবে মাত্র তিনজন? এ তো এক মস্ত বড়ো ঝুঁকি!"—বলল সৈনিকটা।

"যা বলেছেন! আমরাও তাই ঠিক করলাম খালি ভয় দেখাবার চেষ্টা করব ওদের। রাইক্ষেতের তলা দিয়ে দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলাম। ঝুকভ্‌কা গ্রামটা দেখতে পাচ্ছিলাম, জঙ্গল থেকে এক সারি সৈন্য এগিয়ে আসছে তাও নজরে পড়ল—প্রায় শ' দুই লোক হবে, সঙ্গে দুটো কামান, কয়েকটা মালটানা গাড়ি, আর খানিকটা এগিয়ে সামনে রয়েছে একজন ঘোড়সওয়ার টহলদার। আমাদের পার্টিজানদের খ্যাতি নিশ্চয়ই ঢোল-শহরতে ছড়িয়ে পড়েছিল, নইলে আর সত্যি-সত্যিই কামান পাঠায় ওরা! শব্‌জিখেতের মধ্যে তো আমরা মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম। আমাদের মনের জোরও ছিল যথেষ্ট—মজাদার একটা কিছু ঘটবে এই আশায় হাসি আর ধরে না। টহলদার সওয়ারটা যখন আমাদের সামনেই কয়েকগজ তফাতে এসে পড়েছে, আমি হুকুম দিলাম: 'ব্যাটালিয়ন, চালাও গুলি' * দু' রাউন্ড গুলি চালালাম আমরা।......একটা ঘোড়া পিছন দিকে উল্টে যেতেই জার্মান সওয়ারটা কাঁটাগাছের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। আবার গুলি চালালাম। রাইফেলের কুঁদো খট্‌মটিয়ে মাটিতে ঠুকে যথাসম্ভব জোর আওয়াজ করতে শুরু করলাম আমরা......"

তাকের ওপরের সেই মুখটা থেকে এবার একজোড়া চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হি-হি করে হাসতে গিয়েই পাছে একটা শব্দও ফসকে যায় সেই ভয়ে অতিকষ্টে হাত দিয়ে মুখ চেপে রইল সে। সৈনিকটি খুশিতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

"টহলদারটা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল নিজের সারিতে। জার্মানগুলো ডান দিকে ঘুরেই একজোট হয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়াল। তারপর শুরু করল

---

* ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো কোম্পানি নিয়ে হয় ব্যাটালিয়ন—এতে সৈন্য সংখ্যাও থাকে প্রচুর।

পুরোদস্তুর লড়াই। চোখের পলকে ওরা গাড়ি থেকে কামান দাগতে আরম্ভ করল। শবজিক্ষেতের ওপর গোঁ গোঁ করে উড়ে আসতে লাগলো তিন ইঞ্চি ব্যাসের গোলা। মেয়েরা তখন শবজিক্ষেতে আলু তুলছিল।...একটা গোলা ফাটলো, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠলো এক গাদা মাটি। আমাদের মেয়েরা তো......" (বলতে বলতে এক-চোখো মানুষটা এক আঙুলে টুপিটা ঠেলে দেয় কানের ওপর, ফুর্তি চেপে রাখতে পারছে না আর; ওপরের তাক থেকে লোকটা হো-হো করে হাসে) "আলুক্ষেত থেকে আমাদের মেয়েরা তো মুরগির মতো দৌড়োদৌড়ি করে ছুটে পালিয়ে আসতে থাকে।......এদিকে জার্মানরা তখন ডবল-মার্চ করে এগিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। সঙ্গীদের বললাম : 'ওহে, মজা যা দেখবার তা তো দেখেই নিয়েছি—এখন এস, কেটে পড়া যাক এখান থেকে!' রাইক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আবার গুঁড়ি মেরে-মেরে ফিরে চললাম খাদটার দিকে। তারপর গাড়িতে উঠেই ছুটলাম দ্রজ্‌দভ বনের দিকে—অনেক অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা গেছে, আর নয়। পরে যা-যা ঘটেছিল ঝুকভ্‌কার লোকদের মুখেই শুনেছি : জার্মানরা নাকি শবজিক্ষেতের কাছাকাছি একেবারে বেড়ার ধারে এসে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে 'হুররে' বলে! এদিকে বেড়ার এপাশে তো তখন সব ফাঁকা। হাসতে হাসতে গাঁয়ের লোকদের তখন পেট ফেটে যায় আর কি! যাই হোক, জার্মানরা শেষ পর্যন্ত ঝুকভকা দখল করল বটে, কিন্তু না পেল বিপ্লবী কমিটির দেখা, না পেল গেরিলাদের। তবু তারা জারি করল সামরিক আইন। দু'দিন বাদে দ্রজ্‌দভের জঙ্গলে বসেই আমরা খবর পেলাম, জার্মানদের বিরাট একটা গোলাবারুদের কনভয় নাকি ঝুকভ্‌কায় ঢুকেছে। আর তখন আমাদের কার্তুজের দারুণ প্রয়োজন। ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করে সবাই তৈরি হয়ে পড়লাম। ঠিক হল ঝুকভ্‌কায় অভিযান চালিয়ে এই গোলাবারুদ দখল করতে হবে। প্রায় একশোজন লোক জড়ো হলাম আমরা। তিরিশজনকে পাঠানো হল বড়ো সড়কটায়, আমরা যদি সত্যিই জিতি তাহলে জার্মানরা যাতে চের্নিগভের দিকে পালাতে পথ না পায়। বাদবাকি সবাই সার বেঁধে মার্চ করে চলল ঝুকভ্‌কার দিকে। বিকেল হলে গাঁয়ের কাছাকাছি এসে রাইক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আমরা গুঁড়ি মেরে চলতে শুরু করলাম। সাতজন লোককে পাঠিয়ে দিলাম পথ-ঘাট তদারক করে ফিরে এসে খবর দেবার জন্য, যাতে রাত হলেই হঠাৎ আক্রমণ শুরু করা যায়। ইঁদুরের মতো চুপচাপ পড়ে রইলাম সেখানে, ধূমপান পর্যন্ত বারণ। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল......সকলেরই চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু......তার ওপর আবার বিশ্রী স্যাঁত-সেঁতে।...ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা অপেক্ষাই করছি, এদিকে আকাশ তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই কারুর। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। দেখলাম গাঁয়ের মেয়েরা গরুভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। এমন সময় গুঁড়ি মেরে ফিরে এল আমাদের সেই সাতজন স্কাউট—বেচারী ছেলেগুলো!... ব্যাপার হয়েছে কি, ওরা সবাই গাঁয়ের মিল-ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য শুয়ে পড়েছিল, তারপরেই দে ঘুম। হতচ্ছাড়াগুলো সারারাত পড়ে ঘুমোলো, তারপর গাঁয়ের মেয়েরা গরু চরাতে চরাতে ওইখানে এসে দেখে সাতজন ঘুমোচ্ছে।

তখন অবশ্য আক্রমণ করার প্রশ্ন আর ওঠে না।......এমন খেপে গেলাম আমরা যে কী বলব! কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করতে হল, রায়ও দেয়া হল। ওদের যে গুলি করে মারা উচিত সে ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু ওরা শুরু করল কান্নাকাটি,—খালি দয়া ভিক্ষে চায়। খোলাখুলিই স্বীকার করল যে কসুর ওদেরই। একেবারে কাঁচ কাঁচ ছেলে, তা ছাড়া এই ওদের প্রথম অপরাধ,......তাই আমরা ওদের এবারের মতো মাপ করাই ঠিক করলাম। কিন্তু ওদের জানিয়ে দেয়া হল, এর ঠিক পরের লড়াইটাতেই ওদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।”

“মাপ-টাপ করলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়।”—সেপাইটি মন্তব্য করল।

“হ্যাঁ, তা বটে।......যাই হোক, আমরা তো আবার নতুন করে মতলব ভাঁজতে বসলাম। রাতে যখন ঝুকভ্কা দখল করা যায়নি, তখন দিনেই যেমন করে হোক সে কাজটা করতে হবে। কাজও বড়ো সহজ নয়—আমাদের জওয়ানরা অবশ্য ভাল করেই জানতো কী ঝুঁকিটা তারা মাথায় নিতে যাচ্ছে। একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, বন্দুক কখন ছুটতে আরম্ভ করে। হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম না তো, যেন চার হাত-পায়ে দৌড়োচ্ছিলাম বলা যায়......”

উপরের তাকটা থেকে তখন প্রচণ্ড অট্টহাসি।

“কোথায় জার্মান! রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে সবাই মেয়েমানুষ, হাতে ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। রবিবারের দিন, তাই জাম কুড়োতে বেরিয়েছে সব। আমাদের দেখে ওদের কি হাসি। বলে : ‘বড্ডো দেরি করে ফেলেছ! এই দু’ ঘণ্টা আগেই জার্মানরা গোলাবারুদের গাড়ি-টাড়ি নিয়ে কুলিকভ-মুখো রওনা হয়েছে।’ আমরা তখন সবাই একমত হয়ে ঠিক করলাম জার্মানদের পিছু নিতেই হবে, এতে যদি সবাই মারা পড়ে সেও স্বীকার। গর্ত খুঁড়বার জন্য কোদাল নিলাম, মেয়েরা আমাদের জন্য প্যানকেক আর পাই-পিঠে নিয়ে এল। তারপর রওনা হলাম আমরা। অসংখ্য মানুষ এসে জুটতে লাগল আমাদের সঙ্গে, গোটা একটা ফৌজের সমানই হবে,—বেশির ভাগই অবশ্য মজা দেখবার জন্য। আর আমরাও করলাম কি : মেয়ে পুরুষ সবাইকে বিলি করলাম ডাণ্ডা, কুঁড়ি পা’ মতো ফাঁক দিয়ে-দিয়ে দু’ সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলাম প্রত্যেককে,—এমনভাবে করলাম জিনিসটা যাতে একজনের হাতে রাইফেল থাকলেও পরের লোকটির হাতে হয়তো শুধু ডাণ্ডা কিংবা লাঠি রয়েছে, অথচ এইভাবে পর পর সাজানোর দরুণ মনে হবে বুঝি মারাত্মক রকম হাতিয়ারবন্দ ফৌজ। প্রায় তিন মাইল জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে রইল আমাদের সৈন্যসারিটা। আমি বেছে নিলাম পনেরজন লোককে, তাদের মধ্যে সেই পোড়াকপালে স্কাউটগুলোও ছিল, আর রইল দু’জন অফিসার—এদের আমরা জুটিয়েছিলাম খোলাখুলি প্রতি-বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও, তবে শাসিয়ে রেখেছিলাম এই বলে যে, যদি প্রাণের ওপর ওদের কিছুমাত্র মায়া থাকে তাহলে যেন বেইমানি করার কোনোরকম চেষ্টা না করে। আমাদের এই গ্রুপটাই জার্মান রসদবাহী কনভয়ের সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে রাস্তা আগলে রইল।......তারপর শুরু হল একখানা লড়াই, বুঝলেন দাদারা, সে

লড়াই চলল দিনের পর দিন, ফুরোতে আর চায় না......" (এই পর্যন্ত বলে লোকটা এমন একটা ভঙ্গি করল যেন আর কিছু বলতে সে নারাজ)।

"সে কেমন হল ব্যাপারটা?" প্রশ্ন করে সৈনিকটি।

"ব্যাপারটা হল এই রকম,......জার্মানদের সারিটাকে প্রথমে পথ ছেড়ে দিয়ে পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা—একেবারে গাড়িগুলোর ওপর। গোটা কুড়ি গুলিগোলার গাড়ি দখল করেছিলাম। তাড়াতাড়ি থলিগুলো কার্তুজ বোঝাই করে যত পারা যায় রাইফেল বিলিয়ে দিলাম চাষীদের মধ্যে, তারপর চালিয়ে গেলাম হামলা। ভেবেছিলাম আমরা বুঝি জার্মান সৈন্যসারি ঘিরে ফেলেছি, কিন্তু আসলে জার্মানরাই আমাদের ঘিরে ফেলেছিল : তিন দিকের রাস্তা ধরে ওদের সমস্ত ইউনিট এসে জড়ো হল এই একটি জায়গায়।......আমরা তখন ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে খানাখন্দগুলোর মধ্যে মাথা গুঁজতে আরম্ভ করলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল যে জার্মানরা তাদের বড়ো বড়ো লড়াইয়ের কায়দা-কানুন মাফিক এখানেও যুদ্ধ চালাচ্ছিল, না হলে আর কাউকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না।......শেষ পর্যন্ত আমি, আর বোধহয় জনা-দশেক লোক বেঁচে গেলাম। যতক্ষণ না কার্তুজ ফুরোয় সমানে লড়ে চলেছিলাম। তারপর অবশ্য ঠিক করলাম যে এ জায়গায় আমাদের পোষাবে না, দেস্‌না পার হয়ে, নিরপেক্ষ এলাকা হয়ে রাশিয়ায় চলে যাওয়াই ভাল। রাইফেলটা লুকিয়ে রেখে আমি নভ্‌গরদ্‌ সেভের্‌স্কির দিকে রওনা হলাম, ভান করে রইলাম যেন আমি যুদ্ধ-বন্দী......"

"তা এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"মস্কোয় যাচ্ছি, দেখি কী নির্দেশ পাওয়া যায়।"

এর পর পিয়াভ্‌কা আরও অনেক কিছুই শোনালো : পার্টিজানদের কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা। "একটার পর একটা বিপদ আসে আমাদের ঘাড়ে। চাষীদেরও তাই নেকড়ে বাঘের মতোই তৈরি হয়ে থাকতে হয় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য।" পিয়াভকা হল নেঝিন্‌-এর লোক, সেখানকার চিনির কলে কাজ করতো একসময়। কেরেন্স্‌কির আমলের সেই ব্যর্থ 'জুন অভিযানের' * সময় চোখটা খুইয়ে বসে। "কেরেন্স্‌কি আমার চোখ উপড়ে নিয়েছে"—এই হল পিয়াভ্‌কার নিজের সিদ্ধান্ত। যাই হোক, সেই সময় ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই প্রথম সে কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসে। নেঝিন্‌ সোবিয়েতের সদস্য ছিল সে, বিপ্লবী কমিটিরও। পার্টিজান আন্দোলনের গোপন সংগঠনেও তার হাত ছিল।

---

* 'জুন অভিযান'—কেরেন্স্‌কির প্রধান-মন্ত্রীত্বের যুগে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদী চক্রের মর্জি অনুযায়ী সাময়িক গভর্ণমেণ্ট একটা নতুন অভিযান চালাবার জন্য রণাঙ্গনের সৈন্যদের সামনে ঠেলে দেয়—১৯১৭ সালের ১৮ই জুন তারিখে। কেরেন্স্‌কি ভেবেছিলেন বিপ্লবকে ঠেকাবার বুঝি এই একটি মাত্র ভরসাই তার রয়েছে।

ওর কাহিনী দাশার মনটাকে নাড়া দেয়। কাহিনীর পেছনে যে সত্যটা রয়েছে তাকে তো অস্বীকার করা চলে না। কামরার আর-আর যাত্রীও অনুভব করে সেটা, হতবাক হয়ে তাই শোনে ওর কথা।

দিনের শেষার্ধটুকু, এবং লম্বা রাতটাও অবশেষে কেটে যেতে থাকে। আসনের নিচে পা গুটিয়ে দাশা চোখ বন্ধ করে বসে আছে; ভাবতে ভাবতে ওর মাথা যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্‌ করে, ভাবনার এমন একটা প্রান্ত-সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে যে হন্যে হয়ে ওঠার জোগাড়। দুটো সত্য এখানে দেখতে পাচ্ছে সে : একটা সত্য হল ঐ একচোখ-কাণা লোকটির, ফৌজের ঐ সৈনিক আর সাদাসিধে ক্লান্ত মুখওয়ালা ঐ ঘুমন্ত নারী দুটির সত্য; আর অন্যটি হল সেই সত্য যা নিয়ে কুলিচকের অত বাগাড়ম্বর। কিন্তু সত্য তো আর দু' রকম হতে পারে না। এ দুয়ের মধ্যে একটা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, সাংঘাতিক রকম ভ্রান্ত......

দুপুর বেলায় ট্রেন মস্কো এসে পেঁছোয়। পুরনো একটা ইজ্‌ভজ্‌চিক্‌ গাড়িতে চাপে দাশা। ঝ্যাঁকর-ঝ্যাঁকর করে গাড়িটা মিয়াস্‌নিৎস্কায়া স্ট্রীট ধরে চলে। রাস্তাটা এখন যেমন নোংরা তেমনি জরাজীর্ণ, শূন্য দোকানঘরগুলোর জানলায় কাদার ছিটে। শহরের এই লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা দেখে দাশা হতভম্ব হয়ে যায়—ওর মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন পতাকা হাতে গান গেয়ে গেয়ে অসংখ্য মানুষের ভিড় বরফ-ঢাকা রাস্তাগুলোয় টহল দিয়ে বেড়াতো, রক্তপাতহীন বিপ্লবের নামে জয়ধ্বনি তুলে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতো।

লুবিয়ান্‌স্কায়া স্কোয়ারে ধুলোর ঘূর্ণি পাক খেয়ে-খেয়ে যাচ্ছে। কোমর-বন্ধহীন টিউনিক পরে, গলার কাছটায় কলার খুলে দিয়ে দু'জন সৈনিক পায়চারি করছে স্কোয়ারটার মধ্যে। মখমলের জ্যাকেটপরা দুর্বলদেহ একজন লম্বা-মুখো লোক দাশার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, এমন-কি ঘোড়ার-গাড়িটার পেছন পেছন দৌড়লও খানিকটা, কিন্তু তারপরেই আর পারল না, দাঁড়িয়ে পড়ল—ধুলোয় চোখ অন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মেত্রোপোল হোটেলটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কামানের গোলায় গোলায়, এখানেও ধুলোর ঘূর্ণি; জঞ্জাল-ভরা স্কোয়ারটার ঠিক মাঝখানে কোনো অজ্ঞাত লোক কী এক অজ্ঞাত কারণে কেয়ারি করে সাজিয়ে গেছে বর্ণোজ্জ্বল ফুলের শয্যা—দৃশ্যটা যেন একেবারেই খাপছাড়া।

ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটটা তবু একটু প্রাণবন্ত মনে হয়—কতগুলো ছোট ছোট দোকান এখনও খোলা রয়েছে সেখানে। মস্কো সোবিয়েতের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শালু-ঢাকা প্রকাণ্ড এক চৌকো কাঠের টুকরো। ঐ জায়গাটায় একসময় ছিল সেনাপতি স্কোবেলেভের স্মৃতিস্তম্ভ। এই পরিবর্তনটার মধ্যে বীভৎস কিছুর সন্ধান পেল দাশা। গাড়ির বুড়ো কোচম্যান চাবুকের বাঁটটা সেদিকে ঘুরিয়ে দেখাল :

"বীর মানুষটিকে ওরা টেনে নামিয়েছে রাস্তায়। এই তো এত বছর মস্কো শহরে গাড়ি চালিয়ে এসেছি, বরাবরই মূর্তিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি ওখানে। এখনকার গভর্ণমেণ্ট কিন্তু পছন্দ করে না তাকে, বুঝলেন তো। কেমন করে লোকে

বাঁচবে বলুন? এর চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। এক পুড ঘাসের দাম হল গিয়ে দুশো রুব্‌ল্‌! ভদ্রলোকরা সবাই পালিয়ে গেছেন, কমরেডরা ছাড়া আর তো কেউ নেই শহরে—তা ওদেরও বেশির ভাগ হেঁটেই মেরে দেয়।......হায় রে রাষ্ট্র!" ঘোড়ার লাগামটায় ঝাঁকুনি দিল একবার। "শুধু একজন রাজা যদি থাকতেন মাথার ওপর... সে যে রাজাই হোন না কেন!"

স্ত্রাস্‌ৎনায়া স্কোয়ারে পৌঁছুবার ঠিক আগেই বাঁ দিকটায় 'কাফে বম্‌'-এর মোটা কাঁচ-ওয়ালা জানলাদুটো নজরে পড়ে—ভেতরে দেখা যায় একদল অলস যুবক আর মদালসা তরুণী সোফায় গড়াচ্ছে, সিগারেট টানছে, চুমুক দিচ্ছে নাম-না-জানা পানীয়ের গেলাসে। লম্বা-লম্বা চুলওয়ালা দাড়িগোঁফ-কামানো একটি লোক পাইপ মুখে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল খোলা দরজার মুখে চৌকাঠে হেলান দিয়ে। দাশাকে দেখেই লোকটা যেন একেবারে অবাক হয়ে গেল, মুখ থেকে নামিয়ে নিল পাইপটা। কিন্তু দাশার গাড়ি তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। স্ত্রাস্‌ৎনয় মঠের গোলাপী চূড়াটা সামনেই দেখা যাচ্ছে, ঐ তো পুশ্‌কিন দাঁড়িয়ে আছেন উল্টো-দিকের পাদপীঠটার ওপর। পুশকিনের কনুইয়ের নিচে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে লাঠির ডগায় বাঁধা একটা বিবর্ণ নেকড়ার ফালি—গরম-গরম সভা-সমিতির যুগে বুঝি কেউ ওটা রেখেছিল ওখানে। মূর্তির ভিত-পাথরের ওপর খেলা করছে একদল রোগাপটকা ছেলে। একটি বেঞ্চের ওপর বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা, চোখে প্যাঁশনে-আঁটা। পুশ্‌কিন যে-টুপিটা পিঠের ওধারে হাতে ধরে রেখেছেন ভদ্রমহিলার টুপিটাও হুবহু তারই নকল।

ৎভের্‌স্কয় বুলভারের উপর দিয়ে পাতলা-পাতলা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। সৈন্য-বোঝাই একটা মোটর-লরী হুড়মুড় করে চলে গেল। লরীটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কোচম্যান বলল : "লুটের ফিকিরে আছে ওরা। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ অভ্‌সিয়ান্নিকভ্‌কে চেনেন তো? মস্কোর সবচেয়ে বড়ো কোটিপতি। গতকাল তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল ওরা ঠিক এইভাবেই মোটর লরী হাঁকিয়ে। একেবারে সাফ করে দিয়েছে সব কিছু। ভাসিলিয়েভিচ শুধু মাথাটি নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন—কোথায় তা কেউ জানে না। ভগবানকে ভুলে গেছে মানুষ, বুঝলেন! এই হল সেকেলে লোকদের মত......"

বুলভারের একেবারে শেষ প্রান্তে 'গাগারিন'-নিবাসের ধ্বংসাবশেষ নজরে পড়ে। একটিমাত্র লোককে দেখা যাচ্ছে দেয়ালের মাথায় দাঁড়িয়ে গাঁইতি দিয়ে ইট ভেঙে-ভেঙে মাটিতে ফেলতে। শার্টের হাতা-দুটো শুধু সম্বল। বাঁ দিকে, আগুনে-পোড়া বাড়িটার বিরাট ধ্বংসস্তূপ যেন জানলার শূন্য কোটরগুলোর ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে বর্ণহীন আকাশের দিকে। আশপাশের সমস্ত বাড়িগুলো বুলেটের গর্তে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মাত্র আঠারো মাস আগেও দাশা আর কাতিয়া ঠিক এই রাস্তাটার উপর দিয়েই দ্রুত-পায়ে হেঁটে গিয়েছিল মাথায় ভেড়ার-লোমের শাল মুড়ি দিয়ে। বরফের টুকরোগুলো ওদের পায়ের নিচে মুড়মুড়্‌ করে ভাঙছিল। এখানে-ওখানে জমা বরফ-জলের মধ্যে আকাশের তারার প্রতিবিম্ব।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওরা দু' বোন যাচ্ছিল আইনজীবীদের ক্লাবে; পিতার্সবুর্গে নাকি বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, সেই গুজব সম্পর্কে একটা বিশেষ রিপোর্ট শুনতে যাচ্ছিল ওরা। স্নিগ্ধ বসন্তের বাতাসে সেদিন যেন কেমন একটা মাদকতাও ছিল।

দাশা মাথা নাড়ে—নাঃ আর ভাবব না, সেসব দিন কবে ফুরিয়ে গেছে!

দ্রশ্‌কি গাড়িটা এবার আরবাত স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে বাঁ-দিকের গলিটা ধরে চলতে শুরু করল। দাশার বুকটা এমন সাংঘাতিক ঢিপঢিপ করছিল, মনে হচ্ছিল ও মাথা ঘুরে পড়বে। সামনেই সেই সাদা দোতলা থাক-কাটা মেঝে-ওলা বাড়িটা—যেখানে কাতিয়া আর নিকোলাই ইভানোভিচের সঙ্গে দাশা থাকত পনেরো সালের পর থেকে। জার্মান বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এই বাড়িতেই তেলেগিন এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। কাতিয়ার সঙ্গে রশচিনেরও প্রথম সাক্ষাৎ এই বাড়িতেই। এই বাড়ির রং-চটা দরজার নিচে দিয়েই দাশা তার বিয়ের দিন হেঁটে গিয়েছিল, রবারের টায়ার-লাগানো ছাই-রঙের ঘোড়াওয়ালা দ্রশ্‌কি গাড়িটার মধ্যে তাকে হাতে ধরে তুলে দিয়েছিল তেলেগিন, তারপর বসন্ত-গোধূলির ক্ষীণ আলোয় উদ্ভাসিত পথ ধরে ওরা দু'জনে চলেছিল,—সুখের সন্ধানে।......জানলার সে শার্সিগুলো আজ ভাঙা। দাশার পুরনো ঘরটার সেই দেয়াল-মোড়া কাগজগুলো আজও সে চিনতে পারছে—ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে ঝুলছে সেগুলো। জানলার ভেতর থেকে উড়ে এল একটা কাক।

"ডাইনে যাব, না, বাঁয়ে?"—জিজ্ঞেস করল চালক।

দাশা ওর হাতের কাগজটা ভাল করে পড়ে নিল। একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এসে দ্রশ্‌কিটা থামল, সদর দরজাটা ভেতর থেকে তক্তা দিয়ে আঁটা। দাশা কাউকে কোনোরকম প্রশ্ন করবে না, এইটেই ঠিক ছিল। ও তাই পেছনের সিঁড়িটার ওপর অনেকক্ষণ ধরে ওঠা-নামা করল।

'১১২-এ' নম্বরের ফ্ল্যাটটা ওর দরকার। মাঝে মাঝে ওর পায়ের শব্দ শুনে দু' একটা দরজা একটুখানি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় প্রত্যেকটা দরজার আড়ালেই একজন করে নজর-রাখার লোক রয়েছে, যাতে বিপদ বুঝলে সময়মতো ঘরের লোক খবর পেতে পারে।

ছ'-তলায় উঠে দাশা একটা দরজার ওপর টোকা মারল—প্রথমে পর-পর তিনটে তারপর একটা : যেমন শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে। খুব সাবধানে কেউ পা টিপে-টিপে আসছে মনে হল। দরজার চাবির-ফুটো দিয়ে কেউ দেখছে আর জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। তারপর খুলে গেল দরজাটা—লম্বা এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা, উজ্জ্বল-নীল চোখ দুটো ভয়ানকভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আছে। দাশা নিঃশব্দে কার্ডবোর্ডের ত্রিভুজটা এগিয়ে দিল সামনে। মহিলাটি বললেন :

"ও, পিতার্সবুর্গ থেকে আসছেন? দয়া করে ভেতরে আসুন!"

দাশা একটা রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল, অবশ্য অনেককাল যে সেখানে রান্নাবান্নার পাট চুকে গেছে তা দেখলেই বোঝা যায়। একটা বড়ো পর্দা-ওয়ালা কামরায় এসে ঢুকল দাশা। আধো-অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চমৎকার

সব আসবাবপত্রের অবয়বরেখা, ব্রোঞ্জের পালিশের ওপর এখানে-ওখানে ঠিকরে পড়েছে আলো। কিন্তু এ-ঘরটাতেও কেমন যেন একটা আবহাওয়া—মনে হয় কতোকাল কেউ বাস করেনি এখানে। দাশাকে নিয়ে একটা সোফার ওপর বসালেন মহিলাটি, তারপর পাশে একটা আসন টেনে নিয়ে নিজেও বসলেন। আগন্তুকের দিকে ভীতিপ্রদ দুটো ভাঁটার মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

"বলুন!"—কর্কশ হুকুমের সুর তাঁর গলায়।

দাশা সাবধানে সবকিছু ভেবেচিন্তে নিয়ে কুলিচক যেমন-যেমন বলেছিল হুবহু তার পুনরাবৃত্তি করল। আংটি-পরা সুন্দর হাত দু'খানা শক্ত হাঁটুর ওপর চেপে ধরে ভদ্রমহিলাটি আঙুলগুলো টান-টান করছিলেন যতক্ষণ না গিঁটগুলো মট্‌মট্‌ করে ওঠে।

"পেত্রোগ্রাদে ওরা তাহলে কোনো খবরই রাখে না?" বাধা দিয়ে বললেন তিনি। গম্ভীর গলার স্বর আবেগে কাঁপছে :

"আপনারা জানেন না কর্ণেল সিদরভের বাড়ি কাল রাতে খানাতল্লাশী হয়ে গেছে!......শহর থেকে আমাদের সরে যাওয়ার পরিকল্পনা আর দু'একটা জমায়েতের তালিকাও ওদের হাতে পড়েছে।......আপনারা বোধহয় এও জানেন না যে আজ ভোরেই ভিলেন্‌কিন গ্রেপ্তার হয়েছে।"

এক ঝটকায় সোফা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দরজার উপরকার টানা পর্দাটা সরিয়ে দিলেন একপাশে। দাশার দিকে ফিরে বললেন :

"এ দিক দিয়ে আসুন। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!"

"সংকেত!"

জানলার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন যে ভদ্রলোকটি তার মুখ থেকে ছোট্ট কথাটা বেরিয়ে এল। দাশা কার্ডবোর্ডের ত্রিভুজটা সামনে এগিয়ে দিল। "কে দিয়েছে ওটা?" (দাশা ব্যাখ্যা করতে যায়) "সংক্ষেপে বল!"

বাঁ হাত দিয়ে মুখের ওপর সিল্কের একখানা রুমাল চেপে ধরেছিলেন উনি। কালচে বাদামী মুখখানা ঢাকা পড়েছে রুমালে—মুখের রঙটা হয় স্বাভাবিক আর নয়তো কৃত্রিমভাবে করা হয়েছে ঐ রকম। চোখের কিনারা হলদে, জোলো-জোলো। দাশার দিকে অধীরভাবে তাকাচ্ছেন। বাধা দিয়ে আবার বলে উঠলেন :

"এ-সংগঠনে ঢুকে তোমার যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে সে খেয়াল আছে?"

"আমি একলা মানুষ, ইচ্ছেমতো চলাফেরা করি", বলল দাশা : "সংঘ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্যই। নিকানর য়ুরেভিচই আমাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বেকার হয়ে বসে থাকা তো আর চলে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কাজে আমি কখ্‌খনো ভয় পাই না, এমন-কি......"

"তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ।......"

আগের মতোই দমক-ভরা গলায় কথাগুলো বললেন তিনি; কিন্তু দাশা এবার অবাক হয়ে ভুরু উঁচোলো।

"আমার বয়েস যে চব্বিশ।"

"তুমি কি—বিয়ে করেছ?" (দাশা কোনো জবাব দিল না)। "এ ব্যাপারে জিনিসটার গুরুত্ব খুব বেশি।" (মাথা নাড়ল দাশা)। "তোমার নিজের কথা কিছু বলার দরকার নেই, আমি তোমাকে বুঝে নিয়েছি। তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। শুনে অবাক হলে নাকি?"

চোখ পিট্‌পিট্‌ করা ছাড়া দাশার আর কিছু করার নেই। কাটা-কাটা কথা, কর্তৃত্বভরা আত্মপ্রত্যয়ের সুর, আর সেই ঠাণ্ডা দুটো চোখের দৃষ্টি ওর দোদুল্যমান মনটাকে যেন তাড়াতাড়ি শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলছিল। দাশার অনুভূতিটা এখন স্বস্তির অনুভূতি—রোগশয্যার পাশে বসে ডাক্তার যখন ঝকঝকে চশমাজোড়ার ফাঁক দিয়ে বিচক্ষণ চোখে তাকিয়ে বলেন : 'তা'হলে আপনাকে এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে......' তখন যেমন মনে হয় ঠিক তেমনি একটা হাঁফ-ছেড়ে-বাঁচার অনুভূতি এখন দাশার।

মুখে রুমাল চাপা-দেয়া ভদ্রলোকটিকে দাশা আরও মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। তেমন লম্বা নন, মাথায় পরেছেন নরম টুপি, গায়ে চমৎকার হরিণের চামড়ার ওভারকোট, পায়ে চামড়ার পটি। পোশাক-আশাক আর ঘড়ির-কাঁটার মতো চাল-চলন দেখলে মনে হয় যেন বিদেশী মানুষ, কিন্তু কথা বলছেন পিতার্সবুর্গের টান দিয়ে—গলার স্বরটাও কেমন যেন অস্পষ্ট আর চাপা।

"কোথায় উঠেছ এখানে?"

"কোথাও না—ট্রেন থেকে সোজা চলে এসেছি।"

"বেশ। এখন তোমায় যেতে হবে ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটে, কাফে বম্‌-এ। সেখানে খাবার অর্ডার দেবে। একজন লোক আসবেও তোমার কাছে—দেখলেই চিনতে পারবে, তাঁর টাই-পিনে মড়ার মাথা আঁকা। তিনি তোমাকে সংকেত দেবেন : 'ভগবান আপনার সহায় হোন্‌।' তখন তুমি এইটে দেখাবে তাঁকে।" (কার্ডবোর্ডের ত্রিভুজটা দু' টুকরো করে ছিঁড়ে এক টুকরো দিলেন দাশার হাতে) "কিন্তু দেখাবার সময় অন্য কারুর নজরে যেন না পড়ে। উনি যা যা বলবেন প্রত্যেকটা কথা মেনে চলতে হবে। সঙ্গে টাকা আছে?"

পকেট-বই থেকে দুটো হাজার-রুব্‌লের 'দুমা'-নোট বের করলেন তিনি।

"তোমার খরচ-খরচা সব দেয়া হবে। এই টাকাটা সঙ্গে রাখ, বিপদ-আপদে কাছে লাগবে, হয়তো ঘুষ দিতে হতে পারে কিংবা পালাতে-টালাতেও হতে পারে। যে কোনো অবস্থার জন্য তৈরি থেকো। এখন যাও।......কিন্তু প্রথম কথা হল, আমি যা-যা বলেছি সব বুঝতে পেরেছ তো?"

"হ্যাঁ"—তোৎলাতে তোৎলাতে বলল দাশা। নোট দুটো ভাঁজ করতে করতে ও ছোট্ট করে ফেলে একেবারে।

"আমাকে যে দেখেছ সে কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবে না! কাউকে কখখনো ভুলেও বোলো না যে এখানে তুমি এসেছিলে! এখন যাও।"

ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটে দাশা হেঁটেই চলে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, খিদেও পেয়েছে খুব। বুলভারের দু'পাশের গাছগুলো, আর কদাচিৎ দু'একজন গম্ভীর-মুখ পথচারী—যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে সবাই। কিন্তু দাশার মনে এখন শান্তি, ওর সেই যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। ঘূর্ণি ঝড়ের মতো তাকে এখন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দুরধিগম্য ঘটনাস্রোত, তাকে পাক খাইয়ে খাইয়ে টেনে নিয়ে চলেছে এক উদ্দাম জীবনের অভিমুখে।

গাছের বাকলার জুতো-পরা দু'জন স্ত্রীলোক হন্ হন্ করে হেঁটে আসছিল ওরই দিকে। পর্দার ওপর ছায়া পড়লে যেমন দেখায় তেমনি আবছা দেখাচ্ছে ওদের মূর্তি। দাশাকে লক্ষ্য করে একজন চাপা গলায় বলল :

"বেহায়া মাগি—সোজা হয়ে দাঁড়াবার মুরোদ নেই, দেখেছিস!"

একটি দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রমহিলা পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, উশ্কোখুশকো চুল এলোমেলো জট পাকিয়ে আছে, ফুলো-ফুলো ঠোঁটের দু'পাশে করুণ, কষ্টব্যঞ্জক দুটি রেখা। একসময় তাঁর চেহারাটা নিশ্চয় সুশ্রীই ছিল, কিন্তু এখন তাতে দারুণ একটা হতবুদ্ধিতার ছাপ পরিস্ফুট। পরনের লম্বা কালো স্কার্টটায় অন্য রঙের কাপড় দিয়ে এমনভাবে তালিমারা যে সহজেই নজরে পড়ে। একটা লম্বা শালের নিচে একগাদা বই নিয়ে যাচ্ছিলেন, শালের আঁচলাটা মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছে। নিচু গলায় দাশাকে বললেন :

"রোজানভের লেখা বে-আইনী বইগুলো আর ভ্লাদিমির সলোভিয়ভের পুরো সেটটা রয়েছে, নেবেন নাকি?"

আরো খানিকটা দূরে তিনজন বুড়োকে পার্কের একটা বেঞ্চের ওপর ঝুঁকে বসে থাকতে দেখল দাশা। সামনে দিয়ে যাবার সময় নজরে পড়ল, আসলে বেঞ্চের উপর দু'জন লালফৌজের লোক গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছে, দু'হাঁটুর মাঝখানে রাইফেল দুটো রেখে মুখ হাঁ করে তারা গভীর ঘুমে অচেতন; বুড়ো তিনটি ওদের লক্ষ্য করে চাপা গলায় নোংরা গালিগালাজ করছে।

গাছগুলোর ওধারে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুকনো বাতাস। শুধু একখানা ট্রাম চলেছে রাস্তায়, তার আবার সিঁড়িটা ভেঙে ঝুলে পড়েছে—পাথরকুচি-গুলোর ওপর ঠকর-ঠকর আওয়াজ করছে ভাঙা সিঁড়ি। গাড়ির হাতল ধরে ঝুলছে ধূসর উর্দি-আঁটা সৈন্যের দল, কেউ কেউ আবার পিছনের ব্রেকের ওপর চড়ে বসেছে। পুশ্কিনের ব্রোঞ্জমূর্তিটার মাথায় ফূর্তিতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কতগুলো চড়ুই পাখি—বিপ্লব সম্পর্কে ওদের চরম নিরাসক্তি।

ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটে এসে পড়ল দাশা। এক দমক ধুলোর মেঘ উঠেছে ওর ঠিক পেছনেই, ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়িয়ে নিয়ে আসছে ওর দিকে, কাফে বম্-এর দিকেই যেন ঠেলে দিচ্ছে ওকে। ভাবনাচিন্তাহীন পুরনো জীবনের শেষ

আশ্রয়দুর্গ এই কাফে বম্‌। নানান্‌ মতের কবি, প্রাক্তন সাংবাদিক ও সুযোগ-সন্ধানী সাহিত্যিক এখানে ভিড় জমাতেন, আর জুটতো একদল চঞ্চল তরুণ—গোলযোগের দিনগুলোতে যাদের সুকৌশলে নিজেদের সুবিধে করে নিতে একটুও কষ্ট হয়নি; একঘেয়ে জীবন আর কোকেনের নেশায় বুঁদ হয়ে-থাকা অনেক তরুণীও আড্ডা জমাতো এখানে; এ ছাড়া ছিল চুনোপুঁটি অ্যানার্কিস্টদের আনা-গোনা। এরা সবাই আসতো তীব্রতর অনুভূতির আস্বাদ-সন্ধানে, আর শহরের সাধারণ লোক যারা আসতো তাদের একমাত্র আকর্ষণ ছিল এখানকার তৈরি কেক।

কাফের একেবারে পিছনের দিকের একটা আসনে, বিখ্যাত এক লেখকের আবক্ষ মূর্তির নিচে দাশা সবে জায়গা করে বসেছে, এমন সময় একটি লোক যেন অবাক হয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে তামাকের ধোঁয়ার জাল ভেদ করে ছুটে এল দাশার দিকে। ওর পাশেই একটা আসনে ধপ্‌ করে বসল লোকটা; হিহি করে গ্যাঁজলা-ওঠা হাসি হেসে এক সারি নোংরা দাঁত বার করল। দাশা ওকে চিনতে পেরেছে, ওদেরই পুরনো বন্ধু—কবি আলেকসান্দার ঝিরভ।

"সারা লুবিয়ান্‌কা আমি আপনার পিছু পিছু ছুটেছি।......আমি ঠিক ধরেছিলাম, এ নিশ্চয় আপনিই, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না। কিন্তু কোথা থেকে উদিত হলেন, বলুন তো? আপনি একা? না কি স্বামীও আছেন সঙ্গে? আমাকে চিনতে পারছেন তো? আমি আপনাকে ভালবাসতাম—আপনি তো জানতেন সে কথা, তাই না?"

ঝিরভের চোখে একটা তেল-চক্‌চকে ঔজ্জ্বল্য। পরিষ্কার বোঝা যায়, ওর কোনো প্রশ্নের জবাব পাবে এমন আশাই তার নেই। ঠিক আগের মতোই রয়েছে লোকটি—সারাক্ষণ যেন উত্তেজনায় ছটফট করছে। কিন্তু ওর গায়ের চামড়াটা ঝুলে পড়েছে, দেখলে মনে হয় কেমন যেন ব্যারামী-ব্যারামী। আর লম্বা পাঁশুটে ধরনের মুখখানার ওপর তার উঁচোনো নাকটা, গোড়ার দিকে মোটা আর একটু যেন তেরছাও।

"আপনি যদি জানতেন কীভাবে এই বছরগুলো কাটিয়েছি!......একেবারে অবিশ্বাস্য।......বহুকাল হল মস্কো ছেড়েছি।......জানেন তো আমি ইমেজিস্ট গ্রুপের* লোক—সেরিওঝা এসেনিন, বুর্লিয়ুক, ক্রুচোনিখ, এ'রাও তা-ই। আমরা সব তলায় তলায় ভাঙন ধরাচ্ছি। স্ত্রাস্‌নয় মঠের পাশ দিয়ে একবারও যাননি? দেয়ালের ওপরকার বড়ো-বড়ো অক্ষরগুলো দেখেছেন? সত্যি, কী দারুণ বেপরোয়া কাজটাই না করা গেছে, একেবারে অভূতপূর্ব!—বলশেভিকরা পর্যন্ত ভেবড়ে গেছে কান্ড দেখে। এসেনিন আর আমি সারারাত ধরে এই কারবারটি করেছি। কুমারী মেরী আর যিশুখৃষ্টের নাম পর্যন্ত ঢোকাতে কসুর করিনি......যাকে বলে একেবারে মহাজাগতিক অশ্লীলতা—দুটি বুড়ি ভদ্রমহিলা সক্কালবেলায় উঠেই লেখাগুলো

* ইমেজিস্ট—আধুনিক কবিদের একটা অনুদল যাঁরা মনে করেন প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতা লাভ করা যেতে পারে একমাত্র যথাযথ চিত্রায়ণের মাধ্যমেই। এ'রা রোমাণ্টিকতাবাদের ঘোরতর বিরোধী।

দেখে তো চক্ষুস্থির, ওইখানেই পটল তুলেছে দু'জন।......আমি আবার অ্যানার্কিস্টদের 'কালো বাজ' দলটার মধ্যেও আছি, তা জানেন তো দারিয়া দেবী।...... আমরা আপনাকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনব দেখবেন 'খন।......নিমরাজি হয়ে লাভ নেই, আনবই আমরা আপনাকে! আমাদের নেতা কে জানেন? স্বনামধন্য মামন্ত্‌ দাল্‌স্কি।......লোকটার সত্যিই প্রতিভা আছে, দ্বিতীয় কীন বলতে পারেন, সত্যিকারের দুঃসাহসী লোক।......এই হপ্তাখানেক কি হপ্তাদুয়েক যেতে দিন না, সারা মস্কো আমাদের হাতে চলে আসবে।......একটা নতুন যুগের গোড়াপত্তন হবে! কালো ঝাণ্ডার নিচে মস্কো শহর! কেমন করে বিজয়োৎসবটা করব তা জানেন তো? ঢালাও হুল্লোড়-ফুর্তির হুকুম দিয়ে দেব......মদের ভাঁটিগুলো খোলা থাকবে একদম, স্কোয়ারে স্কোয়ারে মিলিটারীর বাজনা বাজবে, আর লাখে-লাখে মুখোশ-আঁটা ফুর্তিবাজের দল বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়—ওদের মধ্যে আর্ধেকই যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে হল্লায় যোগ দেবে তাতে সন্দেহ নেই? আর আতসবাজি দেখাব আমরা লসিনো-অস্ত্রভ্‌স্কায়ার গোলাবারুদের ডিপো উড়িয়ে দিয়ে। সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনার নজীর হয়ে থাকবে।"

এ-ক'দিনে যে-সব রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে দাশার পরিচয় ঘটেছে এ হল তার তৃতীয়। এবার সে নেহাৎই ভয় পেয়ে গেছে। এমন-কি খিদে পর্যন্ত মাথায় চড়ে গেছে ওর। সত্যি-সত্যি দাশার মনে দাগ কাটতে পেরেছে দেখে ঝিরভ বেজায় খুশি হয়ে উঠল, আরও বিশদভাবে বলতে শুরু করল এবার।

"একালের শহরগুলোর অসভ্যতা দেখে আপনার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না? আমার বন্ধু ভালেৎ, সেই যে সেই প্রতিভাধর আর্টিস্ট্‌টি—ওর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই?—ও একটা ছক করেছে—শহরের চেহারা যাতে পুরোপুরি পাল্টে দেয়া যায় তারই নক্‌শা।......উৎসবের সেই দিনটার আগে অবশ্য সবকিছু ভেঙে আবার নতুন করে গড়ার সময় পাওয়া যাবে না।......তবে কয়েকটা বাড়ি তো উড়িয়ে দিতেই হবে—এই যেমন ধরুন, ঐতিহাসিক যাদুঘর, ক্রেমলিন, সুখারেভ টাওয়ার, পের্ৎসভ প্রাসাদ।...আমাদের ইচ্ছে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে বাড়ি-সমান উঁচু করে তক্তা বসিয়ে দেব—ওগুলোর ওপর আঁকা থাকবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সব স্থাপত্যের নিদর্শন।... গাছগুলোর ওপর রঙের পিচকারি ছেড়ে দেব—পাতাটাতাগুলোর স্বাভাবিক রং তো আর আমরা থাকতে দিতে পারি না!...ভাবুন না কেন, প্রেচিস্‌তেন্‌স্কি বুলভারের দু'পাশে কালো-কালো লাইম গাছ, আর ৎভেরস্কয় বুলভারেরগুলো সব বীভৎস বেগুনি! কি রকম ভয়াবহ দেখাবে! পুশকিনের মূর্তিটাকে সর্বজনীনভাবে প্রকাশ্যে কলুষিত করারও একটা মতলব এঁটেছি আমরা।......তেলেগিনের ফ্ল্যাটে সেই 'মহান পাষণ্ডাচার' আর 'ঐতিহ্য-বিরোধী সংগ্রামের' কথা মনে আছে আপনার? লোকে তখন আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করত!"

অতীতের কথা বলতে বলতে ঝিরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে হি-হি করে হাসছিল, দাশার কাছে সরে এসে হাত নাড়ার ছলে মাঝে মাঝেই ওর প্রায়-দুর্লক্ষ্য স্তনরেখা ছুঁয়ে দিচ্ছিল।......

"তারপর এলিজাবেতা কিয়েভনার কথা মনে আছে, সেই যে ভেড়া-চোখো মেয়েটি? আপনার ফিয়াঁসের ওপর ওর দারুণ টান ছিল, থাকতো কিন্তু বেসনভের সংগে। বিয়ে করেছিল ঝাদভকে। ঝাদভ হল নামকরা জংগী অ্যানার্কিস্ট।...... ও আর মামন্ত্ দাল্স্কি—এই দু'জনই তো আমাদের তুরুপের তাস। আন্তোশ্কো আর্নলদভ্ও এখানেই আছেন, জানেন! সাময়িক সরকারের আমলে গোটা সংবাদপত্রজগতটাই তো ওঁর হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল।...দু' দুটো প্রাইভেট গাড়ি......বড়োঘরের মেয়েদের সংগে শয্যাগ্রহণ।......একজন ছিল 'ভিলা রদেল্'-এর হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে—রীতিমতো সুন্দরী।......ওর সংগে বিছানায় যাবার সময় আর্নল্দভ রিভলবারটা পকেটে গুঁজে নিতে ভুলত না। গত জুলাই মাসে প্যারিসে গিয়েছিল—আর একটু হলেই রাষ্ট্রদূত হয়ে যেতে পারত।......কিন্তু এমন গাধা একটা! বিদেশের ব্যাংকে পুঁজি সরাবার কোনো ব্যবস্থাই করেনি, তাই এখন রাস্তার কুকুরের মতো অনশনে দিন কাটাচ্ছে। হ্যাঁ, দারিয়া দেবী, নতুন যুগের সংগে তাল রেখে চলতেই হবে। কিরোচ্নায়া স্ট্রীটে পেল্লায় বাড়ি, পালিশ-করা ফার্নিচার আর কফির কেত্লি, আর একশো জোড়া জুতো—এই করেই তো ডুবল আন্তোশ্কো আর্নল্দভ। সমস্ত রকম সংস্কার আমাদের ভাঙতে হবে, গুঁড়িয়ে, পুড়িয়ে দিতে হবে।......চূড়ান্ত উদ্দাম, পাশবিক, আদিম স্বেচ্ছাচার—এই তো আমাদের প্রয়োজন! এমন সুযোগ আর কখনো মিলবে না।......বিরাট একটা পরীক্ষামূলক কাজ চালাচ্ছি আমরা। মধ্যবিত্তসুলভ লক্ষ্মীলাভের ও-সব আশা ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। আমরাই লুটিয়ে দেব ধুলোয়।......সীমাহীন ভোগতৃষ্ণা নিয়েই তো মানুষ।......" (এইবার গলার স্বরটা নামিয়ে দাশার একেবারে কানে কানে বলল) "বলশেভিকগুলো একেবারে গোবর, বুঝলেন? অক্টোবর মাসের ওই একটি সপ্তাহেই ওদের যা দাম ছিল...... তারপর তো সব আবার পোঁ ধরল 'রাষ্ট্র' শৃঙ্খলারই। রাশিয়া বাবা চিরকালই অ্যানার্কিস্টদের দেশ, রুশ চাষীগুলো তো জন্ম-অ্যানার্কিস্ট!......বলশেভিকগুলো চায় রাশিয়াকে একটা ফ্যাক্টরি বানাতে—যতো সব মূর্খ জুটেছে! ওরা জীবনেও কিছু করতে পারবে না। আমাদের রয়েছেন মাখনো। ওঁর তুলনায় পিটার-দি-গ্রেট তো দুধের বাচ্চা। দক্ষিণে মাখনো, মস্কোতে মামন্ত্ দাল্স্কি আর ঝাদভ...... দু'দিক থেকে আমরা ওদের পিষে মারব না? আজ রাতে আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব, দেখবেন আমাদের কাজের পরিধি কতো বিরাট।......আপনি নিশ্চয় করে আসবেন। আসবেন না?"

ছুঁচলো-দাড়িওয়ালা পাংশু চেহারার এক যুবক পাশের টেবিলে কয়েক মিনিট হল বসে আছে। খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে প্যাঁশ্নের ফাঁক দিয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দাশার দিকে। ঝিরভের গলাবাজি শুনে দাশা এমন হতভম্ব হয়ে গেছে যে প্রতিবাদ করার কথা ওর মনেই হয়নি : ঝিরভের এই সব অপার্থিব ধারণা যেন বিদ্যুৎবেগে জন্ম নিচ্ছে ধোঁয়াটে মেঘের আড়াল থেকে, আর বিস্ফারিত চোখের তারা মেলে, দাঁতে সিগারেট চেপে, অদ্ভুত সব মুখ যেন সরে যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর আশে-পাশে। এ সব কথার কী জবাব সে দেবে? জবাবে সে শুধু

করুণভাবে বিলাপ করতে পারে এই বলে যে ওদের এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে; কিন্তু ওর এ আর্তবিলাপ তো ডুবে যাবে শয়তানী খুশির চিৎকারে, বিদ্রুপের হাসি আর উপহাসের বন্যায়।

ছুঁচলো-দাড়ি সেই লোকটির চোখ দুটো এবার যেন আরো তীক্ষ্ণভাবে দাশাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। লাল টাইয়ের ওপর ধাতুর তৈরি ছোট মড়ার-মাথাটা দেখেই দাশা বুঝতে পারল এই সেই লোক, এরই সঙ্গে ওর দেখা করার কথা। কিন্তু টেবিল ছেড়ে দাশা ওঠার ভাব করতেই লোকটি সামান্য একটু মাথা নেড়ে ইশারা জানাল : যেমন আছো ওইখানেই বসে থাকো। দাশা ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল কী করা যায়। লোকটি অর্থপূর্ণভাবে একবার ঝিরভের দিকে তাকাল। দাশাও বুঝতে পেরেছে। ঝিরভকে বলল ওর জন্য কিছু খাবার এনে দিতে। যেই ঝিরভ সরেছে অমনি সেই ছুঁচলো-দাড়িওয়ালা লোকটি দাশার টেবিলের সামনে এসে প্রায় ঠোঁট না খুলেই বলল :

"ভগবান্ আপনার সহায় হোন!"

দাশা ওর ব্যাগটি খুলে ত্রিভুজের আধখানা বের করল। অন্য আধখানার সঙ্গে একবার জুড়ে দেখেই লোকটি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল দুটো খণ্ড।

"ঝিরভকে চিনলেন কীভাবে আপনি?"—তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল সে।

"ওকে তো অনেককাল হল চিনি—সেই পিতার্সবুর্গ থাকতে।"

"যাক ব্যাপারটা ভালই হল আমাদের পক্ষে। লোকে নিশ্চয় ভাববে আপনি ওদের দলেরই লোক। ও যা-যা বলে সব মেনে নিন। আর কাল ঠিক এই সময়—ভুলবেন না যেন!—প্রেচিস্‌তেন্‌স্কি বুলভারের শেষ মাথায় গোগোলের স্মৃতি-স্তম্ভের নিচে থাকবেন। আজ রাতটা কোথায় কাটাচ্ছেন?"

"তা তো জানি না।"

"আজকের রাতটা থাকুন যেখানে খুশি। ঝিরভের সঙ্গেই যান না কেন..."

"ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে!"

দাশার চোখ জলে ভরে গেছে, হাত দুটো কাঁপছে। কিন্তু লোকটির কঠিন মুখ আর তার টাইয়ের মড়ার-মাথাটায় একবার চোখ পড়তেই সে যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল।

"মনে রাখবেন—চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। মুখ থেকে যদি একটা কথাও খসে, তা সে হঠাৎই হোক আর যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খারিজ করে দেয়া হবে।"

'খারিজ' কথাটার ওপর জোর ছিল খানিকটা। দাশার আঙুলের ডগা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। ঝিরভ পথ করে এগিয়ে আসছিল হাতে দুটো প্লেট নিয়ে। মড়ার-মাথার টাই-পিন আঁটা লোকটি ঝিরভের দিকে এগিয়ে গেল, সরু ঠোঁট দুটো বিদ্রূপে কুঁচকে উঠেছে তার। দাশা শুনতে পেল লোকটি বলছে : "এই খুবসুরত মেয়েটি কে শুনি?"

"নাও, নাও, হাত সরাও য়ুরকা!"—ঝিরভ বলল জবাবে, শাসানির সুরটাকে

যেন হাসি দিয়ে আড়াল করে রেখেছে সে। ওর ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁত-কটা বেরিয়ে পড়েছে একদম।

দাশার সামনে কালো রুটি, সসেজ আর বাদামি রংয়ের কী একটা পানীয় এনে রাখল ঝিরভ।

"আজ রাতের ব্যাপারটা তা হলে?......"

"ক্ষতি কী?" —বিষণ্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সসেজের একটা টুকরো কামড়ে নিয়ে জবাব দিল দাশা।

রাস্তার ওপারে হোটেল লুক্স-এ ঝিরভের কামরাটা। সেখানে আসবার জন্য অনুরোধ জানালো সে দাশাকে।

"ইচ্ছে করলে আপনি ঘুমিয়ে স্নান-টান করে নিতে পারেন—আমি এই গোটা দশেক নাগাদ এসে আপনার খোঁজ নেব।"

দাশাকে নিয়ে যদিও সে অনেক ঘুরল, হৈ-চৈও করল, কিন্তু তবু যেন দাশার সম্পর্কে কেমন একটা সশ্রদ্ধ ভয় রয়ে গেছে ওর মনে। ঝিরভের ঘরটায় ব্রকেডের পর্দা, গোলাপী কার্পেটও আছে। কিন্তু বিছানাটা দেখলে এমন একটা অনাস্থার ভাব আসে যে সে নিজে থেকেই দাশাকে বলে, এর চেয়ে বরং সোফার ওপর ঘুমোলে ভাল। সোফা থেকে বই-পত্র, পাণ্ডুলিপি, খবরের কাগজ ইত্যাদি হটিয়ে দিয়ে সে একটা চাদর পাতে, কালো ফারের একটা খণ্ডও বিছিয়ে দেয়—বোঝা যায় একসময় ওটা দামী কোটের লাইনিং ছিল। তারপর সে হি-হি করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। জুতোজোড়া খুলে ফেলে দাশা। ওর পা, পিঠ, সারা শরীরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। মোটা ফারটার নিচে নাক গুঁজে শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে সে—সুগন্ধী আর ন্যাপথলিনের সুবাস ভেদ করে ওটার মধ্যে থেকে জানোয়ারের গায়ের মৃদু একটা গন্ধ আসতে থাকে। ঝিরভ এসে কোন্‌সময় ওর উপর ঝুঁকে পড়ে দেখে গেছে ওকে, দাশা তা টেরও পায়নি। শুনতে পায়নি—রোমান ছাঁচের চেহারা, লম্বা-চওড়া দাড়ি-কামানো একটি লোক কখন এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মোটা ভারি গলায় বলে গেছে : 'বেশ, ওকে তাহলে নিয়ে যেও সেখানে—একটা চিরকুট পাঠিয়ে দেব 'খন।'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে দাশা যখন জাগলো, সন্ধ্যে হয়ে গেছে ততক্ষণে। উল্টোদিকের বাড়িটার ছাদের ওপাশে একটা হলদে চাঁদ উঠেছে, শার্সির উঁচু-নিচু কাঁচের ওপর তারই ভাঙা-ভাঙা প্রতিবিম্ব। দরজার নিচে ইলেকট্রিক বাল্‌বের একখণ্ড আলো এসে পড়েছে। এতক্ষণে দাশার খেয়াল হল কোথায় রয়েছে ও। তাড়াতাড়ি মোজা-জোড়া এঁটে নিয়ে, চুল আর পোশাকটা গুছিয়ে জলাধারটার দিকে এগিয়ে গেল ও। তোয়ালেটা এমন নোংরা যে ভিজে হাতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল হাতটা মুছবে কি না, তারপর স্কার্টের ভেতর দিকের আঁচলাটা উল্টে নিয়ে সে তাতেই হাত দুটো মুছল।

নোংরামি দেখে ওর গা যেন ঘিন-ঘিন করছিল। মনে হচ্ছিল একবার যদি ওর নিজের বাসায় ফিরে যেতে পারতো, পরিষ্কার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একবারটি

বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেত সোয়ালো পাখির ঝাঁক!......মাথা ঘুরিয়ে দেখল চাঁদটাকে, বিকৃত অশুভ একটা কাস্তের মতো মস্কোর আকাশে ঝুলে আছে মুমূর্ষু চাঁদ। না, না! ফিরে যাওয়া চলবে না কিছুতেই! নির্জন কামেনো-অস্ত্রভ স্ট্রীটের দিকে তাকিয়ে থেকে জানলার পাশের সেই আরাম কেদারাটিতে বসে মৃত্যুর প্রহর গোনা? দরজা জানলায় তক্তা আঁটার সেই শব্দ আবার কান পেতে শোনা?...... না, না, কিছুতেই ও তা পারবে না......যাই ঘটুক না কেন, ফেরার কথাটি আর নয়...

দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছে ঝিরভ।

"অনুমতি-পত্র পাওয়া গেছে, আসুন তা হলে দারিয়া দেবী!"

দাশা একবার জিজ্ঞেসও করল না কিসের অনুমতি-পত্র, কোথায় যেতে হবে ওকে। শুধু ঘরে-তৈরি টুপিটা কপালের ওপর টেনে দিয়ে দু'হাজার রুবলের নোট-ভরা ব্যাগটা জামার একপাশে গুঁজে রাখল সে। তারপর বেরিয়ে পড়ল দু'জন।

ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটের একদিকটায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। আর কোনো আলো নেই। খালি রাস্তায় ধীরে ধীরে পায়চারি করছে একজন পাহারাদার। রাস্তাটা নিস্তব্ধ, শুধু যা একটু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ভারি বুটের।

ঝিরভ ওকে স্ত্রাস্তনয় বুলভারের দিকে টেনে নিয়ে চলল। এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর এখানে-ওখানে চাঁদের আলোর ছোপ। লাইম গাছগুলোর তলায় তলায় এমন গাঢ় অন্ধকার জমেছে যে সেদিকে তাকাতে ভয় করে। ঐ অন্ধকার ছায়ার মধ্যেই একটা মূর্তি যেন অদৃশ্য হয়ে গেল মনে হল। রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিরভ।

এক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপরেই ও শিস্ দিল আস্তে। আঁধারের ভেতর থেকেও জবাব এল। এবার গলাটা একটু উঁচুতে তুলে ঝিরভ বলল : "মাঝের শড়ক!" পরিষ্কার টেনে-টেনে কে যেন উচ্চারণ করল : "ব্যস্ যাও, কমরেড।'

মালায়া দ্মিত্রভ্কায় এসে পড়ল ওরা। চামড়ার জ্যাকেটপরা দু'জন লোক রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছিল ওদের দিকে, কিন্তু একবার নজর বুলিয়েই নিঃশব্দে ছেড়ে দিল পথ। প্রাক্তন মার্চেণ্ট ক্লাবের দোতলা থেকে প্রবেশ-পথের ওপর ঝুলছিল একটা কালো ঝাণ্ডা। ওরা বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই চারজন লোক বেরিয়ে এল প্রবেশপথের থামগুলোর আড়াল থেকে। আগন্তুকদের ওপর দিয়েই ওরা রিভলবারের টিপটা পরীক্ষা করে দেখল একবার। দাশা প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ার জোগাড়।

চটে গিয়ে ঝিরভ বলল : "এসব কী হচ্ছে কমরেড! লোককে এইভাবে ভয় দেখাতে হয়? আমার সঙ্গে মামন্তের সই-করা অনুমতিপত্র আছে......"

"একবার দেখতে পারি?"

চারজন লোকেরই মসৃণ গালগুলো উঁচু কলারের আড়ালে ঢাকা, টুপির নিচে লুকোনো চোখগুলো। চাঁদের আলোয় ওরা অনুমতিপত্রগুলো পরীক্ষা করল। একটা কাষ্ঠহাসির নিচে আড়ষ্ট হয়ে জমে গেছে ঝিরভের মুখোশের মতো মুখাকৃতি। চারজনের একজন রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল :

"কার নামে এটা?"

"এই কমরেডের নামে।"—দাশার হাতটা হাতে নিয়ে বলল ঝিরভ: "পেত্রোগ্রাদের একজন অভিনেত্রী ইনি।......এঁকে তৈরি করতে হবে। আমাদের গ্রুপেই যোগ দিতে যাচ্ছেন......"

"ঠিক আছে......ভেতরে যান......"

মৃদু-আলোকিত একটা হলঘরে ঢুকল দাশা আর ঝিরভ। সিঁড়িতেই বসানো রয়েছে একটা মেশিনগান। ঘরে ঢুকল কম্যাণ্ডাণ্ট, বেঁটে, গোলমুখো, বয়েসে তরুণ। ছাত্রদের উর্দি পরনে, মাথায় আঁটসাট টুপি। অনুমতিপত্রটা হাতের মধ্যে নিয়ে বারবার উল্টেপাল্টে খুব যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর হেঁড়ে গলায় দাশাকে বলল:

"কী ধরনের পোশাক-আশাক হলে আপনার চলবে?"

ওর হয়ে ঝিরভ জবাব দিল: "মামন্ত্ হুকুম দিয়েছেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঁর নতুন সাজপোশাক চাই। সবচেয়ে সেরা জিনিস যা পাওয়া যায় তাই দিতে হবে।"

"মামন্ত্ 'হুকুম' দিয়েছেন কথাটার মানে কী হল? আপনার জানা দরকার কমরেড, আমরা এখানে কারুর হুকুম তামিল করতে আসিনি। এটা তো আর দোকান নয়।" (এমন সময় কম্যাণ্ডাণ্টের হাঁটুটা যেন কুট্‌কুট্ করতে থাকে, ভুরু কুঁচকে জায়গাটা চুলকোতে শুরু করে সে) "বেশ, আসুন তাহলে!"

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে সে সামনের একটা কামরায় ওদের নিয়ে গেল। একসময় পোশাক-ঘর ছিল এখানে, এখন এই 'অরাজক-পুরীর' ভাণ্ডার-ঘর হয়েছে।

"আপনার যা যা পছন্দ সব বেছে নিন, দারিয়া দেবী" বলল ঝিরভ: "এতে আর লজ্জার কী আছে—সবই তো জনসাধারণের সম্পত্তি......"

এপাশ থেকে ওপাশ হাত নেড়ে ঝিরভ কোটের র‍্যাকগুলো দেখিয়ে দিল। নানা ঢঙের লম্বা লেডীজ্ ফার কোট ঝুলছে; সেব্‌ল্, এরমিন, সিলভার ফক্স, চিন্‌চিলা, মারমোসেট, সীল্‌স্কিন ইত্যাদির কোটও রয়েছে। কিছু কিছু টেবিলের ওপর জমা-করা, কিংবা স্রেফ মেজের ওপর পাহাড় করে রাখা। খোলা ট্রাঙ্ক থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে নানাধরনের পোশাক, মেয়েদের অন্তর্বাস, আর জুতোর বাক্স। রীতিমত একটি বিলাস-ভাণ্ডার যেন উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে কামরাটার ভেতর। অঢেল ঐশ্বর্যের এই সমারোহের মধ্যেও কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেবটি যেন পরম নির্বিকার-ভাবে একটা বাক্সের ওপর বসে হাই তুলছে।

"দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা"—ঝিরভের গলায় তাগাদার সুর—"আপনার যা খুশি নিয়ে নিন না, আমিই না হয় বইব। উপরের ঘরে এসে ইচ্ছে করলে পোশাক বদলে নিতেও পারেন।"

দাশার ভাবাবেগের মধ্যে যত জটিলতাই থাকুক না কেন আসলে তো ও মেয়েমানুষই। গাল দুটো তাই ওর রাঙা হয়ে ওঠে। এক হপ্তা আগে ঘরের

জানলার পাশে বসে যখন ও রৌদ্রতাপ-বঞ্চিত লিলিফুলের মতো প্রায় নুয়ে ঝরে পড়ছিল সে সময় ওর স্থির ধারণা ছিল, এই বুঝি সব শেষ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বুঝি কিছুই রইল না।—এমনি ধরনের ঐশ্বর্যের কোনো মোহ তখন হয়তো তাকে প্রলুব্ধই করতে পারত না। এখন মনে হচ্ছে ওর আশে-পাশের সবকিছুর মধ্যে যেন জীবনের সাড়া জেগেছে, ওর নিজের অন্তরের যতো কিছু একসময় মনে হয়েছিল স্থবির, মৃত, এখন তা সবই যেন গতিচঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর এখন এক এক অদ্ভুত মনের অবস্থা, সব কামনা-বাসনা আর অংকুরিত আশা যেন ধেয়ে চলেছে অনাগত দিনের কম্পিত কুহেলি লক্ষ্য করে; আর বর্তমান ওকে ঘিরে পড়ে আছে ভগ্ন অট্টালিকার মতো ধ্বংসস্তূপ হয়ে।

ও যেন নিজের গলাও চিনতে পারে না, অবাক লাগে ওর নিজের আচরণ দেখে, নিজের প্রত্যুত্তর শুনে। আশেপাশের এই উদ্ভট পরিবেশটাকে ও যে কেমন নির্বিকারচিত্তে মেনে নিয়েছে সেইটেই ওর পরম বিস্ময়। মনের সংগোপনে এতদিন যে সহজাত বাসনাটা সুপ্ত ছিল আজ তা জেগে উঠেছে, ওর কানে-কানে বলছে, পাল তুলে দিয়ে ভেসে পড়ার এই তো সময়, অপ্রয়োজনের যত বোঝা সব ফেলে দাও সমুদ্রের গর্ভে।

কালো সেব্‌ল্‌-লোমের একটা কোটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল দাশা :

"আমাকে ওই জিনিসটা দেবেন?"

ঝিরভ কম্যাণ্ডাণ্টের দিকে তাকাতে লোকটা শুধু একবার গাল ফোলায়। ঝিরভও কোটটা নামিয়ে নিজের কাঁধে ফেলে। দাশা একটা মস্তোবড় খোলা ট্রাংকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে—অন্যের পোশাক পরতে হবে ভেবে মুহূর্তের জন্য ওর গাটা ঘিন-ঘিন করে ওঠে—তারপরেই হাতটা ও কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয় এক গাদা অন্তর্বাসের মধ্যে।

"জুতো নেবেন না দারিয়া দেবী? বর্ষা বাদলার দিনে একজোড়া বুট সংগে রাখা ভাল! বল-নাচের পোশাক পাবেন ঐ বড় ঘরটায়। কমরেড কম্যাণ্ডাণ্ট, চাবিটা পাব ও ঘরের? বোঝেনই তো, অভিনেত্রীদের কারবারের আসল পুঁজিই হল বল-নাচের পোশাক।"

"যা দরকার লাগে নিয়ে নিন—আমার তাতে কী আসে যায়!" বলল কম্যাণ্ডাণ্ট।

দাশা দোতলার ঘরে উঠে যায়। ওর প্রায় সংগেই সংগেই আসে ঝিরভ, কাপড়ের বোঝা নিয়ে। একটা ছোট ঘরে ঢোকে ওরা। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে-যাওয়া একটা আয়না রয়েছে ভেতরে। ময়লা কাঁচের গায়ে জালের মতো অগুন্তি ফাটলের দাগের মধ্যে উঁকি দিয়ে দাশা দেখতে পায় অন্য এক নারীকে—সিল্কের মোজা আঁটছে পায়ে। সূক্ষ্মতম কাপড়ের একটা শেমিজ পরে নিচ্ছে, ওপরে চড়াচ্ছে লেস্‌-লাগানো অধোবাস, জুতোর ডগা দিয়ে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তার পুরনো রিফু-সেলাই-করা অন্তর্বাসগুলো। তারপর নিরাবরণ তনু কাঁধদুটোর উপর চাপিয়ে নিচ্ছে ফারের কোটটা।......নিজেকে এখন কী মনে হচ্ছে তোমার?

গণিকা? ডাকাত-মেয়ে? না, চোর? কিন্তু যাই বলো না কেন, ভারী খাসা দেখাচ্ছে তোমায়।...তাহলে মনে হচ্ছে সুদিন এল বলে! আসুক না, ক্ষতি কী!— এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পরে অনেক মিলবে।......

অক্টোবরের গোলাবর্ষণে হোটেল মেত্রোপোলের বড়ো রেস্তোরাঁঘরটার ক্ষতি হয়েছিল। তাই তার দরজাটি বন্ধ। কিন্তু প্রাইভেট কামরাগুলোতে নিয়মিত পরিবেশন করা হচ্ছে খাবার ও পানীয়। এটা করতে হয় তার কারণ হোটেলের একটা অংশ বিদেশীরা, প্রধানত জার্মানরা, দখল করে বসে আছে। আর আছে একদল একগুঁয়ে ফাটকাবাজ যারা কোনোরকমে বিদেশী পাসপোর্ট জোগাড় করতে পেরেছে—কিছু লিথুয়ানিয়ান, কিছু পোলিশ, কিছু পারস্যবাসীও রয়েছে তাদের মধ্যে। প্রাইভেট কামরাগুলোতে কারণ-বারির যে বন্যা বয়ে যায় তার একমাত্র তুলনা মিলবে ফ্লোরেন্স নগরীর সেই প্লেগ-মহামারীর যুগের পানোৎসবের সঙ্গে। খাঁটি মস্কো-বাসী যাঁরা (বিশেষ করে অভিনেতারা—এঁদের স্থির বিশ্বাস মস্কোর রঙ্গ-মঞ্চগুলোর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, থিয়েটার আর অভিনেতা, দুইয়েরই এবার অন্তিম দশা), তাঁদেরও অবশ্য ঢুকতে দেয়া হত এখানে,—তবে ব্যক্তিগত সুপারিশ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে আসতে হত তাঁদের। এঁরা সবাই দস্তুরমতো পানোৎসব চালাতেন।

ট্রাজেডি-অভিনেতা মামন্ত্ দাল্স্কি ছিল এইসব উদ্দাম নৈশলীলার প্রাণ-স্বরূপ। বিখ্যাত অভিনেতা রসি-র মতোই ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল কিছুদিন আগে। লোকটির প্রবৃত্তি বল্গাহীন, চেহারাটা কার্তিকের মতো, জুয়ার নেশা আছে, ধীর মস্তিষ্কে পাগলামি করে। প্রকৃতিটা ভয়ানক, আবার একটা রাজসিক ভাবও অছে, মাথায় ধূর্ত বুদ্ধি। সাম্প্রতিককালে তাকে রঙ্গমঞ্চে নামতে বড় একটা দেখা যায়নি, নামলেও আমন্ত্রিত অভিনেতা হিসেবেই নেমেছে। কিন্তু পিতার্সবুর্গ আর মস্কোর গোপন জুয়ার আড্ডাগুলোতে কিংবা দক্ষিণাঞ্চলে ও সাইবেরিয়ায় অনেক সময়ই তাকে দেখতে পাওয়া যায়। জুয়া খেলতে গিয়ে ওর সর্বস্বান্ত হওয়ার অনেক কাহিনীই বাজারে চালু। বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। নিজেই অনেক সময় বলে, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দেবে। যুদ্ধের সময় ফৌজের রসদ সরবরাহ-সংক্রান্ত কাজে অত্যন্ত সন্দেহজনক ধরনের ফাটকাবাজির ব্যাপারে লিপ্ত ছিল সে। বিপ্লব শুরু হবার পরে-পরেই মস্কো চলে আসে। বিপ্লবের নাটকীয় সম্ভাবনার কথা আঁচ করতে পেরে তার মনে এক নতুন বাসনা জাগলো : সুবিরাট এই বিপ্লব-রঙ্গমঞ্চে সে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে—বুঝি-বা শিলারের "দস্যু"রই এক নবতম নাট্যরূপ হবে তা।

প্রতিভাশালী অভিনেতা হিসাবে দর্শক-চিত্ত প্রভাবিত করার যে ক্ষমতাটুকু তার আয়ত্তে ছিল তারই সাহায্যে সে ঘোষণা করতে লাগল স্বর্গীয় অরাজকতন্ত্রের কথা, অবাধ স্বাধীনতা, সবরকম নৈতিক মানদণ্ডের আপেক্ষিকতা আর যে-কোনো প্রয়োজন প্রত্যেকের নিজের খেয়ালমতো মেটাবার অধিকারের কথা। মস্কোতে এক

অশান্ত মনোবিকারের বীজ বপন করল সে। মস্কোর যুবক সমাজের কয়েকটি বিশেষ দল তখন ব্যক্তিগত বাড়িঘর জবর-দখল করতে শুরু করেছিল, পেশাদার অপরাধীরা যোগ দিয়ে তাদের সংখ্যা আরো ফাঁপিয়ে তুলল। এই সব এলোমেলো ছড়ানো অ্যানার্কিস্ট দলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করল মামন্ত্‌ দাল্‌স্কি, 'ব্যবসায়ী সংঘের' ক্লাবঘরটা জোর করে দখল করে সেটার নাম পাল্টে নতুন নাম দিল : "অরাজক পুরী"—সমস্ত কাজটা শেষ করে সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি এমনভাবে তারা দাঁড়াল যেন যা হবার তা হয়ে গেছে বলে মেনেই নিতে হবে। সোবিয়েত শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে সে অবশ্য তখন পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ওর মস্তিষ্কে যে-সব কল্পনা বাসা বেঁধেছে তাতে শুধু ব্যবসায়ী সংঘের ক্লাবের ভাঁড়ার ঘরেই তার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকবে না কিংবা খালি নৈশ-লীলা করেই সে ক্ষান্ত থাকবে না। রাত্রির সেইসব উদ্দাম উৎসবের পর সে "অরাজক-পুরী"র জানলায় দাঁড়িয়ে আঙিনায় জড়ো-হওয়া জনতার উদ্দেশে প্রচুর বক্তৃতা ঝাড়তো, তার সেই নাটকীয় অভিব্যঞ্জনা শেষ হবার সংগে সংগে ওপর থেকে অজস্র পাৎলুন, বুটজুতো, কাপড়ের থান আর ব্রাণ্ডির বোতল এসে পড়তো জনতার মধ্যে।

ঝিরভের সংগে মেত্রোপোলের সেই খাস কামরাটিতে ঢুকে প্রথমেই যা দাশার নজরে পড়ল তা হচ্ছে এই লোকটির সুকঠিন গম্ভীর মুখ। ঠোঁটজোড়া আর চোয়ালদুটো দৃঢ় রেখায় সম্বদ্ধ, গলাটা ঘিরে একটা ময়লাটে নরম কলার। মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন ব্রোঞ্জের ছাঁচে ঢালাই-করা, কোনো দক্ষ কারিগরের হাতে যেন সে মুখের প্রতিটি ভাঁজে ও রেখায় বিকৃত-বাসনা আর লাম্পট্যের ছবি খোদাই হয়ে গেছে।

প্রকাণ্ড পিয়ানোর ঢাকনাটা তোলা। মখমলের জ্যাকেট-পরা শীর্ণ একটি লোক বসে সমাধি-সংগীতের সুর বাজিয়ে চলেছে। লোকটির দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, দাঁতের ফাঁকে চেপে রেখেছে সিগারেট, চক্‌চকে চোখদুটো আধবোজা, মাথাটা পিছন দিকে হেলানো। অসংখ্য খালি বোতল-সাজানো একটা টেবিল ঘিরে বসে রয়েছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন "প্রখ্যাতনামা" ব্যক্তি। ওঁদের মধ্যে নাক-বোঁচা এক ভদ্রলোক ধর্মসংগীতের চড়া সুরের অংশটুকু গাইছেন, উঁচু থুতনিটা হাতের তেলোর উপর রেখে এমনভাবে সামনে বাগিয়ে রয়েছেন যে ওঁর ভোঁতা গোলগাল মুখটা যেন তুবড়ে গিয়ে চ্যাপটা কেকের মতো হয়ে গেছে। আর মাঝে মাঝে গানের ধুয়ো ধরছেন বাদবাকিরা সবাই মিলে—'ভারিক্কি বাপে'র চরিত্রে অভিনয় করেন এমনি একজন হাঁড়ি-মুখো ভদ্রলোক; নিচের ঠোঁট ঝুলে-পড়া বিষণ্ণ প্রকৃতির একজন কমিক অভিনেতা; তিন-দিনের দাড়ি-গজানো চোখা-নাক 'যুবক নায়ক'; পাঁড় মাতাল প্রণয়ী চরিত্রাভিনেতা; আর একজন নামকরা প্রধান অভিনেতা যাঁর চওড়া কপালে গভীর কুঞ্চনের দাগ,—দলের মধ্যে ইনিই মাথাটা ঠিক রেখেছেন।

'পরিত্রাতার গির্জা' থেকে এসেছিলেন একজন আর্কডিকন। পাদ্রী সাহেবটির চমৎকার চেহারা, চুলে পাক ধরেছে। মস্কোর ব্যবসায়ীদের উপহার হিসেবে পাওয়া

একজোড়া ভারি সোনার রীমওয়ালা চশমা তাঁর চোখে। কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে তিনি দোহারদের সঙ্গে গলা মিলাচ্ছিলেন। আংরাখার ঢিলে হাতাদুটো দুলছিল দুপাশে। ওঁর ভরা আর দরাজ মোটা গলার আওয়াজে টেবিলের উপকার গেলাসগুলো অবধি ঝন্‌ঝন করে উঠছে। খাস কামরার দেয়ালগুলো টকটকে লাল সিল্কে ঢাকা, দরজায় ব্রকেড পর্দা ঝুলছে। দরজার ঠিক সামনেই তিন-ভাঁজওয়ালা একটা স্ক্রীন খাড়া করা।

স্ক্রীনটার ওপর কনুই রেখে দাঁড়িয়েছিল মামন্ত্‌ দাল্‌স্কি। ওর হাতে এক-জোড়া তাস। আধা-মিলিটারী ধরনের উর্দি পরেছে—নরফোক জ্যাকেট, পেছনে চামড়ালাগানো ডোরা-কাটা ব্রিচেস্‌, কালো ঘোড়সওয়ারী বুট। দাশা যখন ঘরে ঢুকছে সে তখন একটা কঠিন ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে শুনছিল অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীতের বিলাপ।

"চমৎকার দেখতে তো মেয়েটি—একবারে পাগ্‌লা করে দিতে পারে দেখছি!" —পিয়ানোবাদক বলল। দাশা ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দাল্‌স্কি ছাড়া আর সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখল ওর দিকে।

"খাঁটি রুশ সুন্দরী।"—বললেন পাদ্রী সাহেব।

"এসো, আমাদের সঙ্গে বস না এসে।"—প্রধান অভিনেতা ভদ্রলোকটি বললেন মিহি গলায়।

"বসুন না, বসে পড়ুন।"—ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ঝিরভ।

টেবিলের পাশে বসল দাশা। ওঁরা সবাই ভিড় করে ওকে ঘিরে দাঁড়ালেন। তারপর একে-একে ওর হাতে চুম্বন করে সশ্রদ্ধভাবে মাথা নিচু করে এমনভাবে পিছনে সরে আসতে লাগলেন—যেন স্বয়ং মেরী স্টুয়ার্ট এসেছেন ওঁদের সামনে। তারপর আবার শুরু হল গান। দাশার সামনে মাছের ডিম আর চাটনি এগিয়ে দিল ঝিরভ, কী একটা ঝাঁঝ-মিষ্টি পানীয়ও খাইয়ে দিল ওকে। ঘরের মধ্যেটা বড্ড গুমোট, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। চট্‌চটে আঠালো সেই পানীয়টা গলাধঃকরণ করার পরেই দাশা কাঁধ থেকে ফার কোটটা সরিয়ে দিল, অনাবৃত বাহুদুটো রাখল টেবিলের ওপর। পিয়ানোর বিষাদগম্ভীর ঝঙ্কার আর স্তোত্রসঙ্গীতের সুপ্রাচীন শব্দচ্ছন্দ ওর মনটাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিচ্ছে। মামন্তের ওপর থেকে ও কিছুতেই চোখ সরাতে পারে না। মানুষটির সম্পর্কে সবকিছুই ও শুনেছে ঝিরভের মুখে। এখনও সে দল থেকে আলাদা হয়ে স্ক্রীনটার কাছেই দাঁড়িয়ে। ভয়ংকর চটা মেজাজে আছে, না, মদে চুর হয়ে আছে তা বলা অবশ্য খুবই দুষ্কর।

"কী হল মশাইরা?" গম্‌গমে গলায় ঘরটা কাঁপিয়ে বলে উঠলো দাল্‌স্কি : "কারুর কি খেয়াল মন-টন নেই?"

"তোমার সঙ্গে এখন খেলার গরজ নেই কারুর, আমরা সবাই একটু আনন্দ করছি। তুমি এখন মুখটি বুজে ঠান্ডা হয়ে থাক তো।" চ্যাপটা-মুখো ভদ্রলোকটি চড়া গলায় তাড়াতাড়ি বললেন। "এসো ইয়াশা—সাত নম্বরের স্তোত্রটা শুরু করা যাক্‌!"

পিয়ানোর সামনে বসে ইয়াশা তার মাথাটা বেশ করে পিছন দিকে হেলিয়ে আধ-বোজা চোখে আঙুলগুলো রাখলো পিয়ানোর চাবির উপর।

"টাকার জন্য খেলব না—চুলোয় যাক টাকা......"

"ওই একই কথা, আমাদের বুঝিয়ে লাভ নেই মামন্ত্! আমরা একেবারেই গররাজি।"

"গুলি বাজি রেখে খেলতে চাই!"

মামন্তের এই ঘোষণার পর খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ। তারপর সেই ছুঁচলো-নাক 'যুবক নায়ক'টি কপাল আর চুলের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওয়েস্ট্কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল:

"আমি গুলি বাজি রেখে খেলব!"

কমিক-অভিনেতা নিঃশব্দে চেপে ধরল ওকে, নিজের ভারি দেহের সমস্তটা ওজন ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে ওকে ঠেলে নিয়ে এল পিছনের চেয়ারটার ওপর।

"জান্-ই বাজি রাখব আজ!"—চেঁচিয়ে উঠল 'যুবক নায়ক' : "ওই, ওই বদমায়েশ মামন্ত্টার সমস্ত তাস মার্কা-করা! চুলোয় যাক্, ওই শালাই বেঁটে দিক্ তাস! ছেড়ে দাও আমায়!"

কিন্তু তখন আর শরীরে ওর এতটুকু জোর নেই। হাঁড়ি-মুখো 'ভারিক্কি বাপ' এবার আস্তে আস্তে বললেন:

"এক ফোঁটা মদও অবশিষ্ট নেই! কী লজ্জার কথা বল তো মামন্ত্ ভাই...।"

হঠাৎ হাতের তাসগুলো আর সেই সঙ্গে একটা বড়ো অটোমেটিক রিভলবার সামনের ছোট টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল মামন্ত্ দাল্স্কি। টেবিলটার উপর টেলিফোন রয়েছে। মামন্তের প্রকান্ড খোদাই-করা মুখটা রাগে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

"কামরা ছেড়ে কেউ বেরোতে পারবে না", চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে : "আমি যেভাবে চাই ঠিক সেইভাবে খেলতে হবে সবাইকে! তাসে কোনো রকম চিহ্ন করা হয়নি।"

নিচের ঠোঁটটা ঝুলিয়ে বিস্ফারিত নাকের ফুটো দিয়ে মামন্ত্ একটা গভীর নিঃশ্বাস টানল। সবাই বুঝল অবস্থাটা এখন সাংঘাতিক ঘোরালো হয়ে উঠেছে। টেবিলের আশে পাশে সবাইকে এক-এক করে দেখতে থাকল মামন্ত্। পিয়ানোর চাবিতে একটিমাত্র আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে একটা জনপ্রিয় গানের কলি বাজাচ্ছিল ইয়াশা। মামন্তের কালো ভুরুজোড়া হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠল। অতল চোখদুটোর মধ্যে মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি। দাশাকে দেখতে পেয়েছে। ওর দৃষ্টির সামনে দাশার বুক যেন হিম হয়ে যায়। দৃঢ় পায়ে দাশার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর আঙুলের ডগা ধরে মামন্ত্ নিজের শুকনো ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে, কিন্তু করচুম্বন না করে ঠোঁটটা খালি বুলিয়ে নেয় একবার।

"মদ নেই বলছ? বেশ তো, শিগগিরই জুটে যাবে কিছু!"

দাশার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই মামন্ত্ ঘণ্টা টিপলো একটা। ঘরে

ঢ্কল একজন তাতার খানসামা। হাত দ্টো দ্পাশে ছড়িয়ে সে জানালো—এক বোতল মালও নেই, সবটুকু সাবাড়, চোরা কুঠরির দরজায় তালা পড়েছে, হোটেলের ম্যানেজার সাহেব পলাতক।......

"বেরিয়ে যাও!" বললো মামন্ত্। টেলিফোনটার কাছে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন বিরাট এক দর্শকমন্ডলীর দৃষ্টি এসে স্পর্শ করছে তাঁকে। টেলিফোনে একটা নম্বর চেয়ে কথা বলতে শ্রু করল: "হ্যাঁ......আমিই...দাল্‌স্কি বলছি।... প্রো খবরটা চাই। মেত্রোপোল। আমি এখানেই আছি...খ্ব জর্রি।...হ্যাঁ... চারজন লোক হলেই যথেষ্ট।"

আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দেয়ালে সম্পূর্ণ শরীর হেলান দিয়ে হাত-দ্টো ভাঁজ করে দাঁড়ালো মামন্ত্। সিকি ঘণ্টা এইভাবেই কেটে গেল। ইয়াশা মৃদ্ স্রে 'স্ক্রিয়াবিন' বাজাচ্ছে। আওয়াজটা দাশার এত পরিচিত, অতীতের স্মৃতি এমনভাবে জাগিয়ে তোলে মনে, যে শ্নে দাশার মাথাটা যেন ঘ্রতে থাকে। উধাও হয়ে যায় সময়ের ঠিক-ঠিকানা। ওর ব্কের ওপরের র্পোলি ব্রকেডটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-নামা করে, কানের কাছে শিরায় শিরায় রক্তের দাপাদাপি শ্রু হয়। ঝিরভ ওর কানে-কানে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলছিল, কিন্তু ওর কানেই ঢোকে না সে সব কথা।

ম্ক্তির আনন্দ-আস্বাদ আর যৌবনের উচ্ছল অন্ভূতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে দাশা। ওর মনে হয় আকাশে উড়ছে ও—বাচ্চা খ্কীর পেরাম্ব্লেটর-গাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে খেলনার বেল্ন যেমন আকাশে ওড়ে, তেমনি অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ও, এত উঁচু যে মাথা ঘ্রে যায়......

থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা সেই ভদ্রলোকটি ওর নিরাবরণ হাতের ওপর আস্তে চাপড় দিয়ে গম্‌গমে মোলায়েম গলায় বললেন:

"অমন করে ওর দিকে তাকিও না গো, চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।......সত্যি সত্যিই শয়তানের মতো কিছ্ একটা আছে ঐ মামন্ত্ লোকটার মধ্যে।..."

ভাঁজ-করা দরজাটা হঠাৎ খ্লে যায়। ট্পি-পরা চারটে মাথা উঁকি দেয়: স্ক্রীনটার ওপর দিয়ে চারটে হাত বেরিয়ে আসে চামড়ার আস্তিনের ফাঁক দিয়ে, শক্ত করে হাতবোমা ধরে রেখেছে সে হাতগ্লো। চারজন অ্যানার্কিস্টই চিৎকার করে হ্মকি দেয়:

"খবরদার নড়বে না! হাত তোলো!"

"ছেড়ে দাও! সব ঠিক আছে", গ্র্গম্ভীর অবিচল কণ্ঠে বলে মামন্ত্ দাল্‌স্তি। "ধন্যবাদ, কমরেডরা!" ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্ক্রীনের উপর ঝ্কে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বোঝাল ওদের। ট্পিগ্লো সামনের দিকে ঝ্ঁকল একবার, তারপর সবাই বেরিয়ে চলে গেল। মিনিট কয়েক বাদেই অনেক-গ্লো গলার আওয়াজ ভেসে এল, কে একজন চাপাগলায় আর্তনাদ করে উঠল যেন। ধপ্ করে একটা ভোঁতা গোছের বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই দেয়ালগ্লো কেঁপে উঠল থর্‌থর্ করে।

"কুকুরের বাচ্চাগুলো বাজে সোরগোল না তুলে কিছুই করতে পারে না যেন।"

আবার ঘণ্টা টিপলো মামন্ত্। পাংশুমুখে হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢুকল খানসামাটা। ভয়ে তার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

"এগুলো সব পরিষ্কার করো, আর টাটকা গেলাস নিয়ে এস,"—হুকুম করল মামন্ত্। "ইয়াশা, দয়া করে তোমার ওই প্যান্‌প্যানানি থামাও তো! মজাদার কিছু বাজাও!"

খানসামা সবে একটা পরিষ্কার কাপড় পেতেছে এমন সময় অ্যানার্কিস্ট চারজন আবার এসে হাজির হল, এবার প্রত্যেকের সঙ্গে বোতল। কার্পেটের ওপর ব্র্যান্ডি, হুইস্কি, লিক্যুর আর শ্যাম্পেনের বোতল রেখে ওরা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে কেটে পড়ল। টেবিলটা ঘিরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা তখন বিস্ময়ে আর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"হোটেলের কামরাগুলোয় যা মদ পাওয়া যাবে তার মাত্র আধা-আধি দখল করতে হুকুম দিয়েছিলাম ওদের।"—বোঝাতে লাগলে মামন্ত্ : "বাকি অর্ধেক মালিকদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কিছু অন্যায় করা হয়নি। সব ঠিক আছে।"

পিয়ানোয় একটা উদ্দাম গৎ তুলল ইয়াশা। শ্যাম্পেনের কর্ক ছিটকে উঠল। মামন্ত্ বসেছে দাশার পাশেই। টেবিলের উপরের বাতিটার মৃদু আলোয় ওর খোদাই-করা মুখমণ্ডলের রেখাগুলো যেন আগের চেয়ে আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

"আজ তোমাকে ল্যুক্স্-এ দেখেছিলাম, ঘুমুচ্ছিলে। তুমি কে তা জানতে পারি?"

স্রেফ নেশার ঝোঁকেই যেন হেসে ফেলে জবাব দিল দাশা :

"কেউ না! এই খেলনার বেলুন।"

দাশার নগ্ন কাঁধের ওপর প্রকাণ্ড উষ্ণ হাতটা রেখে মামন্ত্ ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল। দাশা গ্রাহ্যই করল না। ও শুধু ওর ঠাণ্ডার কাঁধটার ওপর একটা তপ্ত হাতের ভার অনুভব করছিল। শ্যাম্পেনের গ্লাসের সরু কোমরটা ধরে ও সবটুকু নিঃশেষে গলায় ঢেলে দিল।

"তা হলে তুমি কারুরই কিছু নও?"—জিজ্ঞেস করল মামন্ত্।

"কারুর কিছু নই!"

দাশার কানে-কানে ব্যথাতুর আবেগরুদ্ধ গলায় গুন্‌গুন্ করে বলে চলল মামন্ত্ :

"জীবনটা দেখে নাও, বুঝলে! স্বভাবের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে জীবনের আস্বাদ বুঝে নাও।......তোমার ভাগ্য ভাল যে আমার দেখা পেয়েছ।......ভয় নেই, ভালোবাসা দিয়ে তোমার যৌবনকে কলঙ্কিত করব না আমি।......যারা মুক্ত তারা ভালবাসে না, তাদের কাছে ভালবাসার প্রয়োজনও নেই।......ওথেলো হচ্ছে মধ্যযুগীয় ডাইনী-পোড়ানোর কুসংস্কার, কাফের দাবিয়ে ধর্মের ধ্বজা ওড়ানো। শয়তানের

মুখ-ভ্যাংচানি হল ওথেলো।......আর রোমিও জুলিয়েট......আমি জানি,—তোমার মনের গোপনে যে অমন একটি প্রেমের স্বপ্ন রয়েছে সে আমার ভাল করেই জানা।... কিন্তু এসব তো সেই বস্তাপচা রাবিশ।......আমরা যে সব ভেঙে গুঁড়ো করে দিচ্ছি, আগাসে গোড়া। সব কেতাবপত্র পুড়িয়ে শেষ করব, যাদুঘরগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা।......মানুষকে ভুলতে হবে অতীতের ঐতিহ্য।......মুক্তি বলতে শুধু একটা জিনিসই বোঝায় : স্বর্গীয় অরাজকতন্ত্র......ইন্দ্রিয়াবেগের সর্বগ্রাসী দাবদাহ।......না, না! আমার কাছে শান্তি আর ভালোবাসা আশা কোরো না তুমি। আমি তোমায় মুক্তি এনে দেব......তোমার অজানার বাঁধন আমি আঘাতে আঘাতে ছিন্ন করে দেব।......তোমার দুই আলিঙ্গনের মাঝে আমি তোমায় উজাড় করে দেব তোমার যা-কিছু কামনার ধন।......চাও......এখনই চেয়ে নাও যা চাইবার......কাল হয়তো খুব দেরি হয়ে যাবে।"

উন্মত্ত কণ্ঠের এই আকুতির আড়ালে দাশা তার সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে টগবগ করে ফুটে-ওঠা এক তপ্ত আবেগের সান্নিধ্য। দারুণ ভয়ে ও বিহ্বল হয়ে যায়, যেন বুকচাপা স্বপ্নের মধ্যে নড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও, একটা আগুন-চোখো দৈত্য যেন স্বপ্নের অন্ধকার কন্দর থেকে বেরিয়ে আসছে ওকে নিচে ফেলে, দু'পায়ে দলে, পিষে ওর প্রাণটা বের করে নেবার জন্য।......কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক হল আরেকটি অনুভূতি : ওর মধ্যেও যেন এই সঙ্গে সাড়া দিয়ে জেগে উঠছে অজানা, জ্বালা-ধরানো, শ্বাসরোধী এক কামনার হলাহল।......দাশার মনে হল ও যেন আজ পূর্ণাবয়ব নারী। উত্তেজনার বিহ্বলতায় ওকে নিশ্চয় সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাই প্রধান অভিনেতা ভদ্রলোকটিও ওর দিকে হাত বাড়িয়ে ওর গেলাসের সঙ্গে নিজের গেলাসটা ঠুকে ঈর্ষাভরা গলায় বললেন :

"মামন্ত্, তুমি এই কাঁচ মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ!"

দাল্স্কি এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন কেউ তাকে গুলি করেছে। টেবিলের উপর সজোরে ঘুষি মারল সে, গেলাসগুলো শূন্যে নেচে উঠে মেজেতে পড়ে গেল।

"এই মেয়ের দিকে যে হাত বাড়াবে তার আর রক্ষে থাকবে না, গুলি করেই আমি তাকে সাবাড় করব!"

টেলিফোনটা যে টেবিলের ওপর ছিল তার ওপর যেন ছিটকে পড়ল মামন্ত্—রিভলবারটা তখনও সেখানেই পড়ে আছে। অন্যরা সবাই চেয়ার টেয়ার ফেলে লাফিয়ে উঠল। প্রকাণ্ড পিয়ানোর নিচে আশ্রয় নিল ইয়াশা। এর মধ্যে রিভলবারটা তুলে নিয়েছে মামন্ত্। দাশাও জানে না কীভাবে কখন সে মামন্তের হাতটা চেপে ধরে তার মুখের দিকে মিনতিভরা চোখে তাকিয়ে আছে। দাশার পিঠের হাড়টার নিচে হাত দিয়ে ওর সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে মামন্ত্ ওকে শূন্যে তুলে নিল। তারপর ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে এমন জোরে পিষতে লাগল যে দাশার দাঁতে ওর দাঁত ঠেকে গেল। চাপা গলায় একটা আওয়াজ করে উঠল দাশা। ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। দাশাকে একটা আরামকেদারার ওপর নামিয়ে দিয়ে মামন্ত্ রিসিভারটা ধরল। দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে রইল দাশা।

"হ্যাঁ......কী চাই? আমি ব্যস্ত আছি।......ও! কোথায়? মিয়াস্‌নিৎস্কায়া স্ট্রীটে? হীরা? দামি জিনিস তো? দশ মিনিটের মধ্যেই হাজির হচ্ছি।......"

ব্রিচেসের পেছনের পকেটে রিভলবারটা গুঁজে দাশার সামনে এগিয়ে গেল মামন্ত্‌। দু'হাতের তেলোর মধ্যে দাশার মুখখানা চেপে ধরে উদগ্রভাবে বারে বারে চুমু খেতে লাগল। তারপর, নাটকীয় ভঙ্গিতে বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাকি রাতটুকু দাশা ল্যক্স্‌-এই কাটালো। মরার মতো পড়ে ঘুমুলো—রুপোলি ব্রকেডের পোশাকটা পর্যন্ত খুলবার অবসর পায়নি। (ঝিরভ ঘুমিয়েছিল বাথরুমে—মামন্তের ভয়ে।) বিছানা ছেড়ে উঠে দাশা জানলার কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে। এইভাবেই কাটিয়ে দেয় দুপুর অবধি। ঝিরকভের সঙ্গে কথা বলার মন নেই ওর, ওর কোনো প্রশ্নের জবাবও দেয় না। বেলা চারটে নাগাদ বেরিয়ে গিয়ে প্রেচিস্তেন্‌স্কি বুলভারে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে—গোগলের নাক-লম্বা মূর্তিটার সামনে। হাড়-জিরজিরে একপাল ছেলেমেয়ে চুপচাপ বসে মাটি আর বালি দিয়ে কাদার পাই-পিঠে তৈরি করছে।

দাশার পরনে ওর সেই পুরনো পোশাকটা আর ঘরে-তৈরি টুপিটা। ওর পিঠের ওপর এসে পড়েছে উষ্ণ রোদ, জীবনের দারিদ্র্যের ওপর সূর্যটা যেন প্রহরীর দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় যেমন হয়ে থাকে, রাস্তার ওই কচি ছেলেগুলোর অনাহার-খিন্ন মুখে কেমন একটা বুড়োটে ছাপ পড়েছে। চারদিকেই একটা শূন্য থমথমে ভাব। গাড়ির চাকার শব্দ নেই, নেই পথিকদের উচ্চকণ্ঠ আলাপ। সব চাকা যেন গড়িয়ে চলে গেছে যুদ্ধে, পথিকেরা সবাই বুজেছে মুখ। গ্রানাইটের চেয়ারে বসে গোগোল যেন তার আংরাখার ভারে নুয়ে পড়েছেন, সারা পোশাকটা চড়ুই পাখির মলে একাকার হয়ে গেছে। দু'জন দাড়িওয়ালা লোক চলে গেল, দাশার দিকে একটিবারও তাকাল না তারা। ওদের মধ্যে একজন হাঁটছিল মাটির দিকে তাকিয়ে, আরেকজনের চোখ গাছের মাথায়। ওদের কথাবার্তার দু'একটা টুকরো দাশার কানে এল।

"একেবারে গো-হারা হেরে গেল! কী ভয়ানক কথা! এখন তা হলে কী করব আমরা বল তো?"

"সে যা হোক, সামারা তো দখল করা গেছে, উফা-ও এসে গেছে মুঠোর মধ্যে......"

"আমার কিন্তু আর বিশ্বাস নেই কিছুতেই! সামনের শীতকাল পর্যন্ত টিঁকব কিনা সন্দেহ।"

"কিন্তু দেনিকিনই তো এখন দনের হর্তাকর্তা......"

"আমার বিশ্বেস হয় না। ব্যাবিলন গেছে, রোম গেছে, আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব এবার......"

"কিন্তু সাভিনকভ তো ধরা পড়েন নি, চের্‌নভও ধরা পড়েননি।"

"তাতে আর এমন কী এগচ্ছে! বোঝা গেছে সবই—একসময় রাশিয়ার অস্তিত্ব ছিল, এখন আর তার কিছুই রইল না......"

সেই পাকাচুল ভদ্রমহিলাটি যাকে দাশা গতকাল দেখেছিল, আজও তিনি তেমনিভাবেই শালের তলা থেকে ভয়ে ভয়ে রোজানভের রচনাবলী দেখিয়ে চলে গেলেন। দাশা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। মড়ার-মাথা-আঁকা টাই-পিনওয়ালা সেই যুবকটি হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছিল দাশার বেঞ্চের দিকে। তাড়াতাড়ি চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে প্যাঁশ্‌নেটা এঁটে দাশার পাশে বসে পড়ল।

"রাতটা কি মেত্রোপোলে কাটিয়েছিলেন নাকি?"

দাশা মাথাটা ঝোঁকাল একবার, 'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে ওর ঠোঁটটাই শুধু নড়ে উঠল।

"বেশ, বেশ! আপনার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছি। আজ সন্ধ্যেয়ই ইচ্ছে করলে আপনি সেখানে চলে আসতে পারেন। ঝিরভকে কিন্তু একটু আঁচও দেবেন না! যাক, এখন কাজের কথা হোক! লেনিনকে আপনি কখনো চোখে দেখেছেন?"

"না।"

পকেট থেকে এক বাণ্ডিল ফটোগ্রাফ বের করে সে দাশার ব্যাগটার মধ্যে গুঁজে দিল। তারপর চুপ করে বসে আঙুল দিয়ে থুতনির দাড়িগুলো ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল দুটো ঠোঁটের মধ্যে। খানিক বাদে দাশার কোল থেকে ওর নিষ্প্রাণ হাত দুটো তুলে নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল :

"ব্যাপারটা এখন এইরকম দাঁড়িয়েছে...বলশেভিজম বলতেই বোঝায় লেনিন। বুঝেছেন তো? আমরা লাল ফৌজকে গুঁড়ো করে দিতে পারি, কিন্তু লেনিন যতোক্ষণ ক্রেমলিনে রয়েছেন ততক্ষণ আমাদের জিতবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। পরিষ্কার হল কথাটা? লেনিনই বলশেভিক তত্ত্বের আসল তত্ত্বজ্ঞ, মূর্তিমান ইচ্ছাশক্তি যেন লোকটি—শুধু আমরা নই, গোটা দুনিয়ারই সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু।......এখন বেশ করে ভেবে নিয়ে আমাকে সাফ-সাফ বলুন : আপনি কি রাজি আছেন, না গররাজি?"

"ওঁকে খুন করবার কথা বলছেন?"—জিজ্ঞেস করল দাশা; ধনুকের মতো বাঁকা-পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল একটা অর্ধ-উলঙ্গ বাচ্চা ছেলে। তার দিকেই তাকিয়ে কথাটা বলল দাশা। শুনে যেন দারুণ চমকে উঠে যুবকটি ডান দিকে ঘুরে দেখল, বাচ্চাগুলোর দিকে চোখ কুঁচকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে আবার ঠোঁট দিয়ে দাড়ি কামড়াতে শুরু করল।

"ও ভাবে কেউ বলে না কথাটা। আপনি যা ভাবছেন, যদি তা সত্যিও হয় তবু এতটা জোরে বলার তো কোনো দরকার করে না। আপনাকে আমাদের সংগঠনের মধ্যে আনা হয়েছে।......কেন, সাভিনকভ আপনাকে যা বলেছেন আপনি তা বুঝতে পারেন নি?"

"আমার সঙ্গে তাঁর কোনো কথাই হয় নি......।" (যুবকটি হাসল) "ও! রুমাল হাতে সেই ভদ্রলোকই বুঝি......"

"ব্যস্‌ ব্যস্‌!......হ্যাঁ—উনিই বরিস্‌ ভিক্তরোভিচ।......আপনার ওপর যে আস্থা রাখা হয়েছে তা ঠিক মামুলি ধরনের নয়। সংগঠনের মধ্যে আমরা নতুন রক্ত ঢোকাতে চাই। ধরপাকড় তো বড় কম হয়নি। কাজানে ঘাঁটি করার পরিকল্পনাটা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে সে খবর আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।......এখন আমাদের সদর দপ্তরের কাজ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।......তবে এখানে আমাদের সংগঠন যা-হোক একটা থেকেই যাবে।......আপনার কাজ হবে, লেনিন কখন কখন জনসভায় বক্তৃতা দেন তার খোঁজখবর রাখা, সভায় যোগ দেয়া, কারখানার মধ্যে ঢোকা।......আপনাকে অবশ্য একা-একা কাজ করতে হবে না।......ক্রেমলিন থেকে কখন লেনিন চলে যান, কোথায় বক্তৃতা দেন সে-সব খবর আপনি যথাসময়েই পেয়ে যাবেন।......আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে যদি আপনি কমিউনিস্টদের মধ্যে বন্ধু যোগাড় করে নিতে পারেন, আর যদি চেষ্টা করে পার্টির মধ্যে ঢুকতে পারেন তো খুবই ভালো। ওদের কাগজপত্র পড়ুন, ওরা যখন যা লেখে সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকুন। কাল সকালে আপনি আরো কতকগুলো নির্দেশ পাবেন, ঠিক এই জায়গাতেই......"

যাবার সময় একটা গোপন ঠিকানা দিয়ে সেখানে দাশাকে খবর দিতে বলে গেল যুবকটি। একটা সংকেতবাক্যও জানিয়ে দিল সেই সঙ্গে। দাশার নতুন ঘরের চাবিটা ওর হাতে দিয়ে আরবাত্‌ স্কোয়ারের দিকে চলে গেল সে। ব্যাগের ভেতর থেকে একখানা ফটোগ্রাফ বের করে দাশা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখছিল সেটি। কিন্তু ঐ ছবিটার জায়গায় যখন গত রাতের আরক্ত যবনিকার আড়াল থেকে ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল অন্য একটা মুখ, তখন আর দাশা বসে থাকতে পারল না, ঠোঁট দুটো চেপে রাগে ভুরু কুঁচকে সজোরে ব্যাগটা বন্ধ করে ও উঠে পড়ল বেঞ্চ ছেড়ে। ধনুকের মতো বাঁকা-পা সেই ছোট্ট ছেলেটা ওর পিছু নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, ধপ্‌ করে বসে পড়ল বালির ওপর। ছোট ল্যাংলেঙে শরীরে ব্যথা পেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকল।

দাশার কামরাটা হল সিভিৎসেভ-ভ্রাঝেক্‌ স্ট্রীটে। উঠোনঘেরা একটা ছোট জীর্ণ বাড়ি। দেখলে মনে হয় লোকজন বাস করে না। পিছনের দরজায় অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর বেঁটে খাটো আর ভারিক্কি চেহারার এক বুড়ি এসে দরজা খুলে দিল। বুড়িটার চোখের পাতা উল্টে গিয়ে লাল মাংস বেরিয়ে পড়েছে। সমস্ত চেহারাটাই যেন বুড়ি ধাইয়ের মতো, আজীবন খেটে এখন শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে মনিবের বাড়িতে। দাশা কী চায় তা বুঝতেই তার অনেক সময় লেগে গেল, তারপর অবশ্য দাশাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে ওর কামরায় পৌঁছে দিল সে। সারাক্ষণই কেবল অসংলগ্নভাবে বক্‌বক্‌ করে যাচ্ছিল বুড়িটা :

"উড়ে গেছে ওরা, তেজীয়ান্‌ শিকারী বাজগুলো—য়ুরি য়ুরিচ্‌টা গেছে,

মিখাইল য়ুরিচ গেছে, ভাসিলি য়ুরিচও......ভাসেঙ্কা তো এই সেদিন সেণ্ট্ টমাসের পরবের দিনে ঘোলোয় পা দিয়েছিল। এখন খালি প্রার্থনা করি, ওদের আত্মায় সম্পাতি কামনা করি......"

দাশাকে বুড়ি চা খেতে বলেছিল, কিন্তু ও রাজি হল না। জামাকাপড় খুলে মোটা লেপটার নিচে ঢুকে পড়ল ও। অন্ধকারের মধ্যে দারুণভাবে কাঁদতে শুরু করল—বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

পরদিন সকালে গোগোলের মূর্তির নিচে এসে হাজির হল দাশা। নতুন নির্দেশ পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে হুকুম হল আগামী কাল একটা কারখানায় যেতে হবে। প্রথমে ও ভেবেছিল ঘরে ফিরবে কিন্তু তারপর কী ভেবে চলে এল কাফে বম্-এ। সেখানে ঝিরভের সঙ্গে দেখা হতেই লোকটা ওর পেছনে-পেছনে লেগে রইল, খালি জিজ্ঞেস করে এত সময় সে কোথায় কাটালো, জিনিসপত্র না নিয়েই বা কেন চলে গেল। বলল : "মামন্ত্ কখন টেলিফোনে ডাকবে সেই অপেক্ষায় আছি—আপনার কথা ওঁকে কী বলব বলুন তো?"

দাশার গাল দুটো লাল হয়ে উঠতেই ও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজেকে বোঝালো : আমাকে তো ও'র সঙ্গে মেলামেশা করার হুকুমই দেয়া আছে! নিজের মনকেই যে ও চোখ ঠারছে সে কথাটা কিন্তু একবারও ভোলেনি দাশা।

একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল : "আমি গিয়ে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসব'খন, তারপর যা-হয় দেখা যাবে।"

দাশা ওর নিজের কামরায় ফিরে এল সেই দামী ফার-কোট, অন্তর্বাস আর বলনাচের পোশাকের বাণ্ডিল সঙ্গে নিয়ে। বিছানার ওপর জিনিসগুলো খুলে বিছিয়ে নিয়ে সেগুলোর দিকে চেয়ে রইল দাশা—কেমন যেন একটা কাঁপুনিতে শিউরে উঠছিল সে; দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আবার যেন সেই লোকটার ভারি হাত ওর কাঁধের ওপর এসে পড়েছে, ওর দাঁতের ওপর তার দৃঢ়সন্নদ্ধ দাঁতের ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করছে ও।......বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দাশা, মুখটা গুঁজলো সুগন্ধি-মাখা ফারকোটটার মধ্যে। "এ কী হল? এ আবার কী?"—বিড়বিড় করে ও নিজের মনেই বলে চলল।

দাশাকে যেমন শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল তেমনিভাবেই ও পরদিন সকালে ছাপা-কাপড়ের একটা গাঢ়-রঙের পোশাক পরল, মাথায় বাঁধল একটা রুমাল—যাতে মজুরের ঘরের মেয়ের মতো দেখায়। জামাটা এনে দিয়েছিল মড়ার-মাথার টাই-পিনওয়ালা লোকটি। (বড়োলোকের বাড়িতে একসময় ঝিয়ের কাজ করত, মনিব তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, এই কথা তাকে বলতে হবে এখন থেকে)। ট্রাম ধরে দাশা কারখানার দিকে রওনা হল।

ওর সঙ্গে প্রবেশপত্র ছিল না, কিন্তু গেটের সামনে-বসা বুড়ো পাহারাওয়ালাটা ওর দিকে চোখ মটকে বলল : "মিটিং শুনতে এসেছ, তাই না গো? তা যাও না, ওই বড়ো দালানটায়।"

পচা তক্তা আর লোহালক্কড়ের পুরনো গাদা ডিঙিয়ে বড়ো-বড়ো ভাঙা জানলা-

গ্লোর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল দাশা। কাছাকাছি কেউ নেই, নির্মেঘ আকাশের গায়ে সারি সারি চিম্‌নি নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ছে।

ঝুল-কালিমাখা একটা দরজার দিকে আঙুল দেখালো একজন। ভিতরে ঢুকে দাশা দেখে লম্বা হল-ঘর, দেয়ালের ইটগুলোর উপর আস্তরের বালাই নেই। কাঁচের ছাদটা ধোঁয়ায় কালো, তারই ফাঁক দিয়ে আসছে একটুখানি ক্ষীণ আলো। সবকিছুই নগ্ন আর নিরাবরণ। মাথার ওপরের কপিকলগুলো থেকে শিকল ঝুলছে। আরেকটু নিচে মেশিনের চাকার দাঁড়গুলো, পুলির ওপর তাদের ড্রাইভিং বেল্ট নিশ্চল হয়ে আছে। দাশার অনভ্যস্ত চোখ দুটো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে কালো কালো লেদ-মেশিনগুলো; পালিশ-করার মেশিন, চাপ-দেয়া আর জোড়া-লাগাবার মেশিন, ফ্রিকশন কব্জার লোহার ডিস্ক্‌গুলো সব দাঁড়িয়ে আছে নানা ভঙ্গিতে—কোনোটা মাটিতে বসা, কোনোটা টিংটিঙে লম্বা, কোনোটা আবার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। বিরাট একটা স্টীম হাতুড়ির ছায়ারেখাও দাশার নজরে পড়ল, প্রকাণ্ড একটা খিলানের আবছা অন্ধকারে সেটা মাথা ঝুলিয়ে পড়ে আছে।

কারখানার অন্ধকার দেয়ালের বাইরে যে জীবন, তার সবটুকু উত্তাপ, আলো আর গতিচাঞ্চল্য, সবটুকু সার্থকতা আর বিলাসিতার উপাদান যোগায় যন্ত্র আর যান্ত্রিক কৃৎকৌশল। আর সেই যন্ত্রেরই সৃষ্টি হয় এই কারখানাটিতে। উকো-ঘষা লোহার গুঁড়ো, মেশিন তেল, মাটি আর গিরস্তি তামাকের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। একটা কাঠের মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য নরনারী, অনেকে আবার জায়গা করে নিয়েছে মেশিনগুলোর সাইডপ্লেটের ওপর কিংবা উঁচু জানলার চৌকাঠের ওপর।

দাশা ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যায় মঞ্চের কাছে। ঢ্যাঙা একটি ছোকরা মাথা ঘুরিয়ে আকর্ণ দাঁত বের করে হাসে, ঝুলকালিমাখা মুখের মধ্যে তার দাঁতগুলোকে আরও বেশি সাদা দেখায়; একটা বেঞ্চির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। দাশা তার পাশে উঠে এসে জানলার নিচের লেদ মেশিনটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েক হাজার লোকের বিশাল ভিড়ের মধ্যে মুখগুলোকে দেখায় বিষণ্ণ, ভুরু কুঁচকে ঠোঁট এঁটে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। রোজ রাস্তায় আর ট্রামে দাশা এই মুখগুলোই দেখে, এমনি ধরনের ক্লান্ত রুশীয় মুখ, চোখে তাদের অসৌহার্দ্যের বিতৃষ্ণা। যুদ্ধের আগের একটি দিনের কথা দাশার মনে পড়ে। রবিবার দিন পিতার্সবুর্গের এক দ্বীপে ও বেড়াচ্ছিল। ওর সঙ্গী দু'জন ব্যারিস্টার ভদ্রলোক। আলাপ প্রসঙ্গে তাঁরা ঠিক এমনি ধরনের মুখের কথাই বলছিলেন : "প্যারিসের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না—কেমন ফূর্তিবাজ, আর রসিক, আনন্দে যেন উপচে পড়ছে......আর এখানে! মানুষগুলোর চেহারায় যেন তিরিক্ষি বদমেজাজী ভাব। ওই যে দুটি কারখানার মজুরকে দেখুন, এদিকেই আসছে। ওদের কাছে গিয়ে একবার ঠাট্টা তামাসা করার চেষ্টা করেই দেখুন না? বুঝবে তো না কিছু, উল্টে চটে যাবে। আমাদের এই রুশগুলোর মাথায় কি সহজে কিছু ঢোকে? এমনি মোটা বুদ্ধি সব......।" সেই বেরসিক মানুষগুলোকেই এখন

সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে দাশা, উত্তেজনায় থমথম করছে ওদের আঁধারমলিন মুখ, দৃঢ়তার ছাপ চোখে মুখে। সেই একই মুখ, কিন্তু এখন যেন অনাহারে তা কালো হয়ে উঠেছে, সেই একই চোখ, অথচ তাতে আগুনের জ্বালা, ধৈর্যচ্যুতির ছাপ।

দাশা ভুলেই গেছে ও কী জন্য এসেছে এখানে। ক্রাস্নিয়ে জোরি স্ট্রীটের সেই জানলার ধারের নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের বিনিময়ে যে-জীবনটাকে ও আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছে তারই টানে ঝড়ের পাখির মতো দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে ও— জীবনের এই নব-সঞ্চিত আস্বাদের মধ্যে ও নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে শিশুর সারল্যে। ও তো আর সত্যি সত্যিই নির্বোধ নয়, কিন্তু অনেকের মতোই ওকেও আজ নিজের হাল নিজেকেই ধরতে হচ্ছে, অথচ ওর পাথেয় শুধু ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার এই সামান্য পুঁজিটুকু। কিন্তু ও চায় সত্যকে উপলব্ধি করতে—সত্যকে ও জানতে-বুঝতে চায় ব্যক্তি হিসেবে, নারী হিসেবে, মানুষ জাতিরই অন্যতমা হিসেবে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বর্ণনা করে একজন বক্তা কিছু বললেন। তার বক্তব্যটা অবশ্য তেমন কিছু উৎসাহজনক মনে হল না। খাদ্য অবরোধের প্রাচীর ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে : চেকোস্লোভাকরা সাইবেরিয়া থেকে সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, এদিকে আতামান ক্রাস্নভ আটকাচ্ছে দন এলাকার খাদ্যশস্য। উক্রেইনীয় পার্টিজান যোদ্ধাদের উপর নির্মম প্রতিশোধ নিচ্ছে জার্মানরা। হস্তক্ষেপকারী বৈদেশিক শক্তিবর্গের নৌবহর ক্রনস্টাড্ট্ আর আর্খানগেল্স্ক্-এর দিকে এগিয়ে আসছে। "কিন্তু তবু বিপ্লবের জয় অনিবার্য!"

বাতাসের গায়ে শ্লোগান ছুঁড়ে বক্তা যেন হাতের মুঠি দিয়ে শূন্যেই তা গেঁথে দিলেন পেরেক ঠোকার মতো। তারপর ব্রীফ কেস্টা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। সামান্য হাততালি পড়ল—অবস্থা যেমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে হাততালি দেবার উৎসাহই বা আসবে কোথা থেকে। শ্রোতারা মাথা নিচু করে বসে আছে। কুঞ্চিত ভুরুর আড়ালে চোখগুলো একেবারে অদৃশ্য।

চকচকে দাঁতওয়ালা সেই ছেলেটির সঙ্গে দাশার চোখাচোখি হতেই ফূর্তির ভাব দেখিয়ে ছেলেটি দাঁত বের করে হাসল।

"বড্ডো বিশ্রী দিনকাল যাচ্ছে, বুঝলে গো, ওরা আমাদের না খাইয়ে মারতে চায়। কী করা যায়?"

"ভয় পেয়েছেন নাকি?" দাশা জিজ্ঞেস করে।

"কে, আমি? ভয়ে বলে বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাবার জোগাড়! তা, তোমার নামটা কী?"

ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অন্যরা চেঁচিয়ে উঠল : "শ্-শ্!" "এই, চুপ করো!"

দাশা একবার নজর বুলিয়ে নিল ছেলেটির ওপর। কালো শার্টের বোতাম খোলা, পেশীবহুল বুকখানা দেখা যাচ্ছে। কাঁধটা বৃষের মতো। খুশি খুশি মুখটায় একটা উজ্জ্বল হাসি লেগে আছে। ভিজে কোঁকড়া চুলগুলো মাথায় বসে আছে চ্যাপ্টা হয়ে। ঘাঘু প্রেমিকের মতো গোল-গোল চোখ। সারা গায়ে তেলকালি আর ময়লার ছাপ।

"বেশ ছেলে তো আপনি? দাঁত বের করে অমন হাসছেন কেন?" বলল দাশা।

"অভ্যেস। এইটুকুন বয়েস থেকে মায়ের কোল ছাড়া কিনা। একটা কথা বলি? আমাদের সঙ্গে এস তুমি, কাল বাদ পরশু আমরা ফ্রণ্টে চলে যাচ্ছি। আসবে তো? মস্কোয় থাকলে কোথায় তলিয়ে যাবে তার কি ঠিকানা আছে?......ভাবনা কী, সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে যাচ্ছি।......"

প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির মধ্যে ওর কথাগুলো ডুবে যায়। একজন নতুন বক্তা এবার মঞ্চে উঠে এসেছেন। ধূসর জ্যাকেট-পরা খাটো মানুষ, ওয়েস্ট্কোটে আড়াআড়ি ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো। বড়ো টাক-মাথাটা ঝুঁকে আছে হাতের কাগজগুলোর ওপর। "কমরেড্স্"—বলতে আরম্ভ করলেন তিনি। দাশা লক্ষ্য করল 'র'-গুলোকে উনি একটু টেনে উচ্চারণ করেন, চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ, চোখ দুটো কুঁচকে রেখেছেন, চোখে আলো পড়লে যেমন হয়। টেবিলের একগাদা কাগজপত্রের ওপর হাতটা স্থির করে রেখেছেন। যখন উনি বললেন যে ওঁর আজকের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এমন একটি প্রচণ্ড সংকটের কথা যা সারা ইউরোপ এবং বিশেষ করে রাশিয়াকে জর্জরিত করে তুলেছে, এবং সে সংকট হচ্ছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, তখন ধোঁয়ায় কালো ছাদের নিচে সেই তিনহাজার মানুষ যেন দম বন্ধ করে কান পেতে থাকে।

প্রথমে উনি সাধারণ কয়েকটি কথা বলে নেন নিচু গলায়, শ্রোতাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করবার জন্য। টেবিল ছেড়ে কখনো সামনে এগিয়ে আসেন, কখনো পিছিয়ে যান। বিশ্বযুদ্ধের কথা বলেন—সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের দুটো দল পরস্পরের টুঁটি টিপে ধরেছে, যুদ্ধ থামাবার ক্ষমতাও নেই তাদের, ইচ্ছেও নেই। দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে উন্মত্তের মতো মুনাফাখোরী চলছে, সে কথাও তিনি বললেন। ঘোষণা করলেন, একমাত্র সর্বহারার বিপ্লবই পারে যুদ্ধকে চিরতরে খতম করতে।......

বক্তা ব্যাখ্যা করে বললেন, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়বার দুটো রাস্তা খোলা আছে : একটা হল ফাটকাবাজদের পকেট ফাঁপিয়ে তাদের অবাধ ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ করে দেয়া, দু' নম্বর হল—রাষ্ট্রের হাতে একচেটিয়া অধিকার। টেবিলের কিনারা থেকে তিন পা সরে এসে তিনি শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। ওয়েস্ট-কোটের দু' বগলে দু'হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছেন। এই বিশেষ ভঙ্গিটার ফলে তাঁর উঁচু চওড়া কপাল আর প্রকাণ্ড হাত দুটো সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়েছে। দাশা দেখল, বক্তার ডান হাতের তর্জনীতে কালির দাগ লেগে রয়েছে।

"যে-শ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, যে-শ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা বুর্জোয়াদের উৎপাটিত করেছি, যে-শ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা বর্তমান সংকটের সমস্ত আঘাতটা সহ্য করে যাচ্ছি, সেই শ্রেণীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা বরাবর লড়েছি, চিরকালই লড়ব। খাদ্যশস্যের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্বের সপক্ষে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবই...।' (কথাগুলো

শুনে সেই হাসি-মুখ ছোকরাটা সমর্থনসূচকভাবে 'হুঁ-হুঁ' করতে থাকে)। "দুর্ভিক্ষকে পরাস্ত করাই হচ্ছে আমাদের কাজ, অন্ততপক্ষে আগামী ফসলের আগে পর্যন্ত বোঝাটাকে যেমন করে হোক খানিকটা হালকা করতেই হবে। আমাদের কাজ হল খাদ্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করা, খাদ্যের ব্যাপারে সোবিয়েত গভর্নমেণ্ট ও শ্রমিক রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সমস্ত উদ্বৃত্ত শস্য আমাদের উদ্ধার করতে হবে, যেখানে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি সেখানেই যাতে সেই শস্য পাঠানো যায় এবং ভালোভাবে তার বিলিব্যবস্থা হয় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।......

"কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ হলো সমাজ-কাঠামোটিকে চালু রাখা. এইটে নজরে রাখতে হবে যাতে এই বিরাট কাজে যে মেহনতের প্রয়োজন তাতে কখনো ভাঁটা না পড়ে—আর তা সম্ভব একমাত্র ঐক্যবদ্ধ, অদম্য চেষ্টার মারফত......"

একটা চাপা আওয়াজে রুদ্ধশ্বাস নীরবতাটুকু ভেঙে গেল—বোধহয় কোনো ক্ষুব্ধ-হৃদয়ের আর্তনাদ; ধূসর পোশাক-পরা মানুষটি তুষারসংকুল শিখরের দিকে যে-পথ দেখাচ্ছেন সে পথের কথা ভেবে হয়তো কারুর বুক দুর-দুর করে উঠেছে। শ্রোতাদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বক্তার প্রকাণ্ড ললাট—উঁচু ভুরুদুটোর নিচে চোখজোড়া অচঞ্চল, অনতিক্রম্য।

"......বৈপ্লবিক ও সামাজিক এক কর্তব্য পালনের প্রয়োজন আজ আমাদের সামনে। এ পথে বাধাবিপত্তিও আছে অনেক। আমাদের এ যুগটা হল তীব্র গৃহযুদ্ধের যুগ।......একমাত্র প্রতিবিপ্লবীকে পরাস্ত করে, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রীতিমতো লড়াই করেই আমরা দুর্ভিক্ষ দূর করব, আর দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে যারা মুনাফা কামায় সেই বিপ্লববিরোধীদেরও একই সংগে খতম করতে পারব।......"

ওয়েস্ট্‌কোটের বগল ছেড়ে বক্তার একটা হাত শূন্যে ছিটকে এল যেন অদৃশ্য কোনো শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্যই; শ্রোতাদের মাথার ওপর সে-হাত স্থির হয়ে রইল।

"মুনাফাখোরদের চেঁচামেচি শুনে অনেক মজুরের মাথা ঘুরে যায়, তাঁরাও ওদের সংগে সুর মিলিয়ে দাবি করতে থাকেন, শস্যের বিক্রির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হোক, মোটর লরী আর ঐরকম ধরনের সব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা হোক বলে। আমরা তখন জবাবে বলি, এর ফলে কুলাকদেরই সাহায্য করা হবে।......আমরা সে পথ নিতে পারি না।......আমরা চাইব শ্রমিকদের সমর্থন, তাঁদের সংগে মিলেই আমরা অক্টোবরে জয়লাভ করেছি। মেহনতী জনতার সমস্ত অংশের ওপর সর্বহারার শৃংখলা কায়েম করেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত কাজে চালু করতে পারি। আমাদের সামনে আজ এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব আমরা পালন করবই।......সব প্রশ্নের গোড়ার প্রশ্ন যেটা—অর্থাৎ রুটির সমস্যা—তাই নিয়েই আমাদের সর্বশেষ ফরমানগুলোতে লেখা হয়েছে। তিনটে মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে এইসব ফরমান জারি হয়েছে। প্রথম নীতিটা হল কেন্দ্রীকরণের

নীতি, অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে কেন্দ্রের পরিচালনায় একটা সাধারণ একক কর্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।......অনেকেই আমাদের কাছে জানিয়েছেন যে একচেটে শস্য-বণ্টনের প্রত্যেকটা ধাপে ব্যক্তিগত ক্রেতা ও মুনাফাখোররা নাকি বাগড়া দিচ্ছে। বুদ্ধিজীবীদের মুখে আজকাল ঘন-ঘনই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, চোরাকারবারীরা নাকি তাঁদের অশেষ উপকার করছে, ওরাই নাকি তাঁদের বাঁচিয়ে রাখছে।......হ্যাঁ ব্যাপারটা অবশ্য তাই।......কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা এ কাজ করছে 'কুলাক' পদ্ধতিতে, এ পদ্ধতির ফলে কুলাকদের ক্ষমতাই সংহত হবে, ওরাই কায়েম হয়ে বসবে, কুলাকদের শক্তিই এর ফলে দীর্ঘতর আয়ু লাভ করবে।......"

বক্তার হাতটা এবার এমনভাবে ঘুরে গেল যেন ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত অসহনীয় একটি পরিস্থিতিকে তিনি একেবারেই মুছে দিলেন সামনে থেকে।

"আমাদের দ্বিতীয় স্লোগান হল শ্রমিকদের ঐক্য। আজ রাশিয়া যে প্রচণ্ড আর ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়েছে তা থেকে তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র শ্রমিকরাই। শ্রমিকদের খাদ্য-অভিযান-দলের সংগঠন, আর কৃষিহীন দুর্ভিক্ষ-অঞ্চলের উপবাসী মানুষদেরই আমরা প্রথম সাহায্যের জন্য ডাকব, তাদের কাছেই আমাদের সরবরাহ-কমিসারিয়েটের দপ্তর বক্তব্য পেশ করবে, আমাদের রুটির জেহাদে যোগ দিতে আমরা তাদেরই প্রথম আহ্বান জানাব!"

রোষকম্পিত প্রচণ্ড হর্ষধ্বনিতে ঘর ফেটে পড়ার জোগাড়। দাশা দেখল কেমন করে বক্তা পকেটে হাত গুঁজে কাঁধ দুটো উঁচু করে পিছিয়ে এলেন কয়েক পা। দু গালের হাড়ের ওপর যেন আগুনের ছোপ লেগেছে, চোখের পাতা কাঁপছে, স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে কপালটা।

"আমরা একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করছি।......শোষকদের বিরুদ্ধে আমরা সর্বহারার একাধিপত্য গড়ে তুলছি......"

এ-কথাগুলোও ডুবে গেল হর্ষধ্বনির মধ্যে। চূড়ান্ত রায় দেবার ভঙ্গীতে শ্রোতাদের স্তব্ধ করে তিনি পূর্ণ নীরবতা ফিরে আসবার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর আবার শুরু করলেন :

"......'গরীবদের প্রতিনিধিরা, এক হও!'—এই হল আমাদের তৃতীয় স্লোগান। আমাদের সামনে আজ এক ঐতিহাসিক কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে; সে কর্তব্য হল ইতিহাসের পক্ষে অভিনব এক শ্রেণীকে শ্রেণী-চেতনায় দীক্ষিত করা।...সারা দুনিয়ার শহুরে মেহনতী মানুষ আর কারখানার মজুর আজ এককাঠ্ঠা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সুদূর গ্রামাঞ্চলে যারা ছোট ছোট জোতবাড়িতে দিন গুজরান করে, অন্ধকার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হবার ফলে যাদের মন যায় ভোঁতা হয়ে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর কোথাও এ পর্যন্ত কোনোরকম সুষ্ঠু, নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগমূলক প্রচেষ্টা হয়নি বলা চলে। এখন আমাদের সামনে কর্তব্য হল, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে হবে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও লড়াই। এই লড়াইয়ে আমাদের সম্পূর্ণ শক্তির সদ্ব্যবহার করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে সবরকম

ত্যাগের জন্য, কারণ এ লড়াই হল সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই, মেহনতী মানুষ ও শোষিতশ্রেণীর চূড়ান্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য লড়াই।......"

কপালের ওপর তাড়াতাড়ি একবার হাতের তালুটা বুলিয়ে নিলেন তিনি।

"মস্কোর কাছাকাছি জেলাগুলোতে, আশেপাশের প্রদেশগুলোতে,—কুরস্ক্, ওরেল, তাম্বোভে, খুব কম করে ধরলেও এখন পর্যন্ত এক লক্ষ পুড উদ্বৃত্ত শস্য মজুত রয়েছে। কমরেডস্, আসুন আমরা সমবেত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবার! সমবেত শক্তি, দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামে ও শহরে যারা সবচেয়ে বেশি ঘা খেয়েছে তাদের সকলের শক্তি একত্র করেই আমাদের কিছু কাজ হতে পারে। আর সোবিয়েত শাসক-শক্তির তরফ থেকে তাই এই ডাকই আপনাদের কাছে এসেছে : শ্রমিকদের ঐক্যবন্ধ করো! তাদের মধ্যে যারা অগ্রণী, সবচেয়ে গরীব অংশটাকে ঐক্যবন্ধ করো, যাতে 'রুটির জন্য কুলাকদের সংগে যুদ্ধ করতে হবে' এই ধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে......"

হাত দিয়ে ঘন ঘন কপাল মুছতে শুরু করেছেন বক্তা, গলার স্বরে সেই গম্‌গমে ভাবটা অন্তর্হিত হয়েছে। যা বলবার ইচ্ছে তাঁর ছিল, সবই বলা হয়ে গেছে। টেবিল থেকে এক শিট্ কাগজ তুলে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর বাদবাকি কাগজগুলো একজায়গায় জড়ো করলেন।

"তাহলে, কমরেডস্, এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারি এবং সেই অনুসারে কাজ করে যেতে পারি তা হলে জয় আমাদের অনিবার্য।"

তারপর হঠাৎ একটা সরল প্রাণখোলা হাসিতে তাঁর মুখটা ভরে উঠল। সবাই বুঝে নিয়েছে : এ যে আমাদেরই একান্ত আপনার লোক! সকলে মিলে চেঁচায়, হাততালি দেয়, পা দাপায়। মঞ্চ থেকে বক্তা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন, মাথাটা যেন কাঁধদুটোর মধ্যে ঢুকে গেছে। সাদা-দাঁতওয়ালা সেই ছেলেটি দাশার পাশ থেকে বলিষ্ঠ মোটা গলায় চীৎকার করে ওঠে :

"ইলিয়িচ জিন্দাবাদ!"

সবকিছুর মধ্যে থেকে দাশার কাছে কেবল এই কথাটাই পরিষ্কার হয়ে এল যে সে আজ "নতুন কিছু" দেখেছে ও শুনেছে। সভা থেকে ঘরে ফিরে ও বিছানায় বসে রইল, দেয়াল-মোড়া কাগজের নক্‌শাগুলোর দিকে বড়ো-বড়ো চোখে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। বালিশের ওপর ঝিরভের একটা চিরকুট, তাতে লেখা : "মামন্ত্ আপনার সংগে এবারোটার সময় মেত্রোপোলে দেখা করতে চায়।" আর মেঝের ওপর ঠিক দরজার চৌকাঠটার কাছে পড়ে আছে আর একটা চিরকুট, সেটাতে লেখা : "গোগোলের মূর্তির কাছে আজ সন্ধ্যে ছ'টার সময় হাজির থাকবেন।"

প্রথমেই দাশার যা মনে হচ্ছে তা হল, আজকের এই "নতুন কিছু"র মধ্যে আছে একটা সুকঠোর নৈতিকতা, যার ফলে তা মহনীয় হয়ে উঠেছে।...আলোচনাটা হচ্ছিল রুটি নিয়ে। এতদিন দাশা জানত, রুটি কিনতে পাওয়া যায়, কিংবা হয়তো অন্য কিছুর বদলেও পাওয়া যায়—এমন একটা দামে যা সকলেরই জানা : এই

ধরুন একজোড়া পাৎলুনের বদলে পাওয়া যেতে পারে এক বস্তা ময়দা। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে এমন রুটি ওরা লাথি মেরে সরিয়ে দিতে চায়—এ রুটিকে বিপ্লব রোষভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। অপবিত্র উচ্ছিষ্ট এ অন্ন। এ অন্ন গ্রহণ করার চেয়ে উপোস করে মরা ভাল! তিন হাজার ক্ষুধার্ত নরনারী আজ এ উচ্ছিষ্ট রুটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

"প্রত্যাখ্যান করছে......" (কিন্তু কিসের নামে? দাশার দুর্বল স্মৃতিশক্তি সব কিছু ঘুলিয়ে ফেলে আবার।) "অপমানিত ও নির্যাতিতদের নামে......" তাই তো বলেছিলেন উনি, তাই না? "মেহনতী মানুষ আর শোষিতদের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হবে, যথাসর্বস্ব এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে...।" ওদের এই মর্মন্তুদ কঠোরতার কারণই হল এই।...

কুলিচক ওকে বলেছিল, দুনিয়ার সব জায়গা থেকে নাকি আজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের জন্য—সে হাতে রয়েছে রুটি,......নিলেই হয়, তবে সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তিটাকে তাদের ধ্বংস করতে হবে প্রথমে......আগে ধ্বংস করো, তারপরেই পাবে রুটি।......কিন্তু তাই বা কিসের নামে? রাশিয়ার মুক্তির নামে। কিন্তু কার হাত থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করব? আমাদেরই হাত থেকে......। কিন্তু এরা তো ওইভাবে রুটির বিনিময়ে নিজেদের বাঁচাতে চায় না—দাশা আজ নিজের চোখেই তা দেখল।

দাশা কী বোকা, কী বোকা! ওগো দাশামণি, রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছ তুমি বড্ড দেরিতে! "সবুর, এক মিনিট!" দাশা চেঁচিয়ে ওঠে: "এক মিনিট, এক মিনিট দাঁড়াও!" হাত দুটো পিছনে রেখে সে পায়চারি করতে থাকে কামরার মধ্যে। চোখ দুটো মাটির দিকে। "অত্যাচারিত আর অপমানিতদের জন্য প্রাণ বলি দেওয়া—এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কী হতে পারে? কিন্তু কুলিচক তো বলে বলশেভিকরাই নাকি রুশদেশটাকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে ছাড়ছে, সবাই তো দেখি তাই বলে......"

চোখ দুটো বোজে দাশা, প্রাণের চেয়েও যাকে বেশি ভালোবাসা উচিত এমন এক রাশিয়ার চিত্র কল্পনা করতে চেষ্টা করে সে। সেরভ্-এর আঁকা একটা ছবির কথা মনে পড়ে: পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ঘোড়া, অস্তাচলে থরে থরে জমেছে মেঘ, জীর্ণ পর্ণকুটীর......"কিন্তু সে তো একান্ত সেরভেরই নিজস্ব কল্পনা......।" এবার ওর বন্ধ চোখের পাতার নিচে ভেসে ওঠে সেই ঝক্‌ঝকে দাঁতওয়ালা তরুণ ছেলেটির চেহারা, তেমনি প্রাণখোলা ফূর্তির হাসি হাসছে সে। আবার পায়চারি শুরু করে দাশা।......"রাশিয়া তাহলে কী? ওরা যে যার মতো টেনে নিয়ে চলেছে কেন দেশটাকে? সত্যি আমি একটা অপদার্থ মেয়েমানুষ, কিছু যদি আমার মগজে ঢোকে!...উঃ, ভগবান্, ভগবান্!" আঙুলের ডগাগুলো এক জায়গায় করে বুকের ওপর ঠুকতে থাকে দাশা। কিন্তু তাতেও কি কোনো কাজ হয়!......"গিয়ে জিজ্ঞেস করব নাকি লেনিনকে? ওহো, আমি যে আবার অন্য শিবিরের লোক, ভুলেই গিয়েছিলাম......"

দাশার মনের সমস্ত শঙ্কাময় দ্বন্দ্ব আর আত্মানুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটল ছ'টার সময় যখন ও চোখ পর্যন্ত টুপিটি টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোগোলের মূর্তির উদ্দেশে। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টাইপিনওয়ালা সেই লোকটি।

"দেরি করেছেন তিন মিনিট। তারপর কী ব্যাপার? গিয়েছিলেন ওখানে? লেনিনের বক্তৃতা শুনলেন? আমাকে এবার আসল খবরগুলো দিন তো! কী ভাবে গেলেন সেখানে? লেনিনের সঙ্গে আর কে ছিল? মঞ্চের ওপর কি পাহারা রেখেছিল নাকি?"

জবাব দেবার আগে দাশা একবার সবকিছু গুছিয়ে ভেবে নেবার চেষ্টা করল। তারপর বলল :

"আচ্ছা একটা কথা বলুন তো আমায়, কিসের আদর্শ সামনে রেখে তাঁকে খুন করতে যাচ্ছি আমরা?"

"কী, কী বললেন! এমন কথা কে আপনাকে বলেছে? কারও মনে সে কথা ওঠেনি।......ও! মনের ওপর তাহলে উনি দাগ কাটতে পেরেছেন দেখছি খানিকটা! তা তো হবেই, স্বাভাবিক। এইজন্যই তো লোকটা আরো বিপজ্জনক।"

"কিন্তু উনি যা বললেন তা তো সত্যিই।"

ঘাড়টা ধনুকের মতো বাঁকা করে, ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ চক্‌চকে একটা হাসি দাশার মুখের ওপর সরাসরি বিঁধিয়ে দিয়ে লোকটা বিদ্রূপভরা গলায় বলে উঠল :

"এর চেয়ে বরং কাজটা ছেড়ে দিলেই ভালো হত না কি?"

দাশা যেন কুঁকড়ে গেল। লোকটার গলাটা ঠিক যেন রবারের মতো লম্বা হয়ে এসেছে, চশমার ঝক্‌ঝকে কাঁচ দুটো দাশার চোখের সামনে নাচছে।

"আমি কিছুই জানি না"—ফিসফিসিয়ে বলল দাশা : "কোনো কিছুই যেন আর বুঝে উঠতে পারছি না একেবারে।......আমাকে যেমন করে হোক বুঝে নিতেই হবে পরিষ্কার করে, বুঝে নিতেই হবে......"

"লেনিন হলেন জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর দালাল",—ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে শুরু করল টাইপিনওলা লোকটা। আধঘণ্টা ধরে সে দাশাকে বোঝালো জার্মানদের নারকীয় পরিকল্পনার কথা : ওরা বলশেভিকদের চড়া দামে ভাড়া করেছে, শীল-মোহর-করা গাড়িতে চড়িয়ে ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছে দেশের মধ্যে : আর এই বলশেভিক-গুলোও আড়াল থেকে সৈন্যবাহিনীর সর্বনাশ করছে, মজুরদের ভোলাচ্ছে, দেশের শিল্প আর চাষ আবাদ ধ্বংস করছে।......আর মাসখানেক বাদেই জার্মানরা একটা গুলিও খরচা না করে অনায়াসে রাশিয়া দখল করে নেবে।

"বলশেভিকরা এখন খাদ্য-অবরোধের ধুয়ো তুলে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে খুন করছে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের যারা কিনা আমাদের দুর্দিনে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ওরা ইচ্ছে করেই দুর্ভিক্ষ বাধাচ্ছে।......আজ দেখেছেন তো লেনিনের মুখের কথায় হাজার হাজার গবেট মূর্খ কেমন উঠছে বসছে...একেবারে

অসহ্য, রাগে গা জ্বলে যায়।......মানুষকে ঠকাচ্ছে লোকটা, সারা দেশটাকে ধাপ্পার ওপর দিয়ে রেখেছে।......বস্তুবাদী দৃষ্টি থেকে দেখলে লোকটা হল "মহা ধড়িবাজ উস্কানিদাতা"......আর অন্যভাবে দেখলে......(দাশার কাছে সরে এসে এক নিঃশ্বাসে ওর কানে কানে বলে)—"এই লোকটিই হল সেই খৃষ্ট-শত্রু এ্যাণ্টিক্রাইস্ট্! বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে আছে তো? সবকিছু মিলে যাচ্ছে হুবহু। উত্তর যাবে দক্ষিণের সংগে যুদ্ধ করতে। মৃত্যুর লৌহ অশ্বারোহীদলের আবির্ভাব হবে—তার মানে ট্যাঙ্ক।...জলধির উৎসমুখে অশুভ এক তারকার পতন হবে—তার মানে বলশেভিকদের ওই পাঁচ-মুখো তারা।......আর ইনিও ঠিক খৃষ্টের মতোই বিরাট জনতার সামনে বাণী বিতরণ করছেন, শুধু খৃষ্টের বিপরীত এই যা।...আজ এমনকি আপনার মনও উনি ভোলাতে চেষ্টা করেছেন। তবে আমরাও আপনাকে ছাড়ছি না।...আমি আপনাকে অন্য কাজে বদলি করিয়ে দেব।"

দাশার তৃতীয় প্রশ্নের কোনো জবাব মিলল না। (ঘরে ফিরে ও বিছানায় শুয়ে থাকল, কনুইয়ের কিনারা দিয়ে ঢেকে রাখল চোখ দুটো।) তারপর হঠাৎ এক সময় ও বিরক্ত হয়ে উঠল এত কথা ভাবছে বলে।......"লোকে ভাববে আমি যেন কোন্ একশো-বছরের বুড়ি! অমন কুৎসিত আমি হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার যেমন খুশি আমি তাই করব।...মেত্রোপোলে যাব না কেন? যদি আমার [illegible] ভাল লাগে তবে যাব না কেন? যা লুকিয়ে রাখা যায় না তা লুকোবার এই চেষ্টা কেন, বুকের ভেতর থেকে যে আনন্দের ধ্বনি ঠেলে আসছে তাকে চাপা দেবার এই প্রয়াস কেন? যন্ত্রণার বাঁধনে নিজেকে কেন বেঁধে রাখা? কার ঐকান্তিক প্রয়োজনে? বোকা, একেবারেই বোকা আমি, ভীরু! ছেড়ে দাও নিজেকে! দাও গা ভাসিয়ে! কিসের বা কী দাম আছে? চুলোয় যাক ভালোবাসা, চুলোয় যাক আমার সবই......"

দাশা গোড়া থেকেই জানে ও মেত্রোপোলেই যাচ্ছে। ও যদি ইতস্তত করার ভান করে থাকে, তার মানে আর কিছুই নয়—যে-সময় ঠিক করা আছে সে সময় এখনো হয়নি, এখনও বিকেল রয়েছে, আর বিকেল হলেই যতো রাজ্যের চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। বাড়ির মধ্যেই কোথায় যেন একটা ঘড়িতে ন'টা ঘণ্টা বাজল পরপর। আওয়াজটা গম্ভীর, যেন গির্জার টাওয়ার ঘড়ি বাজছে। বিছানা ছেড়ে হুড়মুড় করে লাফিয়ে উঠল দাশা। "এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়লাম কেন, ছি ছি!"

তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, শেমিজ গায়েই ও ছুটে গেল বাথরুমে। যত রাজ্যের কাঠ, ট্রাঙ্ক, আর আজে বাজে জিনিস রয়েছে সেখানে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল দাশা, পিঠের ওপর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে পড়ার সময় দম বন্ধ করে রইল ও। তারপর ভিজে গায়ে এক ছুটে কামরার মধ্যে ফিরে এসে তোষকের ওপর থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে মুছতে শুরু করল গা। দাঁত দুটো তখন ওর ঠক্ ঠক্ করছে ঠাণ্ডায়।

কিন্তু তবু যেন ও মনটাকে স্থিরই করতে পারছে না। মেঝের ওপর ছেড়ে-রাখা পুরনো পোশাকটা থেকে ওর দৃষ্টি নিতান্ত দুর্বলতার বশেই যেন সরে যায় চেয়ারের ওপর সযত্নে রাখা সান্ধ্য পোশাকটার দিকে। তারপর অবশেষে ও নিজের

মনকে বোঝায়, নিছক ওর নিজের ভীরুতা আর গড়িমসি ছাড়া এ সব আর কিছুই নয়। কাপড় পরতে শুরু করে দেয় এবার। দাশার বেশ স্বস্তি লাগে যখন ও দেখে ঘরে একটাও আয়না নেই। সেব্‌ল্‌ কোটটা কাঁধের ওপর ফেলে ও চুপি-চুপি চোরের মতো বেরিয়ে আসে রাস্তায়। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে এখন। বুলভারের ওপর দিয়ে ও হাঁটতে থাকে। লোকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওকে, এমন দু'একটা মন্তব্য দাশার কানে আসে যার পরিষ্কার দু'রকম অর্থ করা যায়। সৈনিকদের জোব্বাকোট পরা দু'জন লোক গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। ওরা চেঁচিয়ে উঠল : "এই যে পরগাছা, এত তাড়াতাড়ি কোথায় চললি?"

নিকিৎস্কি স্কোয়ারে এসে দাশা থামলো, দম নিতে পারছে না যেন—বুকটার মধ্যে ছোরা বেঁধার মতো খচ্‌ খচ্‌ করছে। আলো জ্বালিয়ে একটা ট্রাম ছুটে চলেছে—জোড়া গাড়ির ট্রাম। ঘণ্টাও বাজাচ্ছে প্রাণপণে। পা-দানি অবধি ভিড় ঠাসা। দাশার সামনে দিয়ে যাবার সময় ট্রামের পিতলের হাতলটা ডান হাতে ধরে, আরেক হাতে একটা কুমীরের-চামড়ার এ্যাটাচি ঝুলিয়ে দাশার দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল একটি লোক। দাঁড়ি-গোঁফ কামানো বলিষ্ঠ মুখমণ্ডল। লোকটি মামন্ত্‌। ঊর্ধ্বশ্বাসে দাশা ছুটতে শুরু করল ট্রামের পিছন পিছন। মামন্ত্‌ ওকে দেখতে পেয়েছে, হাতের এ্যাটাচিটা ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল একবার। পূর্ণবেগে চলছে ট্রাম, তারই মধ্যে সে লাফ দিয়ে পড়ল হাতল ছেড়ে দিয়ে। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে পাগলের মতো একবার বাতাসটাকে খামচে ধরবার চেষ্টা করল মামন্ত্‌; ওর একখানা বুটের তলা যেন মুহূর্তের জন্য প্রকাণ্ড হয়ে শূন্যে জেগে রইল—পরক্ষণেই ওর দেহের ঊর্ধ্বাংশ অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনের গাড়িটার নিচে, কুমীরের চামড়ার এ্যাটাচিটা ছিটকে এল দাশার পায়ের কাছে। দাশা দেখল মামন্তের হাঁটু-দুটো প্রবল ঝাঁকুনিতে উপরদিকে উঁচিয়ে গেছে, হাড়গুলো মট্‌ মট্‌ করে উঠল একবার, তারপর বুটজোড়া সশব্দে গড়িয়ে পড়ল পাথরকুচির ওপর। ট্রাম ততক্ষণে ব্রেক কষেছে। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

দাশার চোখের ওপর নেমে এল একটা ঘোলাটে পর্দা; রাস্তাটাকে দেখাচ্ছিল যেন নরম এক ফালি চাদরের মতো—জ্ঞান হারিয়ে দাশা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ওর গাল আর হাত দুটো আছড়ে পড়ল কুমীরের চামড়ার কেস্‌টার ওপর।

॥ নয় ॥

তর্গোভায়া রেলস্টেশনের ওপর হামলা করে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী শুরু করল তাদের নতুন অভিযান—তথাকথিত "দ্বিতীয় কুবান অভিযান"। এই রেল-জংশনটা দখল করার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ এর ফলে গোটা উত্তর ককেসাসই রাশিয়ার বাকি অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বলা যায়। জুন মাসের দশ তারিখে দেনিকিনের পরিচালনায় পদাতিক আর অশ্বারোহী সমেত ন'হাজার সৈন্যের একটা ফৌজী-বাহিনী চারটি সারিতে ভাগ হয়ে এগিয়ে চলল তর্গোভায়া স্টেশন ঘিরে ফেলবার জন্য।

দেনিকিন স্বয়ং ছিলেন দ্রজ্‌দ্‌ভস্কির সারিতে। চারিদিকে ভয়ানক থম্‌থমে ভাব। সবাই বুঝতে পারছে, যুদ্ধের একেবারে প্রথম দফার লড়াইয়েই বাহিনীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। দ্রজ্‌দভ্‌স্কির সৈন্যরা তাদের একখানা মাত্র সম্বল কামান সামনে রেখে এলোমেলো গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবেগে ছুটে চলল এগর্‌লিক্‌ নদীর দিকে—শত্রুর গোলাবর্ষণের মধ্যেই ওরা নদী পার হবে। সারির একেবারে সামনে ছিল ক্যাপ্টেন তুর্‌কুল, রেজিমেণ্টের অধিনায়ক। জলের মধ্যে ঠিক রবারের বলের মতোই সে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর চারিদিকে জল ছিটিয়ে একধার থেকে গালাগাল ঝাড়ছিল। লাল সৈন্যরা প্রথমে সাংঘাতিক বাধা দিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেহাৎ আনাড়ির মতো নিজেরাই অভিজ্ঞ শত্রুদের সুযোগ করে দিল ঘেরাও করে ফেলার। ওদের ঘাঁটিগুলো সবই উৎখাত হয়ে গেল, দক্ষিণ দিক থেকে এল বরোভ্‌স্কির সৈন্য-সারি আর পূর্বদিক থেকে এরদেলির ঘোড়সওয়ার দল। হতচকিত লাল ইউনিটগুলো তখন তর্গোভায়া ছেড়ে তাদের বড়ো-বড়ো মালটানা ট্রেনগুলো নিয়ে উত্তরের দিকে পিছু হটতে শুরু করল। কিন্তু শাব্‌লিয়েভ্‌কা বলে একটা জায়গায় মারকভের সৈন্যদল এসে সে-রাস্তাও বন্ধ করে দিল। ভলাণ্টিয়ারদের এবার চূড়ান্ত জয় হয়ে গেছে। এরদেলির কসাক কোম্পানিগুলো স্তেপের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, যেখানেই পলাতকদের হাতে পাচ্ছে কেটে ফেলছে, বন্দী করছে; দখল করছে মালটানা গাড়ি।

বিকেল হয়ে এল। লড়াইও ঠান্ডা হয়ে আসছে। রেলওয়ে প্লাটফর্মের ওপর পায়চারি করছিলেন দেনিকিন। রাঙা মুখটার ওপর ভ্রূকুটিচিহ্ন, মোটা হাতদুটো পিছনদিকে জোড় করে রেখেছেন। ক্যাডেটরা খুব হাসাহাসি আর ঠাট্টাইয়ার্কি করছে, সাংঘাতিক বিপদের মধ্যেও যখন গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে না তখন লোকে এমনি হাসি তামাসাই করে। বালির বস্তা টেনে এনে খোলা ট্রাকগুলোর ওপর চাপাচ্ছিল ওরা, বাদবাকি সবাই তাড়াতাড়ি-করে-সাজানো সাঁজোয়া ট্রেনের ওপর মেশিনগান তুলছিল। মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজে বাতাস থর-থর করে কেঁপে উঠছে—লালবাহিনীর সাঁজোয়া ট্রেন থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে উত্তর দিকে, শাব্‌লিয়েভকার ওধারে। মানিচ নদীর পুলটার কাছে জেনারেল মারকভ যেখানে

তাঁর ছাইরঙা ঘোড়াটায় চেপে বসেছিলেন, সেইখানে পড়ল লালফৌজের তরফের শেষ গোলাটা। পুরো দু'দিন তাঁর ঘুম হয়নি, পেটে কিছু পড়েনি, এমন-কি ধূম্রপান পর্যন্ত করতে পারেননি একটিবারও। আর শাবলিয়েভকা দখলের ব্যাপারটা তাঁর নিজের পরিকল্পনা মাফিক হয়নি বলে মনে মনে ভয়ানক চটেও উঠেছিলেন। দেখা গেল রীতিমতো কামান-সাঁজোয়াগাড়ি সঙ্গে নিয়ে জবরদস্ত একটা ফৌজ স্টেশনটাকে দখলে রেখেছে। গতকাল আর আজ সারাদিনটাই মারকভের অগ্রবর্তী বাহিনীকে লড়াই করতে হচ্ছে প্রাণপণে, অথচ কোনো সাফল্য অর্জন করা যাচ্ছে না। এবার যেন তাঁর গ্রহটাই অপ্রসন্ন, আগের মতো আর চট্ করে কিস্তিমাৎ করা যাচ্ছে না। আর ক্ষতিও হয়েছে প্রচণ্ড। একেবারে সেই সন্ধ্যের দিকে শাবলিয়েভকার ফৌজ পিছু হটলো, তাও অবশ্য সাধারণ অবস্থার চাপে পড়েই।

ঘোড়ার জিনের ওপর থেকে সামান্য একটু ঝুঁকে মারকভ ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করতে লাগলেন—সামনে অনেকগুলো মৃতদেহের অস্পষ্ট রেখাকৃতি, মৃত্যুর অব্যবহিত আগে যেভাবে তারা ছিল সেই ভঙ্গিতেই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ওরা সবাই মারকভের অফিসার, লড়াইয়ের মাঠে ওদের একেকজনের দাম একেকটা গোটা পল্টনবাহিনীর সমান। শুধু খানিকক্ষণের জন্য মনটা তাঁর দমে গিয়েছিল আর তারই ফলে কয়েক-শো বাছা বাছা লড়িয়ে প্রাণ হারালো, ঘায়েল হয়ে গেল।

মারকভের কানে এল একটা গোঙানির আওয়াজ, ফোঁস ফোঁস করে ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ—যেন বুক-চাপা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কারুর ঘুম ভেঙে গেছে। একজন অফিসারকে দেখা গেল পুলের সামনে খোঁড়া ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে, কিন্তু পরক্ষণেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পরিখার উঁচু কিনারাটার ওপর। কাশতে কাশতে তবু সে মাটি আঁকড়ে রইল, তারপর অতিকষ্টে একখানা পা তুলে বেরিয়ে এল বাইরে। মুমূর্ষু অস্তরাগের বুকে প্রকাণ্ড এক উজ্জ্বল তারা,—সেই দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর কামানো মাথাটা ঘুরিয়ে একবার ককিয়ে উঠল যন্ত্রণায়, খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল সামনের দিকে। হঠাৎ তার ঠাহর হল—সামনে জেনারেল মারকভ। স্যালুট করে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলল :

"ভীষণ চোট পেয়েছি, জেনারেল সাহেব।"

"হুঁ, তাই দেখছি।"

"পিঠে গুলি লেগেছে।"

"খুব বিশ্রী তো......"

"খুব কাছ পাল্লা থেকে রিভলবারের গুলি এসে লেগেছে পিঠে। ভলাণ্টিয়ার ভ্যালেরিয়ান ওনোলি ইচ্ছে করেই গুলি ছুঁড়েছে আমার দিকে......"

"আপনার নাম?" চট্ করে প্রশ্ন করলেন মারকভ।

"রশচিন......লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল রশচিন।"

ঠিক সেই মুহূর্তে উত্তরমুখী লাল সাঁজোয়াগাড়ি থেকে ছ-ইঞ্চি ব্যাসের কামানটা গর্জে উঠল শেষবারের মতো একটা গোলা ছুঁড়ে। অন্ধকার স্তেপের উপর

দিয়ে শোঁ করে উড়ে এল গোলাটা। জেনারেল সাহেবের ছাইরঙের ঘোড়াটা চমকে উঠে কান খাড়া করল, তারপর বসতে গেল মাটিতে। আকাশ চিরে গোলাটা এসে ফেটে পড়ল মারকভের কয়েকহাত তফাতেই।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিন ছিটকে পড়েছিল পিছনে। ধুলো আর ধোঁয়া কেটে যেতেই ও দেখল জেনারেলের ছাইরঙা ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে পাগলের মতো খুরগুলো আছড়াচ্ছে শূন্যে—পাশেই পড়ে আছে একটা ছোট, নিশ্চল দেহ। একবার ওঠার চেষ্টা করল রশচিন, তারপর চেঁচিয়ে উঠল :

"স্ট্রেচার কোথায়! জেনারেল মারকভ খুন হয়ে গেছেন!"

তরগোভায়া দখল করার পর ভলাণ্টিয়ার বাহিনী ঘুরল উত্তরদিকে—ভেলিকক্‌নিয়াঝেস্‌কায়ার দিকে। ওদের মতলব ছিল দুটো : সাল্‌স্ক্‌ জেলা থেকে বলশেভিকদের তাড়াবার ব্যাপারে আতামান ক্রাসনভ্‌কে সাহায্য করা যাবে, আবার জারিৎসিন থেকে কোনোরকম আক্রমণ ঘটলে নিজেদের পিছনের ঘাঁটিগুলোও জোরদার করা যাবে। ভেলিকক্‌নিয়াঝেস্‌কায়া দখল করতে অবশ্য খুব বেশি হাঙ্গামা হয়নি, কিন্তু এ বিজয়ের ফলভোগ করা সম্ভব হল না তাদের পক্ষে,—বুদিওনির একটা অশ্বারোহী ফৌজীদল রাতের অন্ধকারে কসাক ইউনিটগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলল, মানিচ নদী পেরুবার রাস্তাই তারা এইভাবে বন্ধ করে দিল।

স্টেশনের কাছাকাছি এলাকায় ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর প্রথম সাঁজোয়া ট্রেনটা খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। সাদা ঝাণ্ডা উড়িয়ে একটা ইঞ্জিন আসছিল উল্টোদিক থেকে। সাঁজোয়া ট্রেনের ক্রু'রা ভাবল বুঝি যুদ্ধবিরতির নিশানা জানিয়ে আত্মসমর্পণকারীরা আসছে। শ্বেতরক্ষীরাও তাই গুলিগোলা ছোঁড়া বন্ধ করে বসে রইল। এদিকে ইঞ্জিনটা কিন্তু পূর্ণগতিতে ছুটে আসছে এক নাগাড়ে হুইস্‌ল্‌ বাজাতে বাজাতে। একেবারে শেষ মুহূর্তে বুঝি সাঁজোয়া ট্রেনের ক্রু'দের মাথায় একটু বুদ্ধি খুলেছিল, তাই ইঞ্জিনটা একেবারে যখন কাছে এসে পড়েছে তখন দু'চার রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল ওরা। কিন্তু কলিশন এড়াবার কোনো উপায়ই তখন নেই। একটা বগি গুঁড়ো হয়ে গেল। ইঞ্জিনটা আগে থেকেই পেট্রোলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, আপাদমস্তক সাজানো ছিল বোমা দিয়ে। সেটাও পড়ল লাইন-চ্যুত হয়ে। কয়েক মুহূর্ত ধরে চোখের সামনে যে-দৃশ্য সবাই দেখল তার তুলনা মেলে একমাত্র মার্কিন ছায়াছবিতে।

দনের কসাকদের হাতে এ অঞ্চলটা তুলে দিলেন দেনিকিন। বলশেভিকদের নিঃশেষ করার কাজটাও তিনি স্থানীয় কসাকদের হাতেই ছেড়ে দিলেন। তারপর ফিরলেন দক্ষিণের দিকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রেলজংশন দখল করাই তাঁর লক্ষ্য—জায়গাটার নাম তিখরেৎস্কায়া, দন আর কুবান এলাকা, কাস্পিয়ান আর কৃষ্ণ-সাগর এসে যুক্ত হয়েছে এই একটি স্টেশনে। সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে দেনিকিনকে। রাস্তায় দুটো বড়ো-বড়ো অ-কসাক গ্রাম—পেস্‌চানোকপ্‌স্কয়ে

আর বেলায়া গ্লিনা। দুটো গ্রামই বলশেভিজমের লালনকেন্দ্র। ওরা রক্ষাব্যূহ তৈরি করছে ক্ষিপ্রগতিতে। তিখোরেৎস্কায়ার আশে পাশে কালুনিনের ফৌজ পুরোদমে লেগে গেছে ঘাঁটি গেড়ে বসতে। সরোকিনের বাহিনী ইতিমধ্যে ভয়ত্রস্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠে পশ্চিমদিক থেকে আবার চাপ দিতে শুরু করেছে। যে-সব লাল ইউনিট মানিচ এলাকায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তাদের আবার জড়ো করা হয়েছে, তারা নতুন করে হামলা শুরু করেছে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে। অনেকগুলো গ্রাম থেকে আবার অতিরিক্ত সৈন্য হিসেবে স্বেচ্ছাসেবকও পাঠাচ্ছে।

দেনিকিনের এখন একমাত্র ভরসা শত্রুর সৈন্যচলাচলের মধ্যে সংগতির অভাব। কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে সে-অবস্থাও পাল্টে যেতে পারে। সুতরাং তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হচ্ছে সৈন্যদলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার, কারণ সময়-সময় তারা লড়াইয়ের ময়দানে দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ছে। পদাতিক সৈন্যদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি জোড়াতালি দিয়ে খাড়া-করা একটা সাঁজোয়া-ট্রেন ফৌজের আগে-আগে চলেছে।

পেস্চানোকপ্স্কয়ে গাঁয়ের সমস্ত মানুষ লালফৌজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। ভলাণ্টিয়ার বাহিনী জন্মে কোনোদিন এমন ভয়ংকর বাধার সম্মুখে পড়েনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কামানের গোলাবৃষ্টির নিচে থরথর করে কাঁপতে লাগল স্তেপের মাটি। বরোভ্স্কি আর দ্রজ্দভ্স্কির রেজিমেণ্ট দুটোকে দু'-দু'বারই গ্রাম থেকে হটিয়ে দিয়েছিল লালফৌজ, কিন্তু যখন ওরা দেখল শত্রু ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, অথচ শত্রুর শক্তি আর হাতিয়ারের পরিমাণ আন্দাজ করার কোনো কায়দা নেই, তখন তারা একেবারে শেষ প্রাণীটি অবধি গ্রাম ছেড়ে সরে পড়ল। ইউনিট, ফৌজীদল আর অসংখ্য উদ্বাস্তু এসে ভিড় জমালো বেলায়া গ্লিনা গ্রামটিতে।

দ্মিত্রি শেলেস্ত্-এর লৌহ ডিভিশনটা এখানেই মোতায়েন ছিল। ওদের সঙ্গে অতিরিক্ত ফৌজ হিসেবে ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের একটা গণফৌজ—দশ হাজার সেপাই সে গণফৌজে। সব রকম বয়েসের লোকই যোগ দিয়েছে। গ্রামের প্রবেশ-পথগুলো শক্ত করে আগলাবার ব্যবস্থা হল; লালবাহিনীর মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল সুশৃঙ্খলা, আর পরিস্থিতি সম্পর্কে রণকুশল বিচারবুদ্ধি। সভাসমিতি-গুলোতে শপথ নেয়া হল—হয় জয়লাভ করতে হবে, না হয় মৃত্যু।

কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। যুদ্ধ-নিপুণ শত্রু, তারা বিজ্ঞান আর করণকৌশল দিয়ে মোকাবিলা করে হিম্মত আর বেপরোয়া লড়াইয়ের, সামান্যতম বিষয়ও তারা উপেক্ষা করে না, দাবা-খেলোয়াড়ের মতো প্রত্যেকটা চাল দেয় রীতিমতো ভেবেচিন্তে, আর সব সময়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে এসে হাজির হয় শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে। সত্যি কথা, প্রথমটায় শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। দ্রজ্দভ্স্কির কলামটার পরিচালনাভার ছিল কর্ণেল ঝেব্রাকের হাতে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে তার লোকজন নিয়ে সিধে উঠল একটা খামারবাড়িতে, লাল বাহিনীর সম্মুখ-

সারির সৈন্যরা তখন সেখানেই মোতায়েন ছিল। শত্রুপক্ষের জোর গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ঝেব্‌রাক ছুটে গেল আক্রমণ চালাবার জন্য, কিন্তু ধরাশায়ী হল সে। ঝেব্‌রাকের লোকজন পালিয়ে এল আড়ালে। কিন্তু পরদিন সকাল ন'টার সময় দক্ষিণ দিক থেকে বেলায়া গ্লিনায় ঢুকলেন কুতেপভ। তাঁর সঙ্গে ছিল কর্নিলভ রেজিমেণ্ট, দ্রজ্‌দভ্‌স্কির একটা অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট আর একখানা সাঁজোয়া গাড়ি। অধিকৃত রেল স্টেশনটার দিক থেকে এগিয়ে এল বরোভ্‌স্কি। শুরু হল রাস্তায় রাস্তায় লড়াই। চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে লাল বাহিনীর লোকেরা গেল বিষম ঘাবড়ে। ওদের সৈন্যসারির মাঝখান দিয়েই পথ কেটে বেরিয়ে গেল সাঁজোয়া গাড়িটা। কুঁড়েঘরের ছাদগুলোতে আগুন লেগে গেছে। গরু-ঘোড়ার দল ছুটছে আগুনের শিখা, কামানের গুলিগোলা আর চীৎকারের মধ্যে।......

শেলেস্তের লৌহ ডিভিশনের সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা যোদ্ধারা আর গাঁয়ের সমস্ত লোকজন শুরু করল পিছু হটতে—একমাত্র রাস্তা যেটা ওদের সামনে খোলা ছিল, সেই রাস্তাই ধরল ওরা। কিন্তু সেখানেও দেনিকিনকে দেখা গেল সিগন্যাল-বক্সের সামনে, ঘোড়ার পিঠে চেপে ঠোঁটের পাশে হাত রেখে মারাত্মক সব হুকুম করছেন শত্রুর পালাবার পথ বন্ধ করার জন্য। এরদেলির ঘোড়সওয়াররা পলাতকদের পেছু নিয়েছে। কম্যাণ্ডারের পার্শ্বচররাও চুপ করে থাকতে পারল না, খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে ধাওয়া করল ওদের পিছন-পিছন। স্টাফ অফিসাররা জিনের ওপর বসে ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শিকারী কুকুরের মতো এবার ওরা তাড়া করল, হাতের কাছে মাথা পিঠ যা পায় তারই ওপর বসাতে থাকে তলোয়ারের কোপ। দেনিকিন এখন একেবারে একা দাঁড়িয়ে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে তাই দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন নিজের উত্তপ্ত মুখমণ্ডলের ওপর। আজকের এই জিতের ফলে তিখোরেৎস্কায়া আর একাতেরিনোদারের রাস্তা তাঁর সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে গ্রাম আর খামারবাড়িগুলো থেকে প্রচণ্ড গুলিগোলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল : দ্রজ্‌দভ্‌স্কির সেপাইরা ঝেব্‌রাকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে বন্দী লালফৌজের সৈন্যদের উপর গুলি চালিয়ে। মাছি-ভন্‌ভনে একটা কুঁড়েঘরে বসে দেনিকিন চা খাচ্ছিলেন। রাতের গুমোটভাব সত্ত্বেও মোটা ভারী টিউনিকের বোতামগুলো গলা পর্যন্ত আঁটা। এককেবার গুলির আওয়াজ হয় আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাঙা জানলাটার দিকে ঘোরেন, দলা পাকানো রুমালখানা কপালের ওপর, নাকের দু'পাশটায় একবার করে বুলিয়ে নেন।

"ভাসিলি ভাসিলিচ্‌,"—পার্শ্বচরকে বললেন এক সময় : "ভাল ছেলের মতো এখন একবার গিয়ে দ্রজ্‌দভ্‌স্কিকে বলো তো এখানে আসবার জন্য। এ জিনিস আর চলতে দেওয়া যায় না, বুঝেছ!"

ঠুং করে রেকাব বাজিয়ে শক্ত কাঠের মতো সিধে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল লোকটি, তারপর গোড়ালি ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সামোভার থেকে

চায়ের কেতলিটার মধ্যে গরম জল ভরতে লাগলেন দেনিকিন। নতুন এক ঝাঁক গুলির আওয়াজ এল—এবার এত কাছে যে শার্সির কাঁচগুলো অবধি ঝন্‌ঝন করে উঠেছে। তারপর রাতের অন্ধকার চিরে একটা দীর্ঘ বুকফাটা চীৎকার। কেতলি উপচে পড়ছে গরম জলে, গোটা কয়েক চায়ের পাতাও বেরিয়ে এসেছে সেই সঙ্গে। "ছি-ছি-ছি," কেতলির ঢাকনাটা চাপা দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে উঠলেন দেনিকিন। দরজাটা হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল, ঘরের মধ্যে ঢুকল একটি লোক, বছর তিরিশ বয়স, মড়ার মতো ফ্যাকাশে, গায়ের টিউনিকটা ভাঁজ-পড়া, কাঁধের ওপরে জেনারেলের কাঁধপটিটাও একই রকম ভাঁজ-পড়া। তেলের বাতির শিখাটা তার চশমার কাঁচজোড়ার ওপর ম্লান প্রতিবিম্ব ফেলেছে। সামনের দিকে উঁচোনো থুতনির মাঝখানটায় ভাঁজ, দাড়ির গোড়া দেখা যাচ্ছে তাতে, বসা গালদুটো কুঁচকে আছে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেনিকিন হাঁসফাঁস করে বেঞ্চি থেকে উঠে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে।

"বস বস, মিখাইল গ্রিগরিয়েভিচ! চা খাবে নাকি?"

"না ধন্যবাদ স্যর, আমার যে সময় নেই!"

লোকটি হল দ্রজ্‌দভ্‌স্কি, অল্প কিছুদিন হল জেনারেলের পদে উন্নীত হয়েছে। কম্যান্ডার-ইন-চীফ কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে তা সে জানত, বরাবরের মতোই সে সম্ভাব্য তিরস্কারের কথা আন্দাজ করতে পেরে অতি কষ্টে মনের রাগটাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। মাথা নিচু করে, চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

"মিখাইল গ্রিগরিয়েভিচ, ভাই, এই যে সব গুলিগোলা চলছে—এ নিয়ে গুটিকত কথা বলতে চাই তোমাকে।......"

দ্রজ্‌দভ্‌স্কির মুখখানা আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"আমি আমার অফিসারদের সামাল দিতে পারছি না", বিশ্রীরকম তীক্ষ্ণ, অনেকটা ক্ষিপ্ত কণ্ঠেই জবাব দিল সে : "আপনি তো জানেন, জেনারেল সাহেব, বলশেভিকরা কর্নেল ঝেবরাকের ওপর কী অত্যাচারটাই না করেছে।...রুমানিয়া থেকে পঁয়ত্রিশজন অফিসার এনেছিলাম, অত্যাচার করে, মেরে ওদের আর কিছুই রাখেনি।......বলশেভিকরা আমাদের লোকজনদের যাকে পাচ্ছে খুন করছে, পীড়ন করছে......হ্যাঁ যাকে পাচ্ছে তাকেই।......" (গলার স্বর ভেঙে গেল, যেন দম আটকে এসেছে) "আমি তো আর আমাদের লোকদের আটকাতে পারি না......আটকাতে আমি অস্বীকার করি।......আপনি যদি আপত্তি তোলেন......আমি ইস্তফা দিতে প্রস্তুত।......সাধারণ সেপাইদের মধ্যে কাজ করে বরং......আমি আনন্দই পাব।..."

"হয়েছে, হয়েছে..." বললেন দেনিকিন : "অত রাগ করতে হবে না, মিখাইল গ্রিগরিয়েভিচ।......ইস্তফা দেবার কথা কি বলছ? দেখতে পাচ্ছ না, মিখাইল, বন্দীদের ওপর এইরকম গুলি চালাবার ফলে শত্রুদের প্রতিরোধ আরও কঠিন হবার সুযোগই করে দিচ্ছি আমরা? এইসব মারধোরের কানাঘুষো খবর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা নিজেদের বাহিনীর ক্ষতি করতে যাব কেন? তুমি

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার কথাটা কত খাঁটি...তাই না, কি বল?" (দ্রজ্‌দভ্‌স্কি চুপ করেই রইল।) "আমি যা-যা বললাম সব তোমার অফিসারদের গিয়ে বল, আর এইসব ব্যাপার যাতে না ঘটে তাই দেখ।..."

"বেশ, তাই হবে স্যার!"

দরজাটা দড়াম্‌ করে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল দ্রজ্‌দভ্‌স্কি।

চায়ের গেলাসটার সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়তে লাগলেন দেনিকিন। শেষবারের মতো কতগুলো বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল কোথাও, তারপর সব নিস্তব্ধ, অন্ধকার।

প্রায় চল্লিশ মাইল চওড়া রণাঙ্গনে ফৌজটাকে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিল ওদের, তিখোরেৎস্কায়া দখলের অভিযান সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। সমস্ত এলাকাটা থেকে তাই শত্রুদের বিচ্ছিন্ন ফৌজীদল আর গেরিলা ইউনিটগুলোকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন ছিল। কাজটার ভার দেয়া হয়েছিল তরুণ সেনাপতি বরোভ্‌স্কির হাতে। দু'দিনের মধ্যে ষাট মাইলেরও বেশি রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে অনেকগুলো গ্রাম দখল করল বরোভ্‌স্কি। প্রায় সারা রাস্তাই লড়াই করতে করতে যেতে হয়েছিল তাকে। গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্‌ভাগে তথাকথিত আক্রমণ চালানো হল।

ভলাণ্টিয়ার বাহিনী এবার সমস্ত এলাকাটার ওপর নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যূহ বিস্তার করতে পেরেছে। তিরিশে জুন তারিখে দেনিকিন একটা সংক্ষিপ্ত আদেশ জারি করলেন: "আগামী কাল পয়লা জুলাই তারিখে তিখোরেৎস্কোয়া রেলস্টেশন দখলে আনিতেই হইবে, তের্নভ্‌স্কায়া-তিখোরেৎস্কায়া জেলায় শত্রুসৈন্যের সমাবেশ যেমন করিয়া হউক ভাঙিয়া দিতে হইবে।......" রাতের অন্ধকারে অভিযান শুরু করল ওরা, বিরাট একটা সাঁড়াশির আকারে তিখোরেৎস্কায়া ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করল। ছোটখাট কয়েকটা সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর বলশেভিকরা পিছিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল রক্ষাঘাঁটির মধ্যে।

এখন আর এক-হপ্তা আগের মতো মরিয়া হয়ে রুখতে পারছে না ওরা। বেলায়া গ্লিনার পতনের ফলে ফৌজের মধ্যে হতাশার ভাব এসে গেছে। সরোকিনের অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়েছে। রক্তঝরা লড়াইয়ে হাজারে-হাজারে প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতি সব বৃথাই। যন্ত্রের মতো নির্ভুল গতিতে এগিয়ে আসছে দুশমনরা। ভলাণ্টিয়ারদের শক্তি সামর্থ্য ওরা কল্পনায় আরো দশগুণ বাড়িয়ে দেখছে। গুজব, সারা রুশদেশ থেকে নাকি অফিসাররা সব দলে-দলে ছুটে আসছে দেনিকিনের কাছে, ক্যাডেটরা নাকি কাউকেই দয়া দেখাচ্ছে না, যে-মুহূর্তে এককেটা জেলা ওরা খালি করে চলে যাচ্ছে সেই মুহূর্তেই নাকি সেখানে এসে ঢুকছে জার্মানরা। তিখোরেৎস্কায়া স্টেশনে একটা ট্রেনের কামরায় পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে বসেছিল কাল্‌নিন, তিখোরেৎস্কায়া গ্রুপের অধিনায়ক। যখন সে শুনল দেনিকিনের বগী-

দল সর্বদিক থেকেই এগিয়ে আসছে, তখন সে একেবারেই সাহস হারিয়ে ফেলল, হুকুম করল পশ্চাদপসরণ করতে হবে।

সকাল ন'টার মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এল লড়াই, লাল সৈন্যরা হটে গিয়ে আশ্রয় নিল তিখোরেৎস্কায়ার পিছনে অর্ধ-বৃত্তাকার রক্ষাঘাঁটির মধ্যে। কাল্‌নিন তার কামরার দরজায় তালা মেরে শুয়ে পড়ল একটুখানি ঘুম দেবার জন্য। ওর বিশ্বাস সেদিন আর লড়াই-টড়াই হবে না। এদিকে দুপুর নাগাদ সাঁড়াশি অভিযানের দুই মুখ এসে মিলল একজায়গায়, ভলাণ্টিয়াররা এগিয়ে চলল দক্ষিণে, শত্রুর পিছন দিকে। কর্নিলভ রেজিমেণ্ট ঝাঁপিয়ে পড়ল রেলস্টেশনের ওপর, কোনোরকম লোকসান না দিয়ে ওরা অনায়াসেই দখল করে নিল স্টেশনটা। রেলের কর্মচারীরা সবাই গা ঢাকা দিয়েছে। কাল্‌নিন অদৃশ্য—কামরার মেঝের ওপর তার টুপি আর উঁচু-বুটজোড়া গড়াচ্ছে। পাশের কামরায় তার চীফ অব-স্টাফ জ্‌ভেরেভ্‌কে দেখা গেল মেঝের ওপর পড়ে থাকতে, মাথার খুলি একদম ফুটো হয়ে গেছে। জারতন্ত্রী সেনাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন অফিসার ছিল সে। আসনের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে তার স্ত্রী, মাথাটা শাল দিয়ে ঢাকা, বুকের মধ্যে বুলেট চলে গেছে, কিন্তু এখনও প্রাণ আছে দেহে।

লাল ফৌজী-ইউনিটগুলো তাদের অধিনায়কদের হারিয়েছে, মূল রসদ ঘাঁটি আর যোগাযোগের রাস্তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—ভলাণ্টিয়ার ফৌজগুলোর সামনে তাই এখন শুধু ওদের চারদিক থেকে ছেঁকে ধরার অপেক্ষা। কামান আর মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গুলিগোলা চলে সন্ধ্যে অবধি। সাঁড়াশি আক্রমণের মাঝখানে পড়ে লালফৌজের লোকেরা এলোমেলোভাবে ছুটতে থাকে একবার সামনে, আরেকবার পিছনে; ওদের মাথার ওপর চারদিক থেকে ঝড়ের মতো সীসার ঝাঁক ছুটে আসে। পাগলের মতো পরিখা বেয়ে উপরে উঠে আসে ওরা, বেয়নেট উঁচিয়ে আক্রমণ চালাতে যায়। চারদিক থেকেই যেন মৃত্যু এসে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বাইরে যাবার একমাত্র রাস্তা ছিল উত্তর-মুখো রাস্তাটা। সন্ধ্যের মুখেই কুতেপভ সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। রেল লাইনের দিকে যে লালফৌজী গ্রুপগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল, আগুন আর ঠাণ্ডা ইস্পাতের মুখে কুতেপভ তাদের মৃত্যু-অভ্যর্থনা জানালেন। গোধূলির আলোয় গমক্ষেতের ভেতর লালফৌজ ও শ্বেতরক্ষীরা যেন একদম জট পাকিয়ে মিশে গেছে। গমগাছগুলোর মধ্যে দিয়ে তিতিরের মতো এদিক ওদিক ছুটছে কম্যাণ্ডাররা, অফিসারদের জমায়েত করে বারে বারে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে হামলায়। পরিখাগুলোর ভেতর একজায়গায় দেখা গেল বেয়নেটের ডগায় সাদা রুমাল ওড়ানো হয়েছে। কুতেপভ তাঁর দলবল নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটে চললেন সেই দিকে, কিন্তু এক ঝাঁক গুলি আর একরাশ অশ্রাব্য গালাগাল ছাড়া আর কোনো অভ্যর্থনাই মিলল না তাঁর। নিচু হয়ে ঘোড়ার কাঁধসই ঝুঁকে পড়ে কুতেপভ আবার লাগাম ফেরালেন উল্টোদিকে। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হুকুম দিয়েছেন বন্দীদের গুলি করে মারা চলবে না, কিন্তু বন্দী করতে হবে এমন কথাও তো কেউ বলেনি!

পরদিন সকালে গোটা রণাঙ্গন জুড়ে গুটি-গুটি এগোলো দেনিকিন-বাহিনী। যতদূর চোখ যায়, গমক্ষেতগুলো সব পায়ের তলায় পিষ্ট, দলিত। অদ্ভুত সুন্দর নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ছে চিল। দেনিকিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন পরিখার সারিগুলো—মাঠের ওপর দিয়ে পুরনো কবর-ঢিবি আর নিচু খাতের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে সেগুলো। হাত পা মাথা সব বেরিয়ে আছে গর্ত থেকে, বস্তার মতো মৃতদেহ ঝুলছে পরিখার কিনারায়। দেনিকিন সাহেবের তখন ভাবালু অবস্থা, জিনের ওপর অর্ধেকটা ঘুরে তিনি তাঁর পার্শ্বচরকে ইশারা জানালেন যাতে সে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললেন :

"ভাবো দেখি, এরা সবাই রুশ! কী ভয়ানক! আমাদের আনন্দটা যে অবিমিশ্র হল না, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ!"

জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়েছে। কাল্‌নিনের তিরিশ হাজার সৈন্যের ফৌজ পরাস্ত, বিধ্বস্ত, ছত্রভঙ্গ। মাত্র সাতখানা লাল সৈন্যবাহী ট্রেন পালিয়ে আসতে পেরেছে একাতেরিনোদারে। সরোকিনের ফৌজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আরমাভির জেলায় পূর্বাঞ্চলের গ্রুপটা আর তামানের উপকূল-ফৌজ তাই এমনভাবে আলাদা হয়ে পড়ল যে যোগাযোগের কোনো আশাই রইল না। দেনিকিনের বাহিনীর হাতে এসেছে বিরাট এক লুটের ভান্ডার—তিনটে সাঁজোয়া ট্রেন, সাঁজোয়া গাড়ি, পঞ্চাশটা কামান, একটা এয়ারপ্লেন, রাইফেল, মেশিনগান, গোলাগুলি, আর প্রচুর রসদে ঠাসা কয়েকটা মালগাড়ি।

এই জয়ের ফলে বিপুল সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। আতামান ক্রাস্‌নভের হুকুমে নভোচেরকাস্কের গির্জায় প্রার্থনানুষ্ঠান হল ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। অনুষ্ঠানের শেষে ক্রাস্‌নভ সৈন্যদের উদ্দেশে বাণী বিতরণ করলেন, ওঁর বন্ধু কাইজার যেমনটি বলতেন, হুবহু তেমনি করেই বললেন ক্রাস্‌নভ। তিন হপ্তায় দেনিকিনের ফৌজের যদিও চারভাগের একভাগই খোয়া গেছে, তবু জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই তাঁর সৈন্যসংখ্যা ডবল বেড়ে গেল। উক্রেইন, নভোরোসিয়া অঞ্চল, আর মধ্য রুশিয়া থেকে দলে দলে অবিরত এসে ভর্তি হচ্ছিল স্বেচ্ছাসেবকরা। লাল ফৌজের বন্দীদের নিয়ে গড়া ইউনিটও এই প্রথম শ্বেতরক্ষীদের কাজে লাগানো শুরু হল।

দু'দিন বিশ্রাম নেবার পর দেনিকিন তাঁর ফৌজটাকে তিনটি ভাগে ভাগ করলেন, তিন-তিনটে রণাঙ্গনে শুরু করলেন ব্যাপক আক্রমণ : পশ্চিমে সরোকিনের ফৌজের বিরুদ্ধে, পুবে আরমাভির গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে, আর দক্ষিণে কাল্‌নিনের হতাবশিষ্ট ফৌজের বিরুদ্ধে। কাল্‌নিনের এই সৈন্যদলটাই তখন একাতেরিনোদার শহর আগলাচ্ছিল। দেনিকিনের মতলব ছিল একাতেরিনোদারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পিছনদিকের সমস্ত এলাকাটা সাফ করে নেয়া। সমস্ত পরিকল্পনাটাই উচ্চতম সামরিক বিজ্ঞানের নিয়মকানুন অনুযায়ী ভেবেচিন্তে ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছিল। একটা বিষয় কিন্তু দেনিকিন আমলের মধ্যে আনেননি, অথচ সেটার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম : দেনিকিন এটা বুঝতে পারেননি যে তিনি আজ এমন এক শত্রুর

সম্মুখীন যার শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাপ করা তাঁর সাধ্যাতীত, রীতিমতো অস্ত্রসজ্জিত এক জনসমষ্টি আজ তাঁর সম্মুখে, তাদের শক্তিও অপরিমেয়। এটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি যে তাঁর নিজের পক্ষে প্রত্যেকটা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের এই ফৌজের মধ্যেও পাল্টা বেড়ে চলেছে ঘৃণা, আরও এককাট্ঠা হয়ে উঠছে তারা। যে-যুগে গরম-গরম সভাসমিতি করে নিছক ভোটের জোরেই অবাঞ্ছিত কম্যান্ডারদের সরানো চলত আর ইচ্ছেমতো অভিযান চালানো হত, সে যুগ যে আর নেই সে-হিসেব রাখেননি দেনিকিন। খেয়ালখুশির বদলে এখন ঘরোয়া-লড়াইয়ের উপযোগী এক নতুন শৃঙ্খলাবোধ এসেছে, অবশ্য খুব জোরদার হয়ে ওঠেনি তা, কিন্তু দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে দৃঢ়তর হয়ে।

গতিক দেখলে মনে হয় জয়লাভের পথ পাকা হয়ে গেছে, খুব বেশি দেরিও হবে না। পর্যবেক্ষকরা খবর দিয়েছে, সরোকিনের ফৌজ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কুবানের ওপারে একাতেরিনোদারের দিকে পালাচ্ছে। কিন্তু পুরো সত্যি নয় খবরটা। পর্যবেক্ষকদের হিসেবে ভুল হয়েছে। কুবানের ওপারে যারা হটে যাচ্ছে তারা আসলে পলাতক, ছোট-ছোট ফৌজীদল আর গাড়িভর্তি উদ্বাস্তু। সরোকিনের তিরিশ হাজারের ফৌজ থেকে ফালতু গলগ্রহগুলোকে বিদায় দেয়া হয়েছে, সে-ফৌজ এখন সুশৃঙ্খল দুর্ধর্ষ। জার্মানদের বিরুদ্ধে বাতায়িস্ক রণাঙ্গনের প্রতিরোধ তুলে নেয়া হয়েছে। লালফৌজ এখন দেনিকিনের বাহিনীর সঙ্গে খোলা ময়দানেই মোকাবিলা করার অপেক্ষায় আছে। তারপর যা ঘটল তা এই : জয়ের উন্মাদনায় উল্লসিত ভলান্টিয়ার বাহিনী যখন প্রায় লক্ষ্যের কাছে এসে পৌঁচেছে, এমনি সময় সম্মুখবর্তী সরোকিন ফৌজের সঙ্গে দশদিনের প্রচণ্ড রক্তাক্ত লড়াইয়ে ওদের প্রায় শেষ মানুষটি অবধি খতম হয়ে গেল।

কুবান-কৃষ্ণসাগর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রশ্নের জবাবে নেপোলিয়নের মতো ধৃষ্টতার সঙ্গে জবাব দিলেন সরোকিন : "আমার কোনো আন্দোলনকারী প্রচারকের দরকার নেই। দেনিকিনের ডাকাতদলই আমার হয়ে প্রচার করে দিচ্ছে। প্রতিবিপ্লবীরা যে প্রাচীর তুলেছে, আমার সৈন্যদলের অতুলনীয় মহাবীরত্বের আঘাতেই সে-সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।" দেনিকিনের প্রথম আক্রমণের দিন-গুলোতেই সরোকিন সেনানীদের আতঙ্কের ভাবটা দমন করতে পেরেছেন, যেন একটা মাতলামির ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠেছেন তিনি। দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছেন রণাঙ্গণে, কখনো ট্রেনে, কখনো রেলওয়ে ট্রলিতে, কখনো ঘোড়ার পিঠে চেপে। সৈন্যদের তদারক করছেন; একবার তো ফৌজের চোখের সামনে দুজন অফিসারকে তিনি নিজের হাতে গুলি করেই মেরে ফেললেন—ওদের মধ্যে নাকি বিপ্লবী উদ্দীপনার অভাব ঘটেছিল। রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে উঠে গাঁজলা-ওঠা ঠোঁট দুটো বন্যভাবে বিকৃত করে তিনি যখন জনগণের শত্রুদের মুণ্ডপাত করে গালাগালি আরম্ভ করতেন, তখন ওঁর মুখের ওই কদর্য ভাষা শুনে লালফৌজের লোকেরা এমনভাবে খেপে উঠে বক্তৃতার মাঝে-মাঝে সিংহনাদ করত, যেন একদল বুনো

মোষ ডাঁশ মাছির কামড় খেয়ে পাগল হয়ে গেছে। সামরিক তৎপরতা আর 'বিশেষ বিভাগের' কাজকর্ম অনেকগুণ বাড়িয়ে দিলেন সরোকিন; রাইফেল ধরতে অস্বীকার করলে মৃত্যুদণ্ড হবে, এ আদেশও জারী করলেন তিনি। ফৌজের কাছে সরোকিন তাঁর হুকুমনামার মারফত জানালেন: "সৈনিকগণ! সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষ আজ অনেক আশা লইয়া তাকাইয়া আছে আপনাদের দিকে, কৃতজ্ঞতার মহত্তম হৃদয়ানুভূতি আজ তাহারা অর্ঘ্যরূপে সঁপিয়া দিতেছে আপনাদেরই সামনে। জাগ্রত দৃষ্টি আর সবল বাহু লইয়া আপনারা আগাইয়া চলিয়াছেন নতুন এক ঐতিহাসিক যুগের রক্তাক্ত অরুণোদয়কে আবাহন জানাইতে। পরজীবী, মৃত্তিকালেহী কীটগুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে, চূর্ণ করিতে হইবে দেনিকিনের দস্যুদলগুলিকে, আগুন আর সীসার জর্জর আঘাতে জঞ্জাল এই প্রতিবিপ্লবীদের মুছিয়া ফেলিতে হইবে দুনিয়ার বুক হইতে। মেহনতী জনতার শান্তি অক্ষয় হোক, শোষকের দল ধ্বংস হোক, বিশ্ব বিপ্লব জিন্দাবাদ!"

যেন এক বিকারের ঘোরে সরোকিন নিজের হাতে লিখলেন এই হুকুমনামাটা। ফৌজী কোম্পানিগুলোর মধ্যে জোরে-জোরে পড়ে শোনানো হল এই ইশ্‌তেহার। উক্রেইনীয় চাষী, দনের খনিমজুর, ককেসীয় ফৌজের ঝুনো লড়াকু, কসাক আর ভিনদেশী—আইনশৃঙ্খলাহীন পাঁচমিশেলি, অমার্জিত হল্লাবাজ এক জনযূথ—স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনল তাদের সেনাপতির ভাষণ।

চীফ-অব-স্টাফ বেলিয়াকভ বুদ্ধিমান লোক, সৈনিক হিসাবেও যথেষ্ট গুণের অধিকারী। আক্রমণের এক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন তিনি—আক্রমণের ঠিক নয়, বরং বলা চলে তিরিশ হাজার সৈন্যের গোটা দলটা যাতে বেষ্টনী ভেদ করে কুবান নদীর ওপারে হটে যেতে পারে তাই এক পন্থা বের করেছেন। দেনিকিনের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে তার ফল কী দাঁড়াবে সে-সম্পর্কে চীফ-অব-স্টাফের এতটুকু মোহ নেই, সুতরাং এ ছাড়া আর কোন্ বুদ্ধি তাঁর কাছে আশা করা যেতে পারে! করেনভ্‌স্কায়া রেলস্টেশনেরই কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় শত্রুবেষ্টনী ভাঙতে হবে (জায়গাটা হবে তিখোরেৎস্কায়া আর একাতেরিনোদারের মাঝামাঝি)। একবার করেনভ্‌স্কায়া দখল করতে পারলে দ্রজ্‌দভ্‌স্কি আর কাজানোভিচের সৈন্যদের সঙ্গে অনায়াসেই মোকাবিলা করা যাবে কারণ তখন তারা দক্ষিণাঞ্চলের মূল শ্বেতরক্ষী বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; তারপর এগোনো যাবে একাতেরিনোদারের দিকে—বাকীটা অবশ্য ছেড়ে দিতে হবে ভাগ্যের হাতে।...... এইভাবে যুক্তি দেখালেন চীফ-অব-স্টাফ। তাঁর নিজের অবস্থাটাই তখন চূড়ান্ত রকমের বেকায়দা: শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তিনি সারা মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করেন লালবাহিনীকে, কিন্তু ভাগ্যের কী এক নিষ্ঠুর পরিহাস, বলশেভিকদের সঙ্গেই তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। দেনিকিন সম্পর্কে ও'র কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর, ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা, কিন্তু দেনিকিনের হাতে পড়া মানে অবধারিত মৃত্যু! এদিকে আবার সরোকিন যদি সন্দেহ করেন যে, ও'র মধ্যে বিপ্লবী উদ্দীপনার অভাব ঘটেছে কিংবা দেনিকিনের প্রতি ও'র যথোচিত ঘৃণা নেই তাহলেও

সর্বনাশ, সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিত মৃত্যু। তাই সরোকিনের উন্মাদ উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই উনি সান্ত্বনা খুঁজে পান—এ এক উদ্ভট কল্পনাবিলাস বটে, কিন্তু সে আমলের সবকিছুই তো এমনি উদ্ভট। বেলিয়াকভের মতলবটা হল, সমস্ত রকম ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রথমে তো সরোকিনকে ডিক্টেটরের গদীতে বসাও, তারপর দেখা যাবে কী করা যায়!

মনে-মনে যে মতলবই থাক, বেলিয়াকভ কিন্তু চূড়ান্ত রকমের সক্রিয় প্রস্তুতি চালাতে আগলেন আক্রমণের জন্য : রসদ আর ঘোড়ার খাবার জমা করা হল তিমাশেভ্স্কায়া স্টেশনে, কামানের গোলা সাজিয়ে রাখা হল, স্তেপ এলাকায় সরানো হল সারি সারি গাড়ি। তিমাশেভ্স্কায়ার আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে রাখা হল গোটা ফৌজটাকে, ওদের সামনেটা ছিল পূবদক্ষিণ-মুখো—এভাবে ওদের সাজাবার উদ্দেশ্য, করেনভ্স্কায়া আর উত্তরদিকে ভিসেল্কি, এই দুটো জায়গার ওপর একই সঙ্গে আঘাত হানা যাবে।

পনেরই জুলাইয়ের ভোরবেলায় করেনভ্স্কায়ার ওপর লালফৌজের কামান থেকে ঝড়ের মতো গোলাবর্ষণ শুরু হল। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কসাক ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলো লাভাপ্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম আর স্টেশনে। সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে ওরা তলোয়ারের কোপ বসাতে লাগল ক্যাডেটদের ওপর, ঘোড়ার পায়ের নিচে ফেলে পিষল ওদের, বন্দী করল শুধু তাদেরই যারা লাল সৈন্যদের আসার আগেই রাইফেল ত্যাগ করেছিল। পদাতিক ইউনিটগুলো সারারাত ধরে মার্চ করে চলল। করেনভ্স্কায়া পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ট্রেঞ্চ-ঘাঁটি তৈরি করতে লেগে গেল—এবার আর বেলায়া গ্লিনার মতো অর্ধবৃত্তের আকারে নয়, এবার একেবারে পুরো উপবৃত্তের আকারে ট্রেঞ্চ সাজালো ওরা।

সাদা সূর্য উঠেছে, উষ্ণ ধুলোর মেঘে ঢাকা। সারা স্তেপটাই যেন গতিশীল হয়ে উঠেছে : ঘোড়সওয়ারবাহিনী ছুটে বেড়াচ্ছে, পদাতিক রেজিমেণ্টগুলো গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে, গুর-গুর করে চাকার আওয়াজ তুলে কামানগুলো গর্জন করছে, গালাগাল, চীৎকার, আঘাত, গুলির আওয়াজ, ঘোড়ার হ্রেষা আর কর্কশ হুকুমের শব্দে বাতাস মথিত হচ্ছে। রসদবাহী যানবাহনের সারি একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। উষ্ণ চুল্লীর মতো দিনের উত্তাপ। সেনাপতিমণ্ডলীর দল থেকে কেটে পড়ে সরোকিন একাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সৈন্যদের মধ্যে, তাঁর ঘোড়াটার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে ফেনা, গ্রে-হাউণ্ডের মতো দ্রুতগামী সংবাদবাহক ঘোড়সওয়ার আর পার্শ্বচররা সরোকিনের হুকুম তামিল করবার জন্য সারা রণাঙ্গন চষে বেড়াচ্ছে!

ঘোড়া হাঁকিয়ে চলবার সময় সরোকিনের টুপি খসে পড়েছিল, সিরকাশিয়ান জামাটাও অবশেষে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। কনুইয়ের অনেকটা উপরে লাল সিল্কের শার্টের হাতদুটো গুটিয়ে-রাখা, নীল সওয়ারী-ব্রিচেস্টা শক্ত করে চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটা। অনেকগুলো জায়গায় যেন একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় সরোকিনকে। ধূলিধূসর মুখখানার মধ্যে তাঁর উন্মুক্ত দাঁতগুলো ঝক্ঝক্

করতে থাকে। দু'বার ঘোড়া বদলাবার পর এবার তাঁর তৃতীয় আনকোরা ঘোড়াটার উপর চেপে সরোকিন তদারক করে বেড়াচ্ছেন কামানশ্রেণীর অবস্থান আর পরিখার অবস্থা। পরিখাগুলোতে বসে পদাতিক ডিভিশনের লোকেরা ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ছে উর্বর কালো মাটির মধ্যে। সরোকিন এবার ঘোড়া হাঁকিয়ে চললেন 'আড়ি-পাতা' ঘাঁটিতে *, সেখান থেকে রসদ-যোগানদার সারির এসে পৌঁছনো, মালপত্র নামানো ইত্যাদি লক্ষ্য করলেন; চাবুকের ইশারা করে কম্যাণ্ডারদের তাঁর নিজের পাশে ডেকে নিয়ে জিনের উপর ঝুঁকে বড়ো-বড়ো চোখ করে তিনি শুনতে লাগলেন তাদের রিপোর্ট, তখন তাঁর সে কী ভয়ানক উত্তেজিত মূর্তি! যেন এক বিরাট ঐকতান সংগীতের পরিচালকের মতো আসন্নযুদ্ধের নানা বিচিত্র যন্ত্র থেকে সুর-তরঙ্গের উদ্বোধন করছেন তিনি। ঘোড়াটাকে যখন স্টেশনে রেখে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাফ-ঘরে ঢুকলেন ওটা তখন দারুণ হাঁফাচ্ছে। অফিসারের কাঁধ-পটি লাগানো একটা মৃতদেহ লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন রাস্তা থেকে—খুলি দু'খণ্ড হয়ে লাশটা পড়েছিল চৌকাঠের ওপর আড়াআড়ি। টেলিগ্রাফ-ফিতের ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলোলেন সরোকিন, উন্মত্ত উত্তেজনার আবেগে নেশাতুর হয়ে উঠেছেন যেন: দ্রজ্‌দভ্‌স্কি আর কাজানোভিচের ফৌজ দ্রুত ছুটে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে, যুদ্ধে নামবে বলেই আসছে—এর মধ্যেই দিন্‌স্কায়া স্টেশন পার হয়ে এসেছে তারা।

সারাদিন গাড়িতে চেপে স্তেপের ওপর ঝাঁকুনি খেতে-খেতে তপ্ত ধুলোর ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে দ্রজ্‌দ্রভস্কির সেপাইরা। মৃত জেনারেল মারকভের সৈন্যরা এখন জেনারেল কাজনোভিচের পরিচালনাধীনে। গোলন্দাজদের সঙ্গে একই ট্রেনে চেপে তারা আগেই এসে হাজির হল—ষোলো তারিখ ভোরবেলায়, তারপর রেলগাড়ির কামরা ছেড়ে বেরিয়েই সোজা ছুটল করেনভ্‌স্কায়া আক্রমণ করতে।

রেলশেডের সামনে একটা কুয়োর কিনারায় দাঁড়িয়ে জেনারেল কাজানোভিচ স্থিরভাবে লক্ষ্য করছিলেন অফিসার-সারিগুলোর সুনিপুণ গতিবিধি, গুলি না ছুঁড়েই তারা এগিয়ে চলেছিল সামনের দিকে। কাজানোভিচের মুখখানা সুরুচি-সম্পন্ন, পাতলা গোছের, লম্বা পাকা গোঁফ আর ছোট-করে-ছাঁটা দাড়ি (হুবহু মহামান্য জারের মতো), মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা সস্মিত অভিনিবেশের ভাব, চমৎকার চোখদুটোর মধ্যে অনেকটা নারীসুলভ আবেগমাখা একটা কঠিন মৃদুহাসি। যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে তাঁর এমন দৃঢ় আস্থা যে দ্রজ্‌দভস্কির ডিভিশন আসার জন্য তিনি অপেক্ষাই করতে রাজি নন। দ্রজ্‌দভ্‌স্কির সঙ্গে তাঁর রেষারেষি লেগেই আছে। সাংঘাতিক দেমাকী আর অতিরিক্ত সাবধানী দ্রজ্‌দভ্‌স্কি, এমন শম্বুকগতি যে তা একটা খুঁতেই দাঁড়িয়ে গেছে, এমন-কি মাঝে-মাঝে কাজের পক্ষে বিপজ্জনকও হয়ে পড়ে তাঁর এই ঢিলেমি। অথচ কাজানোভিচ লড়াই ভালো-

---

* লিস্‌নিং পোস্ট—শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি অবস্থান যেখান থেকে শব্দ শুনে শত্রুর গতিবিধি ও চলাচল নির্ণয় করা হয়।

বাসেন তৎপরতার ব্যাপক সুযোগের জন্য, যুদ্ধের সংগীত-ব্যঞ্জনা আর বিজয়ের গৌরব-ডঙ্কার জন্য।

জুলাই দিনের কাঠ-ফাটা গরমের ইশারা জানিয়ে প্রকাণ্ড ঢলঢলে সূর্য উঠছিল স্তেপের উঁচু ঢিবিগুলোর আড়াল থেকে। ঝল্‌মলে রোদটা এসে পড়েছে ঠিক বলশেভিকদের চোখের ওপর। মেশিন-গানগুলো খেঁকিয়ে চলেছে খক্‌-খক্‌ করে, লাগাতর তোপের আওয়াজে গুমোট স্তব্ধ আবহাওয়াটা খান্‌ খান্‌ হয়ে যাচ্ছে। বিপক্ষের লোকদের দেখা গেল কাঁধে-কাঁধ লাগিয়ে পরিখা ছেড়ে সার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে। মারকভ-ফৌজের সৈনিকরা বুলেট উপেক্ষা করে সামনে ছুটে চলেছে। গুঁড়ি মেরে ওদের মুখোমুখি এসে পড়ল হাজার হাজার ছোট-ছোট মূর্তি। কাজানোভিচ ফিল্ডগ্লাসটা চোখে ধরলেন। অদ্ভুত ব্যাপার তো!

"কমরেডদের জন্য তিন রাউণ্ড শ্রাপনেল দাগো!" টেলিফোন অপারেটরকে চেঁচিয়ে জানালেন কাজানোভিচ। কুয়োর একপাশে জায়গা করে নিয়েছিল লোকটা। ঢিবির আড়ালে লুকোনো দুটো কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হল। শত্রু লাইনের একেবারে মাথা ছুঁয়ে ফাটলো শ্রাপনেল, ছিন্নভিন্ন তুলোর পাঁজার মতো। খুদে-খুদে মূর্তিগুলো প্রথমে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই তারা দ্রুত-বেগে সারিবদ্ধ হয়ে গেল, এগোতে শুরু করল আবার। সারা রণাঙ্গনটাই তখন গুলিগোলার শব্দে কেঁপে উঠছে। অবশেষে বলশেভিকদের কামানগুলোও গর্জে উঠে সুর মেলালো। কাজানোভিচ কেমন যেন অপ্রতিভের মতো হাসলেন, ফিল্ড-গ্লাস-ধরা সরু হাতটা কেঁপে উঠল। যখন দেখলেন মারকভ-ফৌজ শুয়ে পড়েছে, হন্তদন্ত হয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, তখন ওঁর রোদে-পোড়া মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কুয়ো থেকে লাফিয়ে নেমে তিনি ফিল্ড টেলিফোনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, ডাকলেন জেনারেল তিমানভ্‌স্কিকে।

"সেপাইরা একদম শুয়ে পড়েছে মাটির ওপর", রিসিভারটার সামনে চীৎকার করে বললেন কাজানোভিচ : "যেমন করে হোক্‌ শত্রুর বাঁ-দিকটায় ভাঙন ধরান!... এখন প্রত্যেকটা মুহূর্তেরই অনেক দাম!"

সঙ্গে সঙ্গে মারকভ-ফৌজের কিছু লোক বেরিয়ে এল রেল-লাইনের ধারের উঁচু পাড়টার আড়াল থেকে—এরা সবাই তিমানোভ্‌স্কির রিজার্ভ সৈন্য। দলে দলে, ভাগ ভাগ হয়ে, পর পর সারি বেঁধে ওরা অদৃশ্য হতে লাগল শীষ-ঝরা উঁচু উঁচু পাকা গমের ক্ষেতের আড়ালে, ওদের সবারই এখন দারুণ উত্তেজিত একরোখা মেজাজ। তিমানোভ্‌স্কির চেহারায় তারুণ্য. গাল দুটো লাল, ফূর্তিমাখা। উঁচু টুপিটা টেনে দিয়েছে এক কানের ওপর। পরনে নোংরা লিনেন শার্ট, কাঁধে জেনারেলদের কালো পটি। সারির পিছন পিছন ছুটে এল সে ঝুলন্ত তলোয়ারটা চেপে ধরে। সম্পূর্ণ ধারণাতীত কিছু একটা ঘটছে : বলশেভিকরা যেন এখন একেবারে নতুন মানুষ—এক সময় ওদের দোদুল্যমানতাকে মনে হত অবধারিত, কিন্তু সে-সময় এখন উৎরে গেছে। সারা স্তেপের মধ্যেই এখন ছেয়ে আছে ওদের খুদে-খুদে অগ্রসরমান মূর্তিগুলো। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর মেশিনগানগুলো ভীষণ-

ভাবে খোঁকিয়ে চলেছে—শত্রুর যেন অন্ত নেই, যত মরছে তত নতুন লোক এসে জায়গা দখল করছে।

প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা এমনিভাবে তিমানোভ্স্কির কোম্পানিগুলো এগিয়ে চলল রাইফেল উঁচিয়ে, ছুটলো গমক্ষেতের একেবারে কিনারায়। বেহালার তারের মতো সোজা টান-টান হয়ে কাজানোভিচ দাঁড়িয়েছিলেন কুয়োর ওপর। দূরবীনের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন মারকভ-ফৌজের সৈনিকদের পিঠগুলো—ওদের পিছনদিক থেকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। কী সাংঘাতিক উত্তেজনা! পড়ে যাচ্ছে ওরা একের পর এক! পড়ে যাচ্ছে! ধাবমান সৈনিকদের ডিঙিয়ে আরও সামনে দূরবীন কষলেন কাজানোভিচ। হঠাৎ যেন কোত্থেকে ওর দৃষ্টিপথে এসে পড়ল ঠোঁট-খোলা, চওড়া-মুখ, জাহাজী-টুপিপরা একদল মানুষ, উন্মুক্ত ব্রোঞ্জের মতো ওদের বুকের পাটা।...বলশেভিক জাহাজী।... পর মুহূর্তেই সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল, ব্যাপক হাতাহাতি লড়াইয়ের মধ্যে আর কিছু ঠাহর করা গেল না। কাজানোভিচের খোদাই-করা ঠোঁটদুটোর ওপর যেন একটা রুগ্ন হাসি পাথরের মতো জমে গেল।...মারকভের সেপাইরা হেরে যাচ্ছে। প্রথম কোম্পানীর হতাবশিষ্ট সৈনিকরা পালিয়ে আসছে গমক্ষেতের মধ্যে, সেখানেই সটান শুয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় কোম্পানীটাও মার খেয়ে ফিরে হাত-পা ছড়িয়ে দিচ্ছে মাটিতে।

কুয়োর ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন জেনারেল, হাল্কা পায়ে ছুটে চললেন মাঠের ওপর দিয়ে। সেপাই তাঁকে দেখেছে। "ছি-ছি, লজ্জার কথা মশাইরা! লজ্জার কথা!"—এই ক'টা কথা চেঁচিয়ে বলতেই ওরা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের দিয়ে আরেকবার আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করলেন কাজানোভিচ, কিন্তু এমন সাংঘাতিক গুলি চলতে লাগল আর এত অসংখ্য লোক ধরাশায়ী হতে লাগল যে ওরা আর তিষ্ঠোতে না পেরে আবার শুয়ে পড়ল।...তা হলে কি যুদ্ধে হেরে গেল ওরা? তাও কি সম্ভব?

ন'টার সময় পশ্চিমদিক থেকে শোনা গেল দ্রজদ্ভ্স্কির কামানের গর্জন। মাঠের ওপর প্রথমে এল একটা সাঁজোয়া গাড়ি। মেটে রঙের কচ্ছপের মতো হোঁচট খেতে খেতে আসছিল সেটা। দ্রজ্দভ্স্কির ফৌজ আক্রমণ চালালো বেশ গুছিয়ে নিয়ে, তড়বড় না করে। কাজানোভিচের সৈন্য সারি তৃতীয়বার উঠল মাটি ছেড়ে। একটা প্রকান্ড অর্ধবৃত্ত ব্যূহের আকারে এবার ভলাণ্টিয়ার বাহিনী এগোতে শুরু করল। বলশেভিকরা এ আক্রমণ রুখতে পারবে এমন কথা ভাবতেই পারা যায় না।

বলশেভিক সারিগুলোর মাঝখানে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। ঝক্-ঝকে একটা তলোয়ার ঘুরিয়ে বাঘের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। তীরবেগে একটা ঢিবির মাথায় উঠে তিনি সজোরে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। লাল একটা শার্ট গায়ে, আস্তিন গুটানো, মাথা পিছনে হেলিয়ে চিৎকার করে আবার তিনি তলোয়ারটা ঘোরালেন। সঙ্গে সঙ্গে লাভাস্রোতের মতো অসংখ্য ঘোড়সওয়ার সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্রজ্দ্ভস্কির হামলাদার সৈন্যসারিটার ওপর।

ওদের সেই খাটো-খাটো পা-ওয়ালা দুর্দান্ত টাট্টুঘোড়াগুলো পাগলের মতো ছুটে আসছিল যেন বুক দিয়ে মাটি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। গুলি ছোঁড়া বন্ধ হল। চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে কেবল তলোয়ারের সাঁই-সাঁই শব্দ, চিৎকার, খুরের আওয়াজ। টিবির ওপর থেকে আবার তীরবেগে নিচে নেমে গেলেন লাল-শার্টপরা সেই ঘোড়-সওয়ার। জোর কদমে ছুটতে গিয়ে তিনি ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিলেন একদম। কালো ধুলোর মেঘ উঠল আকাশে, আচ্ছন্ন হয়ে গেল সারা ময়দানটা। অশ্বারোহী সৈন্যদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দ্রজ্‌দভ্‌স্কি-মারকভ ফৌজ পালাতে শুরু করল। তারপর একেবারে সেই ছোট্ট কিরপেলি নদীটার ধারে এসে অবশেষে ওরা থামলো, ঘাঁটিও গাড়লো সেইখানেই।

ভুরুজোড়া কুঁচকে ব্যথায় কাঁপছিল ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন। ফার্স্ট-এডের মোড়ক থেকে গজ বার করে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধেছে ও।

সামান্য একটু আঁচড় লেগেছে, হাড় অবধিও পৌঁছয়নি জখমটা, কিন্তু যন্ত্রণা দারুণ—মনে হচ্ছে সারা মাথাটাই বুঝি ফেটে পড়ল চৌচির হয়ে। ব্যান্ডেজ বাঁধার পর ঐটুকু পরিশ্রমেই এত কাতর হয়ে পড়েছিল যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল গমক্ষেতের মধ্যে।

ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলো ডেকে চলেছে পরম শান্তিতে, শুনতে অদ্ভুত লাগে—যেন কিছুই ঘটেনি কোথাও। মাটির ফাটলে-ফাটলে লুকিয়ে আছে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা, দক্ষিণের আকাশে রাতের অন্ধকারে ফুটে উঠেছে বড়ো-বড়ো তারা, তেলেগিনের চোখ আর আকাশের মাঝখানে নিশ্চলভাবে ঝুলে আছে কেশর-ওয়ালা কয়েকটা গমের শীষ—এত রক্তাক্ত লড়াই, চিৎকার আর যুদ্ধাস্ত্রের ঝন্‌ঝনার এই তাহলে শেষ পরিণতি! খানিকক্ষণ আগে একজন আহত মানুষ কাছেই কোথায় যেন গোঙাচ্ছিল, এখন সেও নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

নীরবতা জিনিসটা যে এত অদ্ভুত হতে পারে তা কে জানত! ওর মাথার দপ্‌দপানিটা যেন অনেকটা কমে এসেছে, যেন রাতের এই সুগম্ভীর প্রশান্তির মধ্যেই রয়েছে বেদনার উপশম। কিন্তু তারপরেই সারাদিনের ঘটনার টুকরো-টুকরো স্মৃতি জাগে ওর মনে—কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, বুনো জানোয়ারের মতো হাঁ-করা মুখগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে তীব্র আর্তনাদ, প্রচন্ড ঘৃণার অভিশাপ; কেউ হয়তো ছুটছে তো ছুটছেই—নিজের বেয়নেটের ডগা, আর যে-লোকটি তাকে গুলি করছে তার ফ্যাকাশে মুখটা ছাড়া আর কিছুই হয়তো তার চোখে পড়ছে না। এমনি সব দৃশ্যের স্মৃতি তেলেগিনের মস্তিষ্ককে এমন-ভাবে বিদীর্ণ করছে, ওর মাথার খুলির ওপর এমন একটা আকস্মিক অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করছে যে ইভান ইলিয়িচ কিছুতেই গোঙানিটাকে চেপে রাখতে পারছে না, তাই প্রাণপণে ও চেষ্টা করছে অন্য কিছু ভাববার।

কিন্তু আর ভাববার মতো ওর আছেই বা কী? হয় এই অন্তহীন অসংখ্য টুকরো-টুকরো ঘটনার ভীতিপ্রদ ভিড়, যার কোনো থই খুঁজে পাওয়াই ভার ওর

পক্ষে—কেবল বিপ্লব আর লড়াই,—আর নয়তো দূরান্তরের সুখ-স্বপ্ন, দাশার স্বপ্ন, যে-পাট ও চুকিয়ে দিয়েছে আগেই। দাশার কথাই ভাবতে থাকে তেলেগিন (সত্যি বলতে কি, এ-ভাবনার কোনোদিনই বিরতি হয়নি), দাশাকে দেখাশোনা করার কেউই নেই, একেবারে একা : দুনিয়ার কিছু বোঝে না ও, নিজের কল্পনা নিয়ে নিজেই মত্ত হয়ে আছে...দৃষ্টিতে ওর দৃঢ়তা আছে, কিন্তু মনটা পাখির মতো ভীরু, সচকিত,—একেবারে বাচ্চা, নেহাৎই শিশু ও...

সামনে বাড়ানো হাতটা দিয়ে তেলেগিন এক মুঠো গরম মাটি চেপে ধরে। চোখ বুজে আসে ওর। দাশা তো ওকে ছেড়েই গেছে—চিরকালের জন্য। সে বিষয়ে দাশার নিজের বোধহয় কোনো খট্‌কাই নেই! কী বোকা মেয়েটা! কে তোমার ওই কড়া চোখকে ভয় করে? ভেবেছ আর কেউ তোমাকে আমার মতো এমন গভীরভাবে ভালবাসতে পারবে? বোকা কোথাকার! পরে যে কতো কষ্ট তোমায় সইতে হবে!...কত জ্বালা, ভুলতে পারবে না!......

ইভান ইলিয়িচের চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে অজান্তেই গড়িয়ে পড়ল জল—জখমটা ওকে বড়ো কাহিল করে দিয়েছে। কানের কাছেই কোথায় যেন একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। তারার আলোয় রক্তাক্ত পদদলিত লড়াইয়ের ময়দানটাকে রুপোলি দেখাচ্ছে। রাতের আঁধারে ঢাকা পড়েছে সবকিছু।...নিজেকে কোনোরকমে ঠেলে তুলে ইভান ইলিয়িচ উঠে বসল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল হাঁটুজোড়া। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, যেন ছেলেবেলার দিনগুলো আবার ফিরে এল। বুকটা ওর বেদনায় অশ্রুতে ভরে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে ও হাঁটতে শুরু করে, এমনভাবে হাঁটে যেন মাথায় ঝাঁকুনি না লাগে।

করেনভ্‌স্কায়া এখান থেকে আধমাইল-টাক দূরে। গ্রামের এখানে ওখানে দু'একটা অগ্নিকুণ্ড দেখা যাচ্ছে। তেলেগিনের কাছেই একটা নিচু মতো জায়গায় মাটির ওপর নাচছে আগুনের নির্মল লেলিহান শিখা। হঠাৎ যেন ওর খিদে আর তেষ্টা পেয়ে যায়, আগুনের দিকেই এগিয়ে যায় ইভান ইলিয়িচ।

মাঠের চারদিক থেকে কালো-কালো সব মূর্তি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে আগুনটার দিকে—অনেকে সামান্য আহত, অনেকে আবার বিধ্বস্ত ডিভিশন থেকে দলছাড়া হয়ে পড়েছে, কেউ-কেউ বন্দীদের ধরে আগে-আগে ঠেলে নিয়ে আসছে। একজন আরেকজনকে ডাকছে, ভাঙা গলায় খিস্তি করছে, পাগলের মতো হাসিতে ফেটে পড়ছে কেউ-কেউ। আগুনের কুণ্ডের পাশে রীতিমতো একটা ভিড় জমে গেছে। জ্বলন্ত রেল-শিলপার গাদা করে আগুনে চাপানো হচ্ছে।

ইভান ইলিয়িচের নাকে রুটির গন্ধ আসে—ঝুলকালিমাখা মানুষগুলো সবাই যেন কী চিবোচ্ছে। আগুনের খুব কাছেই রুটি-বোঝাই একটা গাড়ি, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রোগা চেহারার একটি স্ত্রীলোক, মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। সবাইকে জল খেতে দিচ্ছে সে।

প্রাণভরে জল খেয়ে, এক টুকরো রুটি হাতে নিয়ে তেলেগিন গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, রুটি চিবোতে চিবোতে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে

রইল সে। আগুন ঘিরে যারা বসেছিল, সবাই চুপ মেরে গেছে এতক্ষণে, অনেকে ঘুমিয়েও পড়েছে। কিন্তু মাঠ থেকে যারা সদ্য এসে হাজির হচ্ছে তারা রাগে টগবগ করছে তখনও। ওদের দিকে কেউ নজর না দিলেও ওরা কিন্তু সমানে গালাগালি করছে, অন্ধকারের দিকে চেয়ে শাসাচ্ছে। নার্সটি কিন্তু একভাবে বিলি করে চলেছে রুটি আর জলের মগ।

কোমর অবধি জামা-খোলা কালো-দাড়িওয়ালা একজন লোক টানতে টানতে নিয়ে এল তার বন্দীটিকে, আগুনের পাশে এনে ধপ্ করে ছুঁড়ে দিল মাটির ওপর।

"এই যে দেখ, কুত্তীর বাচ্চা পরগাছাটাকে দেখ...বেটাকে সওয়াল করো তো হে ভাইসব।"

সটান-শুয়ে-থাকা দেহটার ওপর একটা লাথি ঝেড়ে পাৎলুনের কোমর কষতে কষতে সে পেছনে সরে এল, নিচু বুকটা তার দারুণভাবে ওঠা-নামা করছে। ইভান ইলিয়িচ তাকে চিনতে পেরেছে—চেরতোগনভ্। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল সে। বন্দী লোকটার দিকে হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল অনেকে। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল তাকে।

"বেটা ভলাণ্টিয়ারি করছিল..." (বন্দীর কাঁধপটিটা খুলে ওরা আগুনে ছুঁড়ে দিল।)

"এইটুকুন তো বাচ্চা, কিন্তু গোখরোর মতো বিষ!"

"বাপের পুঁজি বাঁচাবার জন্য লড়াইয়ে নেমেছিলেন আর কি!...বড়োলোকের বেটা, দেখে বুঝতে পারছ না..."

"দেখ দেখ, চোখ দুটো কেমন জ্বলছে শুয়োরটার!"

"ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ কী, বলো না আমায় ঝাঁপিয়ে পড়ি......"

"সবুর এক মিনিট! সঙ্গে হয়তো কাগজপত্র থাকতে পারে।...সদর দপ্তরেই নিয়ে যাও..."

"হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাও সদর দপ্তরে..."

"না না, খবদ্দার!" চেঁচিয়ে ছুটে এল চেরতোগনভ: "জখম হয়ে পড়েছিল বেটা, তাই এগিয়ে গেলাম কাছে—দেখছো না ওর বুটজোড়া! আর হারামজাদা কিনা আমায় দু'দু'বার গুলি করে বসল! আমি ওকে এমনি ছেড়ে দিচ্ছি না!" তারপর আরো হিংস্র গলায় বন্দীকে উদ্দেশ করে ও চেঁচিয়ে হুকুম করল: "বুট-জোড়া খোল্ হারামজাদা।"

দলটার দিকে একবার আড়চোখে দেখল ইভান ইলিয়িচ। বন্দীর গোল নিটোল কামানো মাথাটা আগুনের আভায় চক্‌চক্ করছে। মুখ খিঁচিয়ে দাঁত বের করছে লোকটা, বড়ো-বড়ো চোখদুটো একধার থেকে সবাইকে যেন গিলছে, খুদে নাকটা একেবারে কুঁচকে গেছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল লোকটা বুঝি উন্মাদের মতো চিৎ হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ সে একেবারে লাফ দিয়ে উঠল। রক্তাক্ত জামার ছেঁড়া হাতার মধ্যে তার বাঁ-হাতটা ঝুলঝুল করছিল। দুসারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে সে বিশ্রীরকমভাবে তার থুতনিটা এগিয়ে ধরল

সামনে।...লাফ দিয়ে চেরতোগনভ পিছনে হটে এল—কী ভয়ানক এই জীবটা, যেন ঘৃণার জীবন্ত প্রেতমূর্তি......

"ও হো! একে তো আমি চিনি—" ভিড়ের মধ্যে থেকে মোটা ভারি গলায় কে যেন বলে উঠল: "এর বাপের তামাক কারখানায় যে আমি কাজ করেছি—সেই ওনোলিরই ছেলে, রস্তভের কারখানা মালিক ছিল..."

অনেকগুলো গলা একসঙ্গে গুনগুন করে উঠল: "চিনি, আমরাও চিনি ওকে!"

নিচু মাথাটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ভ্যালেরিয়ান ওনোলি ভ্রূকুটি করল। তারপর কর্কশ গলায় বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল:

"জানোয়ার সব! নোংরা, লাল শুয়োর! ঘুষিয়ে মুখের বদনা ভেঙে দেব জানিস, শুয়োর কোথাকার! এতগুলোকে মেরে লাশ করেছি, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি, তবু সখ মেটেনি তোদের কুত্তার দল? এখনো আক্কেল হয়নি? তোদের সবগুলোকে বাঁধব, হতভাগা কুত্তীর বাচ্চা সব!"

রাগে বেসামাল হয়ে সে চেরতোগনভের এলোমেলো দাড়িটা চেপে ধরল, ওর খোলা পেটের ওপর লাথি কষাতে শুরু করল।

ইভান ইলিয়িচ তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছ থেকে সরে আসে। অনেকগুলো কণ্ঠের একটা অশুভ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, আচম্বিতে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ যেন সেই ক্রমবর্ধমান রুষ্ট গুঞ্জন ভেদ করে বেরিয়ে এল। ভ্যালেরিয়ান ওনোলির দেহটা উপরে উঠে গেল হাত-পা ছড়িয়ে, ভিড়ের অসংখ্য মাথার ওপর ভয়ানকভাবে পা ছুঁড়তে লাগলো সে, তারপরে একবার শূন্যে ছিটকে উঠেই আবার পড়ে গেল।... আগুনের শিখার ওপর জেগে উঠল একরাশ ছোট ছোট ফুলকি...

ভোর হওয়ার আগেই স্তেপের প্রান্তরে যে ঠাণ্ডা হাওয়াটা বইতে থাকে, তার মধ্যে ভেসে এল বিচ্ছিন্ন কতগুলো বন্দুকের গুলির আওয়াজ। কামানের গম্ভীর নির্ঘোষের ফাঁকে-ফাঁকে আওয়াজটা শোনা গেল ঠিক চাবুকের সাপ্টানির মতো। বন্দুকের শব্দটা আসছিল দ্রজ্দভ্স্কি আর বরোভ্স্কির সৈন্যসারি থেকে—কির্পেলির ওপার থেকে ওরা আবার আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে অদৃষ্টের ফের পাল্টাবার।

ঠিক সেই রাতেই একাতেরিনোদারের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি থেকে একটা হুকুম এল। এই ক'দিন লাগাতর বৈঠক চলছিল কমিটির। তাঁরা কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সরোকিনকে উত্তর ককেসাসের সমস্ত লালফৌজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন।

সরোকিনের কাছে খবরটা নিয়ে এলেন চীফ-অব-স্টাফ বেলিয়াকভ। টেলিগ্রাফের ফিতেটা হাতে নিয়ে তিনি সিধে ছুটে এলেন নতুন সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের গাড়িতে। আসনের ওপর থেকে সরোকিনের পা-জোড়া ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তিনি সিগারেট-লাইটারের আলোয় ওঁকে পড়ে শোনালেন আদেশ-লিপিটা। সরোকিন

উঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আবার চিত হয়ে পড়লেন গরম বালিশটার ওপর, চোখদুটো তাঁর অসহায়ভাবে পিটপিট করতে লাগল। বেলিয়াকভ তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

"উঠুন, মহামান্য কমরেড সুপ্রীম কম্যান্ডার সাহেব। এখন তো আপনি ককেসাসের সর্বেসর্বা।...শুনতে পাচ্ছেন কী বলছি? আপনি তো এখন একাধারে জার আর সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং—শুনছেন আমার কথা?"

এতক্ষণে সরোকিন বুঝলেন খবরটার তাৎপর্য। বুঝলেন যে ফুটকি আর ড্যাশ্-এর আকারে তাঁরই চমকপ্রদ ভাগ্যলিপি লেখা রয়েছে ওই সরু কাগজের ফিতেটার ওপর, যে-ফিতেটা এখন চীফ-অব-স্টাফ তাঁর আঙুলে পাকিয়ে রেখেছেন। তাড়াতাড়ি পাতলুনটা ঠিক করে তিনি কাঁধের ওপর চাপিয়ে নিলেন টিউনিক, পিস্তলের খাপ আর তলোয়ারটাও এ'টে নিলেন কোমরে।

"ফৌজের কাছে এখনই হুকুমটা জানিয়ে দাও।......আমার ঘোড়া কোথায়!"

ভোরের দিকে তেলেগিন গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে রাস্তা করে বেরিয়ে এল নিজের রেজিমেণ্টাল সদরদপ্তরের আস্তানাটা খুঁজে বের করবার জন্য। মাথায় একটা নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে ও। ঠিক এমনি সময় একদল ঘোড়সওয়ারকে ছুটে আসতে দেখা গেল স্টেশনের দিক থেকে। ওদের কসাক আংরাখার প্রান্তদেশ উড়ছে বাতাসে। দলের একজন হল বিউগ্‌ল-বাদক, তার পেছনে দু'জন সওয়ার—লম্বা-ঝুঁটিওয়ালা ঘোড়ার মুখের কাছাকাছি ঝুঁকে টগবগিয়ে ছুটে আসছেন সরোকিন, আর তাঁরই পাশে পাশে আসছে একজন কসাক, বর্শার মাথায় সর্বাধিনায়কের সরু নিশানটা উড়িয়ে। যে-দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল সেইদিকে ছুটে চলল সওয়াররা। ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা পড়ে ওদের দেখাচ্ছিল আবছা প্রেত-মূর্তির মতো।

শিশির-ভেজা গাড়িগুলোর ভেতর থেকে অবসন্নভাবে কয়েকটা মাথা জেগে উঠল দাড়ি উ'চিয়ে—কর্কশ গলার স্বরে নিস্তব্ধতা ভাঙল। কিন্তু বিউগ্‌ল-বাদক এর মধ্যেই অনেকটা দূরে চলে গেছে, সশব্দে সে ঘোষণা করছে সুপ্রীম কম্যান্ডারের উপস্থিতির কথা,—কাছেই রয়েছেন তিনি, লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে, বুলেট-বিদীর্ণ আকাশের নিচে।......বিউগলের সুরে ধ্বনিত হচ্ছে গান : "দুশমনকে আমরা করব নিপাত! এগিয়ে চলো বিজয়গৌরবের দিকে!......বীরের মৃত্যু নেই, তাঁর প্রাপ্য চিরন্তন সম্মান......টা-রা-টা-রা......"

ইভান ইলিয়িচ গিম্‌জাকে খুঁজে পেল ভাঙা জানলাওয়ালা একটা মাটির কুঁড়ে ঘরে। স্টাফের আর কোনো সদস্য তখন ছিল না। বিশালদেহী গিম্‌জা বিষণ্ণভাবে একটা বেঞ্চের ওপর বসেছিল ঘাড় গুঁজে, দু'হাঁটুর মাঝে ঝুলছিল একখানা হাত, কাঠের চামচে ধরা। টেবিলের ওপর এক বাটি কপির ঝোল, তার পাশেই পড়ে আছে পেট-মোটা একটা ব্রীফকেস্—ওটার মধ্যেই 'বিশেষ দপ্তরের' প্রধানের যাবতীয় সম্পত্তি।

গিম্‌জাকে মনে হচ্ছিল তন্দ্রামগ্ন। নড়াচড়া না করে চোখটা শুধু ঘুরিয়ে একবার সে দেখল ইভান ইলিয়িচকে।

"জখম নাকি?"

"না, এই সামান্য—একটু আঁচড়। গমক্ষেতের মধ্যেই আদ্ধেকটা রাত শুয়েছিলাম। দলের লোকরা যে সব কে কোথায় চলে গেল! এমন ডামাডোল! আচ্ছা, আমাদের রেজিমেণ্টটা কোথায়?"

"বসুন না," বলল গিম্‌জা, "খিদে পেয়েছে আপনার?"

আড়ষ্টভাবে হাতটা তুলে চামচেটা এগিয়ে দিল তেলেগিনের দিকে। একটা অস্ফুট আওয়াজ করে ও যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আধ-ঠাণ্ডা ঝোলের বাটিটার ওপর। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খেল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল :

"কাল রাতে কী দারুণ লড়াইটাই না লড়েছে আমাদের ফৌজ, বুঝলেন কমরেড গিম্‌জা! বলতে পর্যন্ত হয়নি কিছু—তিনশো কি চারশো গজ দূর থেকেই ওরা বেয়নেট চালাবার জন্য ছুটে গেছে!"

"খুবই তো করেছেন আপনারা", বলল গিম্‌জা : "নতুন হুকুমটা শুনেছেন?"

"না তো।"

"সরোকিনকে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার করা হয়েছে। আপনার কী মনে হয় এ ব্যাপারে?"

"ভালই তো হয়েছে।......কাল দেখেছিলেন তাঁকে? ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে উনি সিধে ঢুকে পড়েছিলেন একেবারে লড়াইয়ের সারিতে। গায়ে ছিল লাল শার্ট, যাতে সবাই চিনতে পারে। ওঁকে দেখামাত্র সেপাইরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। উনি না থাকলে কাল যে কী হত কে জানে।......আমরা তো একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি—পুরোদস্তুর সীজার!"

"তাই বটে," বলল গিম্‌জা, "সীজারই বটে!—দুঃখ যে ওকে গুলি করে সাবাড় করতে পারছি না!"

তেলেগিন বিস্মিত হল। বলল :

"আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন!"

"না, সত্যি কথাই বলছি। যাক গে—আপনি তো আর এ-সব বুঝবেন না।" স্থির অপলক চোখে গিম্‌জা তাকিয়ে রইল ইভান ইলিয়িচের দিকে : "আপনি—আপনি নিশ্চয়ই বেইমানি করবেন না আমার সঙ্গে?" (তেলেগিন সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে রইল) "তাহলে শুনুন।......আমি আপনার ওপর একটা কঠিন কাজের ভার দিতে চাই, কমরেড তেলেগিন। আমার মনে হয় আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।......একবার ভলগার ধারে যেতে হবে আপনাকে......"

"নিশ্চয় যাব!"

"যতরকমের দরকারী হুকুমনামা আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। সামরিক কাউন্সিলের সভাপতির নামে একটা চিঠিও দেব। সে চিঠি যেমন করে হোক

যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। না পারেন তো চলে যান শ্বেতরক্ষীদের দলে—আর মুখ দেখাবেন না। বুঝতে পেরেছেন তো কথা?"

"ঠিক আছে, পারব।"

"জ্যান্ত অবস্থায় কখনো ধরা দেবেন না। চিঠিটাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বড়ো মনে করবেন। ও-পক্ষের গোয়েন্দার হাতে পড়লে যা ভাল বুঝবেন করবেন, দরকার পড়লে গিলেও ফেলতে পারেন, কিংবা যা খুশি করতে পারেন......বুঝতে পেরেছেন?" সামনে এগিয়ে এসে গিম্‌জা এমনভাবে টেবিলের ওপর ঘুষি মারল যে বাটিটা পর্যন্ত লাফিয়ে উঠল। "চিঠিতে কী আছে, সেটাও আপনার জানা থাকা দরকার। চিঠিতে আছে : সরোকিনের ওপর ফৌজের আস্থা রয়েছে। সরোকিন হল বীর, ও যেখানে যেতে বলবে ফৌজ সেখানেই যাবে।......আমি চাই সরোকিনকে গুলি করে মারা হোক্......ওকে মারা হোক্ বিপ্লবের রাশ ওর নিজের হাতে টেনে নেবার আগেই। এইসব কথাগুলো মনে রাখবেন কমরেড তেলেগিন,—এই কথা কটির জন্য আপনার মৃত্যুও ঘটতে পারে।......বুঝতে পেরেছেন?"

চুপ করে গেল গিম্‌জা। তার ভুরুর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটা মাছি।

"ঠিক আছে!" বলল তেলেগিন : "নিশ্চয়ই করব কাজটা!"

"তা হলে এখনই চলে যান, ভাই। জানি না কোন্ রাস্তায় গেলে আপনার সবচেয়ে সুবিধে হবে—আস্ত্রাখান হয়ে স্ভিয়াতয় ক্রেস্তের মধ্যে দিয়ে যেতে হলে বড্ড দূর পড়বে......তার চেয়ে দনের পাড় দিয়ে জারিৎসিনে যাওয়া ভাল। শ্বেতরক্ষীদের পিছন দিকের এলাকাটা দেখেও নিতে পারবেন তাহলে। অফিসারদের মতো কাঁধ-পটি এঁটে বুক ফুলিয়ে চলে যান। কার কাঁধ-পটি নেবেন—ক্যাপ্টেন, না লেফটেন্যান্ট কর্ণেল?"

হাসতে হাসতে তেলেগিনের হাঁটু চাপড়ে দিল গিম্‌জা—ইভান ইলিয়িচ যেন কচি খোকা।

"ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিন, এর মধ্যে আমি চিঠিটা লিখে ফেলছি......"

॥ দশ ॥

শেষ পর্যন্ত তিন হপ্তার ছুটি মিলেছে। ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিনের এখন আর নড়বার শক্তি নেই, ভয়ানক কাহিল পড়েছে সে, মনেও নানারকম দ্বন্দ্ব।

ভেলিকক্‌নিয়াঝেস্‌কায়া স্টেশনে যে ভলান্টিয়ার গ্যারিসনটা মোতায়েন ছিল, রশচিনও সেই দলে ছিল এতদিন। খুব বড়দরের লড়াই বিশেষ একটা হয়নি, কারণ লালফৌজকে আরও দক্ষিণে হটিয়ে নেয়া হয়েছে। সেখানে তারা এখন দেনিকিনের প্রধান বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। মানিচ আর সাল নদীর আশপাশের গ্রামগুলোতে অবশ্য মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, কিন্তু আতামান ক্রাস্‌নভের কসাক পিটুনি-ফৌজ এইসব দুর্দান্ত লোকদের ঠান্ডা করবার কায়দা ভালভাবেই রপ্ত করেছে—প্রথমে তারা মিষ্টি কথা বলে বোঝায়, তারপর আনে কাঁটা-তোলা চাবুক, তাতেও না হলে ফাঁসিকাঠ।

এইসব প্রতিহিংসার কাজ ভাদিম পেত্রোভিচ এড়িয়ে গেছে মাথায় জখমের অজুহাত দেখিয়ে। দেনিকিনের জয়ে উল্লসিত হয়ে অফিসাররা যে-সব উৎসবের অনুষ্ঠান করত, রশচিন যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকতো সেসব থেকে। আর অদ্ভুত জিনিস, ঘাঁটির মধ্যেই কি, আর লড়াইয়েই কি, সবাই রশচিনের সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতো, ওর সম্পর্কে সবারই কেমনধারা একটা চাপা শত্রুতার ভাব।

কে একজন রটিয়ে দিয়েছিল, রশচিন লোকটি আসলে লাল, আর সেই বিশেষণটাই এখন ওর সম্পর্কে চালু হয়ে গেছে।

শাব্‌লিয়েভকার পরিখায় ভলান্টিয়ার ওনোলি ওর ওপর গুলি চালিয়েছিল। রশচিনের সে ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে : সাঁজোয়া ট্রেন থেকে ছুটে আসছিল একটা গোলা, কম্যান্ডার সাহেব হুকুম করলেন : 'শুয়ে পড়ো!' তারপরই বিস্ফোরণ। আর—রিভলবারের আওয়াজটা হল একটু দেরিতে, লাঠির খোঁচার মতো একটা আঘাত লাগল ওর মাথার পিছনটাতে, ওনোলির ঘূর্ণ্যমান কালো চোখ-দুটোর মধ্যেও দেখতে পেল পাশব উল্লাসের দীপ্তি।

রশচিনের কথা শুধু একজনই সত্যি বলে মানতে পারতেন—তিনি হলেন জেনারেল মারকভ। কিন্তু তিনিও আজ মৃত। রশচিন তাই ঠিক করেছে ওনোলি ছোকরার সম্পর্কে তার সন্দেহজনক নালিশটা আর তুলে কাজ নেই।

একটা প্রশ্নের জবাব ও প্রাণপণ চেষ্টা করেছে খুঁজতে : তার সম্পর্কে ওদের এই ঘৃণাটা কেন? ও যে সৎ লোক, তা কি ওরা কেউ খোলা চোখে দেখতে পায় না? দেখতে পায় না যে, ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, ওর সমস্ত কাজকর্মের পেছনে একমাত্র প্রেরণা রাশিয়ার মহত্ত্ব? স্তেপের এই ভয়াবহ প্রান্তরে ও তো আর জেনারেলের পদকচিহ্নের লোভে আসেনি!......

যে-দৃষ্টির সামনে নির্মমভাবে প্রকট হয়ে ওঠে সবকিছু, সে-দৃষ্টির অভাব আছে রশচিনের। নিজের মনের রঙ দিয়ে ও পৃথিবীটাকে রাঙায়, ঘটনার বিচার

করে, ও নিজে যাকে মনে করে উত্তুঙ্গ, সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন তারই কষ্টিতে ও যাচাই করে সবকিছু। যে-সব জিনিস ওর ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না সে-সব ওর নজর এড়িয়ে যায়, আর নেহাৎই যখন না মেনে উপায় থাকে না তখন চোখবুজে কোনোরকমে সয়ে যায় মাত্র। ওর দৃষ্টিতে পৃথিবীটা সুব্যবস্থিত, নিশ্ছিদ্র। নিঃসন্দেহে ওর এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে আপখুশি জমিদারকুলের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অভিজাত অপসংস্কারের ফলে। অধুনালুপ্ত এই মানব-প্রজাতিটি মনে করত ভগবানের সব আশীর্বাদের সেরা আশীর্বাদ বুঝি নিরুদ্বেগ আত্মসন্তুষ্টি, সকলের বেলায় আর সব জিনিসের বেলায় তারা এই আপ্তবাক্যটাকেই খাটাতে চেষ্টা করত। আস্তাবলের মধ্যে ধরে চাষীকে পেটানো হচ্ছে? তাতে আর কী হয়েছে? প্রথমে একটু ট্যাঁ-ফো করবে, তারপর, বাঁশ-ডলা খেলে আপনিই আপশোষ করবে। তখন সে উপকারই হয়েছে মনে করবে, কারণ আপশোষের পরেই আসে মনের প্রশান্তি। আইনসভায় বিলের প্রতিবাদ হয়েছে? জমিদারী নিলামে উঠেছে? তা আর কি করা যাবে! না হয় দেউড়ি-ঘরেই থাকব ডক পাতাঘেরা গুজবেরী কুঞ্জের মধ্যে, গোলমাল নেই ঝামেলা নেই : বুড়ো বয়সে এই তো ভাল!......ভাগ্যের চূড়ান্ত মুষ্ট্যাঘাতেও জমিদারপুঙ্গবদের আপখুশিভাব ঘুচল না; একবার যখন দুনিয়ার যার-পর-নাই সুন্দর আর মহৎ জিনিস দেখার চোখ তারা পেয়েছে তখন কি আর তা সহজে ঘুচবার?

ভাদিম পেত্রোভিচের নিজের বিশেষত্বটুকুও ঠিক এমনি—ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে, ব্যক্তিবিশেষের কাজকর্ম সম্পর্কে তারও এমনি ধরনের বিশ্লেষণী মনোভাবের অভাব। অবশ্য গত কয়েক বছরের নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ওর স্বপ্নিল আবেগসর্বস্বতায় বেশ খানিকটা ঘুণ ধরে গেছে, এখন তো প্রায় জীর্ণদশাতেই পৌঁচেছে বলা যায়। ক্রমাগতই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হচ্ছে তাকে। আর ঠিক এই কারণেই ও আজকাল যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে অফিসারদের আড্ডাখানা।

ওর নিজের যা চিন্তাধারা সে-অনুসারে এই মুষ্টিমেয় অফিসার আর ক্যাডেটদের উচিত ধর্মযোদ্ধাদের মতো সাদা পোশাক পরা। কেন, ওরা না হাতিয়ার তুলেছে বিদ্রোহী ইতর-জনতা আর তাদের সর্দারদের বিরুদ্ধে—তা সে এ্যাণ্টিক্রাইস্ট বা জার্মানি যার পদলেহী ভাড়াটে সৈন্যই হোক না কেন তারা? এই সব ধারণা মাথায় নিয়েই তো রশচিন দন এলাকায় এসেছিল।

অফিসারদের পানোৎসবে গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকির সঙ্গে যে-সব গলা-ফাটানো হামবড়াইয়ের কথা আর ভ্রাতৃহত্যার উল্লসিত আলোচনা চলত তা শুনলেও শিউরে উঠতে হয়। একদা-সুরুচিসম্পন্ন এই 'ধর্মযোদ্ধাদের' যৌবনদীপ্ত মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে ওঠে হত্যার অধীর লালসায়, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের উদগ্র কামনায়; প্রায় নির্জলা স্পিরিটের গেলাস শূন্যে তুলে ওরা মৃতের উদ্দেশে প্রশস্তিগান গায়, এমন একজন নগণ্য মানবসন্তানের নামে বিলাপ করে, গুলির আঘাতে যে প্রাণ দিয়েছে, দেহাবশেষ যার চিতায় তুলে ছাই উড়িয়ে দেয়া হয়েছে বাতাসে,—সেই 'ভণ্ড দ্মিত্রির' মতো। এমন একজনের নামে ওরা শোক-সঙ্গীত গায় যার অবিমৃষ্য বাসনার কাছে

আত্মসমর্পণ করে যতোলোকের যতো রক্ত ঝরেছে তা যদি আজ একজায়গায় জমা করা যেত তাহলে সেই বিরাট রক্তের নদীতে তাকে নিঃসন্দেহে ডুবিয়ে মারতো লোকে।

রশচিনের সহযোদ্ধা-অফিসারদের মাথায় একমাত্র ভাবাদর্শ যা আছে তা ওই শ্রাদ্ধবাসরের সংগীত। রশচিনকে তাই দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হয়।......রাশিয়া থেকে বলশেভিকদের হটাও, মস্কো দখল করো। গির্জার ঘণ্টা......সাদা ঘোড়ায় চেপে দেনিকিন ঢুকছেন ক্রেমলিনে।......এ সব অবশ্য বুঝতে কোনোই কষ্ট নেই।... কিন্তু তার পর? সেইটেই তো আসল প্রশ্ন! অফিসার মহলে সংবিধান পরিষদের নামোচ্চারণ করলেও তা অভদ্রতার পরিচায়ক। তা হলে কি শুধু মৃতদের উদ্দেশে বিলাপ করলেই সবকিছু হয়ে গেল?

এতগুলো মানুষ যে লড়াইয়ে নেমেছে, মৃত্যু বরণ করছে, সে তাহলে কিসের আকর্ষণে? রশচিন আবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়।......বুলেটের সামনে বুক পেতে দেয়া, আর তারপরেই মালগাড়িতে চড়ে নির্জলা মদের গেলাসে চুমুক দেয়া—একে নিশ্চয়ই বীরত্ব বলে না। এ তো হল মামুলি ব্যাপার। সাহসীই বলো আর ভীরুই বলো—সবাই তো তাই করে থাকে। মরণের পরোয়া না করাটা এখন নিতান্তই দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষের জীবন এখন শস্তা।

বিশ্বাস আর সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করলে তাকেই বলা যায় আসল বীরত্ব। কিন্তু এবারও রশচিনকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে হয়। ওর সংগী-অফিসাররা কোন্ সত্যে বিশ্বাস করে? ওর নিজেরই বা কোন্ সত্যে আস্থা? রাশিয়ার মহান্, করুণ ইতিহাসে? কিন্তু সে তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, সত্য তো নয়। সত্য আছে গতির মধ্যে, জীবনের মধ্যে—জীর্ণ খাতার বহু-আঙুল-ঘষা পাতার মধ্যে নয়, আছে ভবিষ্যতের চির-প্রবহমান জীবনধারার মধ্যে।

কোন্ সত্যের নামে রুশ চাষীদের হত্যা করার প্রয়োজন হল (মস্কোর গির্জার ঘণ্টা, সাদা ঘোড়া, আর বেয়নেটের মাথার ফুল ইত্যাদিতে যদি কারো ভক্তি নাই-বা থাকে)? এই প্রশ্নটাই মাথা চাড়া দিতে শুরু করল ভাদিম পেত্রোভিচের চেতনার মধ্যে, ওর চিন্তাভাবনাকে বিপর্যস্ত করে তুলল—একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে দিলে জলের ওপরকার প্রতিবিম্ব যেমন বিপর্যস্ত হয় ঠিক তেমনিভাবে। রশচিনের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে একটা মর্মান্তিক বিদারণ শুরু হল এই সময়টায়। সংগী-অফিসারদের কাছে তার পূর্ব-পরিচয় ঘুচে গেল, ও এখন "লাল", "বল্‌শি"।

কাতিয়াকে ও শেষ যে-কথাগুলো বলেছিল সেগুলো যেন ক্রমেই আরো বেশি করে মনে পড়তে থাকে ওর। লজ্জায় কান পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। আবেগে রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে দাশা বলেছিল: "ভাদিম, ভাদিম! একেবারে অন্য রকম কিছু যে করা দরকার আমাদের।" ও বোধহয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল অতল গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে রশচিন, আর তার পায়ের নিচে যেন হড়কে যাচ্ছে পাথরের নুড়ি।

রশচিন এখনো মানতে রাজি নয় যে কাতিয়াই ঠিক, ও মানতে চায় না যে ওর অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। যতোই নিচের দিকে নামছে ও, ততোই

ওর কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে—এই "বিদ্রোহী ইতর জনতার" শক্তির উৎস কোথায়; ওদের এ শক্তি কী ভাবে এমন ভয়াবহ গতিতে বেড়ে চলেছে। অথচ নিজের এই অপারগতার কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না ও। বলশেভিকরা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে, ঝপ্ করে এমন একটা সিদ্ধান্ত টানা যে নিতান্তই মূঢ়তা তা ও স্বীকার করবে না; আসলে কেউই বলতে পারে না, বলশেভিকরাই বিপ্লবকে টিঁকিয়ে রেখেছে, না, জনসাধারণই বলশেভিকদের টিঁকিয়ে রেখেছে! এখন যে আর নিজেকে ছাড়া আর কারুর উপরেই দোষ চাপানো যায় না—সে কথাও রশচিন মানতে নারাজ।

সব ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে কাতিয়াই ছিল সঠিক। পুরনো জীবন থেকে ও শুধু নির্ভরযোগ্য একটা সম্পদই টেনে এনেছিল এই দুস্তর যুগের পাথেয় হিসেবে—সে হল ওর ভালবাসা, আর করুণা। রশচিনের মনে পড়ে, মাথায় শাল জড়িয়ে, হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে ওর সেই নম্র সাথীটি কেমন করে সারা রস্তভ শহরটা হেঁটে বেড়িয়েছিল ওর পিছু-পিছু।...বেচারী কাতিয়া, এত ভাল, এত ভাল তুমি... আজ যদি রশচিন কাতিয়ার কোলে মাথা রেখে ওর নরম হাত দুটো গালে চেপে ধরে বলতে পারত শুধু একটি কথা : "আর যে পারছি না কাতিয়া!"...কিন্তু কী একটা অর্থহীন অহঙ্কার যেন ভাদিম পেত্রোভিচকে সজোরে পিছনে টেনে রাখে। লোহার বর্ম-আঁটা ঋজু দেহের মতো ওর শীর্ণ-কঠিন মূর্তি আর উদ্ধত উন্নত পক্ককেশ মাথাটা নিয়ে ও যেখানেই যায় সেখানেই সবার আগে ওরই ওপর নজর পড়ে—তা সে ধুলোভরা গ্রামের পথেই হোক, সৈন্যসারির মধ্যেই হোক, আর অফিসারদের মেস্-ঘরেই হোক।..."ফুলবাবু!" ওকে উদ্দেশ করে বলাবলি করে লোকে : "ঠাট বজায় রাখছেন দেখ না! যেন খাস-ফৌজের বড়কর্তা,—এদিকে তো পায়দল-চলা শুয়োর!"

কাতিয়াকে ও সংক্ষিপ্ত দুটো চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কোনো জবাব পায়নি। শেষে ও ঠিক করল, কর্নেল তেৎকিনকেই লিখবে। কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে পেয়ে গেল ছুটিটা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো রস্তভ।

দুপুর বেলায় স্টেশনে নেমে একটা দ্রশ্কি ভাড়া করল। শহরটা এমন বদলে গেছে যে আর চিনতেই পারা যায় না। সাদোভায়া স্ট্রীটটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গাছগুলোর পাতা ছেঁটে দেয়া হয়েছে। রাস্তার যে দিকটায় ছায়া সেদিক দিয়ে চলেছে সাদা পোশাকপরা মেয়েরা, দোকানের শার্সির কাঁচে মুখ দেখে মুগ্ধ হচ্ছে তারা।

আসনে বসে ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘুরছে রশচিন, কে জানে হয়তো কাতিয়ার দেখাও পেয়ে যেতে পারে। নিজের চোখকে যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। পালক-গোঁজা টুপি, পানামা কাপড় আর সাদা ওড়না-পরা মেয়েদের যেন কোন্ বিস্মৃত স্বপ্নরাজ্যের পরী বলে ভ্রম হচ্ছে।...গম্ভীর-মুখ জমাদাররা পরিষ্কার করে গেছে বাঁধানো ফুটপাত, তার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে সাদা-জুতোপরা পা-গুলো, সাদা মোজার ওপর এক বিন্দুও রক্তের দাগ নেই। ও, এই-

জন্যই তাহলে ভেলিকক্‌নিয়াঝেস্কায়ায় শিখণ্ডী ফৌজীদলগুলোকে রাখতে হয়েছে! এইজন্যই বুঝি দেনিকিন চার সপ্তাহ ধরে আপ্রাণ লড়াই চালাচ্ছেন লালদের সঙ্গে! আসল ব্যাপারটি তাহলে এই! দিনের আলোর মতো পরিস্কার সবকিছু। 'শ্বেত-রক্ষী'-সংগ্রামের আসল সত্য এবার ধরা পড়েছে।

রশচিন বিদ্রূপভরে হেসে ওঠে। জার্মানগুলোকে দেখা যাচ্ছে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, ওদের পরনে সেই গা-ঘিনঘিন করা বস্তাপচা ধূসর-সবুজ উর্দি আর মাথায় আনকোরা নতুন টুপি—ভারী বহাল-তবিয়তে আছে এই জার্মানগুলো। ঐ যে একটিকে দেখা যাচ্ছে ঢ্যাঙা হাসিমুখো এক সুন্দরীর হাতের ওপর চুমু খেতে, ঝুঁকতে গিয়ে বুঝি-বা তার চোখের কোটর থেকে এক-চোখের চশমা খসেই পড়ল!

"তাড়াতাড়ি, এই কোচম্যান!"......

বাড়ির আঙিনার ফটকে দাঁড়িয়েছিলেন কর্নেল তেৎকিন। সোজা ভেতরে চলে এল ভাদিমের গাড়ি। লাফ দিয়ে নেমে পড়তেই ও দেখে, তেৎকিন কেমন যেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে ফুলে উঠেছে, মোটা-মোটা হাত দুটো নেড়ে যেন ভূত তাড়াবার মতো করে রশচিনকে খেদাবার চেষ্টা করছেন।

"সুপ্রভাত কর্নেল।...চিনতে পারছ না? আমি...দোহাই তোমার, কাতিয়া কোথায়? ভাল আছে তো? বলছ না কেন..."

"হায় ভগবান্‌, তুমি বেঁচে আছ!"—কাংস্য মেয়েলি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন তেৎকিন: "ভাদিম পেত্রোভিচ, আমার কতকালের বন্ধু!" বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রশচিনের ওপর, দু'হাতে ওকে বুকে চেপে ধরে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন ওর গাল দুটো।

"কী হয়েছে বলতো কর্নেল?...সব খুলে বল..."

"আমি জানতাম তুমি বেঁচে আছ! উঃ, বেচারি একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভনা, কত কষ্টই না পেয়েছেন উনি!"

আবোল-তাবোল করে তেৎকিন সব কথাই বলে ফেলল—কাতিয়া কিভাবে ওনোলির কাছে গিয়েছিল, কি জানি কী কারণে ওর্নোলি ওকে বুঝিয়েছিল রশচিন সত্যিসত্যিই মারা গেছে; তারপর কাতিয়া ভেঙে পড়ে একদম, অবশেষে বিদায় নিয়ে একেবারেই চলে যায়।

"ব্যাপার তাহলে এই", মাটির দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বলল রশচিন: "আচ্ছা ও গেল কোথায় বল তো?"

হতাশভাবে হাত নাড়ল তেৎকিন, ওর ভালোমানুষ মুখটার মধ্যে ফুটে উঠেছে রশচিনের সাহায্য করার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা।

"আমার যেন মনে হচ্ছে উনি বলেছিলেন একাতেরিনোস্লাভ যাবেন।...একটা বিস্কুটের দোকানে না কোথায় কাজ নেবেন এমন কথাও বলেছিলেন বলে বোধ হচ্ছে।...আমি ভেবেছিলাম উনি চিঠি লিখে জানাবেন, কিন্তু একটা লাইনও তো লিখলেন না, একেবারে হাওয়া হয়ে গেলেন!"

রশচিন আবার ছুটলো স্টেশনমুখো, এক কাপ চাও খেল না তেৎকিনের ঘরে। সন্ধ্যের সময় একাতেরিনোস্লাভের একটা ট্রেন রয়েছে, সেটা ধরতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে ঢুকে ও একটা শক্ত ওক কাঠের বেঞ্চিতে বসল। কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিল চুপচাপ।...

ভাদিম পেত্রোভিচের পাশেই কে যেন এসে গা এলিয়ে দিল বেঞ্চিটার ওপর, এমনভাবে হাঁফ ছেড়ে বসল লোকটা যে পরিষ্কার বোঝা গেল বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাবার জন্যই সে এসেছে। এর আগে অনেকেই এসে বসেছে, আবার চুপচাপ চলে গেছে, কিন্তু এই শেষ আগন্তুকটি বসে এমন জোরে-জোরে পা আর হাঁটু নাড়াতে শুরু করল যে গোটা আসনটাই কেঁপে উঠতে লাগল। লোকটা যায়ও না, পা-নাচানো বন্ধও করে না। চোখের ওপর থেকে হাত না সরিয়েই রশচিন বলল :

"এই যে মশাই—পা নাচানোটা একটু বন্ধ করতে পারেন?"

"ওঃ, মাপ করবেন—বড্ড বিশ্রী অভ্যাস", মোলায়েম সুরে জবাব এল।

এর পর একেবারে চুপ হয়ে গেল আগন্তুকটি।

গলা শুনে ভাদিমের মনে হল চেনা-চেনা—কোন্ এক দূরান্তরের মনোমুগ্ধকর স্মৃতির সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে গলার স্বরটা।...হাত না সরিয়েই রশচিন আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে তার পার্শ্ববর্তীকে। এ যে তেলেগিন। কাদামাখা বুটওয়ালা পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে, পেটের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে হাত দুটো, উঁচু আসনের পিছনে ঘাড়টা হেলিয়ে দিয়ে ঝিমুচ্ছে মনে হল। ওর পরনে আঁটসাঁট উর্দি, বগলের কাছটা তাই কুঁচকে আছে, কাঁধের ওপর লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কাঁধপটিগুলো ঝক্‌ঝকে নতুন। পরিষ্কার-কামানো রোগা মুখটার ওপর একটা স্থির হাসি, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন লোকে বিশ্রাম নেয় তখন যেমন হাসি লেগে থাকে মুখে, তেমনি।......

কাতিয়ার পর যাকে রশচিন দুনিয়ার সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসে সে হল তেলেগিন—একেবারে ভাইয়ের মতো, প্রিয় বয়স্যের মতো ভালবাসে ওকে। কাতিয়া আর দাশা—এই দু'বোনের স্নিগ্ধতার আলোয় তেলেগিনও আলোকিত।...ওকে দেখে বিস্ময়ে ভাদিম প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, আর একটু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়তো ইলিয়িচের ওপর। তেলেগিন কিন্তু চোখ খোলেনি, নড়েও নি একবার। এর মধ্যে রশচিন সামলে নিল নিজেকে। ও বুঝতে পারছে ওর পাশেই যে-লোকটি বসে আছে সে ওর দুশমন। মে-মাসের শেষাশেষি ও জানতে পেরেছিল, তেলেগিন লালফৌজে আছে, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই নাকি যোগ দিয়েছে, আর ওকে নাকি খুব ভক্তিশ্রদ্ধাও করে ওরা। ওর পোশাকগুলো যে নিজের নয় তা বোঝাই যাচ্ছে, সম্ভবত কোনো নিহত অফিসারের সম্পত্তি যাকে নিশ্চয়ই প্রথমে খুন করতে হয়েছে ওকে। লেফটেন্যান্ট কর্নেলের পরিচয়চিহ্ন ওর কাঁধে, কিন্তু রশচিন ভাল করেই জানতো ও আগে সাধারণ একজন ক্যাপ্টেন ছিল। হঠাৎ রশচিনের যেন গা বমি-বমি করতে থাকে, মনে দারুণ ঘৃণা এলে সাধারণত ওর যেমন হয়। তেলেগিন এখানে এল কী করে? নিশ্চয়ই বলশেভিক গোয়েন্দা হিসেবে!...

এখনই গিয়ে মিলিটারী কম্যান্ডাণ্টকে জানানো দরকার ব্যাপারটা। দু' মাস আগে হলে ও হয়তো এক মুহূর্তও ইতস্তত করত না। কিন্তু এখন কেমন যেন বেঞ্চি ছেড়ে উঠতেই পারছে না ও—নিজেকে মনে হচ্ছে একেবারেই শক্তিহীন! এর পর আস্তে আস্তে ঘৃণার ভাবটাও যেন চলে যেতে থাকে।...ইভান ইলিয়িচ, লালফৌজী অফিসার, এই তো সে বসে আছে পাশে, ঠিক আগেরই মতো—ক্লান্ত, মূর্তিমান ভালোমানুষটির মতো।...ও তো আর টাকার জন্য এসব করছে না, কিংবা নিজের উন্নতির জন্যও নয়—ও সব প্রশ্নই ওঠে না! শান্ত, মাথা-ঠাণ্ডা লোক, লালফৌজে যদি যোগ দিয়েই থাকে তার একমাত্র কারণ ও বুঝেছে ওদের আদর্শটাই ঠিক।..."ঠিক আমার মতো—আমারই মতো।...ওকে যদি এখন ধরিয়ে দি'—তা'হলে ঘণ্টাখানেক বাদে দেখতে পাব দাশার স্বামী, কাতিয়ার ভাই, আমারই ভাই হয়তো একটা বেড়ার গোড়ায় ময়লার গাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, পায়ের বুট-জোড়া খোলা..."

ভয়ে গলা শুকিয়ে যায় রশচিনের। ও যেন নিজের মধ্যেই কুঁকড়ে গেছে... কি করবে এখন সে? উঠে চলে যাবে? কিন্তু তেলেগিন হয়তো চিনে ফেলবে, বোকার মতো ডেকে বসবে ওকে। কী করে তখন বাঁচাবে ও তেলেগিনকে?

রশচিন আর ইভান ইলিয়িচ ওককাঠের বেঞ্চিটার ওপর পাশাপাশি বসে রইল নিশ্চল হয়ে, যেন দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সময়ে স্টেশনটা একেবারে ফাঁকা রয়েছে। প্ল্যাটফর্মের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে পাহারাদার। এমন সময় চোখ না খুলেই তেলেগিন বলল :

"ধন্যবাদ ভাদিম।"

দারুণভাবে কাঁপতে লাগল রশচিনের হাত। আস্তে করে উঠে ইভান ইলিয়িচ শান্ত পায়ে হেঁটে গেল চত্বরের দিকে বেরুবার রাস্তায়, একবারও ফেরালো না মাথাটা। একমিনিট বাদে রশচিনও ছুটল ওর পিছন পিছন। স্টেশন-চত্বরের চারদিকটা খুঁজে বেড়ালো। অ্যাস্‌ফালটের বাঁধানো-রাস্তাটা সূর্যের সাদা আলোয় গলতে শুরু করেছে। রোদে-পোড়া তামাটে চেহারার ফেরিওয়ালারা ধুঁকছে ভাপ-সেদ্ধ মাছের ঝুলন্ত গাঁটগুলোর নিচে বসে, ওদের সামনে রয়েছে পশরার ডালা।... গাছে পাতাগুলো রোদে ঝলসে গেছে, এমন-কি শহরের ধুলো-ভরা হাওয়াটা পর্যন্ত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

"আর কিছু না—একবার যদি শুধু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম!"

রশচিনের চোখের সামনে ভাসতে লাগল প্রখর উত্তাপময় লাল-লাল সব চক্র। তেলেগিন যেন মাটির গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সূর্যের শেষ রশ্মি যখন স্তেপের প্রান্তর থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে ঠিক তেমনি সময় রশচিনও রেলের কামরার উপরের তাকে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছে চাকার আওয়াজের ঘুম-পাড়ানি তালে। আর ঠিক এমনি সময়টাতেই, যাকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে আর যাকে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে ওর রক্ত-ঘৃণার গ্লানিতে ভরা অন্তর,

সেই কাতিয়া একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে স্তেপের ওপর দিয়ে। কাঁধদুটো ওর শাল দিয়ে জড়ানো। পাশে বসে আছে সুন্দরী মাত্রিয়োনা ক্রাসিল্‌নিকোভা। লক্কর গাড়িটার ঝনর্‌-ঝনর আওয়াজ। ঘোড়াগুলো ফোঁস-ফোঁস করছে। সামনেও অসংখ্য গাড়ি সারি বেঁধে চলেছে, পেছনেও অসংখ্য। স্তেপের ওপর দিয়ে চলে গেছে বহুদূর। তারায় ভরা রাতের আকাশের নিচে অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে সবাই।

সামনেই বসেছিল আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ, হাতে আলগা করে ধরে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম। গাড়ির একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে সেমিয়ন, ওর বুটের ওপর এসে-এসে পড়ছে কাঁটা গাছের পাতা আর ঘাসগুলো। সোমরাজ লতা আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধ আসছে। কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো আকাশ-পাতাল ভাবছে কাতিয়া। স্তেপের যেন আর শেষ নেই। রাস্তাও যেন ফুরোতে চায় না। ঘোড়াগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে সামনে, চাকাগুলোও সমানে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে,—যেন কোন্‌ অনাদিকাল থেকে যাত্রা শুরু করে প্রাচীন যাযাবরদের স্রোতের মতো সারি বেঁধে ওরা চলেছে তো চলেছেই!

সুখের সন্ধান মিলবে অনন্ত চাওয়ার শেষে স্তেপের সীমানায় এসে, নীল সমুদ্রের তটরেখায়, ঢেউয়ের আকুলি-বিকুলিতে, সুখ হল প্রশান্তি, সুখ হল প্রাচুর্য।

কাতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে মাত্রিয়োনা একবার খিল্‌খিল্‌ করে হাসল। তারপরেই আবার আগের মতো সব নিস্তব্ধ, আওয়াজ যা শুধু ঘোড়ার পায়ের। বেষ্টনীর ভেতর থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসছে ওদের ফৌজ। মাখনো ওদের বলে দিয়েছে যথাসম্ভব নিঃশব্দে সরে পড়ার জন্য। আলেক্সির ভারি কাঁধজোড়া নুয়ে পড়তে চায়—ওরও নিশ্চয় ঝিমুনির ভাব এসেছে।

"ব্যাপার এমন নয় যে আমি তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাই।" আস্তে আস্তে বলছিল সেমিয়ন মাত্রিয়োনাকে : "তুমি আমার কানের কাছে অমন ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করে 'সেমিয়ন, সেমিয়ন' কোরো না তো..." (ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতিয়া মুখ ঘুরিয়ে নেয়, চেয়ে থাকে স্তেপের দিকে।) "আমি তো আলেক্সিকে সেবার বলেইছিলাম, জাহাজী-টুপির রিবনের জন্য আমি পরোয়া করি না...আসল কথাটা হচ্ছে আদর্শের..." (আলেক্সি একটা কথাও বলে না।) "নৌ-বহর এখন কাদের হাতে? আমাদের চাষীদেরই তো হাতে। আর আমরাই যদি চম্পট দি তাহলে!...আমরা সবাই তো লড়ছি একই লক্ষ্য নিয়ে—তোমরা এখানে, আমরা সেখানে..."

"চিঠিতে ওরা কী লিখেছে?" জিজ্ঞেস করল মাত্রিয়োনা।

"ওরা লিখেছে, যদি নিজেকে আমি পলাতক আর বিপ্লবের আঙিনা থেকে বিতাড়িত প্রমাণ করতে না চাই তবে যেন এখনই ফিরে যাই নিজের ডেস্ট্রয়ারে..."

মাত্রিয়োনা একদিকের কাঁধ উঁচু করে। বোঝা গেল ভয়ানক রেগে গেছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে রইল ও। খানিকক্ষণ বাদে আলেক্সি একবার

খাড়া হয়ে উঠল তার আসনে, কিছু একটা শুনতে পেয়েছে যেন। হাতের চাবুকটা অন্ধকারের দিকে ঘুরিয়ে বলল :

"ওই একাতেরিনোস্লাভ্ এক্সপ্রেস যাচ্ছে!"

কাতিয়া একবার তাকালো সেদিকে, কিন্তু ওই ট্রেনেরই একটা কামরায় যে ঘুমিয়ে আছে ভাদিম পেত্রোভিচ, তা তো আর দেখতে পেল না সে! ও শুধু শুনল একটানা শিটির আওয়াজ, যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা, আর ওর বুকটার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে তীব্র একটা বেদনা।...

একাতেরিনোস্লাভ স্টেশন থেকে বেরিয়ে রশচিন সোজা চলল বিস্কুটের দোকানগুলোর দিকে, কাতিয়ার খবর যেমন করে হোক পেতেই হবে। কাফে-গুলোতে ঢুকলে যেন দম আটকে আসে, নোংরা জানলার ওপর মাছির ঝাঁক, কেকের ওপরের পাতলা মাখনের গায়েও মাছি। দরজার ওপর কার্ডবোর্ডের বিজ্ঞাপনগুলোও এক-এক করে পড়তে লাগল রশচিন ঃ "ভার্সাই", "এলডোরাডো", "আরাম কোণ"; অবশ্য খাবার-ঘর হিসেবে সেগুলো সন্দেহজনকই মনে হয়, দরজা-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কট্‌মটে চোখে ওর দিকে তাকায় তামাটে চেহারার গাল-পাট্টাওয়ালা লোকগুলো, জ্বল্‌জ্বলে ফুলোফুলো চোখে ওরা এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন প্রয়োজন হলে যা হাতের কাছে পাবে তাই জবাই করে ওরা 'শাশ্‌লিক'* বানাবার জন্য তৈরি। এমন কি এই কাফেগুলোতেও খোঁজ করল রশচিন। তারপর এক-এক করে সব দোকানই দেখল।

নির্দয় প্রখর রোদ। একাতেরিনিন্‌স্কি প্রস্‌পেক্টের ধার দিয়ে সারি-বাঁধা অ্যাশ-গাছগুলোর ঘন পাতার নিচে অসংখ্য লোকের ভিড় জমেছে, অসংখ্য ধরনের মানুষ ঠেলাঠেলি আর চেঁচামেচি করছে। ভাঙা ট্রাম চলেছে ঠকর-ঠকর করতে করতে। যুদ্ধের আগে দক্ষিণ উক্রেইনের নতুন রাজধানী হিসেবে শহরটাকে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় সব বন্ধ হয়ে গেল। হেৎমানের শাসনে আর জার্মানদের ছত্রচ্ছায়ায় শহরের আবার প্রাণ ফিরে এল বটে, কিন্তু একটু অন্যরকমভাবে : অফিস, ব্যাঙ্ক আর মালগুদামের জায়গায় দেখা দিল জুয়ার আড্ডাখানা, টাকা লেনদেনের ঘাঁটি, কাবাবের দোকান আর সোডা ফাউন্টেন। ব্যবসা-বাণিজ্য আর হাটবাজারের কোলাহল-গুঞ্জনের জায়গায় এল টাকার ব্যাপারীদের উন্মত্ত কর্মব্যস্ততা, কাফে থেকে রাস্তার মোড়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি। দাড়ি কামাবার ফুরসৎ পায় না ওরা, মাথার পেছনে ঠেলে রাখে টুপি। সে সময়কার একমাত্র শিল্প ছিল বুট জুতোর কালি তৈরি করা। অসংখ্য বুটপালিশওয়ালা আর জুতোর কালি-বিক্রেতার চেঁচামেচির সঙ্গে মিশে যেত বদমায়েস বাউণ্ডুলেদের হাঁকডাক আর "আরাম কোণ"-এর অর্কেস্ট্রার বিলাপ। তারই মধ্যে আবার অসংখ্য মানুষের অলস ভীড়ে নিরর্থক ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি—জাল টাকা আর

---

* ককেসীয় কায়দায় কিমা করা ভেড়ার মাংস।

ভুয়ো মালের কেনাবেচার ওপর নির্ভর করেই ওরা বেঁচে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃথা খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে নিরাশ আধা-বিহ্বল অবস্থায় অবসন্ন হয়ে রশাচিন বসে পড়ে এ্যাকেসিয়া গাছের নিচে একটা বেঞ্চির ওপর। ওর সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অগণিত মানুষের ভীড় : মেয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ বেশ সুবেশা, কেউ-কেউ পরেছে বেয়াড়া ধরনের সব পোশাক, কারো জামা পর্দা দিয়ে তৈরি, কেউ-কেউ আবার পরেছে উক্রেইনের জাতীয় পোশাক; অনেক মেয়ের আবার সুর্মা-টানা চোখের পাতা ঘামে ভিজে গেছে, সেই ঘাম দরদর করে নামছে রুজ পাউডারমাখা গাল বেয়ে; উত্তেজিত মুনাফাশিকারীর দল পাগলের মতো এগিয়ে চলেছে দু'হাতে মেয়েদের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে; টুপিতে ত্রিশূল-চিহ্ন আঁকা হেৎমানের কর্মচারী, চেহারায় রাজসিক ভাব, মতলব আঁটছে কোথায় কি দাঁও মারা যায়, সরকারী সম্পত্তি কীভাবে গায়েব করা যায়; চওড়া-কাঁধ ঢ্যাঙা হেৎমান-কসাকরা চলেছে সন্ন্যাস-রোগীর মতো আড়ষ্ট ঘাড় নিয়ে; লাল মুকুট-আঁকা বড়ো-বড়ো টুপি, আসমানী আঙরাখা আর অতিরিক্ত রকমের ঢোলা পাজামা-পরা গুঁপো গাইদামাকগুলোও চলেছে—দুশো বছর ধরে ওদের ওই পোশাকের ওপর একমাত্র লোভ ছিল উক্রেইনীয় ইস্কুল মাস্টারদের। ক্বচিৎ দু'একটি পূত-পবিত্র-দেহী জার্মান অফিসারকে দেখা যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে, সব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে ওরা লক্ষ্য করছে মানুষের ভিড়......

এইসব দেখতে দেখতে রাগে রশাচিনের মাথা গরম হয়ে ওঠে। "উঃ এই হতভাগা জানোয়ারগুলোকে পেট্রোলে ডুবিয়ে যদি আগুন লাগিয়ে দিতে পারতাম..." সোডা ফাউন্টেনে গিয়ে ও এক্‌গ্লাস ফলের রস খেয়ে নেয়। তারপর আবার শুরু করে এ-দরজা থেকে ও-দরজা। এতক্ষণে অবশেষে ও বুঝতে পারে এভাবে খুঁজে কোনো লাভ হবে না। কাতিয়া এই অর্ধোন্মত্ত মানুষের ভিড়ে হয়তো হারিয়ে গেছে—কপর্দকহীন, সাংসারিক-বুদ্ধিহীন, নিঃসঙ্গ, ভীতচকিত, ভারাক্রান্ত মনে (বারে বারে মস্কোর ফ্ল্যাটের সেই বিষের শিশির কথা মনে হয় আর তীব্র অন্তর্দাহ অনুভব করে রশাচিন)। টাকা লেনদেনের ব্যাপারী, দালাল আর রেস্তোরাঁ-মালিকদের চট্‌চটে হাতের ছোঁয়া বুঝি লাগছে কাতিয়ার দেহে, ঘৃণ্য চোখের চোরা চাউনি হয়তো লক্ষ্য করছে ওকে আড়াল থেকে।...রাগে যেন দম আটকে আসে রশাচিনের। কনুই দিয়ে ঠেলে ঠেলে ও ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়ে, চেঁচামেচি গালাগালি কিছুই গ্রাহ্য করে না। সন্ধ্যে নাগাদ একটা হোটেলের কামরা ভাড়া করে ও দারুণ চড়া দামে —কামরা তো নয়, একটা অন্ধকার গর্ত। অতি কষ্টে একটা ছেঁড়া গদিওয়ালা লোহার খাট ঢুকানো হয়েছে সেখানে। বুট খুলে ও শুয়ে পড়ে। পাকাচুলওয়ালা মাথাটা গোঁজে বালিশে, তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে চোখের জল না ফেলে...

দনের সীমান্ত হেঁটে পার হয়ে তেলেগিন ওর লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কাঁধ-পটিজোড়া ব্যাগের মধ্যে পুরে নিল। জারিৎসিন অবধি ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে চাপলো একটা প্রকাণ্ড ফেরি স্টীমারে। উপরের ডেক থেকে পাটাতন অবধি ঠাসা

ভীড়—চাষী, যুদ্ধফেরত সৈনিক, পলাতক, উদ্বাস্তু, সবাই আছে। সারাতভে নেমে বিপ্লবী কমিটির অফিসে গিয়ে ও কাগজপত্র দেখালো, তারপর সেখান থেকে ধরল সীজরানের টাগ্‌বোট। চেকোস্লোভাক রণাঙ্গনও সীজ্‌রান থেকেই শুরু।

সেই আধা-পৌরাণিক যুগে চেঙ্গিস্‌ খাঁর ঘোড়সওয়াররা নাকি ভল্‌গার বালুকাময় তীরভূমিতে এসে এই বহুবিখ্যাত নদীর জল খাইয়েছিল তাদের ঘোড়াদের। সে সময় যেমন ছিল, আজও তেমনি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে ভল্‌গার তীর। বালুতট, সবুজ জলা-মাঠ আর রোজ-উইলো ঝোপের নক্‌শার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে অক্লান্ত বয়ে চলেছে ভল্‌গার জলবিস্তার, আয়নার মতো স্বচ্ছ। অল্প ক'টা গ্রাম, মনে হচ্ছে তাও পরিত্যক্ত। অখণ্ডবিস্তৃত স্তেপ পুবের দিকে ছড়িয়ে আছে, মনে হয় গরম ভাপের ঢেউয়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে,—ঠিক মরীচিকার মতো। জলের ওপর মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে মন্থরগতিতে। নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ শোনা যাচ্ছে নীল জলে টাগ-বোটের প্যাডেলের ছপ্‌ ছপ্‌ আওয়াজ।

কাপ্তেন-বুরুজের নিচে কাঠফাটা গরম ডেকের ওপর শুয়েছিল ইভান ইলিয়িচ। ওর খালি পা, পরনে বেল্‌ট্‌খোলা সুতীর কোর্তা; চোয়ালের ওপর লালচে-সোনালি দাড়ি দেখা দিয়েছে। রোদে গা-এলিয়ে-দেওয়া বেড়ালের মতো আরামে ও উপভোগ করছিল নীরব পরিবেশটুকু; জলা ঘেসো ফুলের ভিজে সুবাস, স্তেপ-ঘাসের শুকনো গন্ধ ভেসে আসছে নদীর ঢালু পাড় থেকে। আর আলোর সে কী সীমাহীন প্রাচুর্য! পরিপূর্ণ বিশ্রাম কাকে বলে তা আজই প্রথম জানলো ইভান।

স্তেপ এলাকার গেরিলাদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র আর গুলিগোলা যাচ্ছিল এই স্টীমারে। মালের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব লাল ফৌজী সেপাই চলেছিল তারা সবাই তাজা হাওয়া খেয়ে কেমন যেন ঢিশ্‌ঢিশ্‌ করছে—কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ প্রাণভরে ঘুমিয়ে নিয়ে এখন গান গাইছে, কেউ গড়াচ্ছে, কেউ আবার জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফৌজীদলের কম্যান্ডে আছে কমরেড খ্‌ভোদিন, কৃষ্ণসাগরের নাবিক। দিনের মধ্যে বার-কয়েক করে সে চেষ্টা করছে সেপাইদের কর্তব্যবোধ জাগাতে, শ্রেণী-চেতনার অভাবের জন্য ওদের লজ্জা দিতেও চেষ্টা করছে। কিন্তু ওরা খালি কম্যান্ডারকে ঘিরে দল পাকিয়ে শুয়ে-বসে থাকে, হাতের তেলোয় থুতনি রেখে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

খস্‌খসে গলায় বলে খ্‌ভোদিন : "একবার বুঝতে চেষ্টা করো ভাইসব! শুধু দেনিকিন নয়, আতামান ক্রাস্‌নভ্‌ও নয়, শুধু চেকরাও নয়, আমরা আজ লড়ছি পুব-পশ্চিম দুনিয়ার গোটা বুর্জোয়া জাতটার বিরুদ্ধে।......নিজেদের ওরা শেষবারের মতো গুছিয়ে নেবার আগেই খুনী বিশ্ববুর্জোয়াগুলোর ওপর একটা চরম আর ভীষণ আঘাত হানতে হবে। আমাদের পক্ষে রয়েছে দুনিয়ার সর্বহারা মানুষ—ওদের সঙ্গে যে রক্তের টান রয়েছে আমাদের র্‌-র্‌-রাশিয়ানদের! (শব্দটা সে রীতিমতো গর্বের সঙ্গে জোর দিয়ে-দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে)।...ওরা শুধু একটা জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছে—আমাদের নিজেদের দেশের পরগাছাদের

উপড়ে ফেলে যাতে আমরা শ্রেণীসংগ্রামে ওদের সাহায্য করি।...এ আর ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার কী, ভাইসব। সারা দুনিয়ায় রুশ সৈন্যদের চেয়ে বড়ো বীর আর কোথাও খুঁজে পাবে না—অবশ্য লাল নৌবহরের নাবিকদের কথা আলাদা, ওরা আরো বড়ো। সুতরাং আমরা যে জিতবই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা তাহলে পরিষ্কার, কি বল? অ-আ-ক-খ'র মতো সোজা। আজ হয়তো সামারার কাছেই লড়াই হচ্ছে, কিন্তু শিগ্‌গিরই সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটা মহাদেশে লড়াই শুরু হয়ে যাবে..."

ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সবাই শোনে ওর কথা।...একজন শান্ত-ভাবে মন্তব্য করে ঃ

"ঠিক কথাই তো...মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছি আমরা...সারা দুনিয়াটাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছি!"

বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে খ্‌ভালিন্‌স্কের নীল পাহাড়। ফিল্ডগ্লাস্‌ চোখে লাগিয়ে দেখল কমরেড খ্‌ভেদিন। গাছের ফাঁকে ফাঁকে এখন ঘুমন্ত খ্‌ভালিন্‌স্ক্‌ শহরটা নজরে পড়ে। ওখানে স্টীমার বাঁধতে হবে নতুন জ্বালানির জন্য।

হালের ধারে সারেঙের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জাহাজের কটা-চুলো কাপ্তেন সাহেব। নদীটা এখানে তিনটে স্রোতে ভাগ হয়ে গেছে, মধ্যে মধ্যে তৈরি হয়েছে উইলো গুল্মের ছোট-ছোট দ্বীপ। জাহাজ চলার রাস্তা এখানে দুর্গম। খ্‌ভেদিন এগিয়ে গেল কাপ্তেনের কাছে।

"শহরে জনপ্রাণী দেখতে পাচ্ছি না।—ব্যাপারটা কী?"

"যাই হোক আর তাই হোক্‌, তেল আমাদের পেতেই হবে।"

"যান্‌ তবে। নিন্‌ গে তেল!"

স্টীমার গিয়ে সোজা ভিড়তে লাগল একটা দ্বীপের ধারে। কালো পপ্‌লারের ডালগুলো প্রায় প্যাডেল-ঢাকনা ছোঁয় আর কি। বাঁশি বাজিয়ে স্টীমার পাশ ফিরছে, এমন সময় অনেকগুলো গলা যেন পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল চরের ভেতর থেকে ঃ

"থাম! থাম! কোথায় চলেছ এই?"

খাপ থেকে রিভলবার বের করল খ্‌ভেদিন। বোটের কিনারা থেকে সরে দাঁড়াল জাহাজীরা। প্যাডেলের ছপ্‌ছপানির নিচে জল যেন টগবগ করে উঠছে।

"থাম! থাম!" চীৎকার উঠতে লাগল আবার।

উইলো গাছগুলোর মধ্যে পাতার খস্‌খসানির আওয়াজ শোনা গেল, নদীর পাড়ে কারা যেন ছুটে আসছে। ওদের উত্তেজিত লালচে মুখগুলোও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শহরের দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে সজোরে হাত নাড়তে লাগল ওরা। এমন হট্টগোল যে কান পাতাই দায়। খ্‌ভেদিন ওদের উদ্দেশ করে গালাগাল ঝাড়তে চেষ্টা করল—নিটোল, সরেশ জাহাজী গালাগাল। কিন্তু ততক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে এসেছে।......জাহাজঘাটা থেকে শহরের দিকে যাবার রাস্তায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ। খ্‌ভালিন্‌স্ক্‌

এখন শ্বেতফৌজের দখলে। দ্বীপের ওপর যারা আছে তারা হচ্ছে পলাতক গ্যারিসনেরই হতাবশিষ্ট লোকজন। স্থানীয় গেরিলাদের একটা অংশও আছে। কারো-কারো হাতিয়ার আছে, তবে গুলিবারুদ ফুরিয়ে গেছে একদম।

লালফৌজের লোকেরা কেবিনে ছুটে যায় রাইফেল আনতে। কাপ্তেনের জায়গায় খ্ভোদিন নিজেই গিয়ে দাঁড়ায়। ওর মুখের সচীৎকার খিস্তি আর গালাগালি নদীর ওপর গম্‌গম্‌ করে এমন সাড়া জাগায় যে চরের লোকদের আশ্বস্ত হতে একটুও দেরি হয় না, ওদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মুহূর্তের উত্তেজনায় খ্ভোদিনের ঝোঁক উঠেছিল নদীর দিক থেকে শহরের ওপর এখনই সামনাসামনি হামলা চালাবে, শত্রুদের মোকাবিলা করবার জন্য ডাঙায় নামিয়ে দেবে একটা অবতরণকারী দল। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ বাধা দিল, সামান্য চেষ্টা-চরিত্র করেই ওকে বুঝিয়ে দিল অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলা করলে সে হামলা ব্যর্থ হতে বাধ্য; প্রথমে চারদিকের ঘাঁটি শক্ত করতে হবে; খ্ভোদিন তো জানেও না শত্রুর সামরিক শক্তি কেমন—হয়তো ওদের কামানও আছে!

খ্ভোদিন দাঁত কিড়মিড় করল বটে, কিন্তু মেনে নিল কথাটা। মাথার ওপর রাইফেলের গুলি চলছে, সেই অবস্থায় স্টীমার পেছু হটতে শুরু করল স্রোতের অনুকূলে। তারপর দ্বীপটার দিকে এগোল পশ্চিম দিক ধরে, সেদিক থেকে শহর দেখা যায় না, জংগলের আড়ালে পড়ে। এইখানে নোঙর করল ওরা। দ্বীপের লোকেরা ছুটে এল বালির চড়া ডিঙিয়ে—জনাপঞ্চাশেক লোক। উদ্‌ভ্রান্ত ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থায়।

"আমাদের কথাটা একবার শুনতে কী হয়, শয়তানের ঝাড়!" চেঁচিয়ে বলতে লাগল ওরা।

"আমাদের জন্য জাখারকিনের আসার কথা পুগাচেভ্‌স্কের গেরিলাদের নিয়ে"

"পরশুদিন আমরা লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিলাম তাকে।"

ওরা বলতে লাগল, তিনদিন আগে নাকি স্থানীয় বুর্জোয়ারা সশস্ত্র হামলা করে শহর-সোবিয়েতের বাড়ি, টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিস দখল করে নিয়েছে। অফিসাররা আগের যুগের মতোই একেবারে কাঁধপটি লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অস্ত্রাগারের ওপর, কতকগুলো মেশিনগানও ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। স্কুলের ছাত্র, ব্যবসায়ী, কর্মচারী সবাই বন্দুক ধরেছিল, এমন কি গির্জার পাদ্রিও হাতে একটা শিকারী বন্দুক নিয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করেছে। হঠাৎ এমনি ধরনের ক্ষমতা-দখল হতে পারে তা কেউ আশাই করেনি, রাইফেল ধরার পর্যন্ত সময় ছিল না লালসৈন্যদের।

"আমাদের কম্যান্ডাররা পালিয়েছে—ওরা বেইমানি করেছে আমাদের সংগে..."

"আর এখন হারানো ভেড়ার মতো ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছি।"

খ্ভোদিন আর সামলাতে পারল না :

"দূর হ, অপদার্থ যতো সব ডাঙার ভূত!"

রাগে আর কোনো কথাই ও খুঁজে পেল না।

নদীর ধারে জড়ো হল সবাই—সামরিক মন্ত্রণাপরিষদ তৈরি করার জন্য।

তেলেগিন হল সম্পাদক। প্রথমে ঠিক করতে হবে, বুর্জোয়াদের হাত থেকে খ্‌ভালিন্‌স্ক্‌ কেড়ে নেয়া হবে কি হবে না। সিদ্ধান্ত হল, নেয়া হবে। পরের প্রশ্ন হল, পুগাচেভ্‌স্কের গেরিলাদের জন্য সবুর করা হবে, না, হাতে যা সৈন্যবল আছে তাই দিয়েই শহর দখল করা হবে। এই বিষয়টার ওপর জোর তর্কাতর্কি চলল। কেউ কেউ জানালো, সবুর করাই উচিত, কারণ গেরিলাদের মেশিনগান আছে। অন্যরা বলল, সবুর করা উচিত নয়, কারণ যে-কোনো মুহূর্তে সামারা থেকে শ্বেতরক্ষীদের জাহাজ এসে পড়তে পারে। তর্কাতর্কিতে বিরক্ত হয়ে খ্‌ভেদিন হাত নাড়তে লাগল অধৈর্যভাবে।

"উঃ, যথেষ্ট বক্‌বকানি হয়েছে কমরেডস্‌! সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল : সন্ধ্যের আগেই খ্‌ভালিনস্ক আমাদের হাতের মুঠোয় আনতে হবে। কমরেড তেলেগিন, দয়া করে মিনিট লিখে ফেলুন তো ঝটপট!"

ঠিক সেই সময় নদীর বাঁ-দিকে একদল ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাব হল : প্রথমে দু'জন, তারপর আরো চারজন। স্টীমার দেখেই ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলে গেল। অল্পক্ষণ বাদেই সমস্ত নদীর পাড়টা ছেয়ে গেল ঘোড়সওয়ারে, সূর্যের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগলো হেঁসোর ফলা দিয়ে তৈরি ওদের চওড়া-চওড়া বর্শাগুলো।

"এই ও,—কে তোমরা?" খ্‌ভালিন্‌স্কের লোকরা চীৎকার করে বলল।

ও তরফ থেকে জবাব এল :

"আমরা পুগাচেভ্‌স্ক্‌ চাষী ফৌজের জাখারখিন ফৌজীদল।"

মেগাফোনটা টেনে নিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে চীৎকার করে জানালো খ্‌ভেদিন :

"তোমাদের জন্য হাতিয়ার এনেছি ভাইসব—শিগগীর এই দ্বীপটায় চলে এস।......আমরা খ্‌ভালিন্‌স্ক্‌ দখল করতে যাচ্ছি......"

অন্য তরফ থেকে চীৎকার ভেসে এল :

"ঠিক হ্যায়! আমাদেরও কামান আছে একটা।......নিতে চাও তো স্টীমার এ পাশে ভিড়াও!"

সামারার সাময়িক গভর্ণমেণ্টকে যে-সমস্ত জেলা মেনে নিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে চাষীদের একটি গেরিলা বাহিনী লড়ছিল সামারার স্তেপ প্রান্তরে। নদীর পাড়ের এই ঘোড়সওয়াররা হল সেই বাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত একটা ফৌজীদল।

চেকরা সামারা দখল করার পরে-পরেই এই গেরিলা বাহিনীটা গড়ে ওঠে। পুগাচেভ্‌স্ক্‌ (পুরনো নাম নিকোলায়েভ্‌স্ক্‌) ছিল ওদের সংগঠনের মূলকেন্দ্র। ঘোড়া দাবড়ানোর মধ্যে যাদের একমাত্র আনন্দ এমন মাথা-গরম লোকও আসতে থাকল পুগাচেভ্‌স্কে—জমির ডাকসাঁইটে খদ্দের শেখোভালভের পাল্লায় পড়ে যে-সব চাষী নামমাত্র জমিতে মাথাগুঁজতে বাধ্য হয়েছিল তারাও আসতে লাগল সেখানে; ধনী উরাল-কসাকদের শত বাধা সত্ত্বেও যারা জমি আঁকড়ে পড়েছিল সেই সব গরীব

চাষীও এল; আর এল তারা যাদের বুকে টগবগিয়ে উপচে পড়ছে আবেগ—যে-আবেগের জন্ম দিগন্তহারা স্তেপের প্রান্তরে, গমের ক্ষেতের চিরন্তন মর্মরগানে, চাষীরা যেখানে অলসভাবে-চলা বলদগুলো ঠেলে নিয়ে চলে সাবেকীধরনের লাঙলের সামনে—তাদের সে-আবেগ দুর্দমনীয়, সে-আবেগ স্বীকার করে না কোনো বাধাবন্ধ।

শত্রু গজিয়ে উঠতে লাগল চারদিকেই, স্তেপের বুকের মরীচিকার মতো। হয়তো গাঁয়ে একটা সভা ডাকা হয়েছে—ধনী চাষী, জার-বাহিনীর কমিশন-হীন অফিসার আর সামারার প্ররোচকরা সেখানে চাষীর ছদ্মবেশে ঢুকল, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করল : গরীব চাষী, দিনমজুর আর জমিহীন বেকারগুলো আবার কবে থেকে দেশশাসনের অধিকার পেল! সচ্ছল চাষীর ঘর থেকে ফসল ছিনিয়ে নেবে, জমি ছিনিয়ে নেবে—এমন কথা কি কেউ কবে শুনেছে? তারপর সভায় হয়তো প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল : আশেপাশের গাঁয়ে খবর পাঠাও, ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে তাদের। তারপর গোটা এলাকাটা হয়তো কোমর বেঁধে লেগে গেল, গোপন জায়গা থেকে হাতিয়ার বের করে আনল, লাঙল চালিয়ে জমির সীমানা ঠিক করল, কিংবা হয়তো দশ বারো মাইল লম্বা একটা পরিখাই খুঁড়ে বসল।

মাঝে মাঝে আবার একেকটা জায়গায় প্রজাতন্ত্রও ঘোষণা করা হল, সামারার গভর্নমেন্টকে মেনে নেয়া হল কেন্দ্র হিসাবে, এলাকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছেড়ে দেয়া হল ঘোড়সওয়ারফৌজের হাতে, যখন লালফৌজের আক্রমণ হবে বলে মনে হয় তখনই শুধু ডাক পড়ে পদাতিকদের। ঘোড়সওয়ারদের অস্ত্র হল লম্বা লগির মাথায় সোজা করে বাঁধা হেঁসো। কুলাকদের এই ফৌজগুলো ছিল সত্যিসত্যিই বিভীষিকার মতো। হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয় কুয়াশাভরা স্তেপের মাঠ থেকে, তারপর বলা-নেই কওয়া-নেই ঝাঁপিয়ে পড়ে লালফৌজের সৈন্যসারি আর মেশিনগানের ওপর। এইভাবে মানুষ লড়াই করে চলল তাদের নিজের রক্তমাংসের আত্মীয়দের সংগে—ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই, ছেলের বিরুদ্ধে বাপ, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী—আর তাই তারা লড়লও হিংস্রভাবে, নিষ্ঠুরভাবে। যখনই 'লাল'দের হারিয়ে দেয় কোনো লড়াইয়ে, সংগে সংগে কুলাকরা নিজেদের রাইফেল মেশিনগান ইত্যাদির সুরাহা করে নেয়, কিন্তু তাই বলে পুরনো হেঁসোটাকে বরবাদ করে না।

১৭৭২ সালে পুগাচেভের সেই অভিযানের কথা এখনো সামারার লোকে ভোলেনি; সেই সামারারই আশেপাশে স্তেপের ময়দানে যে বিরাট কৃষক যুদ্ধ হয়ে গেল তার খবর কোনো ইতিহাসের পাতায় কিংবা সামরিক দলিলে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তা হলেও, উৎসব-পার্বণের কোনো ছুটির দিনে হয়তো হঠাৎ কানে আসবে, এক বালতি ভদ্‌কা সামনে রেখে বাপ-বেটায় মিলে তর্ক করছে। সেদিনকার সেই লড়াইয়ে কার কোথায় ভুল হয়েছিল তাই নিয়ে বিদ্রূপ করছে পরস্পরকে।

"কলদিবানের সেই দিনটার কথা তোর মনে আছে ইয়াশা, যেদিন তোরা আমাদের ওপর কামান তাক করেছিলি? আমি সেদিন ঠি-ক ধরেছিলাম : 'ওটা নিশ্চয় আমার ইয়াশা, কুত্তীর বাচ্চা ইয়াশা......ছোকরাটাকে আরেকটু ঘষে-মেজে তৈরি করে দেয়া উচিত ছিল' ভেবেছিলাম তখন।...তা, তোদের কিন্তু সেবার বেশ

ঘাবড়ে দিয়েছিলাম যাই বল্।......তোর ভাগ্যি ভাল যে আমার হাতে পড়িস্ নি......"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো! আরও জাঁক করো! সেবার জিতেছিল্ম কিন্তু আমরাই!"

"সবুর, সবুর—আর দুটো দিন বাদে আবার লড়া যাবে'খন দুই উল্টো তরফ থেকে!"

"সে নয় লড়ব।...চিরকালই তুমি কুলাক ছিলে, আর তোমার ওই নোংরা কুলাক-মার্কা বুদ্ধি ঘুচবেও না কোনোদিন।"

"ওরে বেটা, তোর স্বাস্থ্য কামনা করি!"

"তোমারও স্বাস্থ্য কামনা করি বাবা!"

নদীর বাঁ-দিকে গিয়ে ভিড়ল স্টীমার। গ্যাংওয়ে নামিয়ে দিতেই পুগাচেভ্স্ক্-ফৌজীদলের কম্যান্ডার জাখারকিন উঠে এল ডেকের ওপর। শকুনের ঠোঁটের মতো নাকটা তার বাঁকা। এমন শক্তসমর্থ পেশীবহুল চেহারা যে ওর পায়ের ভারে পাটাতনের তক্তা পর্যন্ত ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। রং-জ্বলা উর্দি বগলের কাছে ফেটে গেছে। উঁচু সওয়ারী বুটের ওপর ঠোকর খাচ্ছে বাঁকা তলোয়ারটা। ওর বড়ো ভাইরা উতেভ জেলার চাষী, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একেকটি ডিভিশনের পরিচালনা-ভার। জাখারকিনের পেছন পেছন এল ছ'জন গেরিলা—ওরই কম্যান্ডার সবাই—তাদের পরনে উদ্ভট আর বিচিত্র ধরনের পোশাক: রং-জ্বলা শার্ট, তাতে ধুলো আর আলকাতরার দাগ, বোতামহীন কলার; কারুর পায়ে আবার ফেল্ট জুতো—রেকাব আঁটা, কারুর পায়ে বাক্‌লা-জুতো; কাঁধে ঝুলিয়েছে কার্তুজ বেল্ট, কোমরে গুঁজেছে হাতবোমা, তা ছাড়া আছে চ্যাপ্টা জার্মান বেয়নেট, করাতে-কাটা রাইফেল।

কাপ্তেন-বুরুজের ওপর সাক্ষাৎ হল জাখারকিন আর খ্ভোদিনের, পারস্পরিক সৌহার্দের সঙ্গে করমর্দনও হল। সিগারেট বিলির পালা চলল খানিক। সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত সারমর্ম জানিয়ে দিল খ্ভোদিন। জাখারকিন বলল:

"আমি জানি খ্ভালিন্স্কে গোলমাল পাকাচ্ছে কে—কুকুশ্কিন, জেম্স্তভোর সভাপতি।...শুয়োরটাকে যদি জ্যান্ত পাকড়াতে পারতাম রে..."

"আপনাদের ওই কামানটা", বলল খ্ভোদিন: "ওটা কি চালু অবস্থায় আছে?"

"দাগা তো যায় ভালই, তবে প্রত্যেকবার সোজা করে বসিয়ে নিতে হয়—'সাইট' তো নেই, তাই নলের ফুটো দিয়েই তাক করে নিতে হয়। তবে হতভাগার দাপট বড়ো কম নয়—ঠিক জায়গায় ঘাই দেয়! প্রত্যেকটা তোপের সঙ্গে উড়িয়ে দেয় ঘণ্টাঘর, পাম্প হাউস!"

"চমৎকার! আচ্ছা কমরেড জাখারকিন, বলুন দেখি ডাঙায় নেমে পাশ থেকে হামলা করা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?"

"ঘোড়সওয়ারদের আমরা উল্টো তরফে লাগিয়ে দেব। আপনার স্টীম-বোটে একশো জনের জায়গা হবে?"

"অনায়াসে—তবে দুই ক্ষেপে।"

"তাহলে তো ঠিকই আছে। অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘোড়সওয়ারদের নামিয়ে দেবো শহরের ওধারে। আর এদিকে স্টীমারের ওপর বসাব কামানটা। তারপর ভোর হলেই শুরু হবে আক্রমণ।"

ইভান ইলিয়িচের ওপর খুভেদিন ভার দিয়েছে পদাতিক দলের অবতরণ পরিচালনা করতে হবে। অর্থাৎ ডাঙায় ওঠার সিঁড়িপথে সামনাসামনি আক্রমণ চালাতে হবে ওকে। গোধূলির আলোয় খুব সাবধানে চলতে লাগল স্টীমার—একটাও আলো জ্বালানো হয়নি, ভল্গার পাশ ঘেঁষে দ্বীপের ধার-দিয়ে ধার-দিয়ে চলেছে। পূর্ণ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শোনা যাচ্ছে শুধু খালাসীর জল-মাপার আওয়াজ। পুগাচেভ্স্কের লোকেরা স্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর কিনারা দিয়ে চলছে। মাটির ওপর গুঁড়ি মেরে পড়েছিল খ্ভালিনস্কের গেরিলারা, ওদের হাতে-হাতে রাইফেল দেয়া হল। জলের ধারে এসে তেলেগিন একবার এপাশ একবার ওপাশ ঘুরছে, লক্ষ্য রাখছে যাতে কেউ ধূমপান না করে কিংবা আলো না দেখায়। তটের ওপর এত আস্তে আছড়ে পড়ছে নদী যে কুলুকুলু আওয়াজটুকুও ক্ষীণ। বাতাসে জলা ফুলের গন্ধ। গুন্গুন্ করছে মৌমাছি। বালির ওপর একেবারে চুপচাপ বসে আছে সেপাইরা।

রাত ক্রমেই কালো হয়ে আসে, গাঢ় মখমলের মতো। আকাশেও ফুটতে থাকে অসংখ্য তারা। স্তেপের দিক থেকে নদীর ওপর ভেসে আসে সোমরাজ লতার শুকনো গন্ধ, আর কলকণ্ঠ তিতিরের ডাক "স্পাৎ-পর্‌রা, স্পাৎ-পর্‌রা"*। চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার জন্য জলের ধারে পায়চারি করে ইভান ইলিয়িচ।

রাতের অন্ধকার যখন মিলিয়ে যাচ্ছে, আকাশ থেকে খসে পড়ছে কিংখাবী কালো আর মোরগ ডাকছে দূর থেকে, ঠিক সেই সময় জল-থেকে-ওঠা পাতলা কুয়াশা ভেদ করে এল প্যাডেলের ছপছপানির আওয়াজ। স্টীমারটা এগিয়ে আসছে। রিভলবারের নলচেটা একবার পরখ করে তেলেগিন ওর চামড়ার কোমরবন্দটা শক্ত করে এঁটে নিল, তারপর এক এক করে ঘুমন্ত সেপাইদের প্রত্যেকের পায়ে বেতের ডগা দিয়ে টোকা মারতে লাগল।

"উঠে পড়ো। কমরেডস্!"

ঝপাঝপ্ দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। এখনও ঘুম যায় নি চোখ থেকে, কাঁপছে হি-হি করে, ভাল করে ভাবতেই পারছে না ওদের সামনে এখন কী কাজ।...... অনেকে নদীর দিকে চলে গেল জল খেতে, জলে ডুবিয়ে রাখল মাথা। চাপা গলায় হুকুম করতে লাগল তেলেগিন। যা-হোক কিছু একটা আড়ালের দরকার আছে —ওরা তাই গা থেকে শার্ট খুলে নিয়ে তার মধ্যে বালি ভরতে লাগল, তারপর

* "শুয়ে পড়ো গো, শুয়ে পড়ো গো!"

বস্তার মতো সেগুলো সাজাতে লাগল সারি করে। নিঃশব্দে কাজ করছে ওরা—ব্যাপারটা মোটেই ঠাট্টার নয়।

ভোর হয়-হয়। প্রস্তুতিও শেষ। মরচে-ধরা ছোট পাহাড়ী কামানটাকে বসানো হল স্টীমারের সামনের দিকে। পঞ্চাশজন লোক উঠে এল পাটাতনের ওপর, বালির বস্তাগুলোর পিছনে গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকল। খ্ভোদিন ধরল হাল, চেঁচিয়ে হুকুম করল :

"সামনে বাড়ো পুরোদমে!"

প্যাডেলের নিচে জল সপ্‌সপ্‌ করে ফুলে উঠতে লাগল। দ্বীপের পাশ কাটিয়ে প্রধান স্রোত ধরে তাড়াতাড়ি শহরের দিকে এগিয়ে চলল স্টীমার। শহরের এখানে ওখানে হলদে আলো দেখা যায়। পিছন দিকে, রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে। এখন বেশ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে মোরগের ডাক।

ইভান ইলিয়িচ দাঁড়িয়েছিল কামানের কাছে। আর খানিকক্ষণ বাদেই এই অভেদ্য নিস্তব্ধতাটুকু গুলি ছুঁড়ে ভাঙতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছিল ওর।

পুরুতের মতো দেখতে বেঁটেখাটো নিরীহ চেহারার একজন খ্ভালিন্‌স্ক্‌-বাসী, মাছ ধরার সখও আছে মনে হয়, কামান বসাবার কাজে নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল। তেলেগিনকে বিনীতভাবে বলল ঃ

"কমরেড কম্যাণ্ডার, সোজা পোস্টাপিসের ওপর তোপ দাগলে কেমন হয়? একেবারে মাঝখানে?...ওই যে দেখুন—পোস্টাপিসের হলদে আলো দুটো..."

"পোস্টাপিস তাক করো!" মেগাফোনের মারফত সগর্জনে হুকুম করল খ্ভোদিন : "রেডি! সাইট খোলো!"

গোলন্দাজ হাঁটু গেড়ে বসে কামানের নলের ফুটো দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে কামানের মুখ সরিয়ে এনে তাক করল হলদে আলো দুটোর দিকে। কামানে গোলা পুরে গোলন্দাজটি ঘুরল তেলেগিনের দিকে :

"একটু পেছনে সরে যান তো কমরেড, কখন আবার ফেটে-ফুটে যাবে!"

"ফায়ার!" খেঁকিয়ে উঠল খ্ভোদিন।

সজোরে পিছনে হটে এসে গর্জে উঠল কামান। চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলক বেরিয়ে এল মুখ থেকে। নদীর বুকটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল গুরগুর করে। পাহাড়ের দিক থেকে সগর্জন প্রতিধ্বনি উঠল।

"চালাও তোপ! ফায়ার!" হাল ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচাচ্ছে খ্ভোদিন : "বন্দরের দিক থেকে তাড়াতাড়ি গুলি চালাও! ঝাঁকে-ঝাঁকে গোলা ছোঁড়ো শুয়োরগুলোর মুখের ওপর!"

প্রবল উত্তেজনায় পা দাপাতে দাপাতে বিতিকিশ্রী গালিগালাজ করতে লাগল খ্ভোদিন। ডেকের দিক থেকে এলোমেলো গোলা চলছিল। খ্ভালিন্‌স্কের দিকের পাড়টা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। গোলন্দাজ স্থিরমস্তিষ্কে কামানে গোলা

প্রের আরেকবার দাগলো তোপ। নদীর ওপারে কোনো অন্তরালবর্তী ঘাঁটি থেকে উড়ে আসছিল গোলার টুকরো। কাঠের বাড়িঘর, বাগান আর ঘণ্টাঘরের ছায়ারেখা এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে এসেছে।

ঘাটে ওঠার সিঁড়িপথ থেকে এবার ঝলকে ঝলকে রাইফেলের গুলি ছুটতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে যে জিনিসটার ভয় করছিল তেলেগিন, এবার সেটারই আওয়াজ শুনতে পেল সে: আচমকা একটা মেশিনগান গর্জাতে শুরু করেছে দ্রুত-বেগে। ওর পায়ের ডগাগুলো টান-টান হয়ে উঠল, বরাবর যেমন হয়। মনে হচ্ছিল যেন শরীরের সমস্ত রক্তকোষ সংকুচিত হয়ে আসছে। কামানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ও গোলন্দাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল নদীর ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লম্বা ইমারতের দিকে।

"একবার ওই দিকটায় ঝাড়তে চেষ্টা করো তো ভাই, ওই ঝোপগুলো যেদিকে রয়েছে..."

"চুঃ!" আপশোস করে বলল গোলন্দাজ : "চমৎকার ছোট্ট বাড়িটা। যাক্ গে, কী আর হবে!"

তৃতীয়বার গর্জন করে উঠল কামান। দু'এক সেকেণ্ডের জন্য মেশিনগানটা থেমে গিয়েছিল বটে কিন্তু তারপরেই আর একটু উঁচু থেকে আবার শোনা যেতে লাগল খক্‌খক্ আওয়াজ। চট্ করে পাশ ঘুরেই স্টীমারটা এগিয়ে চলল ঘাটের দিকে। চিমনি আর মাস্তুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ছুটে আসতে লাগল বুলেট।

"জাহাজের নোঙরের অপেক্ষা কোরো না—ঝাঁপিয়ে পড়ো!" চেঁচিয়ে উঠল খ্‌ভোদিন : "হুর্‌রে, জওয়ান ভাইসব!"

জেটির কিনারা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ করে উঠল। তেলেগিনই প্রথম লাফিয়ে পড়েছে। খ্‌ভালিন্‌স্ক্ সেপাইরা রেলিং ডিঙোচ্ছিল, তাদের দিকে ফিরে তেলেগিন হুঙ্কার দিল :

"আমার পেছনে এস! হুর্‌রে!"

তক্তার ওপর দিয়ে তেলেগিন ছুটে গেল ডাঙার দিকে। ওর পেছন পেছন দৌড়লো একটা ফুর্তিবাজ দঙ্গল—ছুটতে ছুটতে, গুলি করতে করতে, হোঁচট খেতে খেতে। নদীর পাড় ফাঁকা। বাগানের আগাছাগুলোর মধ্যে দু'একটা মানুষকে নড়তে দেখা যাচ্ছিল। দু'একটা বাড়ির ছাদ থেকে সামান্য গুলিগোলা চলল। মেশিনগানটা এখন সরে গেছে বেশ দূরে, পাহাড়টার দিকে। সেখান থেকে প্রথমে খানিকক্ষণ থেমে-থেমে গুলি ছুটল, তারপরই শেষবারের মতো দুটো কি একটা গুলি ছুঁড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মেশিনগান। যুদ্ধের কোনো আগ্রহ দেখাল না শত্রু।

তেলেগিন দেখল এবড়ো-খেবড়োভাবে বাঁধানো একটা চত্বরের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে ও। ভাল করে নিজেকে দম নেবার অবসর না দিয়েই ও চারদিক খুঁজে জড়ো করল দলের লোকজনদের। খালি পায়ের তলাটা দপ্‌দপ্ করছে, নিশ্চয় পাথর-টাথরের ওপর ঘষটে গিয়েছিল। বাতাসে ধুলোর গন্ধ। কাঠের বাড়িগুলোর

খড়খাড় ভেজানো। লিল্যাক আর অ্যাকেসিয়া গাছের পাতাগুলো অবধি নড়ছে না। রাস্তার কোণে ছোট মিনারওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি। ব্যালকনির তারের ওপর চার জোড়া পাতলুন ঝুলছে। 'আরেকটু বাদেই তো লোপাট হয়ে যাবে ওগুলো'—ভাবল তেলেগিন। শহরটা যেন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে; দৌড়োদৌড়ি, চিৎকার, গুলি-ছোঁড়া ইত্যাদি যা হচ্ছে সেগুলো যেন ওই ঘুমেরই মধ্যে স্বপ্নমাত্র।

পোস্টাপিস, টেলিগ্রাফ আপিস আর জল সরবরাহের কেন্দ্রগুলো কোথায় তা খোঁজখবর করে তেলেগিন দশ-দশজন লোকের একেকটা দল পাঠালো সেইসব জায়গায়। সেপাইরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের স্নায়ুতে এখনও রীতিমতো উত্তেজনা, হরদম চমকে ওঠে, সামান্য আওয়াজ কানে এলেই বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। শত্রু নজরেই পড়ে না কোথাও। শুকপাখিগুলো ডাকতে শুরু করেছে, ছাদের ওপর থেকে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পায়রার ঝাঁক।

শহর-সোবিয়েতের বাড়ি দখল করল তেলেগিনের ফৌজীদল। ইটের বাড়ি, থামগুলোর আস্তর খসতে শুরু করেছে। সমস্ত দরজা হাট-খোলা, দরজার মুখেই যে-ঘর সেটাতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই। তেলেগিন বেরিয়ে গেল ব্যাল্‌কনির দিকে। নিচেই ফুলে-ফলে-ভরা বাগান, বাড়ির ছাদগুলোতে অনেকদিন রং পড়েনি, ফাঁকা রাস্তাগুলোয় ধুলো উড়ছে—যে-কোনো মফঃস্বল শহরের মতোই শান্ত নিরুদ্বেগ। হঠাৎ শোনা গেল দূর থেকে বিপদের সংকেতধ্বনি : ঘন ঘন ঘণ্টার ভারি আওয়াজ, কাঁপা-কাঁপা সুরে মথিত করছে সারা শহরটাকে। ঘণ্টার কাতর আহ্বান যেদিক থেকে আসছে সেদিকে শোনা গেল দ্রুত বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ, সেই সঙ্গে হাতবোমার বিস্ফোরণ, চিৎকার, আর্তনাদ আর ঘোড়ার ভারি-ভারি খুরের আওয়াজ। জাখারকিনের অবতরণকারী-দল পাহাড়ের দিকে শত্রুর পালাবার পথ বন্ধ করছে। পাশের একটা গলি থেকে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার নালগুলো অবধি ঝন্‌ঝন্ করছে। তারপর আবার সব শান্ত, চুপচাপ।

ইভান ইলিয়িচের ব্যস্ততা নেই। ধীরে ধীরে ও চলল স্টীমারের দিকে—রিপোর্ট দিতে হবে, শহর দখলে এসে গেছে। ওর রিপোর্ট শুনে খ্‌ভোদিন বলল :

"সোবিয়েত শক্তি আবার কায়েম হয়েছে। এখন এখানে আমাদের করার কিছুই নেই। এবার চলো যাওয়া যাক।"

বুড়ো কাপ্তেনের পিঠ আদর করে চাপড়াল একবার। উনি তখনও ভয়ে আধমরা হয়ে আছেন। খ্‌ভোদিন বলল : "তাহলে শেষ পর্যন্ত বারুদের গন্ধ পেলেন তো! যাক্, বুড়ো কত্তা...এবার তো আমি জাহাজের কম্যান্ড ছেড়ে দিচ্ছি ...এই নিন ঘড়িটা!"

ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝকানি আর জলের কলকল শব্দের মধ্যে সন্ধ্যে অবধি ঘুমিয়ে কাটালো তেলেগিন। সূর্যাস্তের আবছা স্বচ্ছ আভা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজের পেছনদিকে ওরা হাল্কাসুরে গান ধরেছে—তারই দু'একটা কলি ভেসে

যাচ্ছে খোলা স্তেপের জনমানবহীন প্রান্তরে। অস্তরাগের ক্ষণিক সৌন্দর্য বুঝি স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে জলে, নদীর তটে, মানুষের চোখে, এমন কি তার হৃদয়েও...

"এমন মন-মরা কেন ভাইসব?" বলল খ্ভোদিন : "গানই যদি গাইবে তো ফুর্তির গান গাও না?"

ও নিজেও একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছে। তারপর এক গেলাস স্পিরিট গলায় ঢেলে এখন পায়চারি করছে ডেকের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পাতলুনটা টেনে সোজা করে বলল ঃ "সীজরানটা যদি একবার দখল করতে পারতাম! আপনি কী বলেন, কমরেড তেলেগিন? জোর একটা ধোলাই দিয়ে দিতে পারতাম ওদের, তাই না?"

ক্রমাগত সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসছিল খ্ভোদিন। বিপদে ওর ভয় কী! ভলগার জলে সূর্যাস্তের কী বিষণ্ণ শোভা তা নিয়ে ও মাথা ঘামায় না, কোন্ দিক থেকে কোন্ মারাত্মক বুলেট এসে ওর প্রাণ হরণ করবে সে গ্রাহ্যও নেই ওর। জীবনের জন্য আকণ্ঠ পিপাসা আর অনির্বাণ প্রাণশক্তি ওর মধ্যে উদ্দাম উদ্বেল।...পাটাতনের তক্তাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ্ করে উঠল ওর খালি পায়ের চাপে।

"একটু সবুর বাছাধনেরা, একটু গুছিয়ে নিতে দাও, তারপর সীজ্রান, সামারা—সারা ভল্গাই আমাদের হাতে এসে যাবে।..."

একটা পাতলা আবরণে ঢাকা পড়ে সূর্যাস্তের আকাশ। স্টীমারে কোনো বাতি জ্বলে না। নদীর পাড় যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাতের আঁধারে। নিজেকে নিয়ে কী করবে ঠিক করতে না পেরে খ্ভোদিন ইভান ইলিয়িচকে ডাকল তাস খেলতে।

"টাকা বাজি রেখে খেলতে না চাও তো এসো—যে হারবে তার নাকের ওপর চাপড়, এই বাজি রাখা যাক্। কিন্তু খাঁটি জিনিস হওয়া চাই!"

কাপ্তেনের কেবিনে বসে ওরা নাকে-চাপড় বাজি রেখে খেলতে লাগল। ঝোঁকের মাথায় খ্ভোদিন বেশি ডাক দিয়ে ফেলল,—উঠতে উঠতে একসঙ্গে একদম তিনশো চাপড় বাজি! খেলতে গিয়ে এমন পাগলা হয়ে গেছে যে প্রায় চুরি করবার জোগাড়। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ কড়া নজর রেখেছে, বলে : 'উঁহু ওটি চলবে না হে দোস্ত!' জিতে গেল তেলেগিনই। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে বেশ যুৎ করে বসে দোস্তের নাকের ওপর তেলতেলে তাসের গোছা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই খ্ভোদিনের নাকটা করমচার মতো লাল হয়ে উঠল।

"কোথায় শিখলে হে ভাই?"

"শিখেছিলাম যখন জার্মানদের হাতে বন্দী ছিলাম তখন।" বলল তেলেগিন : "আরে আরে বদন ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন! এই দু'-শো-সাতা-নব্বই।"

"খবরদার! তাস বাঁকানো চলবে না! যদি বাঁকাও তাহলে কিন্তু আমি..."

"বাজে বোকো না! এই শেষ তিনটে ঘাইয়ে ইচ্ছে করলে বাঁকানো চলে।"

"চালা তাহলে, শয়তান!"

কিন্তু তেলেগিন ঘা কষাবার আগেই কামরার মধ্যে এসে পড়লেন কাপ্তেন। ভয়ে ওঁর চোয়ালজোড়া কাঁপছে। হাতে টুপি। টাক মাথার ওপর থেকে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে।

"আপনারা আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন, কমরেড-মশাইরা," হতাশ হয়ে বললেন তিনি : "সবকিছুর জন্য আমি প্রস্তুত। কিন্তু যাই বলুন আমি কিছুতেই আর এগোচ্ছি না......নির্ঘাৎ মরতে হবে তাহলে।......"

তাসজোড়া ছুঁড়ে ফেলে খ্ভোদিন আর তেলেগিন ডেকের দিকে চলে গেল। সীজরানের ইলেকট্রিক বাতিগুলো দেখা যাচ্ছিল তারার মতো উজ্জ্বল, বাঁদিকে, সামনে। মস্তোবড় একটা ফেরি স্টীমার ধীরে ধীরে পাড় ঘেঁষে চলেছে; অসংখ্য আলোয় উজ্জ্বল স্টীমারটা—প্রকাণ্ড একটা সাদা 'সেণ্ট এণ্ড্রুজ' পতাকা উড়ছে মাস্তুলে, ভারি-ভারি কামানের ছায়ারেখাগুলো দেখলেও ভয় হয়; ডেকের ওপর অফিসারদের দেখা যাচ্ছে পায়চারি করতে। খোলা চোখেই এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু।......

"আমরা আর ফিরতে পারি না, কমরেডস্। যেমন করে হোক এগিয়ে যেতে হবেই," ফিসফিসিয়ে বলল খ্ভোদিন : "একেবারে সেই বাত্রাকি পর্যন্ত গিয়ে তবেই থামা চলবে, মাল নামানো চলবে।"

সমস্ত জাহাজীদের হুকুম দিল সে পাটাতনে জড়ো হতে,—লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে। প্রথমে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তারপর জ্বালানো হল আলো। এতক্ষণে বড়ো স্টীমার থেকে ওরা দেখতে পেয়েছে টাগবোটটাকে। ছোট-ছোট শিটির মারফত ওরা হুকুম জানালো, বেগ কমাও। মেগাফোনে কে যেন ভারিক্কি গলায় প্রশ্ন করল :

"তোমরা কে? কোথায় চলেছ?"

"টাগবোটের নাম 'কালাশ্নিকভ'। সামারায় চলেছি।"—পাল্টা জবাব দিল খ্ভোদিন।

"এত দেরিতে আলো জ্বাললে কেন?"

"বলশেভিকদের ভয়ে।" মেগাফোনের আওয়াজ নামিয়ে দিয়ে তেলেগিনের কানে-কানে বলল খ্ভোদিন : "উঃ, একটা টর্পেডো যদি থাকতো এই সময়! আস্ত্রাখানে খবর পাঠিয়েছিলাম টর্পেডো চেয়ে।......আর আস্ত্রাখানের সোবিয়েতে জুটেছেও একদল অপদার্থ!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওরা উত্তর দিল :

"চলে যেতে পারো।"

কম্পিত হাতে টুপি পরল কাপ্তেন। দাঁত বের করে, চোখদুটো ঘোঁচ করে খ্ভোদিন তাকিয়েছিল স্টীমারের আলোগুলোর দিকে। তারপর থুথু ফেলে ফিরে এল কেবিনে।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা দু'খণ্ড করল, তারপর ধমকানি লাগালো তেলেগিনকে : "এই হতভাগা, শেষ করলে না বাজিটা।"

ঘণ্টাখানেক বাদে সীজরান শহর পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে গেল অনেকটা। বাত্‌রাকির কাছাকাছি আসতে তেলোগিনকে নামিয়ে দেয়া হল ডিঙিতে। বাত্‌রাকি থেকে দুপুরের ট্রেন ধরে গোটা পাঁচেকের সময় তেলোগিন সামারা স্টেশনে এসে পৌঁছুল—সেখানে থেকে রওনা হল ডাক্তার বুলাভিনের ফ্ল্যাটের উদ্দেশে। লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেলের কাঁধ-পটি-লাগানো ছেঁড়া ভাঁজ-পড়া টিউনিকটা আবার সে গায়ে চাপিয়েছে। রাস্তায় যেতে যেতে যতো থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, নোটিস আর আবেদনপত্র চোখে পড়ে সবই ও পরম ঔৎসুক্যভরে পড়তে থাকে, যেন কতকাল সে দেখেনি এসব জিনিস, আর বেত দিয়ে ঠুকতে থাকে বুট জুতোর ডগা—এই বেতটা দিয়েই সে গত রাতে গেরিলা সেপাইদের জাগিয়েছিল ঘুম থেকে। বিজ্ঞাপন আর নোটিসগুলো সবই দুটো ভষায় লেখা : রুশ (প্রাক-সংস্কার যুগের বানানে) আর চেক।

লেমনেডের গ্লাস হাতে ডাক্তার দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্ বুলাভিন; ওয়েস্ট্-কোটের গলায় গোঁজা বড়ো রুমালখানা টেনে বের করে নিলেন তিনি, তারপর রাজকীয় ভংগীতে ঠোঁটদুটো চিবিয়ে-চিবিয়ে আরম্ভ করলেন বক্তৃতা, গলার স্বর সুগম্ভীর আর ব্যঞ্জনাময়, আণ্ডার সেক্রেটারির দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে তিনি সম্প্রতি এমনি ধরনের কণ্ঠস্বর আয়ত্ত করেছেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে অনুমতি দিন..."

পৌরসভার প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এটা একটা সম্বর্ধনা-সভা, উত্তরাঞ্চলে সংবিধানী ফৌজের সাফল্যমণ্ডিত অভিযান উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে এখানে। সিম্‌বির্‌স্ক্ আর কাজান দখল করা হয়েছে। মধ্য-ভল্‌গা এলাকা বুঝি শেষ পর্যন্ত একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেল বলশেভিকদের। মেলেকেস্ বলে একটা জায়গায় লাল অশ্বারোহী ফৌজের হতাবশিষ্ট অংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে। ওদের দলে তখন সাড়ে তিন হাজার সেনা। সম্মুখ-যুদ্ধে চেকরা কাজান দখল করেছে, সেখান থেকে লুঠ করেছে চব্বিশ-হাজার পুড সোনা অর্থাৎ ষাটকোটি রুব্‌লের চেয়েও বেশি যার দাম—রাষ্ট্রীয় স্বর্ণভাণ্ডারের অর্ধেকই চলে এসেছে চেকদের হাতে। ঘটনাটা এমনই অবিশ্বাস্য আর এমনই আশাতিরিক্ত যে এখনো ধারণা করে উঠতে পারা যাচ্ছে না এর গুরুত্ব কতো অপরিসীম!

সেই সোনা এখন আসছে সামারার দিকে। এখন পর্যন্ত অবশ্য কেউ নির্দিষ্টভাবে কোনো দাবি তোলেনি সোনাটার ওপর, তবে চেকরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করেছে, জিনিসটা সংবিধান-পরিষদের সামারা কমিটির সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া হোক। সামারার ব্যবসায়ী-সমাজ সোনাটার সদ্গতি সম্পর্কে যা-কিছু ভাববার নিজেরাই মনে-মনে ভেবে রেখেছে, প্রকাশ করেনি। বিজয়ী চেকদের প্রতি তাদের সুগভীর শ্রদ্ধা এখন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

সম্বর্ধনা সভায় যথেষ্ট ভিড়, রীতিমত জমজমাট। চেক বাহিনীর কম্যাণ্ডার কাপেতন চেচেক্ হলেন আজকের দিনের বাহাদুর বীর, তাঁকে কেন্দ্র করেই আজ

সামারার কলহাস্যমুখর সমাজ-ললনারা যেন তারার হাট বসিয়েছেন; ওঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতর তারকা হলেন আর্জানোভা, কুর্লিনা আর শেখোভালোভা। শেষোক্ত জন আবার পাঁচ-মহলা মিলঘর, এলিভেটর, আর জাহাজ কোম্পানীর মালিক, গোটা একেকটা অনাবাদী কালোমাটির অঞ্চল তাঁর হাতে। এঁদের প্রত্যেকের কানে-গলায় দুলছে হীরা, আকারে একেকটা আখরোট-বাদামের মতো; আর গাউন যা পরেছেন তা হালফ্যাশানের না হলেও, সেগুলো যে সে-যুগের প্যারিস-ভিয়েনার জিনিস তা দেখলেই বোঝা যায়। সব বীরের মতো কাপ্তেন চেচেকও সরল আর সুবিনীত, আর তাই আকর্ষণীয়ও বটে। ওঁর পেশীবহুল দেহটা হয়তো একটু বেশিরকম উষ্ণ, আর নির্ভুলভাবে-ছাঁটা টিউনিকের আঁটসাঁট কলারটা হয়তো একটু বেশি ঢুকে গেছে ওঁর লাল গর্দানের মধ্যে,—তাহলেও ওর ছোট, লালচে-গোঁফ আর উজ্জ্বল চোখ-ওয়ালা উদ্ভাসিত তরুণ মুখটার মধ্যে যেন চুম্বনের আহ্বান—দুটো গালই যেন উন্মুখ হয়ে আছে। ওঁর ঠোঁটের ওই পাগল-করা হাসিটা যেন কোনোকালেও মুছবে না, যেন নিজের বলতে ওঁর যা-কিছু মহিমা,—সব ত্যাগ করে বসে আছেন উনি, ওঁর কাছে বুঝি বিজয়ের উন্মাদনার চাইতেও নারী-সমাজের এই সান্নিধ্যের দাম হাজারগুণ বেশি, মফঃস্বল শহর আর সোনাভর্তি ট্রেন দখলের চাইতে এ বুঝি ওঁর কাছে অনেক বেশি কাম্য।

কাপ্তেনের উল্টোদিকে বসে আছেন ভারিক্কি চেহারার মধ্যবয়েসী একজন সামরিক ব্যক্তি। গলায় উর্দির সাদা এগ্‌লেট। ডিমের খোলার মতো মাথাটা চাঁচাছোলা, প্রকাণ্ড, শাসকসমাজের স্তম্ভস্বরূপ। মেদবহুল, পরিষ্কার-কামানো মুখটার মধ্যে সবচেয়ে নজরে পড়ার মতো জিনিস হল তাঁর পুরু ঠোঁটজোড়া: কখনো জাবর-কাটা বন্ধ করেন না, ভুরুজোড়াও হরদম কোঁচকাচ্ছেন আর টান করছেন, আর চোখদুটো ঘুরঘুর করছে টেবিলের চর্বচোষ্য নানা খাদ্যসম্ভারের ওপর। প্রকাণ্ড হাতের থাবার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে এত্তটুকুন মদের গেলাস,—বেশ বোঝা যায় ও হাত-জোড়া জগের মতো বড়ো-বড়ো গেলাস ধরতেই অভ্যস্ত। ছোট-ছোট চুমুক দিয়েই মাথাটা হেলিয়ে দিচ্ছেন পেছনে। খুদে-খুদে ধূর্ত নীল চোখ কারুর ওপরই বেশিক্ষণ থাকে না, যেন সব সময়ই উনি সতর্ক হয়ে আছেন এখানে। অন্যান্য সামরিক কর্মচারীরা সম্ভ্রমাত্মক মনোযোগের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথা শুনছেন। উনি হলেন ওরেনবুর্গের আতামান দুতভ্‌, উরাল কসাকদের নেতা। সবে পদধূলি দিয়েছেন সামারায়।

কয়েকটা আসন বাদেই দুটি সুন্দরী মহিলার মাঝখানে বসেছেন মসিয়ে জানো, ফরাসী রাষ্ট্রদূত। মহিলা দুটির একজনের চুল সোনালি, আরেকজনের বাদামী। রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের পরনে হালকা ধূসর লাউঞ্জ স্যুট আর ধবধবে সাদা শার্ট। সুন্দর গোঁফ আর তীক্ষ্ণ নাকওয়ালা ছোট্ট মুখটার মধ্যে চূড়ান্ত অনাচারের চিহ্ন। 'র'গুলো 'র্‌-র্‌'-এর মতো করে উনি অনর্গল বকে চলেছেন, কখনো ঝুঁকছেন বাদামী-চুলো মহিলাটির সুপ্রকাশিত দেহসুষমার ওপর (সেও তাঁকে পুরস্কার দিচ্ছে হাতের ওপর ফুলের ঠোনা মেরে), আবার কখনো ঝুঁকছেন সোনালী-চুলো

মহিলাটির মুক্তা-গোলাপী কাঁধের ওপর, মঁসিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছেন এমনিভাবে সে হেসে উঠছে খিলখিল্ করে। দুজনই ফরাসী বোঝে, তবে বেশি তাড়াতাড়ি বললে নয়। বেচারী মসিয়ে জানো যে মরিয়া হয়ে দুদুটো মোহিনীমায়ার ফাঁদে পড়ে গেছেন তা সুস্পষ্ট। কিন্তু তাই বলে, বিশ্রম্ভালাপে একটু ভাঁটা পড়লে তাঁর যে অসুবিধে হয় তা নয়, সংগে সংগে তিনি ফেরেন নির্ভেজাল ময়দা-কলের ব্যবসায়ী ব্রিকিনের দিকে। ব্রিকিন সদ্য এসেছে ওম্স্ক্ থেকে। কিংবা দরকার পড়লে আতামান দুতভের দেদীপ্যমান কীর্তির উদ্দেশে স্বাস্থ্যপানও করে নিতে পারেন মসিয়ে জানো। সাইবেরীয় গম আর ওরেনবুর্গের মাখন-মাংসের দিকে মসিয়ের সবিশেষ আগ্রহ শ্বেতরক্ষী-আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠারই পরিচয় দেয় : খাদ্যসংকটের সময় গভর্নমেণ্টকে পঞ্চাশ গাড়ি ময়দা অথবা অন্য খাদ্যসামগ্রী দেবার জন্য ফরাসী দূত যে-কোনো মুহূর্তেই প্রস্তুত।......তবে অনেক নিন্দুক ব্যক্তি আছে যারা প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়, যে-কোনো স্বাভাবিক গভর্নমেণ্ট যেমন করে থাকে তেমনিভাবে মঃ জানোকেও তাঁর দৌত্য-সংক্রান্ত কাগজপত্র হাজির করতে বললে ক্ষতি কী?......কিন্তু এসব ঝামেলার চেয়ে মিত্রদের প্রতি আস্থা স্থাপন করার সুকৌশলী কর্মপন্থাই গভর্নমেণ্ট আরো বেশি পছন্দ করেন।

বিদেশী অতিথিদের মধ্যে আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বসেছিলেন টেবিলে— সিনর পিচ্চলোমিনি (এইটেই যে তাঁর আসল নাম তা তিনি হলপ করে বলতে পারেন)। গায়ের রং তামাটে, চোখ দুটো সর্বদাই চঞ্চল। ঠিক স্পষ্টভাবে বলা যায় না, তবে তিনি নাকি ইতালীয় জাতি আর ইতালীয় জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। রুপালি ব্যাণ্ড্-বসানো আশমানী রঙের উর্দি গায়ে, কাঁধের ওপর ওঠা-নামা করছে জেনারেলদের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রতীকচিহ্ন। সামারায় উনি নাকি একটা বিশেষ ইতালীয় ব্যাটালিয়ন গড়ে তুলছেন। গভর্নমেণ্টও মাঝে মাঝে বিস্ময় প্রকাশ করেন : 'এখানে উনি ইতালীয় পাবেন কোথা থেকে ভগবান জানেন', কিন্তু তবু গভর্নমেণ্ট তাঁকে অর্থসাহায্য দিতে কসুর করেন না। হাজার হলেও, মিত্র যাঁরা তাঁরা মিত্রই!... বুর্জোয়া সমাজে কিন্তু তাঁর দিকে কেউ বড়ো একটা নজরও দেয় না।

ভোজসভায় একমাত্র সরকারী প্রতিনিধি হলেন ডাঃ বুলাভিন আর সেমিয়ন সেমিয়নোভিচ গভিয়াদিনের মতো পার্টি-নিরপেক্ষ লোকেরা। গভিয়াদিন এখন সরকারী কর্মচারীমহলের উচ্চ শিখরে উঠেছেন, পালটা-গুপ্তচরবিভাগের তিনি এখন সহকারী হর্তাকর্তা। বলশেভিকদের উৎখাত করার সময় যে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যম দেখা গিয়েছিল তা এখন নেই। সংবিধানী পরিষদ কমিটির সদস্যরা সবাই সোশালিস্ট-রিভলিউশনারী (এস্-আর) বাস্তুঘুঘু—বিপ্লবের 'সার্থক ফলাফল' ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা যে হৈচৈ শুরু করলেন তাতে অবশ্য শুধু চেকরাই ভুল বুঝেছিল, কারণ রুশদেশের ব্যাপারাদি সম্পর্কে তাদের নাড়ি-নক্ষত্র জ্ঞানের অভাব। প্রথম পর্যায়ে যখন রাতারাতি ক্ষমতাদখলের প্রশ্ন ছিল, আর প্রয়োজন ছিল চাষী মজুরদের ঠাণ্ডা রাখবার, এস্-আর সরকার তখন যেন সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেরিত প্রতিষ্ঠান। সামারার ব্যবসাদাররা পর্যন্ত এস্-আরদের গলায় গলা

মিলিয়ে শ্লোগান ঝাড়তে লাগল। কিন্তু তারপর তো ভল্‌গা এলাকা উদ্ধার করা গেছে খ্‌ভালিন্‌স্ক্‌ থেকে কাজান অবধি। দেনিকিন ছিনিয়ে নিয়েছেন গোটা উত্তর ককেসাস, ক্রাস্‌নভ এসে পড়েছেন জারিৎসিনের কাছাকাছি, দুতভ্‌ সাফ করে ফেলেছেন উরালের তল্লাট, সাইবেরিয়ায় রোজই নতুন নতুন জাঁদরেল শ্বেতরক্ষী আতামানের আবির্ভাব হচ্ছে—আর ঠিক এমনি সময় কিনা সামারার 'অভিজাত-প্রমুখ' ('মার্শাল অব নোবিলিটি')-প্রাসাদের জমকালো ঘরে বসে ঐ লম্বা-চুলো বাউন্ডুলে ভল্‌স্কি-ব্রুশ্‌ভিৎ-আর-ক্লিুশ্‌কিনের দল সংবিধানী পরিষদের জন্য হেঁদিয়ে মরছে! ফুঃ! সামারার মোটা-মোটা ব্যবসাদাররা ভাল করেই জানে কী করতে হবে, ওরা তাই সম্পূর্ণ আলাদা আওয়াজ তুলেছে,—বুঝতে সহজ, কোনো কারচুপি নেই, আর বেশ জোরদারও বটে।......বিদেশী অতিথিদের সামনে ডাঃ দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌ও অনেকটা এমনি ধরনের কথাই বলছিলেন :

"...গোখরো সাপের বিষদাঁত তুলেছি আমরা। এই অভূতপূর্ব ঘটনার তাৎপর্য কিন্তু ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করেনি কেউ, অথচ এই ঘটনাটাই একটা নতুন যুগের সূচনা করছে......আমি সেই ষাটকোটি টাকার সোনার কথাই বলছি, ঐ সোনা বর্তমানে আমাদের হাতে এসে গেছে......" (মঃ জানোর গোঁফের প্রান্ত উঁচু হয়ে উঠল। গেলাস নেড়ে বললেন : "বাহবা!" পিচ্চোলোমিনির চোখদুটো জ্বলতে লাগল শয়তানের মতো)। "ভদ্রমহোদয়গণ, বলশেভিকদের সোনার বিষদাঁত উপড়ে নিয়েছি এবার।......ওরা এখনো কামড়াতে পারে, কিন্তু সে কামড়ের আর জোর রইল না। ওরা এখনো শাসাতে পারে, কিন্তু লোকে আর ভয় করবে না ওদের, ঠিক যেমন খোঁড়া ভিখিরীর লাঠি-নাচানো দেখে কেউ ঘাবড়ায় না।...ওদের হাতে এখন একভরিও সোনা নেই—আছে শুধু একটা নোট ছাপবার যন্তর।"

ওম্‌স্কের ব্যবসায়ী ব্রিকিন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন দাঁত বের করে, রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বললেন : "কী কাণ্ড! হে ভগবান!"

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আছেন"—ডাঃ বুলাভিন বলে চললেন, গলার স্বরে এবার একটা খন্‌খনে ভাব এসেছে : "আপনারা যাঁরা আমাদের মিত্র,......মনে রাখবেন—বন্ধুত্ব হল এক জিনিস, আর টাকা হল অন্য।......কাল পর্যন্ত আপনাদের চোখে আমরা ছিলাম যাত্রাগানের দলবিশেষ, সাময়িকভাবে গজিয়ে-ওঠা একটা সংগঠন,—ঘুষি মারার সঙ্গে সঙ্গে কোনো জায়গা যেমন ফুলে ওঠে অনেকটা তেমনি।......" (চেচেক ভ্রুকুটি করলেন মঃ জানো আর পিচ্চোলোমিনি রাগত ভঙ্গী করলেন......দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ হাসলেন তির্যকভাবে।) "আজ সারা দুনিয়ার লোক জানে যে আমাদের সরকারের বনিয়াদ এখন শক্ত, তারা জানে, আমরা এখন রাষ্ট্রের স্বর্ণভাণ্ডারের রক্ষক।......এখন নিশ্চয় আমরা একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আসতে পারি, কি বলেন বিদেশী প্রতিনিধি বন্ধুরা......" (টেবিলের ওপর সজোরে গাঁট্টা মারলেন ডাক্তার) "এখন আমি কথা বলছি সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে সাধারণ ব্যক্তিদেরই সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতার আবহাওয়ার মধ্যে। কিন্তু যে মতামত আমি এখানে ব্যক্ত করেছি তার গুরুত্ব সম্পর্কে আমার

ধারণা পরিষ্কার।......আমি আজ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, গুলিগোলা আর কাপড় বোঝাই জাহাজ এসে লাগছে রাশিয়ার বন্দরে......লাখ লাখ শ্বেতরক্ষী ফৌজ দাঁড়িয়ে গেছে সার বেঁধে......রাশিয়ার ওপর যারা এখন মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে সেই বদমায়েসদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে প্রতিশোধের জবরদস্ত্ খাঁড়া। এর জন্য ষাট কোটিই যথেষ্ট।......বিদেশী প্রতিনিধিগণ! আমরা চাই সাহায্য, রুশ জনগণের আইনসম্মত প্রতিনিধিদের জন্য ব্যাপক, অকৃপণ সাহায্য!"

গেলাসের কিনারায় ঠোঁট ঠেকালেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ, তারপর আসন গ্রহণ করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন আর ভুরু কোঁচকাতে লাগলেন। টেবিল ঘিরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সবাই উৎসাহে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন তাঁকে। ব্যবসায়ী ব্রিকিন চেঁচিয়ে উঠলেন :

"ধন্যবাদ, বন্ধু......ঠিক বলেছেন আপনি, একেবারে খাঁটি কথা—আমাদের পথ, সমাজতন্ত্র নয়......"

চেচেক উঠে ভুঁড়ির ওপর হ্যাঁচকা-টানে বেল্ট্‌টা কষে নিলেন।

"সামান্য দুটো কথা বলব আমি," বললেন চেচেক : "আমরা আমাদের সহোদর ভাই রুশদের মংগলের জন্য জীবন দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দিতে থাকব। মহান রাশিয়া, পরাক্রান্ত রাশিয়া জিন্দাবাদ!......হুর্‌রে!"

সারা টেবিলটা এবার ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে। ফুলের আড়াল থেকে সামনে হাত বাড়িয়ে মেয়েরা প্রাণপণে তালি দিতে লাগলো। মঃ জানো বলতে উঠলেন। মহনীয় ভংগিতে মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে রইলেন তিনি, গোঁফের সুপ্রাচুর্যে তাঁর চেহারাটার মধ্যে একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভাবও ফুটে উঠেছে :

"মেদাম এ মেসিয়! আমরা একথা নিশ্চিত জানি যে, রাশিয়ার বীর সেনাবাহিনী তাদের মহান্ পূর্বপুরুষদের গৌরবের কথা বিস্মৃত হয় নি, যদিও একদল বলশেভিক ডাকাত তাদের ধূর্তের মতো ভোলাতে চেষ্টা করেছে। বলশেভিকরা এই মহান্ বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়েছে অস্বাভাবিক ধারণা আর হিংস্র প্রবৃত্তি, ফৌজের আর ফৌজত্ব থাকেনি। মেদাম এ মেসিয়! আমি লুকোবার চেষ্টা করব না—একসময় একটা মুহূর্ত এসেছিল যখন রুশ জনসাধারণের ওপর ফ্রান্স তার আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।...সে দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে।...আজ বুঝতে পারছি আমরাই ভুল করেছিলাম—রুশ জনসাধারণ আমাদের সংগেই রয়েছে। ...ইতিমধ্যেই ফৌজের চেতনা হয়েছে, ভুল বুঝতে পেরেছে সে।...বিশাল রাশিয়া আবার খাড়া হয়ে উঠেছে আমাদের উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে।...আমার এই পুনর্লব্ধ আস্থার জন্য আমি আজ সুখী।..."

হাততালির আওয়াজ ঠাণ্ডা হয়ে আসতেই, পিচ্চলোমিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভারি ভারি পদকচিহ্নগুলো দুলতে লাগল। কিন্তু যেহেতু সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে ইতালীয় ভাষার জ্ঞান কারুরই ছিল না, তাই সকলে আন্দাজ করে নিলেন ওঁর 'সদিচ্ছার' কথা; ব্যবসায়ী ব্রিকিন তো ছুটে গিয়ে খর্বাকৃতি লোকটির তামাটে গালের ওপর চুমুই খেয়ে বসলেন। এরপর পুঁজিদারদের প্রতিনিধিরা এক এক করে

বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ধোঁয়াটে দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যবসাদাররা তাদের বক্তব্য উপস্থিত করলেন—একমাত্র সাইবেরিয়ার দিক থেকেই মুক্তি আসতে পারে, এই কথাটিই তাঁরা জোর দিয়ে বোঝালেন।...প্রত্যেকের বলা হয়ে যাবার পর আতামান দুতভ্‌কে সাধা-সাধি করা হল কিছু বলার জন্য। প্রথমে তিনি গররাজি ভাব দেখালেন। বললেন : "না, না, ভাই, আমি হলাম সৈনিক মানুষ, বক্তৃতা কেমন করে দিতে হয় তা কি আর আমি জানি!" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিরাট দেহটা নিয়ে দাঁড়াতেই সবাই চুপ করে গেল। ফোঁস ফোঁস করে বলতে লাগলেন ঃ

"ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের মিত্ররাষ্ট্ররা যদি সাহায্য করেন—তো ভাল কথা! আর যদি না করেন—তাহলে আমরা নিজেরাই বলশেভিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করে নেব।......যতক্ষণ হাতে টাকা রয়েছে।...আশা করি আপনারাও এ-ব্যাপারে আমাদের ডানা কেটে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবেন না, ভদ্রমহোদয়গণ!"...

"আমাদের কাছ থেকে যা খুশি নিতে পারেন, আতামান, আমাদের কোনো আপশোস নেই!" আনন্দের আতিশয্যে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রিকিন।

সভার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করা হল কালো কফি। বিদেশী ব্রান্ডি আর লিকারও আছে। অনেক দেরি হয়ে গেল। এক ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে এলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ, কাউকে বিদায়-সম্ভাষণও জানালেন না।

মোটরগাড়ি থেকে নেমে সবে বাড়ির সামনের দরজাটা খুলেছেন এমন সময় একজন অফিসার দ্রুতবেগে ছুটে এল তাঁর দিকে ঃ

"মাফ করবেন,—আপনি কি ডাক্তার বুলাভিন?"

আগন্তুকের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ। রাস্তা অন্ধকার, শুধু লেফটেন্যান্ট-কর্নেলের কাঁধপটি দুটো নজরে পড়ল তাঁর। বিড়বিড় করে ডাক্তার বললেন ঃ

"হ্যাঁ, আমিই বুলাভিন।"

"খুব জরুরি কাজে আপনার কাছে এসেছি।...জানি এসময় আপনি কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না।...কিন্তু আমি তিন-তিনবার এসে আপনার খোঁজ না পেয়ে ফিরে গিয়েছি।"

"কাল এগারোটার পর মন্ত্রী-পরিষদের বাড়িতে যাবেন।"

"আজকেই যেমন করে হোক ব্যবস্থা করুন, আমার একান্ত অনুরোধ। রাতের স্টীমারেই চলে যেতে হবে আমাকে।"

জবাব দেওয়ার আগে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ। এই অপরিচিত লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা জবরদস্তির ভাব, আতঙ্ক জাগায় মনে। ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন।

"আমি আপনাকে আগেই জানিয়ে দিচ্ছি—যদি অর্থসাহায্যের জন্য এসে থাকেন, সেটি হবে না, সে ব্যাপারে আমার হাত নেই।"

"না, না, আমি কোনো সাহায্যের জন্য আসিনি।"

"হুম্...তাহলে আসুন।"

আগন্তুকের আগে-আগে দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ হলঘর পেরিয়ে পড়বার-ঘরে ঢুকলেন। বাড়ির ভেতরের দিকে যাবার দরজা তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ করে দিয়েছেন। ভেতরে কোথায় যেন একটা আলো জ্বলছে, নিশ্চয় কেউ জেগে আছে এখন পর্যন্ত। ডেস্কের সামনে বসে ডাক্তার হাত নেড়ে ইশারা করে আগন্তুককে বললেন উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসতে। তারপর স্বাক্ষরের জন্য জড়ো-করে-রাখা কাগজের স্তূপের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিমর্ষভাবে, দু'হাতের আঙুল একজায়গায় করে।

"বলুন—আপনার জন্য কী করতে পারি?"

অফিসার তার টুপিটা বুকে ঠেকিয়ে নরম করুণ গলায় আস্তে আস্তে বলল ঃ

"দাশা কোথায়?"

চেয়ারের কারুকাজ-করা পিঠে ধপ্ করে মাথার পিছনদিকটা ঠেকালেন ডাক্তার। এই প্রথম নজর করে দেখলেন আগন্তুকের মুখখানা। দু'বছর আগে দাশা একটা ফটো পাঠিয়েছিল, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে তোলা। এই তো সে। ডাক্তার যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন, চোখের নিচে ফোলা জায়গাদুটো কেঁপে উঠল। ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্ করে প্রতিধ্বনি করলেন ঃ

"দাশা?"

"হ্যাঁ, আমিই তেলেগিন।"

ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে ও-ও যেন এতটুকু হয়ে গেল। নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন ডাক্তার। জীবনে এই প্রথম তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে দেখা অথচ তাকে স্বভাবত যেভাবে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার কথা, তা না করে ডাক্তার বুলাভিন নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতটা ছুঁড়ে গলা থেকে এমন একটা অস্ফুট আওয়াজ বের করলেন, যেন হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন।

"ও তুমিই তাহলে...তেলেগিন! তা বেশ তো, তোমার নিজের খবর কী বল।"

বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি এত অবাক হয়ে গেছেন যে ইভান ইলিয়িচের সঙ্গে করমর্দন করার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। নাকের গোড়ায় প্যাঁশ্নেটা সোজা করে এঁটে (আগের সেই ভাঙা নিকেল ফ্রেমের পুরনো-জোড়া নয়, এখনকারটা বেশ চমৎকার, সোনার রীম-ওয়ালা) কি জানি কী কারণে তিনি তাড়াতাড়ি ডেস্কের দেরাজগুলো খুলতে লেগে গেলেন। অসংখ্য কাগজপত্রে ঠাসা সেগুলো।

তেলেগিন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে খানিকটা। অবাক হয়ে ও লক্ষ্য করতে লাগল ডাক্তারের আচরণ। এক মিনিট আগেও ও তৈরি ছিল ডাঃ বুলাভিনকে নিজের সব কথা খুলে বলার জন্য, নিজের বাপের খবরও বলতে পারত সে।...... কিন্তু এখন ও ভাবল ঃ কে জানে—বোধহয় সন্দেহ-টন্দেহ করেছেন।......আমি বোধহয় ওঁকে একটু বিপদে ফেলে দিয়েছি; হাজার হলেও মন্ত্রী মানুষ তো......। মাথা নিচু করে ও খুব মিহি গলায় বলল ঃ

"দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ, ছ' মাসেরও বেশি হয়ে গেল দাশাকে দেখতে পাইনি, চিঠিপত্রই পাই না।...ও যে এখন কোথায় আছে তাও কিছু জানি না।"

"সে বেঁচে আছে, মরেনি। ভালই আছে।"

ডাক্তার তখন নিচু হয়ে একেবারে ডেস্কের তলায় চলে গেছেন। একেবারে শেষ দেরাজটা দেখছেন।

"আমি এখন ভলান্টিয়ার বাহিনীতে আছি।......সেই মার্চ মাস থেকে লড়ছি বলশেভিকদের সঙ্গে।...এই এবারই আমাকে ওরা সদরদপ্তর থেকে পাঠিয়েছে উত্তরে, একটা বিশেষ গোপন কাজে।"

দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্ যেন নির্বাক বিস্ময়ে শুনে গেলেন ওঁর কথাগুলো; 'গোপন কাজ' কথাটা শুনেই তাঁর গোঁফের তলায় একটা সূক্ষ্ম হাসি এসে আবার মিলিয়ে গেল।

"ও—হো, তা তোমার রেজিমেন্টটির নাম কী শুনি?"

"প্রাইভেট্স্।"

তেলেগিন অনুভব করল ওর মুখে যেন রক্ত ছুটে আসছে।

"ও—হো, তাহলে ভলান্টিয়ার বাহিনীতে ওই রকম একটা জিনিস রয়েছে! তুমি কী বেশ কিছুদিন কাটাবে নাকি এখানে?"

"আজ রাতেই চলে যাচ্ছি।"

"ভাল কথা। তা কোথায় যাচ্ছ জানতে পারি কি? মাপ করবে—ও তো আবার সামরিক গোপনীয়তার ব্যাপার, থাক্ শুনে কাজ নেই।......বলছিলাম কী—পাল্টা গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার নাকি?"

এমন একটা অদ্ভুতকণ্ঠে বললেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ যে, দারুণ উত্তেজনা সত্ত্বেও সেটা তেলেগিনের নজর এড়ালো না। ও তাই সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল।

কিন্তু ডাক্তার এতক্ষণ ধরে যে জিনিসটা খুঁজছিলেন সেটা এবার পেয়ে গেছেন।

"তোমার স্ত্রীর শরীর তো ভালই আছে।...গেল হপ্তায় এ চিঠিখানা পেয়েছি পড়েই দেখ না। তোমার সম্পর্কেও দু'য়েকটা কথা আছে।" (দাশার গোটা-গোটা হাতের-লেখাওয়ালা একতাড়া কাগজ ছুঁড়ে দিলেন তেলেগিনের সামনে। আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোর মূল্য অনেক, তেলেগিনের চোখের সামনে সেগুলো যেন পাক খেয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল।) "কিছু মনে কোরো না, তোমায় একটু একা থাকতে হবে খানিকক্ষণ। আরাম করেই বসো না!"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। পেছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ওঁর শেষ যে কথাটা তেলেগিনের কানে এল সেটি বাড়িরই কাউকে উদ্দেশ করে বলা: "...কিছু না, এই একজন চাকরীর খোঁজে এসেছে।"

খাবার-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ডাক্তার ঢুকলেন একটা অন্ধকার প্যাসেজের মধ্যে। সেখানে ছিল সাবেকী ধরনের একটা টেলিফোন। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে

টেলিফোনের হাতলটা ঘুরিয়ে ডাক্তার নিচুগলায় একটা নম্বর চাইলেন—পাল্টা গোয়েন্দা-বিভাগের নম্বর, তারপর সেমিয়ন সেমিয়নোভিচ গভিয়াদিনকে ডাকলেন স্বয়ং এসে টেলিফোন ধরবার জন্য।

কপিং-পেন্সিল দিয়ে চিঠিটা লিখেছিল দাশা; হাতের লেখা ক্রমান্বয়ে মোটা-মোটা হয়ে উঠেছে, লাইনগুলোও ক্রমে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

"বাবা, জানি না আমার কী হবে শেষ পর্যন্ত।...আগেও যেমন সবকিছু অস্পষ্ট ছিল, এখনো তেমনি রয়ে গেল।...তুমিই একমাত্র লোক যাকে আমি লিখতে পারি। আমি এখন কাজানে আছি। হয়তো কালই রওনা হব, কিন্তু জানি না তোমার ওখানে পৌঁছুতে পারব কিনা। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তুমিই বুঝবে আমার সব কথা। তুমি আমায় যা করতে বলবে তাই করব।...আমি যে বেঁচে রয়েছি সেইটেই আশ্চর্য।...আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় গেছে তারপর আর না বাঁচলেই হয়তো ভালো হত।...যা কিছু ওরা আমায় শুনিয়েছে সব ডাহা মিথ্যে, ঘৃণ্য জোচ্চুরি।...এমন-কি নিকানর যুরেভিচ্ কুলিচকও ঐ পদের।...আমি লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম, মস্কোতে যাবার জন্য আমায় সাধাসাধি করেছিল—মেনে নিয়েছিলাম। (দেখা হলে সব কথা খুলেই বলব।) এমন-কি তার মতো লোকও গতকাল আমায় এমনি ধরনের সব কথা বলেছে ঃ 'ওরা গুলি করে মানুষ মারছে, ডজনে-ডজনে পুঁতে ফেলছে মাটির নিচে...মানুষের জীবনের কী দাম? একটা বুলেটের সমান তো? সারা দুনিয়াটা ডুবে যাচ্ছে খুনখারাপিতে, আর তুমি কিনা ভাবছ তোমার সঙ্গে আমরা আদিখ্যেতা করতে যাব! আর কেউ হলে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আর কষ্ট করে আলাপ করতে যেত না—সোজা হুকুম করতো—বিছানায় চলো।' আমি তখন রুখে দাঁড়ালাম, সত্যি সত্যিই রুখে দাঁড়ালাম বাবা।...এক গেলাস মদ গিলে আমায় নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা হবে এ আমি সহ্যও করতে পারব না। আমার যদি এতই অধঃপতন হয়ে থাকে তাহলে আর বাকি রইল কি? এইখানেই তাহলে ঘুচে যাবে সব—ফাঁসি দিয়ে মরলেই বা তখন ক্ষতি কী। যাতে সত্যিকারের কোনো কাজে লাগতে পারি এমন চেষ্টাও করেছি। রেডক্রসের নার্স হিসেবে ইয়ারোস্লাভ্লে তিনদিন দৌড়োদৌড়ি করেছিলাম গুলি-গোলার নিচে। রাতে যখন নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়েছি, হাত কাপড় সব রক্তে ভেসে গেছে। একবার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি কে যেন আমার স্কার্টটা তুলবার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম। একেবারে নেহাৎই ছোকরা একজন অফিসার। তার মুখটা আমি জীবনে ভুলব না! একেবারে বুনো জানোয়ার হয়ে গেছে তখন, কব্জি চেপে ধরে আমাকে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলল নিচে, মুখে একটি কথাও নেই। শুয়োরটাকে তখন আমি গুলি করলাম, বাবা,—ওরই নিজের রিভলবার দিয়ে—কি করে কি ঘটে গেল তা এখন ভাবতেও পারি না।...বোধ হয় পড়ে গিয়েছিল লোকটা, আমি তখন কিছুই দেখিনি, কিছু মনেও নেই আমার।...ছুটে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। আকাশটা লাল, শহরে আগুন লেগেছে, গোলা ফাটছে।

...জানি না কেন পাগল হয়ে যাইনি সে রাতে। তখনই ঠিক করলাম, ছুটে পালিয়ে যাব যেমন করে হোক।...আমি চাই তুমি আমার কষ্টটা বোঝো, আমায় সাহায্য করো।...রাশিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হবে আমাকে! আমি একটা সুযোগও পেয়ে গেছি।...তোমাকে শুধু সাহায্য করতে হবে যাতে কুলিচকের হাত থেকে আমি রেহাই পাই। লোকটা সব সময় আমার পেছনে লেগে আছে। মানে আমাকে হরদম টেনে নিয়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, আর প্রতি রাতেই তার মুখে সেই এক কথা। কিন্তু আমি হার মানব না, যদি আমায় সে খুন করে, তবুও না।..."

ইভান ইলিয়িচ থামল। একবার নিঃশ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে উলটালো পাতা।

"একেবারে আকস্মিকভাবেই কতগুলো দারুণ দামী জিনিস আমার হাতে এসে গেছে।...'নিকিৎস্কি গেটে' একটি লোক আমার সামনেই ট্রামে চাপা পড়ে মারা যায়। সে মরেছিল আমারই জন্য, তা আমি জানি।...যখন আমার খেয়াল হল, দেখি একটা কুমীরের চামড়ার ব্রীফকেস্ আমার হাতে : সামনে আমাকে দেখতে পেয়ে কেউ নিশ্চয় হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল কোন্ ফাঁকে।...পরের দিন যখন জিনিসটা খুলেছি, দেখি হীরা আর মুক্তার অলঙ্কারে ঠাসা। এগুলি নিশ্চয় চুরি করেছিল লোকটি।...আমার সঙ্গেই দেখা করতে আসছিল সে।...তার মানে আমার জন্যই চুরি করেছিল, তাই না? বাবা, আমি আর ব্যাপারটার ভালোমন্দ কিছু বিচার করি নি,—রেখে দিয়েছি সঙ্গে।...ওগুলোই আমাকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি এনে দেবে।...তুমি যদি আমাকে বুঝিয়েও দাও যে আমি চুরি করেছি, তবু হাত-ছাড়া করতে চাই না জিনিসগুলো।...জীবনে আমি এত মৃত্যু দেখেছি যে আমি বেঁচে থাকতেই চাই।...মনুষ্যত্বের প্রতিমূর্তিতে এখন আর আমার আস্থা নেই।... এইসব চমৎকার চমৎকার লোক যারা স্বদেশের মুক্তি সম্পর্কে নানা গালভরা কথা বলে থাকে, এরা সবাই হল বীভৎস জানোয়ার, শুয়োরের দল।......নিজের চোখেই দেখেছি তো অনেক কিছু! ভগবানের অভিশাপ লাগুক এদের ওপর! ব্যাপার যা ঘটেছিল বলছি : একদিন অনেক রাত করে আমার ঘরে এল নিকানর য়ুরেভিচ্ কুলিচক, বোধহয় সিধে পেত্রোগ্রাদ থেকে এসেছিল। ওর সঙ্গে মস্কো যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল আমাকে। 'চেকা'র লোকেরা নিশ্চয়ই 'স্বদেশ-মুক্তি সংঘের' গোপন চক্রান্ত ধরে ফেলেছে, মস্কোতে একধার থেকে পাইকিরি গ্রেপ্তার চলছে। সাভিনকভ তাঁর দলবল নিয়ে ভেগে পড়েছেন ভল্‌গার দিকে। তারা নাকি রীবিন্‌স্ক্, ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ আর মুরোম-এ বিদ্রোহ ঘটাবে। এখন সবাই হুড়মুড় করে লেগে গেছে : ফরাসী রাষ্ট্রদূত নাকি আর টাকা দেবেন না, তিনি নাকি বলেছেন সংঘের কী জোর আছে তার বাস্তব প্রমাণ দেখতে চাই। ওরা নাকি আশা করছে দেশের সমস্ত চাষীকে ওরা নিজেদের দলে টানতে পারবে। নিকানর য়ুরেভিচ্ আশ্বাস দিলেন, বলশেভিকদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—গোটা উত্তরাঞ্চল জুড়ে, উত্তর-ভল্‌গার সমস্ত জেলায় নাকি অভ্যুত্থান হবে, চেকদের সঙ্গে ওরা হাত মেলাবে। কুলিচক বলল, সংগঠনের তালিকায় নাকি আমার

নামও পাওয়া বেছে। সুতরাং মস্কোতে থাকা এখন আমার পক্ষে বিপজ্জনক, ওর সংগে ইয়ারোস্লাভ্‌লে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

"ওখানে সবই তৈরি ছিল আগে থেকে : ফৌজ, মিলিশিয়া আর অস্ত্রাগারের বাছা-বাছা পদগুলো আগেই ওদের নিজেদের লোকেরা দখল করে বসেছিল।...... সন্ধ্যের দিকে আমরা পেঁাছলাম সেখানে। ভোর থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল বন্দুকের আওয়াজে।...জানলার কাছে ছুটে গেলাম।...সামনেই একটা উঠোন, উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে গ্যারেজঘরের ইটের দেয়াল আর আস্তাকুঁড়। ফটকের কাছে ঘেউ-ঘেউ করছে কয়েকটা কুকুর।...বন্দুকের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নীরব নিস্তব্ধ। দূরে শুধু দু'একটা গুলির আওয়াজ আর মোটর বাইকের বিশ্রী ভট্‌ভট্‌ শব্দ।... একটুবাদেই সারা শহরের প্রত্যেকটা গির্জায় বাজতে লাগল ঘণ্টা। উঠোনের ফটক-গুলো খুলে গেল, একদল অফিসার ঢুকল ভেতরে। এর মধ্যেই তারা কাঁধপটি চড়িয়েছে। প্রত্যেকেরই উত্তেজিত মুখের ভাব, বন্দুক তড়পাচ্ছে। দাড়িগোঁপ-কামানো ধূসর জ্যাকেট-পরা একজন স্কাউটকে ওরা ঠেলে নিয়ে আসছে ভেতরে। লোকটার মাথায় টুপি নেই, গলাবন্ধ নেই, ওয়েস্টকোটেরও বোতাম খোলা। পিঠের ওপর ঘা কষাচ্ছিল সবাই মিলে। লোকটার মুখ তখন রাগে লাল হয়ে উঠেছে, চোখদুটো ঘুরছে এপাশ-ওপাশ—দেখলেই মনে হয় সাংঘাতিক ক্ষেপে গেছে সে। দু'জন অফিসার তাকে চেপে ধরে গ্যারেজের পাশে দাঁড়িয়ে রইল, এর মধ্যে বাদ-বাকিরা একপাশে সরে গেল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য। ঠিক সেই সময় কর্নেল পের্‌খুরভ্‌ বেরিয়ে এলেন খিড়কির দরজা দিয়ে। আগে তাঁকে কখনো দেখিনি—সশস্ত্র বিদ্রোহী ফৌজের তিনিই হলেন অধিকর্তা।...সবাই তাঁকে অভি-বাদন জানালো। লোকটার লোহার মতো শক্ত মন; দারুণ শক্তসমর্থ চেহারা। কালো চোখদুটো কোটরে-বসা, শীর্ণ মুখ, হাতে দস্তানা, আর বেতের ছড়ি। মুহূর্তে বুঝে ফেললাম—ধূসর কোর্তাপরা লোকটার মৃত্যু অনিবার্য। পেরখুরভ্‌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলেন ভুরুর তলা দিয়ে। শয়তানের মতো দাঁত বের করছিলেন। লোকটা এদিকে সমানে গালাগাল দিচ্ছে, শাসাচ্ছে, কিসের যেন দাবি জানাচ্ছে। পেরখুরভ এবার চট্‌ করে মাথাটা তুলে কি একটা হুকুম দিয়েই ফিরে চললেন।...মোটা লোকটাকে যে দু'জন অফিসার ধরে রেখেছিল তারা লাফিয়ে সরে গেল। গায়ের কোর্তাটা ছিঁড়ে খুলে ফেলে লোকটা সেটাকে শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল সামনে দাঁড়ানো অফিসারদের দিকে—একজনের একেবারে মুখের ওপর গিয়ে পড়ল সেটা। তারপর মুখ লাল করে প্রাণপণে গালিগালাজ করতে লাগল ওদের লক্ষ্য করে। বিশাল, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাতের মুঠো পাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, পরনে শুধু বোতামখোলা ওয়েস্ট্‌ কোটটা। গুলি ছোঁড়া হল ওর ওপর। সারা শরীরটা কাঁপিয়ে হাত দুটো তুলে এক-পা এগিয়েই সে পড়ে গেল মাটিতে। ভূমি-লুণ্ঠিত দেহের ওপর ওরা খানিকক্ষণ ধরে সমানে গুলি চালিয়ে গেল।...লোকটির নাম নাখিম্‌সন, বলশেভিক কমিসার। বাবা, এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের ওপর একটা হত্যাকান্ড দেখলাম! যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না কী ভাবে

লোকটি আকুলি-বিকুলি করছিল একটুখানি দম নেবার জন্য। নিকানর রুরেভিচ আমাকে বুঝিয়ে বলল, কাজটা নাকি ভালই হয়েছে—ওরা যদি গুলি করে না মারত লোকটিকে, তাহলে সে-ই গুলি করত ওদের।...

"এর পরে কী ঘটেছিল আমার মনে নেই ঃ সেই হত্যাকাণ্ডেরই যেন অনুবৃত্তি চলতে লাগল পর-পর, শক্তপ্রাণ সেই বিশাল দেহটির তীব্র আক্ষেপই যেন নিষিক্ত হয়ে গেল সব কিছুর মধ্যে।...আমাকে ওরা হুকুম দিল থামওয়ালা একটা লম্বা হলদে বাড়িতে যেতে, সেখানে বসে হুকুমনামা আবেদনপত্র টাইপ করতে লাগলাম। হরদম মোটর সাইকেল ছুটেছে ধুলো উড়িয়ে...লোকজন ছুটছে, মেজাজ দেখাচ্ছে, হুকুম করছে ঃ সামান্যতম ব্যাপারেই তিরিক্ষি হয়ে তারা চেঁচাচ্ছে, মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। একেকবার ভয়ে মুষড়ে পড়ছে সবাই, তারপরেই আবার অতিরিক্ত উৎসাহে ফেটে পড়ছে। কিন্তু পেরখুরভ এসে যখনই কটমট করে চারদিক চেয়ে দু'চারটে হুকুম ছাড়ছেন, সঙ্গে সঙ্গে সব হৈ-চৈ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। পরদিন শহরের বাইরে কামানের গুরগুর আওয়াজ শোনা গেল। বলশেভিকরা আসছে। আগে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ভিড় লেগে থাকত আমাদের অফিসে, আর এখন সব কোথায় উপে গেল কে জানে। শহরটা যেন মরে গেছে। একমাত্র আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যখন পেরখুরভ গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছেন, কিংবা সশস্ত্র ফৌজীদল মার্চ করে চলেছে।...কয়েকজন ফরাসীকে নিয়ে উড়োজাহাজ আসার কথা, উত্তর দিক থেকে পল্টন আর রীবিন্স্ক্ থেকে অস্ত্রবোঝাই স্টীমারও আসবে কথা আছে।......কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হল না। দেখতে দেখতে সারা শহরটা ঘিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল লড়াই। রাস্তায় রাস্তায় গোলা ফাটতে লাগল।...মান্ধাতার আমলের ঘণ্টা-ঘরগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বাড়ীঘর ধ্বসল। চারদিকেই আগুন, নেভাবার লোক নেই, সূর্য ঢেকে গেছে ধোঁয়ার আড়ালে। রাস্তা থেকে কেউ লাশও সরাচ্ছে না। পরে জানা গিয়েছিল, গোলন্দাজ বাহিনীর ডিপোগুলো ছিল রীবিন্স্কে, আর সাভিনকভ সেখানে এইরকমই একটা অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন, কিন্তু সিপাহীরা তা দমন করে; ইয়ারোস্লাভ্লের আশেপাশে গ্রামের চাষীদের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে হয়নি তাঁকে সাহায্য দেবার; ট্রেঞ্চে গিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াই করতে অস্বীকার করে ইয়ারোস্লাভ্লের মজুররা।......সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠল পেরখুরভের নিজের মুখটা—সে সময় প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হত আমার। লোকটা যেন সাক্ষাৎ যম, ভাঙাচোরা শহরের উপর দিয়ে সশব্দে গাড়ি হাঁকিয়ে যায়—যা কিছু ঘটেছে সব যেন তারই হাতের ইশারায়। কুলিচক আমাকে একটা চোরা-কুঠরির মধ্যে এনে রাখল কয়েকদিন। কিন্তু বাবা, আমার মন থেকে সেই অপরাধের ভাবটা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না।......কুঠরিটার মধ্যে আর বেশিদিন থাকলে আমি পাগলই হয়ে যেতাম। মাথায় রেডক্রসের চিহ্ন-দেয়া রুমাল বেঁধে নেমে পড়লাম কাজে। এমনিভাবেই চলল কিছুদিন—তারপর এল সেই রাতটি যেদিন সেই অফিসারটা আমায় বলাৎকারের চেষ্টা করে।......

"ইয়ারোস্লাভ্লের পতনের আগের দিন আমি আর কুলিচক ভলগা পার হলাম

দাঁড়নৌকায় করে। পুরো এক হপ্তা ধরে হেঁটেই চললাম যাতে কারুর চোখে না পড়ি। রাতগুলো আমরা খড়ের গাদার নিচে কাটাতাম—ঠান্ডা ছিল না তেমন এই যা রক্ষে। হেঁটে হেঁটে জুতো খসে পড়ার জোগাড়, পা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। কুলিচক আমার জন্য কোথা থেকে এক জোড়া ফেল্ট বুট জোগাড় করে আনলো—বোধ হয় কারো বেড়ার খুঁটি থেকে সেরেফ উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল। একদিন, ঠিক মনে নেই কবে, একজন লোককে দেখলাম বার্চ ঝোপের মধ্যে। লোকটার পরনে ছেঁড়া আংরাখা, বাকলার জুতো আর জীর্ণ টুপি। ঠিক পাগলের মতো দেখতে, গম্ভীর মুখে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে সামনের দিকে, একটা মোটা লাঠি হাতে। লোকটা পেরখুরভ। ইনিও তাহলে পালিয়েছেন ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌ ছেড়ে। ওঁকে দেখে এমন ঘাবড়ে গেলাম যে সটান শুয়ে পড়লাম ঘাসের মধ্যে মুখ ঢেকে।......কস্ত্রোমার দিকে চলতে শুরু করলাম আবার। শহরতলীর একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাড়ির মালিক কুলিচকেরই বন্ধু। যতদিন না চেকরা কাজান দখল করে, ততদিন ওইখানেই রইলাম। নিকানর য়ুরেভিচ সব সময়ই নজর রাখতো আমার ওপর, যেন আমি কচি খুকি—যাক্‌ এজন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞই।......কিন্তু কস্ত্রোমায় এসে ও আমার হীরাজহরতগুলো দেখে ফেলল। আমার হাতব্যাগের মধ্যে রুমালে বাঁধা ছিল জিনিসগুলো। হাতব্যাগটা ও এতদিন নিজেরই কোটের পকেটে বয়ে বয়ে এনেছে। কস্ত্রোমায় এসেই প্রথম মনে পড়ল ওগুলোর কথা। কুলিচককে সবই খুলে বললাম—বললাম যে নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছে। কুলিচক কিন্তু এ সম্পর্কে রীতিমতো একটা দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করে দিল : মনে হয় না যে আমি অপরাধী, জীবনের ভাগ্য পরীক্ষায় আমি একটা বিশেষ সংখ্যা টেনেছি এইমাত্র। সেই সময় থেকেই আমার ওপর ওর মনোভাবটা কেমন যেন বদলে গেল; খুবই জটিল হয়ে উঠল ওর আচরণ। এমনিতেও আমাদের সম্পর্কের ওপর একটা প্রভাব পড়েছিল সেই ছোট গ্রাম্য বাড়িটার, সেখানে ওইরকম অনাবিল শান্তজীবন কাটিয়ে, দুধ, গুজ্‌বেরী আর রাস্‌বেরী খেয়ে বেশ একটা অন্যরকম ভাব এসে গিয়েছিল। মোটাও হতে আরম্ভ করেছিলাম আমি। একদিন, সূর্য ডোবার পর ছোট্ট বাগানটায় বসে ও আমাকে প্রেমের কথা শোনাতে লাগল—বলল যে ভালোবাসার জন্যই নাকি আমি জন্মেছি, তারপর চুমুও খেল আমার হাতে। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ওর নিশ্চিত ধারণা হয়েছে আমি আর কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সঁপে দেব ওর হাতে, অ্যাকেসিয়া গাছের নিচে ওই বেঞ্চিটার ওপর।......এতসব ঘটনার পরও, বাবা ভাবো তো একবার! আর বেশি ব্যাখ্যা করে না বুঝিয়ে আমি শুধু বললাম তাকে : 'এ ভাল কথা নয়—আমি যে ইভান ইলিয়িচ্‌কে ভালোবাসি।' আর আমি মিথ্যেও বলিনি বাবা।......"

ইভান ইলিয়িচ রুমাল বের করে মুখ মুছল, চোখটাও মুছল, তারপর আবার পড়তে শুরু করল :

"আমি মিথ্যে বলিনি।......ইভান ইলিয়িচকে আমি ভুলতে পারিনি। ওর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে যায়নি। তুমি তো সে ঘটনা নিশ্চয়ই জানো, তাই না

বাবা? মার্চ মাসে আমরা আলাদা হয়ে যাই, ও চলে যায় ককেসাসে, লালফৌজে।... ওর সম্পর্কে সকলেরই উঁচু ধারণা, যদিও পার্টিসভ্য নয়, তবে খাঁটি বলশেভিক।...... হয়তো সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখনও আমরা অতীতের বন্ধনে বাঁধা।...... আমি তো অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিনি।......কুলিচকের আর কী, সহজ ব্যাপার—বিছানার সম্পর্ক।......যাকে আমরা প্রেম বলি তা আর কিছুই নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহজাত প্রেরণা। আমরা ভয় পাই বিস্মৃতিকে, ধ্বংসকে।......সেই জন্যই রাস্তার গণিকাদের দিকে তাকাতে ভয়ানক খারাপ লাগে......রাতে ওদের নারী বলে মনে হয় না, নারীর প্রেতায়িত ছায়ামাত্র।......কিন্তু আমি তো জীবন্ত, আমি তো ভালোবাসা চাই, আমি তো চাই অন্যে আমার স্মৃতি বুকে ধরে রাখুক, দয়িতের চোখে আমি দেখতে চাই আমারই মুখচ্ছায়া। জীবনকে ভালোবাসি আমি।...... একসময় অবশ্য নিজেকে ছেড়ে দেবার একটা আকস্মিক বাসনা জেগে উঠেছিল মনে—মুহূর্তের উত্তেজনায়ই হয়তো......সে হত এক অন্য ব্যাপার! কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমি রাগ, ঘৃণা আর বিভীষিকা ছাড়া অন্য কিছুই অনুভব করতে পারছি না।......সম্প্রতি কিছুদিন হল একটা পরিবর্তন এসেছে আমার মুখে, দেহশ্রীতে, আমি আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছি।......আমার মনে হয় যেন আমি সব সময় নিরাবরণ, আর অসংখ্য লোলুপ চোখ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে চারদিক থেকে।......অভিশপ্ত এই সৌন্দর্য! আমি এসব তোমার কাছে লিখে জানাচ্ছি এইজন্য যাতে দেখা হলে আর এসব কথা তোমায় মুখে না বলতে হয়।...... আমি এখনো ভেঙে পড়ি নি বাবা, সে-তো দেখতেই পাচ্ছ......"

ইভান ইলিয়িচ মাথা তুলল। অনেকগুলো সতর্ক পায়ের চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে হলঘরের দরজার ওপাশে। দরজার হাতল ঘুরে গেল। লাফিয়ে উঠে তেলেগিন জানলাটার দিকে তাকাল।......

ডাক্তারের ফ্ল্যাটের জানলাগুলো মাটি থেকে বেশি উঁচু নয়—মফঃস্বল শহরের বাড়িগুলোতে যেমন হয়ে থাকে। মাঝের জানলাটা খোলা। তেলেগিন ছুটে গেল সেটার কাছে। বাঁধানো এ্যাস্ফালটের ওপর মানুষের লম্বা ছায়া পড়েছে কম্পাসের মতো, আর সেই ছায়া থেকে আরো লম্বা একটা রাইফেলের ছায়া এগিয়ে গিয়েছে সামনের দিকে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল মাত্র একটি সেকেণ্ডের মধ্যে। দরজার হাতলটা ঘুরে যেতেই, চুড়োটুপি-পরা দু'জন সাধারণ চেহারার যুবক পাশাপাশি এসে ঢুকল পড়বার ঘরে। পরনে ছুঁচের কাজ-করা শার্ট। ওদের পেছনে দেখা দিল গভিয়াদিনের লাল-দাড়িওয়ালা "নিরামিষাশী" মুখখানা—এপাশ-ওপাশ উঁকি দিচ্ছে সে। ওরা ভিতরে ছুটে আসতেই প্রথম যা তেলেগিনের নজরে পড়ল তা হচ্ছে ওর দিকে তাক-করা তিনটে রিভলবারের মুখ।

লড়াইয়ের মাঠে তেলেগিনের যা অভিজ্ঞতা তাতে ও পরিষ্কার বুঝল অপরাজিত সশস্ত্র শত্রুর সামনে এখন আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কোনও লাভ হবে না। পরমুহূর্তেই ও নিজের রিভলবারটা বাঁ-হাতে নিয়ে, জামার নিচের বেল্ট থেকে একটা

ছোট হাতবোমা বের করে ফেলল। হাতবোমার সঙ্গেই গিমজার চিঠিটা বাঁধা আছে।

কর্কশগলায় চেঁচিয়ে উঠল সে : "হাত থেকে নামাও ওসব!"—মুখে তখন রক্ত ছুটে আসছে ওর।

চীৎকারটার মধ্যে এমন জবরদস্ত কিছু ছিল, এবং ইভান ইলিয়িচের নিজের চেহারাটার মধ্যেও এমন ভয়ংকর কিছু ছিল যার ভয়ে বীরপুঙ্গবেরা একদম ভেবড়ে গেলো, আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল দু'পা। নিরামিষাশী চেহারাটা তখন সটকে গেছে একপাশে। আর এক সেকেন্ড সময় পাওয়া গেল......তেলেগিন ওদের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথার ওপর হাতবোমাটা ঘোরাতে লাগল।

"রেখে দাও বলছি!"

ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যা উপস্থিত কেউ প্রত্যাশাই করতে পারেনি, তেলেগিন তো নয়ই।......দ্বিতীয়বার ও চেঁচিয়ে ওঠামাত্র একটা করুণ আর্তনাদ শোনা গেল আখরোট-কাঠের দরজার ওপাশে বাড়ির অন্দর থেকে, আতঙ্ক-বিহ্বল নারীকণ্ঠে কে যেন চীৎকার করে উঠল......দরজাটা খুলে যেতেই তেলেগিন দেখল—দাশা। চোখ বড়ো করে দরজার পাল্লা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে, পাতলা মুখটা থরথর করে কাঁপছে।

"ইভান!"

ওর পাশেই এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার, দাশার কোমর ধরে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন ভেতরে......দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।......আত্মরক্ষা আর আক্রমণের জন্য তেলেগিন যে মতলব এঁটেছিল মুহূর্তের মধ্যে তা সবই ভেস্তে গেল।...... আখরোট-কাঠের দরজার দিকে ছুটল ও, প্রাণপণ শক্তিতে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল কবাটের ওপর......মড়মড় করে কি যেন একটা ভেঙে গেল। তেলেগিন ততক্ষণে খাবার-ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তখনো ওর হাতে সেই মারাত্মক অস্ত্রদুটো।......টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল দাশা,—ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউনের গলা চেপে ধরেছে, আর এমনভাবে ঢোঁক গিলছে যেন কিছু একটা জিনিস গলায় আটকে গেছে। (দৃশ্যটা দেখে একটা মর্মান্তিক পীড়া অনুভব করল তেলেগিন।) ডাক্তার এমনভাবে পেছিয়ে গেলেন যেন একটা জানোয়ার ফাঁদে পড়ে গেছে।

"বাঁচাও! গভিয়াদিন!" দম-আটকানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার।

দাশা আখরোট-কাঠের দরজাটার দিকে ছুটে গিয়ে কুলুপ এঁটে দিল চাবি দিয়ে।

"উঃ ভগবান্, এ কী ভয়ানক কাণ্ড!"

কিন্তু ইভান ইলিয়িচ ওর কথার সঠিক অর্থ বুঝল না : এইসব জিনিস হাতে নিয়ে দাশার সামনে গিয়ে পড়াটা ভয়ানক তো বটেই, ভাবল সে। তাড়াতাড়ি রিভলবার আর হাতবোমাটা ও পকেটে গুঁজল। দাশা তখন ওর হাতটা ধরেছে : "চলে এস!" বলেই ওকে টেনে নিয়ে চলল অন্ধকার প্যাসেজটার মধ্যে, সেখান থেকে চলে এল একটা ছোট অপরিসর ঘরে। চেয়ারের আসনের ওপর একটা মোমবাতি

জ্বলছে। ঘরটার আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই, শুধু একটা পেরেকের ওপর ঝুলছে দাশার স্কার্ট, আর আছে একটা লোহার খাট, বিছানার চাদরটা দেয়ালের দিকে অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

"তুমি কি এখানে একা নাকি?" ফিস্‌ফিসিয়ে বলল তেলেগিন : "তোমার চিঠিটা পড়েছি।"

চারদিকটা দেখল একবার। একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে, ঠোঁট কাঁপছে। জবাব না দিয়ে দাশা ওকে খোলা জানলার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

"পালাও! এক্ষুনি পালাও! পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

জানলা দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উঠোন। অনেকগুলো বাড়ির ছাদ আর ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে নদীর ধার পর্যন্ত, এবং আরো নিচে দেখা যাচ্ছে ঘাট-সিঁড়ির আলো। ভলগার দিক থেকে একটা ভিজে বাতাস আসছে, তাতে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ।......দাশা দাঁড়িয়েছিল ওর সারা দেহটা দিয়ে ইভান ইলিয়িচকে ছুঁয়ে। ভয়ার্ত মুখখানা উঁচুতে তোলা, ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেছে।......

"ক্ষমা করো আমায় ইভান, আর দাঁড়িও না, পালাও!" —তেলেগিনের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল ও।

কেমন করে তেলেগিন নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে যাবে? ব্যবধানের প্রকান্ড প্রাচীরটা সবেমাত্র সরে গেছে। হাজারবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আজ সে দেখা পেয়েছে সেই মুখখানার যার কোনো তুলনাই সে খুঁজে পায় না সারা পৃথিবীতে। ঝুঁকে পড়ে ও চুমু খেল দাশাকে।

দাশার ঠান্ডা দুটি ঠোঁটে কোনো সাড়া জাগল না, শুধু একবার কেঁপে উঠল সামান্য।

"আমি তোমারই আছি।......তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারো! সুদিন এলে আবার আমাদের দেখা হবে, ইভান।......এখন তুমি যাও, পালাও আমার মাথা খাও!"

জীবনে কোনোদিন তেলেগিন ওকে এত ভালোবাসেনি, এমনকি ক্রিমিয়ার সেই আনন্দময় দিনগুলোতেও নয়! প্রাণপণে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখল ও, তাকিয়ে রইল শুধু মুখের দিকে।

"আমার সঙ্গে চলো, দাশা! শোনো! আমি তোমার জন্য নদীর ঘাটে অপেক্ষা করব—কাল রাতে......"

মাথা নেড়ে একটা অস্ফুট ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল দাশা :

"না, না।......সে আমি পারব না!"

"পারবে না?"

"সে হয় না ইভান!"

"বেশ। তাহলে আমিও থেকে গেলাম।"

জানলা থেকে সরে এসে তেলেগিন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।......ডুকরে কেঁদে উঠল দাশা।

......তারপর সে পাগলের মতো ছুটে এল তেলেগিনের কাছে, ওর হাতটা চেপে ধরে ওকে আবার টেনে নিয়ে গেল জানলার কাছে। বাইরে একটা বাখারির ফটক ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। অনেকগুলো সতর্ক পায়ের নিচে সর্‌সর্‌ করে উঠল বালি। দাশা যেন মরিয়া হয়ে তেলেগিনের হাতের ওপর ওর গরম গালটা ঠেকাল।...

"আমি তোমার চিঠিটা পড়েছি," আবারও বলল তেলেগিন : "আমি এখন সবই বুঝতে পারছি।"

এই কথা শুনে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল দাশা, তেলেগিনের গালে নিজের গাল রেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা।

"উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা। তোমাকে যে মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে!"

মোমবাতির আলোয় দাশার এলোচুল সোনালি হয়ে উঠেছে। তেলেগিনের মনে হল ও যেন বালিকামাত্র, কাঁচ শিশু। আহত অবস্থায় গমক্ষেতে শুয়ে, একদলা মাটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে সে দাশাকে যেমনটি কল্পনা করেছিল সেই রাতে, আজ যেন হুবহু সেইরকমই দেখাচ্ছে ওকে—সেদিন তেলেগিন কতোই না ভেবেছিল ওর একরোখা, চঞ্চল, সহজ-ভঙ্গুর হৃদয়ের কথা।

"তুমি আমার সঙ্গে আসবে না কেন দাশা? ওরা তো তোমার ওপর অত্যাচার করছে এখানে। ওরা কী ধরনের লোক তা তো দেখতেই পাচ্ছ।......আমি যদি তোমার পাশে থাকি তাহলে যেকোনো ব্যাপারই, তা সে যতো ভয়ংকরই হোক, সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে যাবে।......আমার দাশামণি।......যাই ঘটুক না কেন, জীবনে-মরণে তুমি আর আমি রয়েছি পাশাপাশি। আমার এই হৃৎপিণ্ডটার মতো তুমিও আমারই অংগ।"

ঘরের আঁধার কোণ থেকে দ্রুত চাপা গলায় কথাগুলো বলে চলেছিল তেলেগিন। দাশা ওর হাত না সরিয়েই নিজের মাথাটা পিছনে হেলিয়ে রাখল—চোখ ভরে উঠছে জলে......

"মরণ পর্যন্ত আমি তোমারই থাকব ইভান।......কিন্তু তোমাকে যে যেতেই হবে!......বুঝতে চেষ্টা করো—তুমি যাকে ভালবাসো সে মেয়ে আমি নই.......কিন্তু ভবিষ্যতে হবো, নিশ্চয়ই হবো!"

আর কিছু শুনতে পেল না তেলেগিন—দাশার চোখের জল, ওর কথা, ওর কণ্ঠের যাদু যেন আনন্দে প্রায় মাতাল করে তুলল তাকে। এত জোরে সে দাশাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল যে ওর শরীরের প্রত্যেকটা জোড় যেন খুলে যাবার যোগাড়।

"বেশ, আমি সবই বুঝে নিয়েছি এবার! চলি তাহলে, বিদায়!" ফিস্‌ফিসিয়ে বলল তেলেগিন।

জানলার কাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে এক লহমার মধ্যে ছায়ার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল তেলেগিন, শুধু জানলার নিচের কাঠের শেডটার ওপর খুট্‌ করে একটা হালকা শব্দ হল ওর বুটের।

জানলার বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল দাশা, কিন্তু কিছুই আর দেখা যায় না—শুধু গাঢ় অন্ধকার আর দূরের হলদে আলোগুলো। বুকের ওপর হাতদুটো

চেপে ধরল দাশা।...বাইরে কোনো শব্দ নেই।...ঠিক এমনি সময় দেখা গেল ছায়ার ভেতর থেকে দুটো মূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। উঠোনটার ওপর দিয়ে কোণাকুণি দৌড়লো তারা মাথা নিচু করে। দাশা আর্তনাদ করে উঠল, এমন তীক্ষ্ম আর ভয়ানক সে আর্তনাদ যে সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি দুটো বোঁ করে ঘুরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চয়ই ওরা দাশার জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ঠিক সেই সময় দাশাও দেখল, উঠোনের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কাঠের ছাদের আল্‌সে বেয়ে উঠছে তেলেগিন।

বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দাশা, কয়েক মুহূর্ত অমনিই পড়ে রইল নিশ্চলভাবে। তারপরেই আবার ধাঁ করে উঠে পায়ের একপাটি চটি কোনো-রকমে হাতড়ে খুঁজে বের করেই ও ছুটে চলে গেল খাবার-ঘরের দিকে।

সেখানে দেখে ডাক্তার আর গভিয়াদিন রীতিমতো মারমুখী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে —দাশার বাবা ধরে আছেন একটা ছোট নিকেল-করা পিস্তল, আর তাঁর বন্ধু তড়পাচ্ছে একটা পল্টনী রিভলবার। একসঙ্গে দু'জনেই বলে উঠলেন "কী ব্যাপার?" হাতের মুঠো পাকিয়ে দাশা কটমট করে চেয়ে রইল গভিয়াদিনের লাল-লাল চোখদুটোর দিকে।

"হতভাগা বদমায়েস!"—গভিয়াদিনের ফ্যাকাশে নাকের নিচে হাতের মুঠি উঁচিয়ে বলল দাশা: "তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে! গুলি খেয়ে মরবে, মনে থাকে যেন সে কথা, বদমায়েস কোথাকার!"

গভিয়াদিনের লম্বা মুখটা আরো কুঁচকে যায়, আরো ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নিস্প্রাণ হয়ে ঝুলে পড়ে ওর দাড়ি। ডাক্তার ইশারা করলেন, কিন্তু রাগে তখন থর-থর করে কাঁপতে শুরু করেছে গভিয়াদিন।

"আমার দিকে অন্তত মুঠি পাকিও না, দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা।...একবার যে তুমি আমায় মেরেছিলে সে কথা আমি কখনো ভুলিনি—জুতোই মেরেছিলে বোধ-হয়, যদ্দুর মনে পড়ে।...মুঠো নামাও...আমাকে যে আর একটু বেশি সম্মান করা উচিত তোমার, সে কথাও মোটামুটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

"সেমিয়ন সেমিয়নোভিচ, সময় নষ্ট করছ তুমি", বাধা দিয়ে বললেন ডাক্তার, তখনো ইশারা করছেন, তবে দাশা যাতে তা না দেখতে পায় সে-চেষ্টাও আছে।

"ঘাবড়াবেন না দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌, তেলেগিনের নিস্তার নেই আমাদের হাত থেকে......"

দাশা চীৎকার করে ধেয়ে গেল ওর দিকে।

"আস্পর্ধা দেখানো হচ্ছে!" (সঙ্গে সঙ্গে গভিয়াদিন আশ্রয় নিল চেয়ারের আড়ালে)।

"আস্পর্ধা আছে কি নেই তা দেখিয়ে দেব।......আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা, জন-নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ নজর রয়েছে তোমার ওপর, হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবেই।......আজকের এই ঘটনার পর কিন্তু আমি আর কিছু ভরসা দিতে পারছি না, তোমার মুস্কিল হতে পারে—সে কথা জানিয়ে রাখলাম!"

"হয়েছে, হয়েছে, সেমিয়ন, আর ঐ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না", রাগতভাবে বললেন ডাক্তার : "অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে একটু..."

"সবকিছুই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে, দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ।... আপনি তো জানেন আপনাকে আমি কতো শ্রদ্ধা করি, আর দারিয়া দ্মিত্রেভনার ওপর আমার অনুরক্তিও তো আজকের ব্যাপার নয়, অনেক দিনের......"

হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল দাশা। ঠোঁটের ওপর একটা বিদ্রূপের কুঞ্চনে বিকৃত হয়ে গেছে গভিয়াদিনের সারা মুখটা, যেন ভাঙা আয়নার ওপর প্রতিবিম্ব। টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, যাবার সময় মাথাটা কাঠের পুতুলের মতো সোজা করে রাখল, যাতে পেছন থেকে ওকে হাস্যকর না দেখায়। টেবিলের পাশে বসে ডাক্তার বললেন :

"গভিয়াদিন বড়ো ভয়ানক লোক কিন্তু।"

আঙুল মটকাতে মটকাতে দাশা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করছিল। বাপের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল :

"আমার চিঠি কোথায়?"

রুপোর সিগারেট-কেস্‌টা খুলতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তার, চেপে-রাখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস করে কী যেন জবাব দিলেন একটা; অবশেষে কেস্‌টা খুলে তিনি একটি সিগারেট বের করে ভোঁতা আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরলেন। তখনো কাঁপছিল আঙুলগুলো।

"ওই তো ওখানে আছে......দুত্তোর—গেল কোথায় জিনিসটা? হ্যাঁ-হ্যাঁ, পড়ার-ঘরের মেঝের ওপর।"

দাশা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এল চিঠিটা নিয়ে। আবার দাঁড়াল দ্মিত্রি স্তেপানোভিচের সামনে। আগুন ধরাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু সিগারেটের মুখের কাছে কেবলই থরথর করে নাচছিল দেশলাই-কাঠির শিখাটা।

"আমি আমার কর্তব্যটুকু করেছি মাত্র",—কাঠিটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন তিনি (দাশা একটি কথাও বলল না) : "ও হচ্ছে বলশেভিক, বুঝলি মা...না, তার চেয়েও খারাপ,— ও হচ্ছে একটি স্পাই।...গৃহযুদ্ধটা কিছু ঠাট্টার জিনিস নয়, বুঝলি, সবকিছু ত্যাগ করবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। সেইজন্যই তো আমাদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আর দুর্বলতা দেখালে লোকেও কোনো-দিন ক্ষমা করবে না।" (দাশা যেন কী ভাবতে ভাবতে চিঠিটাকে আস্তে আস্তে ছিঁড়ছে একেবারে টুকরো টুকরো করে।) "ও এসেছিল আমার কাছ থেকে ওর দরকারি জিনিসটা বের করে নিতে, তারপর প্রথম চোটেই আমাকে সাবাড় করে দিত—এ তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।...দেখেছিলি কেমন হাতিয়ার বাগিয়ে এসেছিল! বোমা ছিল সঙ্গে। ১৯০৬ সালে আমার চোখের সামনে গভর্নর ব্লক-কে দেখেছিলাম বোমার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হতে, ওই মস্‌কাতেলনায়া স্ট্রীটের মোড়ে।...শেষ অবধি তাঁর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, একবার যদি দেখতিস্‌!—হাত-পা

নেই, শুধু ধড়টা, আর কয়েকগাছি দাড়ি।" ডাক্তারের হাত আবার কাঁপতে লাগল, সিগারেটটা শেষ না হতেই এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকটা বের করলেন তিনি। "তোর ওই তেলোগিনটিকে আমার মোটেই ভাল লাগেনি, ওকে ছেড়েছিস ভালই করেছিস।..." (এ কথাটাও দাশা চুপ করে হজম করে গেল।) "দেখ্ না, শুরু করেছিল কেমন বাজে চালাকি খেলে—বলে কিনা তুই কোথায় তা ও জানতে চায়; বটে..."

"গভিয়াদিন যদি ওকে হাতে পায়..."

"সে সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহই নেই—গভিয়াদিনের কর্মচারীরা রীতিমতো কাজের লোক। তুই কিন্তু গভিয়াদিনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিস, জানিস।... গভিয়াদিন সত্যিই বিরাট লোক।...ওর সম্পর্কে সবারই খুব উঁচু ধারণা, কি চেকদের, কি সদর দপ্তরের লোকদের।...এইরকম দিনে আমাদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি-গুলো বিসর্জন দেওয়াই উচিত...অন্তত দেশের মঙ্গলের জন্য...সে-যুগের বড়ো-বড়ো বীরদের কথাই ভাব না কেন।...হাজার হলেও তুই তো আমারই মেয়ে; তোর মগজেও যে আমারই মতো আজে-বাজে নানান্‌টা জিনিস পোরা থাকবে সে আর বিচিত্র কী—" হেসে উঠে ডাক্তার গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন: "তবে মগজটা নেহাৎ গোবর-পোরা নয়..."

"গভিয়াদিন যদি ওকে ধরে",—ভাঙা গলায় বলল দাশা: "তা হলে তুমি যথাসাধ্য করবে তো ইভানকে বাঁচাবার জন্য?"

চট্ করে মেয়ের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ডাক্তার ঘোঁৎ করে নিশ্বাস টানলেন। দাশার হাতের মুঠির মধ্যে তখনো রয়ে গেছে চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো।

"বাঁচাবে তো নিশ্চয়ই, তাই না বাবা?"

"না!" চীৎকার করে উঠলেন ডাক্তার, টেবিলের ওপর মারলেন একখানা ঘুষি: "না! রাবিশ্! তোর নিজের স্বার্থেই বলছি—না!"

"তোমার পক্ষে হয়তো কঠিন হবে বাবা, কিন্তু তোমাকে যে এ কাজ করতেই হবে।"

"তুই একটি আস্ত গাধা, বোকা!"—গর্গর্ করে উঠলেন ডাক্তার: "তেলোগিনটা বদমায়েস, অপরাধী; সামরিক আদালতই ওকে গুলি করে মারবে।"

মাথা তুলল দাশা। ওর ধূসর চোখগুলো এমন অসহ্য রকমের জ্বলজ্বলে যে ডাক্তার ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগলেন, ভুরু দুটো এমনভাবে কুঁচকে রইলেন যেন চোখদুটোকে আড়াল করতে চেষ্টা করছেন। কাগজের ছেঁড়া টুকরো-ধরা হাতের ছোট ঘুষিটা পাকিয়ে দাশা শাসাতে লাগল:

"যদি সব বলশেভিক তেলোগিনের মতোই হয়, তবে তো দেখছি বলশেভিকরাই খাঁটি লোক!"

"বোকা! গাধা!"

ডাক্তারের মুখচোখ লাল। রাগে কাঁপছেন। লাফিয়ে উঠে পা দাপিয়ে বললেন:

"তোর ওই বলশেভিকদের আর তোর ওই তেলেগিনটাকে ফাঁসিকাঠে লটকানো উচিত! টেলিগ্রাফের খাম্বায় ঝুলিয়ে মারা উচিত!...জ্যান্ত ছাল ছাড়ানো উচিত হতভাগাগুলোর!"

কিন্তু দাশার মেজাজ ওর বাপের চেয়েও চড়া। ফ্যাকাশে মুখে সিধে বাপের সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর সেই অসহ্য চক্‌চকে চোখ দুটো তাঁর মুখের ওপর স্থির করে রাখল।

"তুমি একটি হন্যে কুকুর!" চিৎকার করে উঠল দাশা: "তোমার ঐ চেঁচানি বন্ধ করো! আমার বাবা তো নও তুমি—তুমি হলে একটা উন্মাদ, ইতর!"

চিঠির ছেঁড়া-টুকরোগুলো ওর বাপের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল।

সেই রাতেই, ঠিক ভোর হবার মুখে, ডাক্তারের ডাক পড়ল টেলিফোনে।

একটা উদাসীন রুক্ষ গলায় কে যেন তাঁকে জানালো:

"আপনার জন্য খবর আছে: ময়দার আড়তের পেছনে সামোলেৎস্কায়া ঘাটে দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেছে, লাশদুটো সনাক্ত হয়েছে: একজন হলেন পাল্টা-গোয়েন্দা-বিভাগের সহকারী অধিকর্তা গভিয়াদিন, আরেকজন তাঁর সহকারী।"

রিসিভারটা উল্টো করে ঝোলালেন ডাক্তার দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ। তারপর একটু দম নেবার জন্য মুখটা হাঁ করতেই সাংঘাতিক হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে গেলেন টেলিফোনটার পাশে।

॥ এগারো ॥

ভলান্টিয়ার বাহিনীর সেরা পল্টন দ্রজ্‌দভ্‌স্কি আর কাজানোভিচ-ফৌজকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে সরোকিন তাঁর মূল পরিকল্পনাটা বদলে ফেললেন। কুবান নদী পার না হয়ে তিনি করেনভ্‌স্কায়া থেকেই মোড় ঘুরলেন উত্তরমুখো। আক্রমণ করলেন তিখোরেৎস্কায়া স্টেশন। দেনিকিনেরও সদর ঘাঁটি ছিল ওখানেই।

দশ দিন ধরে নির্মম যুদ্ধ চলেছে। প্রথম দিককার সাফল্যে উল্লসিত হয়ে সরোকিনের ফৌজ একেবারে রাস্তা সাফ করে এগিয়ে চলল—পথের সমস্ত কাঁটা সরাতে সরাতে। মনে হচ্ছিল তাদের একরোখা এই অভিযানকে ঠেকাবার সাধ্য বুঝি কারুর নেই। সারা কুবান এলাকায় ছড়িয়ে ছিল দেনিকিনের বাহিনী, তিনিও তাই হুড়মুড় করে তাদের এক জায়গায় জড়ো করতে লেগে গেলেন। দু'পক্ষেই এমন প্রবল উত্তেজনার ভাব যে প্রত্যেকটা সংঘর্ষই শেষ পর্যন্ত সঙ্গীন নিয়ে হাতাহাতি লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু সরোকিনের ফৌজের মধ্যেও একইরকম দ্রুতবেগে নৈতিক বলের হানি ঘটতে লাগল। কুবান আর উক্রেইনীয় রেজিমেন্ট দুটোর মধ্যে রেষারেষি যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অভিযানের পথে যতো গ্রাম পড়ে সব ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে উক্রেইনীয় আর যুদ্ধফেরত লড়াকুরা। গ্রামবাসীরা কোন্ পক্ষকে সমর্থন করে সে খোঁজখবর করার তোয়াক্কাও করে না তারা।

মাথা একেবারে ঘুলিয়ে যায় লোকের—কিছু আর বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। স্তেপের ওপর ধুলোর ঝড় উড়িয়ে আসতে থাকে পল্টনবাহিনী, গ্রামবাসীরা ওদের দেখে ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে। দেনিকিন তো তবু রসদ-খাবারের দাম দেয়, কিন্তু সরোকিনের ফৌজ কিছুই মানে না, পরিষ্কার ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু। গাঁয়ের যুবকরাও তাই ঘোড়ায় চেপে চলে যায় দেনিকিনেরই দলে, আর মেয়ে, শিশু, গরু-বাছুরদের নিয়ে বুড়োরা পালিয়ে যায় স্তেপের জলা জায়গাগুলোতে আশ্রয় নেবার জন্য।

সরোকিনের ফৌজের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে গ্রামকে গ্রাম। কুবান রেজিমেণ্টের সেপাইরা চেঁচায় ঃ "আমাদের পাঠানো হচ্ছে লড়াইয়ের কসাইখানায়, আর যতো হতভাগা ভিনদেশী আমাদের দেশটাকে লুটেপুটে খেল!" ঘটনার ঘূর্ণিস্রোতে প্রাণপণ ঘাড় সোজা রাখার চেষ্টা করছেন চীফ-অব-স্টাফ বেলিয়াকভ, কাঁধের ওপর মাথাটা সত্যি-সত্যিই আছে কিনা পরখ করে দেখছেন। আর এতে অবাক হবারই বা কী আছে! 'রণনীতি' তো কোন্ চুলোয় গিয়েছে! 'রণকৌশলও' দাঁড়িয়ে আছে এখন বেয়নেটের ডগায়, বিপ্লবী তাণ্ডবের মধ্যে। শৃঙ্খলার বদলে এখন এসেছে সশস্ত্র সেনানীদের উগ্র, দুর্দম, তীব্র গণ-আলোড়ন। এ ক'দিন সর্বাধিনায়ক সরোকিন রয়েছেন নির্জলা সুরাসার আর কোকেনের ওপর—তাঁর এখন এক বিকট চেহারা। চোখে ধক্ ধক্ করছে আগুন, মুখটা অন্ধকার, যেন

ভূতে-পাওয়ার মতো এগিয়ে চলেছেন ফৌজের কাঁধে ভর করে, চেঁচাতে চেঁচাতে গলার স্বর বিকৃত করে ফেলেছেন।

এরপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পরাজিত ভলান্টিয়ার বাহিনী অনবরত পিছু হটলেও এমন সাংঘাতিক কড়াকড়ি শৃঙ্খলা কায়েম করা হল এখন, যে প্রতি-পদেই তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল একটি একক ইচ্ছাশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। যান্ত্রিক বশ্যতায় তারা গোঁয়ারের মতো আঁকড়ে রইল প্রতিটি মাটির ঢিবি যেখান থেকে লড়া যায়, আর ধূর্ত কৌশলের সংগে খুঁজে বের করতে লাগল শত্রুর দুর্বলতম উরুস্থল। তারপর পঁচিশে জুলাই তারিখে তিখোরেৎস্কায়া থেকে তিরিশ মাইল দূরে ভিসেল্‌কির কাছাকাছি এলাকায় শুরু হল দশম দিনের শেষ লড়াই; সে-লড়াইয়ে হেস্তনেস্ত হয়ে গেল সবকিছু।

আগের কয়েকদিন যেমন ছিল তার চেয়েও সেদিন শোচনীয় হয়ে পড়েছে ব্রজ্‌দভস্কি আর কাজানোভিচের পল্টনের অবস্থা। লাল সৈন্যরা শত্রুর পশ্চাদ্‌-ভাগে ঢুকে পড়েছে। বেলায়া গ্লিনাতে বলশেভিকদের যে-দশা হয়েছিল এখানেও ঠিক তেমনিভাবেই ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে গেল ভলান্টিয়াররা। কিন্তু ন'দিন আগে সরোকিনের ফৌজ যা ছিল আজ কি আর তার কিছু অবশিষ্ট আছে! শিথিল হয়ে গেছে সেই সাগ্রহ তৎপরতা, শত্রুর একরোখা প্রতিরোধের ফলে সেপাইরা আর ভরসা পাচ্ছে না, ওদের মনে ঢুকেছে সন্দেহ আর হতাশা—কবে যে জয় হবে, কবে বিশ্রাম পাবে, কে জানে!

বেলা তিনটের পরই সরোকিনের ফৌজ ছুটল সারা রণাংগন জুড়ে একসংগে হামলা চালাতে। সংঘর্ষ হল প্রচণ্ড। দিগ্‌বলয়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গর্জাতে লাগল কামান। পাশাপাশি কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে এগোলো সৈন্যরা, আড়াল নেবার কোনো চেষ্টাই করল না তারা। উত্তেজনাময় অধীরতা আর উন্মাদনা যেন এবার ফেটে পড়ার জোগাড়।

কিন্তু সরোকিনের ফৌজের সর্বনাশের এই তো সবে শুরু। আগুন আর ইস্পাতের অভ্যর্থনা জুটল প্রথম আক্রমণকারী সৈন্যসারিটার ভাগ্যে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারা। পরের সারিগুলোও এক-এক করে শত্রুর গোলাবর্ষণে ছত্রভংগ হয়ে পড়ল, অসংখ্য হতাহত আর মরণোন্মুখ সৈনিকের ভিড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। তারপরেই হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা আগে থাকতে আন্দাজ করাও যায়নি, বোঝাও যায়নি, আর যা রোখাও সম্ভবপর ছিল না—সৈনিকদের তৎপরতা যেন নিমেষের মধ্যে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল। লড়াইয়ের একফোঁটা উৎসাহ নেই, শক্তিও নেই তখন।

স্থির ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে-করে আঘাত হানতে লাগল শত্রু, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে আরো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল তারা।...উত্তর দিক থেকে মারকভের ইউনিটগুলো, অশ্বারোহী রেজিমেন্ট একটা, আর দক্ষিণ দিক থেকে এরদেলির ঘোড়সওয়ার বাহিনী একযোগে লাল সৈন্যদের ছত্রভংগ ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলল। শ্বেতরক্ষী সাঁজোয়া গাড়িগুলো বিধ্বংসী গুলিগোলা ছুঁড়তে

ছ‍ুঁড়তে গ‍ুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। বেলা চারটের মধ্যেই সমগ্র স্তেপে ছড়িয়ে পড়ল পেছ‍ু-হটা সরোকিন-ফৌজ, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ করতে লাগল তারা—কর্মক্ষম বাহিনী হিসেবে সরোকিনের ফৌজের আর অস্তিত্বই রইল না এখন।

সর্বাধিনায়ককে জোর করেই মোটরগাড়ির মধ্যে ঠেলে দিলেন চীফ-অব-স্টাফ বেলিয়াকভ। সরোকিনের লাল টক্‌টকে চোখদ‍ুটো তখন বিস্ফারিত, ঠোঁটের কোণে গাঁজলা জমেছে, কাল্‌চে হয়ে-ওঠা হাতখানা তখনো চেপে রয়েছে খালি রিভলবারের বাঁট। অসংখ্য মৃতদেহের ওপর দিয়ে পাগলের মতো ছ‍ুটে চলল ব‍ুলেট-বিদীর্ণ, ঝাঁঝরা-হয়ে-যাওয়া গাড়িটা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়গ‍ুলোর আড়ালে।

সরোকিনের বিধ্বস্ত ফৌজের প্রধান অংশটা ফিরে চলল একাতেরিনোদারের দিকে। পশ্চিম এলাকার লালফৌজী গ্র‍ুপটা অর্থাৎ সেনাপতি কঝ‍ুখ্‌-এর পরিচালনাধীন তথাকথিত তামান আর্মিও তখন ওইদিকেই পালিয়ে আসছিল তামান-উপদ্বীপের দিক থেকে। ওদের পশ্চাদপসরণের রাস্তা বরাবর সমস্ত গ্রামগ‍ুলোতে অভ্যুত্থান শ‍ুর‍ু হল। "বহিরাগতরা" কসাকদের অত্যাচারের ভয়ে গর‍ুবাছ‍ুর-সম্পত্তি নিয়ে ছ‍ুটে আসতে লাগল তামান-বাহিনীর কাছে আশ্রয়ের আশায়। এদিকে রাস্তা আটকে রেখেছে জেনারেল পক্‌রোভ্‌স্কির শ্বেত-অশ্বারোহীদল। তামান-বাহিনী যদিও শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে এই অশ্বারোহী দলটাকে ছত্র-ভঙ্গ করে দিতে সমর্থ হল, কিন্তু একাতেরিনোদারের দিকে এগিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে হয়ে পড়ল অসম্ভব। কঝ‍ুখের বাহিনী তাই অসংখ্য উদ্বাস্তু অন‍ুগামী সঙ্গে নিয়েই সবেগে দক্ষিণ দিকে ঘ‍ুরে ছ‍ুটতে লাগল দ‍ুর্গম অরণ্যসংকুল পার্বত্য অঞ্চলের দিকে। ওদের আশা ছিল এইভাবে বেষ্টনী ভেঙে ওরা নভোরোসিস্ক্‌ গিয়ে পৌঁছ‍ুবে—যেখানে এখন লালফৌজের কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর নোঙর করে রয়েছে।

দেনিকিনকে ঠেকাবার আর কোনো উপায় নেই এখন। অবলীলাক্রমে পথ পরিষ্কার করতে করতে তিনি তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে ছ‍ুটে চলেছেন একাতেরিনোদারের দিকে। আগে যেটা 'উত্তর-ককেসীয় ফৌজ' নামে পরিচিত ছিল তারই একটা হতাবশিষ্ট অংশ তখনও একাতেরিনোদার শহর হাতে রেখেছিল। দেনিকিন সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে দখল করলেন একাতেরিনোদার। এইভাবে শেষ হল "তুষার অভিযান"—ছ'মাস আগে এ-অভিযান শ‍ুর‍ু করেছিলেন কর্নিলভ আর তাঁর ম‍ুষ্টিমেয় কয়েকজন সহকারী।

শ্বেতরক্ষীদের রাজধানী হল একাতেরিনোদার। এক ম‍ুহ‍ূর্ত সময় নষ্ট না করে কৃষ্ণসাগরের উর্বর এলাকা থেকে সমস্ত বিপজ্জনক আর বিপ্লবী লোককে বিতাড়িত করা হল। এই অল্প ক'দিন আগেও যে-সমস্ত জেনারেল বসে-বসে শ‍ুধ‍ু জামার উকুন বাছতেন, আজ তাঁরা প‍ুনর‍ুদ্ধার করলেন মহান্‌ রাষ্ট্রের হৃত-ঐতিহ্য, সাবেকী সাম্রাজ্যের দাপট আবার ফিরিয়ে আনলেন তাঁরা।

লড়াইয়ের ময়দানেই শত্র‍ুর হাত থেকে হাতিয়ার আর রসদ ছিনিয়ে নিয়ে

কিংবা বলশেভিকদের ভাণ্ডার লুট করে অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বাড়াবার যে পুরনো 'দেশী' কায়দা ছিল, তা এখন অচল—নতুন নতুন বিরাট সব পরিকল্পনা রয়েছে এখন, ওসব পুরনো কায়দা আর সাজে না। এখন দরকার হল টাকা, দরকার হল হাতিয়ার-রসদের নিয়মিত জোগান, প্রকাণ্ড আকারে সরবরাহ-ব্যবস্থা, আর রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলা চালাবার জন্য শক্ত-শক্ত ঘাঁটি।

স্থানীয় আকারে ঘরোয়া-লড়াইয়ের যুগ শেষ হয়েছে, এবার লড়াইয়ের আঙিনায় আসছে জবরদস্ত সব বৈদেশিক শক্তি।

জুন মাসে দেনিকিনের বিজয় অভিযানের ফলে জার্মান হাইকম্যান্ড যেন একটু বেয়াড়া আর অপ্রত্যাশিত ধরনের বিপদের সম্মুখীন হল। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক্'এর চুক্তির ফলে ওদের বলশেভিক দুশমনটির হাত-পা ছিল বাঁধা। কিন্তু দেনিকিন হল এমন এক প্রতিপক্ষ যার চরিত্র জার্মানদের অজানা, ভালো করে বোঝার অবসরও পায়নি তারা। সরোকিনের ফৌজকে চূর্ণ করে দেনিকিন একেবারে আজভ-সাগর আর নভোরোসিস্ক্ পর্যন্ত এগিয়ে যাবার সুবিধে পেয়েছেন। আর এই নভোরোসিস্কেই তখন গোটা রুশ নৌবহরটা নোঙর করে ছিল সেই মে-মাসের শুরু থেকে।

কৃষ্ণসাগরের তরফ থেকে আক্রমণ ঠেকাবার কোনো রক্ষাব্যবস্থা জার্মানদের ছিল না। নৌবহর যতক্ষণ বলশেভিকদের হাতে ততক্ষণ কোনো উদ্বেগ নেই ওদের, কারণ সমুদ্রের দিক থেকে কোনোরকম আক্রমণের চেষ্টা হলেই ওরা তার পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে উক্রেইনীয় সীমানা অতিক্রম করে। কিন্তু দেনিকিনের হাতে পনেরোটা ডেস্ট্রয়ার আর ড্রেড্নট্-ধরনের দুটো যুদ্ধ জাহাজের অর্থ হল কৃষ্ণ-সাগরকে বিশ্বযুদ্ধের আর একটি রণাঙ্গনে পরিণত করা।

জুন মাসের দশ তারিখে সোবিয়েত সরকারকে চরমপত্র দিল জার্মানি। চরমপত্রে দাবি করা হল, আগামী নয়দিনের মধ্যে গোটা কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর নভোরোসিস্ক্ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেবাস্তোপোলে। সেখানে জার্মানদের একটা শক্তিশালী ফৌজ মোতায়েন আছে। এই চরমপত্রের দাবি পূরণ না করলে তার শাস্তিস্বরূপ মস্কোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে জার্মানরা।

একই সময়ে আবার ওদেসা-দখলকারী অস্ট্রিয়ান ফৌজের চীফ-অব-স্টাফ নিচের এই বার্তাটি পাঠালেন ভিয়েনার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে :

"উক্রেইনে জার্মানি একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া অগ্রসর হইতেছে। বাকু ও পারস্য হইয়া মেসোপটেমিয়া ও আরবে পৌঁছিবার একটা নিরাপদ রাস্তা তাহারা নিজেদের জন্য পাকাপাকিভাবে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে উৎসুক।

"প্রাচ্যদেশে যাইবার রাস্তা কিয়েভ, একাতেরিনোস্লাভ ও সেবাস্তোপোলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেবাস্তোপোল হইতে আবার সমুদ্রপথে বাতুম ও ত্রাপেজুন্দ্ যাওয়া যায়।

"জার্মানি চায় ক্রিমিয়াকে দখলে রাখিতে—হয় জার্মান উপনিবেশ হিসাবে,

আর নয়তো অন্য কোনো উপায়ে। অমূল্য ক্রিমিয়া-উপদ্বীপটিকে তাহারা কখনোই হাতছাড়া করিতে রাজি নয়। তাহা ছাড়া, এই রাস্তাটিকে পুরাপুরি ব্যবহার করিতে হইলে প্রয়োজন প্রধান রেলপথগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, আর যেহেতু এই রেলপথ এবং কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলির জন্য জার্মানি হইতে কয়লা আমদানি করা অসম্ভব, তাই জার্মানির পক্ষে অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হইল দন কয়লাখনি-এলাকার বড়ো বড়ো খনিগুলিকেও আয়ত্তে রাখা! এই সমস্তই জার্মানি হাঁসিল করিতে চায় যে-কোনো সম্ভাব্য উপায়ে।......"

১০ই জুন তারিখে যখন জার্মান চরমপত্রটি মস্কোতে এসে পৌঁছুল, লেনিনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততার সঙ্গে এই জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেললেন—অথচ অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল এ সমস্যার বুঝি আর সমাধান নেই। সিদ্ধান্ত হল : জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করা বর্তমান অবস্থায় যেমন অসম্ভব, ওদের হাতে নৌবহর তুলে দেওয়াও তেমনি একই রকম অচিন্তনীয়।

সোবিয়েত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মস্কো থেকে কমরেড ভাখ্রামিয়েভ্-কে পাঠানো হল নভোরোসিস্ক্-এ। কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের প্রতিনিধি ও কম্যান্ডারদের এক সভায় তিনি ঘোষণা করলেন, জার্মান চরমপত্রের একমাত্র বলশেভিক জবাব যা হতে পারে তা হচ্ছে : কৃষ্ণসাগরীয় রণতরীবহরের কাছে পিপ্লস্-কমিসারদের পরিষদ খোলাখুলি বেতারবার্তা পাঠাক্ সেবাস্তোপোলের দিকে রওনা হয়ে জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার হুকুম জানিয়ে। কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর কিন্তু এ হুকুম মানতে রাজি হল না, ওরা ঠিক করল নভোরোসিস্ক্-এর সমুদ্রপথে বরং জাহাজগুলোকে ওরা ডুবিয়ে দেবে।

দুটো ড্রেড্নট্, পনেরোটা ডেস্ট্রয়ার, কয়েকটা সাবমেরিন আর ছোটখাট সহগামী জাহাজ নিয়ে সোবিয়েত নৌবহর নভোরোসিস্ক্ ছেড়ে খানিকটা দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল—ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক্ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা হাত-পা-বাঁধা হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

জাহাজের প্রতিনিধিরা ডাঙায় এসে গম্ভীরভাবে শুনল ভাখ্রামিয়েভের বক্তব্য—ওদের কানে তার প্রস্তাবটা মনে হল আত্মহত্যারই সামিল। কিন্তু ওরাও খুঁজে পেল না আর কোনো রাস্তা, কারণ নৌবহরের নেই তেল, নেই কয়লা। এদিকে মস্কোর সামনে পাঁয়তারা কষছে জার্মানরা, পুব দিক থেকে এগিয়ে আসছেন দেনিকিন, জার্মান ইউ-বোটের পেরিস্কোপগুলোকে এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে জাহাজী রাস্তার ওপর দিয়ে ফেনার দাগ কেটে-কেটে ঘুরে বেড়াতে, নীল আকাশের গায়ে ঝক্মক্ করে উঠছে জার্মান বোমারুবিমান। প্রতিনিধিরা অনেকক্ষণ ধরে গরম-গরম তর্ক করল।......একটিমাত্র পথই খোলা আছে : জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেয়া।... এমন একটা ভয়ানক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি এসে অবশেষে প্রতিনিধিরা সাব্যস্ত করল, নৌবহরের ভাগ্য ছেড়ে দেয়া হোক্ সমস্ত নাবিকের ভোটের ওপর।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভা হতে লাগল নভোরোসিস্ক্-এর জাহাজ-ঘাটায়। বিরাট বিরাট ইস্পাত-ধূসর দৈত্য নোঙর করে আছে সেখানে—আছে ড্রেড্নট্ 'ভলিয়া'

(স্বাধীনতা), 'স্ভবোদ্‌নায়া রসিয়া' (মুক্ত রাশিয়া), আছে দ্রুতগামী ডেস্ট্রয়ার যারা লড়াইয়ে নাম কিনেছে, আর অসংখ্য মাস্তুল ও বুরুজের জটিল অরণ্য রয়েছে জাহাজ-ঘাটার শীর্ষে, মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নাবিকরা। ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে বিপ্লবের এই সব অজেয় সম্পত্তি, জাহাজীদের এই সব ভাসমান স্বদেশভূমি কখনো সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে একটিও গোলা না ছুঁড়ে, একটুও রুখে না দাঁড়িয়ে।

কৃষ্ণসাগরের নাবিকেরা অত নির্বিবাদে আত্মহত্যার প্রস্তাব মেনে নেবার মানুষ নয়। ভয়ানক কড়া-কড়া কথা বলতে শুরু করল তারা আর আক্রোশে বুক চাপড়াতে লাগল; কতো অসংখ্য উল্কি-আঁকা বুক থেকে ছিঁড়ে পড়ল তক্‌তি, পায়ের নিচে পিষ্ট হল ফিতে-লাগানো জাহাজী টুপি।......

জাহাজী, যুদ্ধফেরত সেপাই আর সমুদ্রতীরের নানা ধরনের বাসিন্দা এসে ভিড় জমাতে থাকে জাহাজঘাটায়, সূর্য ওঠার সময় থেকে সারাদিন তারা কাটিয়ে দেয় দারুণ উত্তেজনায়, সে ভীড় লেগে থাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যখন ওই অভিশপ্ত সাগরের বেগুনি জলের ম্লানিমা মুমূর্ষু সূর্যের কিরণে একেবারে টকটকে লাল হয়ে ওঠে।—ও সমুদ্রকে শাসনের অধিকার হারিয়েছে তারা।

কম্যাণ্ডার আর জাহাজের অফিসারদের মতের মিল হয় না; বেশির ভাগই মনে-মনে সেবাস্তোপোল চলে যাওয়ার পক্ষপাতী, তাদের গোপন ইচ্ছা জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার; কিন্তু এদিকে একটা সংখ্যালঘু দলও আছে যারা ভালরকমই বোঝে যে আসন্ন এই ভয়ংকর বিপর্যয়টাকে ঠেকাবার কোনো উপায় নেই, বোঝে যে ভবিষ্যতের পক্ষে এ ঘটনার তাৎপর্যও অপরিসীম। রণতরী 'কার্চ'-এর অধিনায়ক সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট কুকেল হল এই দলের নেতা। এরা বলে :

"আমাদের আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে হবে। সাময়িকভাবে তাই কৃষ্ণ-সাগর নৌবহরের ইতিহাস আমাদের রুদ্ধ করে রাখতে হবে, এর প্রত্যেকটি পাতা অকলঙ্কিত রেখে......"

সগর্জন সমুদ্র-ঝড়ের মতো চোখ-ধাঁধানো এই সব বিশাল জনসভায় হয়তো সকালের দিকে এক ধরনের প্রস্তাব পাশ করা হল, বিকেলের দিকে পাশ করা হল অন্যরকম। সবচেয়ে তারিফ হয় সেই সব বক্তার যারা মাটিতে টুপি ছুঁড়ে ফেলে সচীৎকারে ঘোষণা করে :

"কমরেডস্‌, ওই মস্কো-ওয়ালারা গোল্লায় যাক্‌! ওরা যদি পারে তো নিজেরাই এসে ডোবাক্‌ না কেন জাহাজ! আমরা কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দেব না। জার্মানদের সঙ্গে লড়ব শেষ অবধি......"

"হুররে, হুররে"—বজ্রধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে সারা জাহাজঘাটা।

বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে যখন চরমপত্রের শর্তকাল শেষ হবার চারদিন আগে একাতেরিনোদার থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে দুজন প্রতিনিধি : একজন হল রুবিন—কৃষ্ণ-সাগর প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি, এবং আরেকজন হল ফৌজী প্রতিনিধি পেরেবিনোস্‌—ভয়ংকর চেহারার একটি দানববিশেষ, কোমরে

তার সব সময় ঝোলে চার-চারটে রিভলবার। রুবিন একটা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ে, আর রিভলবার তড়পে মোটা বাজখাঁই গলায় চেঁচায় পেরেবিনোস্, দুজনেই ঘোষণা করে : নৌবহর জার্মানদের হাতে ছেড়ে দেয়া চলবে না, ডোবানোও চলবে না; মস্কোর ওই লোকগুলো নিজেরাই জানে না তারা কী বলছে; আর, নৌবহরের জন্য যতো খুশি তেল, কামানের গোলা আর খাবার সরবরাহ করবে কৃষ্ণ-সাগর প্রজাতন্ত্র।

"শালার যুদ্ধে এখন আমাদের এমনি শালার দুর্দান্ত অবস্থা"—একরাশ গালিগালাজের সঙ্গে খ্যাঁকাতে শুরু করে পেরেবিনোস্ : "যে আসছে হপ্তায় ঐ কুত্তীর-বাচ্চা দেনিকিনটাকে জলে চুবিয়েই মারব, কুবানে হতভাগার যে ক্যাডেটগুলো রয়েছে সেগুলোকেও অমনি সাবাড় করব।......জাহাজ তোমরা ডুবিও না ভাইসব—লড়াইয়ের ময়দানে আমরা এইটুকু শুধু বুঝতে চাই যে পেছনে আমাদের একটা জবরদস্ত নৌবহর রয়ে গেছে। ভাইসব, তোমরা যদি জাহাজ নেহাৎই ডোবাও তা'হলে গোটা কুবান-কৃষ্ণসাগর বিপ্লবী ফৌজের নামে এই আমি ঘোষণা করছি যে এ-বেইমানি আমরা বরদাস্ত করব না, তোমরা যদি আমাদের এমনি এক মরিয়া অবস্থার মধ্যে সত্যিই ঠেলে দাও তা'হলে চল্লিশ হাজার সেপাই নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব নভোরোসিস্ক্-এর ওপর, সঙ্গীনের ডগা দিয়ে তোমাদের প্রত্যেকটি লোককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব।......"

রুবিনদের এই সভার পর, সব যেন আরো গোলমেলে হয়ে উঠল, মাথা ঘুরে গেল সকলের। জাহাজ ছেড়ে চলে এল খালাসীরা, ইচ্ছামতো ছুটে বেড়াতে লাগল যেদিকপানে খুশি। ভিড়ের মধ্যে আরো বেশি-বেশি সংখ্যায় দেখা যেতে লাগল সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের। দিনের বেলায় তারা গলা ফাটিয়ে চেঁচায় : "জার্মানদের সঙ্গে শেষ গুলিটি অবধি লড়ো!" কিন্তু রাত হলেই তারা ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে চুপি-চুপি ঢোকে জনবিরল ডেস্ট্রয়ারগুলোতে, যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে খালাসীদের তারা ফেলে দিতে পারে জাহাজের বাইরে, তারপর চালাতে পারে লুটতরাজ।

ঠিক এমনি দিনেই সেমিয়ন ক্রাসিল্নিকভ এসে হাজির হল 'কাচ্' রণতরীতে।

কম্পাসের পিতলের আধারটা পালিশ করছিল সেমিয়ন। সকাল থেকে কাজে লেগে গেছে জাহাজের সমস্ত খালাসী, রণতরীর ঘষা-মাজা, পরিষ্কার করার কাজে সবাই ব্যস্ত। জাহাজটা নোঙর করা হয়েছে ঘাট-সিঁড়ির খুব কাছেই। রোদ-পোড়া পাহাড়তলীর ওপাশে সূর্য উঠছে—চড়া গরম।......নিশ্চল উষ্ণ বাতাসে জাহাজের ঝান্ডাগুলো নেতিয়ে পড়েছে। পিতলের জিনিসগুলো সেমিয়ন ঘষেই চলেছে যাতে জাহাজঘাটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে না হয়। খালাসীরা ডেস্ট্রয়ারটাকে শেষবারের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছিল তার সলিলসমাধির আগে।

বন্দরে ড্রেড্নট্ 'ভলিয়া'র বড়ো-বড়ো চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছিল মেঘের মতো। কামানের ওপর থেকে ত্রিপল সরিয়ে নেয়া হয়েছে, ঝক্ঝক্ করছে সেগুলো। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে আকাশ। উপসাগরের আয়নার মতো স্বচ্ছ

জলে ছায়া মেলেছে জাহাজ, ধোঁয়া, বাদামী পাহাড় আর পাহাড়ের পাদদেশের সিমেণ্ট কারখানাগুলো।

সেমিয়নের খালি পা। পাটাতনে বসে দারুণ মনোযোগ দিয়ে পিতল ঘষছে। গত রাতে পাহারায় দাঁড়িয়েছিল ও, মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেয়েছে একটি চিন্তা—না এলেই বোধহয় ভাল হত। দাদা আর মাত্রিয়োনার কথা না ফেললেই পারত সে।......এখন তো ওরা ঠাট্টা করবে : "ও, এইভাবেই তাহলে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছ!" বলবে : "তোমরা জাহাজগুলোকে বেচে দিলে শেষে!" তখন কী জবাব দেবে ও? ও কি বলবে : "আমি সাফ করে পালিশ করে কার্চ্ জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিয়েছি নিজের হাতে"?

'ভলিয়া' থেকে ছাড়া হয়েছে একটা মোটর লঞ্চ, সিগন্যালম্যান গলুইয়ের ওপর বসে হাত নেড়ে-নেড়ে সংকেত জানাচ্ছে—এক এক করে লঞ্চটা প্রত্যেকটা জাহাজেই গিয়ে লাগছে। বয়ার শেকল খুলে বেরিয়ে গেল ডেস্ট্রয়ার 'দের্জ্কি' ('সাহসী'); 'বেস্পকয়নি' ('দুর্দম') নামে আরেকটা জাহাজকে পেছনে বেঁধে ধীরে ধীরে চলল বার-দরিয়ার দিকে। আরো আস্তে-আস্তে, অনেকটা অসুস্থ রুগীর মতোই, উপসাগরের মসৃণ বুকের ওপর দিয়ে 'ভলিয়া'র পেছন পেছন গড়িয়ে চলল ডেস্ট্রয়ার 'পস্পেশ্নি' (দ্রুতগামী), 'ঝিভয়' (প্রাণ-চঞ্চল), 'ঝার্কি' (উৎসাহী) আর 'গ্রম্কি' (গর্জন)।

কিন্তু এর পরই ছেদ পড়ল মিছিলে। আটটা ডেস্ট্রয়ার জাহাজঘাটাতেই রয়ে গেছে। নড়াচড়ার কোনো লক্ষণই নেই তাদের। সমস্ত চোখগুলো এখন 'ভলিয়া'রই দিকে—হালকা-ধূসর ইস্পাতের পাহাড়টার দু'পাশে মরচের দাগ পড়েছে ডোরা ডোরা। নাবিকরা এখন জাহাজ-মোছা ন্যাকড়া, তোয়ালে আর নলের মুখের কথা ভুলে গেছে, ওরা চেয়ে আছে 'ভলিয়া'র দিকে। নৌবহরের প্রধান অধিনায়ক কমোডোর তিখ্মেনেভের পতাকা অলসভাবে পত্পত্ করছে মৃদু বাতাসে।

'কার্চ্' ডেস্ট্রয়ারের নাবিকরা উদ্বিগ্ন চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে :

"দেখবে ভাই......'ভলিয়া' শেষ অবধি সেবাস্তোপোলেই যাবে।......"

"অত নোংরা কাজ কি ওরা করবে, মেট? ওদের কি একটুও বিপ্লবী বিচার নেই?"

"ভলিয়া গেলে আর কাকে বিশ্বাস করব, বল?"

"হ্যাঁঃ, তিখ্মেনেভ্কে যেন এখনো চিনতে বাকি আছে! ওই আমাদের আসল দুশমন, একেবারে খাঁটি শয়তান।"

"জাহাজটা যে সত্যিই চলল! উঃ কী বেইমান!"

'ভলিয়া'র পাশেই নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল ওরই দোসর 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'। কিন্তু সে যেন নিশ্চিন্তে ঝিমোচ্ছে মনে হল—সবগুলো কামানই ত্রিপল-ঢাকা, ডেকের ওপর জনপ্রাণীও নেই। ঘাটসিঁড়ির দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে লাগল অসংখ্য নৌকো। এমন সময় হঠাৎ খালাসীর শিটির আওয়াজে উপসাগরের

নীরবতাটুকু ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল 'ভলিয়া'র চাকার দাঁড়, দু'পাশ থেকে ওপরে উঠে যেতে লাগল জল-ভেজা শিকল আর পলিমাটি-মাখা নোঙরগুলো। গলুইয়ের দিকটা ঘুরতে শুরু করল, শহরের সূর্যস্নাত বাড়ির ছাদগুলোকে পেছনে ফেলে গতিশীল হয়ে উঠলো অসংখ্য চিমনি আর দড়ি-দড়ার জাল।

"ওরা যে যাচ্ছে!......জার্মানদের কাছে চলল!......উঃ, জাহাজী ভাইসব...... শেষটায় জার্মানদের কাছে চলল নিজেদের সঁপে দেবার জন্য!...এ কী করলে তোমরা?"

'কার্চ্'-এর কাপ্তেন এসে দাঁড়ালেন বুরুজের মাথায়, চটা-ওঠা প্রকাণ্ড নাকটা জেগে আছে রোদ-পোড়া মুখটার ওপর। চোখ কুঁচকে উনি 'ভলিয়া'র গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। বুরুজের ওপর ঝুঁকে পড়ে হুকুম করলেন :

"সিগন্যাল দেখাও!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ"—সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল নাবিকরা, সিগন্যাল পতাকার বাক্সটার দিকে ছুটে গেল ওরা। 'কার্চ্'-এর মাস্তুলের ওপর পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগল ছোট ছোট নিশান, বিভিন্নভাবে সাজিয়ে ওদের মারফত সংকেত জানানো হল :

"যে-সব জাহাজ সেবাস্তোপোলে যাচ্ছে রাশিয়ার সেই বিশ্বাসঘাতকদের আমরা ধিক্কার জানাই!"

সংকেত-বার্তাটা যেন লক্ষ্যই করেনি এমনি ভাব করে সংকেতের কোনো জবাবই দিল না 'ভলিয়া'। পরিত্যক্ত, অবমানিত অবস্থায় আর-আর সব সাচ্চা ইমানদার রণতরীর পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে। নাবিকরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : "ওরা আমাদের সিগন্যাল দেখেছে!" 'ভলিয়া'র পাছ-গম্বুজের ওপর যে প্রকাণ্ড কামান দুটো রয়েছে তাদের মুখ উঁচু হয়ে উঠল, গম্বুজটা ঘুরল 'কার্চ্' রণতরীর দিকে।... রেলিংটা শক্ত হাতে চেপে 'কার্চে'র কাপ্তেন তাঁর প্রকাণ্ড নাকটা বাগিয়ে রইলেন আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায়। কিন্তু কামানগুলো শুধু একবার ঘুরে গিয়েই মুখ নিচু করল।

ভাসমান ঘাটসিঁড়ির পাশ কাটিয়ে 'ভলিয়া' ক্রমেই জোরে ছুটতে লাগল। অল্পক্ষণ বাদেই দিগ্‌বলয়ের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল তার সগর্ব রেখাকৃতি—বহু বছর পরে ভলিয়াকে আবার দেখা গিয়েছিল সেই সুদূর বিজার্তা বন্দরে—মরচে-ধরা অবস্থায়, নিরস্ত্র, চিরদিনের মতো ধিক্কৃত।

নৌবহরের প্রধান অধিনায়ক তিখ্‌মেনেভ দাবি করেছিলেন পিপ্‌লস্‌ কমিসার পরিষদের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে, আর তাই ড্রেডনট 'ভলিয়া' ও অন্য ছ'টি ডেস্ট্রয়ারও সেবাস্তোপোলে গিয়ে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। 'ভলিয়া'র সমস্ত অফিসার আর নাবিককে কাজ ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেয়া হল।

জাহাজীরা ফিরে আসে যার-যার বাড়িতে আর জন্মভূমিতে। তারা অবশ্য বলে যে নিজেদের জাহাজ ডোবাবার ব্যাপারে তারা কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারেনি, কিন্তু আসল কারণ হল, লালফৌজের চল্লিশ হাজার সেপাই নভোরোসিস্ক্-এর সমস্ত মানুষকে কচুকাটা করবে বলে শাসাবার ফলে ওরা ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠেছিল।

ড্রেড্‌নট্‌ 'স্ভবোদ্‌নায়া রসিয়া' আর আটটা ডেস্ট্রয়ার নভোরোসিস্ক্‌ বন্দরেই রয়ে গেল। আগামীকাল চরমপত্রের শর্ত পূরণ করার শেষ দিন। শহরের আকাশে অনেকটা উঁচুতে চক্কর দিতে লাগল জার্মান এয়ারপ্লেন। বার-দরিয়ায় শুশুক লাফিয়ে ওঠে, জার্মান ইউ-বোটের পেরিস্কোপগুলো দেখা গেল তাদেরই মধ্যে-মধ্যে। জার্মানরা নাকি কাছেই একজায়গায়, তেমারিয়ুকে অবতরণ করেছে। নভোরোসিস্ক্‌-এর ডকে গরম-গরম সভাসমিতি চলল দিনরাত, সাধারণ নাগরিকের পোশাকে সন্দেহজনক চরিত্রের সব লোক চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে দাবি জানাতে লাগল :

"জাহাজী ভাইসব, নিজেদের ধ্বংস হতে দিও না, ডুবিও না জাহাজ......"

"শুধু অফিসাররাই চায় জাহাজ ডোবাতে, সবগুলো অফিসার ঘুষ খেয়েছে 'আঁতাতী' * দলের কাছে, প্রত্যেকটা অফিসার......"

"ডিসেম্বর মাসে তোমরাই তো অফিসারদের জলে ডুবিয়ে মেরেছিলে সেবাস্তোপোলে—তা হলে আজ কেন ঘাবড়াচ্ছ? আবার একহাত দেখিয়ে দাও না ভাইসব!"

তারপরেই হয়তো একজন আন্দোলনকারী আসে হাঙ্গামাবাজ লোকটার জায়গায়, শার্টের সামনের দিকটা ছিঁড়ে ফেলে চীৎকার করে ওঠে :

"শত্রুর দালালদের কথায় কান দিও না কমরেড! জার্মানদের হাতে যদি জাহাজ তুলে দাও তাহলে ওরা তোমাদের তোপের মুখে তোমাদেরই উড়িয়ে দেবে।...... সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিও না, কমরেড।......দুনিয়াজোড়া বিপ্লবকে বাঁচাও!......"

কেমন করে লোকে বুঝবে কার কথায় কান দিতে হবে? আন্দোলনকারীটির পরেই হয়তো লাফিয়ে ওঠে একাতেরিনোদার থেকে সদ্য লড়াই-ফেরতা কোনো সেপাই; সর্বাঙ্গে যাবতীয় হাতিয়ার ঝুলিয়ে সে আরেকবার শুনিয়ে দেয় চল্লিশ হাজার বেয়নেটের কথা। এমনি করে, আঠারোই জুনের রাতে দেখা গেল, অনেক জাহাজীই ফিরে আসেনি জাহাজে, সবাই সরে পড়েছে, কেউ আত্মগোপন করেছে, কেউ পালিয়েছে পাহাড়ের দিকে।

সারা রাত ধরে রণতরী 'কার্চ্‌' অন্য জাহাজগুলোর সঙ্গে সিগন্যালের মারফত কথাবার্তা চালালো। 'স্ভবোদ্‌নায়া রসিয়া' জবাবে জানালো যে নীতিগতভাবে সে আত্মনিমজ্জনের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু দু'হাজারের মধ্যে মাত্র দু'শো খালাসী এখন তার রয়েছে, এবং এদের মনেও সন্দেহ আছে জাহাজঘাটা ছেড়ে এগিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট বাষ্প তৈরি করতে পারবে কিনা।

ডেস্ট্রয়ার 'হাদ্‌ঝি-বে' সংকেতে খবর জানিয়ে দিল, ডেকের ওপর এখনো জোর মিটিং চলছে, জাহাজে অনেক মেয়েমানুষও আমদানি হয়েছে বোতলের সঙ্গে সঙ্গে, খুব সম্ভব বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওদের পাঠানো হয়েছে, আর মনে হচ্ছে জাহাজে খুবসম্ভব লুটপাট হবে। টর্পেডোবোট 'কালিয়াকিরিয়া'র ডেকের ওপর রয়েছেন

* 'মিত্রশক্তি'

শুধু কাপ্তেন আর জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার। আর 'ফিদোনিসি' জাহাজেও ছ'জনের বেশি নাবিক নেই। একই ধরনের জবাব এল ডেস্ট্রয়ার 'কাপ্তেন বারানভ' থেকে, স্মেত্‌লিভি' (জাগ্রত), 'স্ত্রেমিতেল্‌নি' (তেজোদৃপ্ত), আর 'প্রন্‌জিতেল্‌নি' (সতর্ক) থেকে। পুরো খালাসী রয়েছে বলে গর্ব করতে পারত শুধু 'কার্চ্' আর 'লেফ্‌টেন্যান্ট শেস্তাকভ্‌'।

মাঝরাতের দিকে একটা নৌকো এগিয়ে এল 'কার্চের' দিকে। ভারি গলায় কে যেন বলল :

"কমরেড জাহাজীরা......কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পত্রিকা 'ইজ্‌ভেস্তিয়ার' সংবাদদাতা আমি কথা বলছি। মস্কো থেকে আমরা এইমাত্র একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি এ্যাডমিরাল সাবলিনের : আপনারা কোনোক্রমেই জাহাজ ডোবাবেন না, বা সেবাস্তোপোলেও যাবেন না, যতক্ষণ না পরবর্তী নির্দেশ আসে, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন......"

নাবিকরা রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়ল, অন্ধকারে দোলায়মান নৌকাটাকে ভালো করে ঠাহর করবার চেষ্টা করল ওরা। গলার স্বরটায় তখনো শোনা যাচ্ছে তর্ক আর অনুরোধ-উপরোধ।...সিনিয়র লেফ্‌টন্যান্ট কুকেল বুরুজের ওপর উঠে বাধা দিয়ে বললেন :

"এ্যাডমিরাল সাবলিনের টেলিগ্রামটা দেখান তো!"

"দুর্ভাগ্যক্রমে টেলিগ্রামটা আমার কাছে নেই কমরেড, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।......"

যাতে সবাই শুনতে পায় এমনিভাবে পরিষ্কার করে চেঁচিয়ে বললেন কুকেল :

"গলুইয়ের দিক থেকে নৌকো আধ রশি দূরে হঠো, নয়তো......"

"মাপ করবেন কমরেড", সজোরে বলে উঠল কণ্ঠস্বর : "কেন্দ্রের হুকুম আপনি আনতে অস্বীকার করছেন, সুতরাং মস্কোতে আমাকে তার করতে হবে......"

"নয়তো নৌকো ডুবিয়ে দেব, আর আপনাকেও টেনে তুলব ডেকের ওপর। খালাসীদের কাজের জন্য আমি জবাবদিহি করতে যাচ্ছি না।"

নৌকো থেকে এর কোনো জবাব এল না, শুধু সাবধানে ছপ্‌ছপ্‌ করে উঠল দাঁড়, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অস্পষ্ট ছায়ারেখাটা। নাবিকরা হেসে উঠল। রোগা, গোল-কাঁধ কাপ্তেন দু'হাত পেছনে রেখে বুরুজের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন খাঁচায়-আটকানো পশুর মতো।

খুব অল্প লোকই সে রাতে ঘুমিয়েছিল। শিশির-ভেজা ডেকের ওপর শুয়েই কাটালো সবাই। মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা মাথা জেগে ওঠে, এক আধটা কথা বলে, আর তাতেই ঘুম টুটে যায় সকলের চোখ থেকে, বিড়বিড় করে আলাপ শুরু হয়ে যায়। তারাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে আসে, পাহাড়ের মাথায় ভোরের আলো দেখা দেয়। এমন সময় 'লেফটেন্যান্ট শেস্তাকভ' জাহাজের কাপ্তেন, মিডশিপম্যান আন্নেন্‌স্কি এলেন ডাঙা থেকে, জাহাজে এসে রিপোর্ট করলেন—শুধু যে ডেস্ট্রয়ার, পোর্ট-টাগ আর মোটরবোটের লস্কররা পালাচ্ছে তাই নয়, সওদাগরী জাহাজগুলোতে

পর্যন্ত একটি প্রাণীও নেই, সে জাহাজগুলোকে বার-দরিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন স্টীমারও নেই একটা।

'কার্চ'-এর কাপ্তেন জবাব দিলেন : "মিডশিপম্যান আন্নেন্স্কি, দায়িত্ব হল আমাদের, যেমন করে হোক জাহাজ আমরা ডুবিয়ে দেবই।"

মিডশিপম্যান আন্নেন্স্কি মাথা নাড়লেন। অল্প কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপরেই আন্নেন্স্কি আবার ডাঙগায় ফিরে গেলেন। সূর্য যখন মাঝ-আকাশে একেবারে উপসাগরের মাথায়, 'লেফটেন্যান্ট শেস্তাকভ্' তখন ভাসমান ঘাটসিঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে 'ক্যাপ্টেন বারানভ'-কে পেছনে বেঁধে নিয়ে—চলেছে বার-দরিয়ায় যেখানে তার আত্মনিমজ্জনের কথা। ডেস্ট্রয়ারগুলো মাস্তুলের ওপর তুলল সংকেত-পতাকা ঃ "জলের নিচে তলিয়ে গেলেও আমরা আত্মসমর্পণ করিনি।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ভোরের কুয়াশার আড়ালে। এখন মনে হচ্ছে সব জাহাজগুলোই বুঝি জনশূন্য, পরিত্যক্ত। ইস্পাতের পাহাড় 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'র মাথার ওপর উড়ছে গাং-চিলের দল। 'কার্চ'-এর চিমনি থেকে উঠছে ধোঁয়া। এত সকালেও ডকের দিকে জমেছে বিস্তর মানুষের ভিড়। ঘাটসিঁড়ির ওপর ছুটোছুটি করছে অসংখ্য মূর্তি, মনে হচ্ছে কালো কালো মাছি বুঝি থিক্ থিক্ করছে সেখানে। জাহাজগুলোর আশেপাশেও অসম্ভব রকম ঠেলাঠেলি ভিড়, এ ওর কাঁধ বেয়ে উঠছে, দু'চারজন পড়েও যাচ্ছে জলে।

জাহাজের সিঁড়িপথের মুখে পাহারায় দাঁড়িয়েছিল সেমিয়ন ক্লাসিল্নিকভ। পাঁচটা বাজার প্রায় সঙেগ সঙেগই খাটো মতো একজন লোক দুম্দাম করে উঠে এল সিঁড়িপথের ওপর, দারুণ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে লোকটি। পরনের কালো রীফার জ্যাকেটটার ওপর কাঁধপটি-টটিও কিছু নেই। লাল মুখটার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে আর ছোট-ছোট স্রোতের আকারে বেয়ে পড়ছে কোঁচকানো খুদে মুখটার দু'পাশ দিয়ে।

"সিনিয়র লেফটেন্যান্ট কুকেল কি এখানে আছেন?" সেমিয়নকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটি—বেয়নেট তুলে রাস্তা আটকে রেখেছে খালাসীটা, তাই তার দিকে জ্বলজ্বলে নীল গোল-গোল চোখে তাকিয়ে রইল সে। বুক আর দু'পাশের পকেট হাতড়ে অবশেষে একটা পরিচয়-পত্র বের করল, কেন্দ্রীয় সোবিয়েত কর্তৃ-পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড শাখভের নামে পরিচয়পত্রটা। গম্ভীরমুখে বেয়নেট নামিয়ে নিল নাবিক।

"রাস্তা ছাড়ো, কমরেড শাখভ!"

কুকেল এগিয়ে এলেন দেখা করতে। এসেই বলতে শুরু করলেন পরি-স্থিতির কথা। তার মতে অবস্থা এখন হতাশাজনকই বলা যায়। আস্তে আস্তে অনেক কথাই বললেন তিনি। অধৈর্যভাবে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল শাখভ :

"বাজে কথা বলছেন, এর আগে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় আমরা অনেক-বার পড়েছি! নাবিকদের সঙেগ কথা বলে দেখেছি, চমৎকার মনোবল রয়েছে

ওদের।...আমি আপনাকে টাগ-বোট এনে দেব, আর আপনার যা-যা প্রয়োজন সবই দেব।......একটা সভা ডাকতে হবে।......শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে, ঘাবড়াবেন না।..."

একটা মোটর-লঞ্চ চেয়ে নিয়ে শাখভ্ 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'তে গিয়ে হাজির হল। তারপর একে একে সমস্ত জাহাজগুলো ও ঘুরে ঘুরে দেখল। সেমিয়ন দেখতে পাচ্ছিল, লোকটির ছোট দেহ কখনো সওদাগরী জাহাজের মইয়ের ওপর ঝুলছে, কখনো লাফিয়ে ডাঙায় নেমে ভিড়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠছে লোকে। এক সময় হাজার কণ্ঠে গর্জন উঠল : "হুররে!"

লস্কর-বোঝাই হয়ে কয়েকটা আট-দাঁড় নৌকো জেটির দিক থেকে ছুটে এল জাহাজঘাটের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা ছোট মরচে-ধরা স্টীমারের কাছে; একটু বাদেই ছোট স্টীমারটার চিমনি থেকে বগ্‌বগ্ করে বেরুতে লাগল মেঘের মতো ঘন ধোঁয়া; নোঙর তুলে স্টীমারটা এগিয়ে গেল 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া' জাহাজের কাছে। একটা স্কুনারও পাল তুলল। 'লেফ্‌টেন্যান্ট শেস্তাকভ্' এর মধ্যে ফিরে এসেছে আরেকটা ডেস্ট্রয়ারকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য।

ন'টা বাজতে বাজতেই ভিড়টা এগোতে শুরু করল 'কার্চ' জাহাজের সিঁড়ি-মুখের দিকে। সাধারণভাবে মনোভাবটা যেন আরো খারাপের দিকেই মোড় নিয়েছে। কনুই ঠেলে-ঠেলে রাস্তা করে জাহাজের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বিদ্‌ঘুটে চেহারার সব গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক, ওদের প্রত্যেকের হাতে ভাপ-সেদ্ধ সসেজ, রুটি আর বেকনের চর্বি। বিশ্রী হাসি হেসে ওরা জাহাজীদের দিকে চোখ মটকাতে লাগল, মদের বোতল তুলে তুলে দেখাতে লাগল ওদের। কুকেল হুকুম দিলেন সিঁড়ি তুলে ফেলতে, এখুনি রওনা দিতে হবে। প্রলোভন এড়িয়ে 'কার্চ' ছুটল পোতাশ্রয়ের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায়, সেখান থেকে সে লক্ষ্য করতে লাগল ডেস্ট্রয়ারগুলোকে কেমন করে বেঁধে টেনে-টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মরচে-ধরা স্টীমারটাকে দেখা যাচ্ছে একটা শূন্য নৌকোর খোলের মতো। অনেক ধোঁয়া ছেড়ে ফোঁস্-ফোঁস্ করে অবশেষে 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'কে নড়াতে পারল সে, রাজকীয় ভঙ্গিতে ডেস্ট্রয়ারটা ভেসে চলল অগণিত দর্শকের সামনে দিয়ে। যেন শবযাত্রা চলেছে এমনিভাবে অনেক লোক মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিল। প্রকাণ্ডকায় জাহাজটা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে জাহাজঘাটের বীম, ফটক আর পোতাশ্রয় পার হয়ে। তারপর সেটা গিয়ে পড়ল বার-দরিয়ার জাহাজী-পথে। সবাই ভাবছে এই বুঝি মাথার ওপর আবার এসে হানা দেয় জার্মান বিমান, কিন্তু আকাশ আর সমুদ্র এখন সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট। পোতাশ্রয়ে একমাত্র জাহাজ রয়ে গেছে এখন 'ফিদোনিসি'।

আবার যেন ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল একটু। যে জেটিতে বাঁধা ছিল ফিদোনিসি তারই ওপর অনেকগুলো কালো-কালো মাথা দেখা গেল মাছের ডিমের মতো জটলা পাকিয়ে জমে আছে। ইঞ্জিন-বসানো একটা পাল-তোলা স্কুনার এগিয়ে এল 'ফিদোনিসি'কে টেনে নিয়ে যাবার জন্য। ভিড়ের ভেতর থেকে ঢিল এসে

পড়তে লাগল স্কুনারের ওপর। দু'একটা রিভলবারের আওয়াজও পাওয়া গেল। পাকা-চুলো একজন লোক ল্যাম্প-পোস্টের ওপর উঠে চেঁচাতে শুরু করল :

"ভাইদের খুন করেছিস্! রাশিয়াকে বেচে দিয়েছিস্ তোরা... ফৌজকে বেচে দিয়েছিস্!......তোমরা চুপ করে আছ কেন, জাহাজী ভাইসব? আমাদের যে-ক'টা জাহাজ আছে তাও যে বেচে দিল হতভাগারা!"

চিৎকার করে জনতা বাঁধানো-রাস্তার পাথর টেনে খুলে তুলতে লাগল। কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল 'ফিদোনিসি'র ডেকের ওপর। দ্রুতবেগে তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগল 'কার্চ', লড়াইয়ের সংকেতধ্বনি করে কামানের মুখগুলো সে ঘুরিয়ে ধরল জনতার দিকে। মেগাফোনের মধ্যে গর্জে উঠল কাপ্তেনের গলা :

'হঠো, এই!—নয়তো তোপ দাগবো!"

ভিড়টা এবার নড়ে উঠে পেছনে হটতে লাগল, পায়ের নিচে যারা চাপা পড়েছে তারা আর্তনাদ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। একটু বাদেই জেটি ফাঁকা, জনপ্রাণীও নেই, শুধু ধুলোর মেঘ উঠছে। স্কুনারটা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল 'ফিদোনিসি'র কাছে, পেছনে বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

জাহাজগুলোকে অনুসরণ করে 'কার্চ' এগিয়ে চলল লক্ষ্যস্থলের দিকে। আর আর সমস্ত জাহাজ তখন সেখানে হাল্কা ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। সেমিয়ন দেখল, গলুইয়ের অনেকটা ওপরে গাংচিলগুলো উড়ছে। কাপ্তেনের দিকে ফিরে তাকাল সে, বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি দু'হাতে চেপে ধরে আছেন রেলিংটা।

চারটে প্রায় বাজে-বাজে এমন সময় 'ফিদোনিসি'র ডানপাশ দিয়ে এগিয়ে গেল 'কার্চ্'। কাপ্তেনের মুখ থেকে একটা ছোট্ট কথা বেরিয়ে আসতেই টর্পেডোর খোল থেকে একটা টর্পেডো ছুটে গেল অন্ধকার ছায়ার মতো। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে গেল একটা ফেনার দাগ। 'ফিদোনিসি'র সমগ্র দেহটাই একবার উঁচু হয়ে উঠল, তারপর ভেঙে গেল দু'টুকরো হয়ে—ফেনিল জলের একটা উচ্ছ্বিত পাহাড় যেন ফুঁশিয়ে উঠল গভীর সাগরের তলদেশ থেকে, একটা গুরু-গুরু গর্জন বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। পর্বতপ্রমাণ জলোচ্ছ্বাস যখন আবার মিলিয়ে গেল, দেখা গেল 'ফিদোনিসি' আর নেই। শুধু ফেনা ছাড়া আর কিছুই নেই। ইতিমধ্যে নৌবহর ডোবানোর কাজ শুরু হয়েছে। বিধ্বংসী স্কোয়াডের লোকেরা ডেস্ট্রয়ারগুলোর জল-ঢোকার রন্ধ্রপথ আর ঢাকনি-দেয়া ছিদ্র-মুখ খুলে দিয়েছে, কাত-হয়ে-যাওয়া জাহাজগুলোর পাশ থেকে ঘুল-ঘুলির মুখ সরিয়ে নিয়েছে, অপেক্ষমান বোটগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ার আগে ফিউজের তারে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে টারবাইন আর বয়লারের তলার দশ-ফুট-লম্বা চার্জগুলো বিস্ফোরিত হয়ে যায়। দ্রুতবেগে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল ডেস্ট্রয়ারগুলো। জলও এখানে অনেক বাঁও। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল বার-দরিয়া।

পূর্ণগতিতে 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'র দিকে ছুটে চলল 'কার্চ্'। ছেড়ে দিল টর্পেডোগুলো। জাহাজীরা আস্তে আস্তে মাথার টুপি নামিয়ে নিল। গলুইয়ে

গিয়ে লাগল প্রথম টর্পেডোটা। ড্রেডনট্‌টিও দুলে উঠল পাগলের মতো ছুটে-আসা জলোচ্ছ্বাসের নিচে। দ্বিতীয়টা লাগল পাশের দিকে। ধোঁয়া আর জলের আড়ালে দেখা গেল মাস্তুলটা টলছে। অতিকায় জাহাজটা জীবন্ত প্রাণীর মতোই ছটফট করছে বাঁচবার জন্য, গর্জায়মান ঢেউ আর বিস্ফোরণের বজ্রনাদের মধ্যে তাকে যেন আরও বেশি মহীয়ান্‌ দেখাচ্ছে এখন। নাবিকদের গালের ওপর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। সেমিয়ন দু'হাতে ঢাকল নিজের মুখ।......

কাপ্তেন কুকেল যেন একেবারে মিইয়ে গেছেন, কাহিল হতে হতে এখন আর তাঁর নাক ছাড়া যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই, নিমজ্জমান জাহাজটার দিকে ঘুরিয়ে রেখেছেন নাকটা। শেষ টর্পেডোর আঘাতে 'স্ভবোদ্‌নায়া রসিয়া' এক-পাশে হেলে পড়তে লাগল।...এক মুহূর্তের জন্য যেন শেষ চেষ্টার মতোই সে জল থেকে লাফিয়ে উঠল একবার, তারপরেই ফেনার ঘূর্ণি তুলে দ্রুতবেগে তলিয়ে যেতে লাগল জলের নিচে।

সলিলসমাধির এই দৃশ্য থেকে পূর্ণবেগে ছুটে পালিয়ে গেল 'কার্চ'—তুয়াপ্‌সের অভিমুখে। পরদিন খুব ভোরে কার্চের খালাসীরা নৌকোয় চাপলো। মৃত্যুপথযাত্রী রণতরী থেকে বেতারের মারফত প্রচারিত হল তার শেষ বার্তা :

"সবাইকে জানানো যাচ্ছে।...কৃষ্ণসাগর নৌবহরের যে-সব জাহাজ জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণের কলঙ্ক স্বীকার না করে বরং মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় মনে করেছিল, তাদের ধ্বংস করে এবার আমি নিজেই ডুবে যাচ্ছি।—রণতরী 'কার্চ'।"

জল-ঢোকার রন্ধ্রপথ খুলে ইঞ্জিন উড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রের নব্বই ফুট নিচে তলিয়ে গেল ডেস্ট্রয়ারটা।

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সেমিয়ন ক্রাসিল্‌নিকভ আর তার জাহাজী সাথীরা ভবিষ্যতে কী করবে তাই নিয়ে জল্পনা করছিল। নানারকম প্রস্তাব আসার পর অবশেষে ঠিক হল, ওরা ভল্‌গার প্রান্তে আস্ত্রাখানে চলে যাবে, সেখানে নাকি শ্বেত-রক্ষীদের সঙ্গে লড়বার জন্য শাখভ একটা নদী-নৌবহর তৈরি করছে।

সেনাপতি কঝুখের তামান ফৌজকে পেছন থেকে তাড়া করেছে শত্রু, তার ওপর আবার গ্রামকে-গ্রাম রুখে দাঁড়িয়েছে লালফৌজের বিরুদ্ধে, ওদের ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। তামান ফৌজ চেষ্টা করছে পাহাড়ী রাস্তা আর পথঘাটহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে বেষ্টনী ভেঙে উত্তর কুবানে পৌঁছোবার।

ওদের রাস্তা চলে গেছে নভোরোসিস্ক্‌-এর ওপর দিয়ে। নৌবহর ডুবে যাবার পর থেকে জার্মানরা দখল করে বসে আছে শহরটা। তামান-বাহিনী আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়ল শহরে—কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখা গেল রাস্তায়-রাস্তায় গান গেয়ে মার্চ করে চলেছে পল্টনদল। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে জার্মানরা হৈ-হৈ করে ছুটে গিয়ে উঠল জাহাজে, সেখান থেকে গোলা দাগতে লাগলো তামান-ফৌজের পেছনের সারির ওপর—এইভাবে লাল পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল অনেক মাতাল কসাকও যারা আপদবিশেষের মতো ফৌজের পেছন-পেছন পাগলের মতো ছুটেছিল।

সাবধানতার খাতিরে জার্মানরা শহর থেকে সরে পড়ল। কঝুখ তার সৈন্য-দল নিয়ে শহরের ওপর দিয়ে চলে যাবার পরে-পরেই কসাকরা দখল করল শহর; তার কিছু বাদেই ঢুকল শ্বেতরক্ষীরা, ওরা এসে চালাল লুটতরাজ।

জাহাজী কিংবা লালফৌজী সেপাই কিংবা যে-কোনো লোক যার চেহারা একটু বেশি গরিব-গরিব তাকেই ধরে টেলিগ্রাফের খাম্বায় ঝোলানো হল বিনা বিচারে। লরী বোঝাই করে তিন হাজার লাশ সমুদ্রের দিকে চালান করা হল এই ক'দিনে। নভোরোসিস্ক্ এখন শ্বেতরক্ষীদের বন্দর।

পনের হাজার উদ্বাস্তু তাদের তল্পিতল্পা নিয়ে তামান-ফৌজের গলগ্রহ হয়েছে। এদের নিয়েই ফৌজ ধুঁকতে ধুঁকতে চলল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উপকূল এলাকা ধরে তুয়াপ্সের দিকে। তুয়াপ্সেতে পৌঁছে ওরা চট্ করে পূব দিকে ঘুরল। দেনিকিনের দল ওদের একেবারে পেছনে এসে পড়েছে, আর সামনে যতো গিরিপথ আর নদীখাত, সব দখল করে রয়েছে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহীরা। এমন একটি দিনও কাটে না যেদিন জোর লড়াই না হয়। সমানে এগিয়ে চলেছে ফৌজ, কখনো গুঁড়ি মেরে, কখনো খাড়া পাহাড়ের উঁচু পাড় বেয়ে; রক্ত ঝরছে, শিরদাঁড়া ভেঙে পড়ছে, অনাহারে আধমরা অবস্থা, যতোই এগোচ্ছে সংখ্যায় ততোই কমছে, তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে মরি-বাঁচি করে।

একদিন কঝুখের কাছে ধরে আনা হল লালফৌজী একজন সেপাইকে, বন্দীদশা থেকে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন জেনারেল পকরোভ্স্কি। তার কাছে একটা চিঠি ছিল, তাতে জঙ্গী কায়দায় বেশ খোলাখুলি ভাষাতেই লেখা রয়েছে ঃ

"রুশ ফৌজ আর নৌবহরের অফিসারদের মুখে তুই চুণ-কালি দিয়েছিস্, হতভাগা বদমায়েশ,—যোগ দিয়েছিস্ বলশেভিক, চোর-ডাকাত, আর বাউণ্ডুলে-গুলোর দলে। তা হলে জেনে রাখ্ এই তোর শেষ, তোর ওই বাউণ্ডুলে হতভাগা-গুলোরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তোকে আমরা শক্ত কব্জার মধ্যে পেয়েছি, বুঝলি বদমায়েশ, এবারে তোকে আঙুলের ফাঁক গলে পালাবার সুযোগ দিচ্ছি না। তুই যদি দয়া ভিক্ষা চাস্, অর্থাৎ কয়েদী-খাটিয়েদের দলে ঢুকে মাথা বাঁচাতে চাস্, তবে যেমন বলছি তেমনি কর্ ঃ আজই তোদের সমস্ত হাতিয়ার ছেড়ে দলবল নিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় বেলোরেচেন্স্কায়া রেলস্টেশনের দু'তিন মাইল পশ্চিমে সরে যা। আমার হুকুম মেনে নিলে সেকথা আমায় জানিয়ে দে, সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠা চার নম্বর সিগন্যাল বক্সে।..."

টিনের কৌটোয় ঢালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে চিঠিখানা পড়ল কঝুখ। লালফৌজী সেপাইটির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার—পায়ে জুতো নেই, টিউনিকের বেল্ট খোলা, বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

"নোংরা কুকুর!" বলে উঠল কঝুখ : "কোন্ সাহসে এই চিঠি আনলে তুমি আমার কাছে? যাও, নিজের ইউনিটে ফিরে যাও এক্ষুনি..."

সেই রাতেই জেনারেল পকরোভ্স্কির ফৌজের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো কঝুখ, তাড়া করে চলল ওদের পিছু-পিছু, ঘোড়সওয়ার লেলিয়ে দিল ওদের

ওপর। তারপর ছুটলো বেলোরেচেন্স্কায়ার দিকে, সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল বেষ্টনী ভেঙে।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তামান বাহিনী আরমাভির-এ পৌঁছুলো। শহরটা তখন ছিল দেনিকিন-ফৌজের দখলে। তামান বাহিনী সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে দখল করল আরমাভির; নেভিন্নমিস্কায়া গ্রামে সরোকিনের বাহিনীর অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিলিত হল তারা।

ভিসেল্কি আর একাতেরিনোদারের বিপর্যয়ের পর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সরোকিন তাঁর হৃত সামরিক গৌরবের চর্বিত-চর্বণ করেই দিন কাটাচ্ছিলেন। সৈনিকদের ওপর তাঁর আগের সে প্রভাবও ছিল না; এক সময় যা ছিল ডিভিশন ব্রিগেড আর রেজিমেণ্ট, এখন তা পরিণত হয়েছে এমন একটা দঙ্গলে যারা শত্রুর পয়লা তোপ শুনলেই আতঙ্কে পালাতে পথ পায় না,—আর তারই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে এখন কুটোর মতো হাবুডুবু খাচ্ছেন সরোকিন।

পশ্চাদ্বর্তনের পথে সেপাইরা সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করছে। ওদের এখন একমাত্র ভাবনা, মৃত্যুর কবল থেকে নিজেদের যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া—একেবারে কাঁধের ওপর অনুভব করছে ওরা মৃত্যুর নিঃশ্বাস। যেখানে খুশি চলো, যতোদূরে হয় ততো মঙ্গল। তেরেক স্তেপের ওপর দিয়ে স্রোতের মতো চলেছে যুদ্ধফেরত পলাতকদের অনন্ত মিছিল, চলেছে সেকালের পুরনো-পুরনো সব শড়কের ওপর দিয়ে। কবরস্তূপ আর সোমরাজলতায় এখন সে-সব রাস্তা ভরে গেছে।

একাতেরিনোদারের লড়াইয়ের পর প্রায় দু'লক্ষ পল্টন আর উদ্বাস্তু পালাতে পেরেছে। শহরে যারা রয়ে গিয়েছিল, কসাকরা তাদের কচুকাটা করেছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, আর নয়তো তাদের ওপর দারুণ অত্যাচার করেছে। প্রত্যেকটা কসাক-গ্রামে লম্বার্ডি-পপ্লারের ডালে ঝুলেছে মৃতদেহ। লালফৌজ আবার ফিরে আসবে সে ভয় কসাকদের নেই, তাই তারা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তারই ওপর প্রতিশোধ নিয়ে। 'বলশেভিক' শব্দটাকেই যেন ওরা মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে গোটা এলাকায় বীভৎস হত্যা আর অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়ে।

সরোকিনের জন্মই হল বিপ্লবে, তাই অনেকটা যেন জান্তব সহজাত বুদ্ধিতেই তিনি আন্দাজ করতে পারেন বিপ্লবের উত্থান-পতন। পশ্চাদপসরণ রোধ করার কোনো চেষ্টাই দেখালেন না তিনি, কারণ তিনি জানতেন এতে কোনো লাভ হবে না। পূর্বদিকে ওরা এখন পাগলের মতো মরি-বাঁচি করে ছুটছে, এ রোধ করা সম্ভব শুধু তখনই যখন শ্বেতরক্ষীরা তাদের উন্মত্ত পশ্চাদ্ধাবনের বেগ কিছুটা কমাবে।

সরোকিনের এখন একমাত্র কাজ হল রেলের কামরার জানলা দিয়ে বিমর্ষভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা। ট্রেন চলেছে রোদ-পোড়া স্তেপের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে, অতীত যুগের সেই পেলাস্‌গি, কেল্ট্, টিউটন, স্লাভ আর খাজার জাতির

কবর ঢিবিগুলোর পাশ দিয়ে দিয়ে।......ট্রেনের কামরায় পাহারায় রয়েছে একজন দেহরক্ষী, কারণ সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় অনেক সেপাইকে বলতে শোনা গেছে : "কম্যান্ডাররা আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে দোস্ত্, বোতলের জন্য বেচে দিয়েছে আমাদের—আমরা যেমন নিজেদেরগুলোকে সাবাড় করেছি, তোমরাও তেমনি তোমাদেরগুলোকে দাও সাবাড় করে!"

চীফ-অব-স্টাফ বেলিয়াকভ মাঝে মাঝে এসে দেখা দেন সরোকিনের গাড়িতে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'একটা ভাসা-ভাসা গোছের মন্তব্যের মারফত সাবধানে জানিয়ে দেন—লড়াই চালিয়ে যাওয়া এখন অসাধ্য। বারে-বারেই বলেন একটা কথা : "বিপ্লবের উঠতি পড়তি আছে।" কথাটা বলার সময় একবার করে প্রকাণ্ড কপালটার ওপর বুলিয়ে নেন হাত : "বিপ্লবী উদ্দীপনার সেই স্তরটা এখন আর নেই। এখন আমাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আদিম স্বভাবজ শক্তি। এখন আর আমরা অফিসারদের সঙ্গে লড়ছি না, লড়ছি খোদ জনসাধারণের সঙ্গে। ধ্বংসের হাত থেকে বিপ্লবের কীর্তিকে বাঁচাতে হলে এখনই সে চেষ্টা করতে হবে, নয়তো পরে আর উপায় থাকবে না......এমন-কি যদি আপোস-মীমাংসা করেও শান্তি আসে তবু তাই করতে হবে।" তারপরেই বেলিয়াকভ ইতিহাসের পাতা থেকে লাগসই ধরনের সব উদ্ধৃতি আওড়াতে থাকেন।

সরোকিনের একমাত্র জবাব : "কত টাকা আমায় ঘুষ দিতে চাও তুমি, শয়তান?" দেনিকিনকে একবার মুঠোয় পেলে তিনি তাঁকে বোধহয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক রাগ ওঁর কমরেডদের ওপর, কৃষ্ণ-সাগরীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যদের ওপর, যারা একাতেরিনোদার থেকে পালিয়ে গিয়েছে পিয়াতিগর্স্ক্-এ। ওদের একমাত্র চিন্তা হল সরোকিনের ডিক্টেটরী ঝোঁককে কীভাবে রোখা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা। অত্যন্ত জরুরি সব হুকুম ওরা অমান্য করেছে, এমন-কি সুপ্রীম কম্যান্ডারের মনের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত উঁকি দেবার চেষ্টা করেছে ওদের ওই মার্কস্-অমুক আর মার্কস্-তমুকের দোহাই দিয়ে।

সরোকিনের লাউঞ্জ গাড়িতে আবার এসে উদয় হয় স্বর্ণকুন্তলা জেনা—বেলিয়াকভেরই সযত্ন দৃষ্টির প্রমাণ এটা। আগের মতোই রয়েছে সে—তেমনি গোলাপী আর ছলাকলাময়ী, শুধু গলাটা একটু কর্কশ হয়েছে এই যা। ওর সিল্ক-ব্লাউজগুলো আর গিটারটা রাস্তায় চুরি গেছে। সুপ্রীম কম্যান্ডারের সঙ্গে ওর আচরণে এখন যেন আগের সে সমীহের ভাব নেই।

রাতে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে সরোকিন নিজেকে সঁপে দেন মদিরার অর্ধ-বিহ্বল বিষণ্ণ তুরীয়ানন্দে, আর এদিকে জেনা তখন 'বালালাইকা'র তারে কিছুক্ষণ টুংটাং ক'রে তারপর শুরু করে বকবকানি, বেলিয়াকভের মতো সেও বিপ্লবের আসন্ন অবসানের কথা বলে, আর বলে নেপোলিয়নের উজ্জ্বল কর্মজীবনের কথা—নেপোলিয়ন জানতেন কেমন করে জ্যাকোবিন সন্ত্রাস আর সিংহাসনের মাঝে সেতুবন্ধ করতে হয়।... সরোকিনের চোখ জ্বলে, দারুণভাবে বুকের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকে, সুরাসারের

ঝাঁঝে বিগলিত হয়ে গরম রক্ত চড়ে যায় মাথায়।......সজোরে পর্দা ছিঁড়ে ফেলে তিনি জানলা দিয়ে চেয়ে থাকেন রাতের অন্ধকারের দিকে, তাঁরই বিকারগ্রস্ত জল্পনা-কল্পনার প্রতিচ্ছায়া যেন ভিড় করে আসতে থাকে সে অন্ধকারে।......

শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণাত্মক অভিযান শিথিল হয়ে এল। লালফৌজ অবশেষে উত্তর কুবানের ডানপাড়ে একটু দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পেয়েছে, সেখানেই ঘাঁটি গাড়লো তারা। এই ফাঁকে আবার লৌহ ডিভিশনের কম্যান্ডার দ্‌মিত্রি শেলেস্ত্‌ও ফিরে এলেন জারিৎসিন থেকে—কিরঘিজ স্তেপের ওপর দিয়ে একসার মোটরলরী আর দু'লক্ষ রাউন্ড গুলিগোলা নিয়ে এলেন তিনি। ককেসীয় বাহিনীকে উত্তরে ঘুরে জারিৎসিন শহর বাঁচাতে যেতে হবে, এ হুকুমনামাও ছিল তাঁর সঙ্গে। আতামান ক্রাস্‌নভের শ্বেত কসাক বাহিনী এখন জারিৎসিন ঘিরে রেখেছে।

সরোকিন এ হুকুম মানতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। উক্রেইনীয় রেজিমেন্টগুলো দেশগ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসে লড়াই করতে গিয়ে এমনিতেই ত্যক্ত-বিরক্ত, রাগে গজগজ করছে তারা, সরোকিনের শত অনুরোধ-উপরোধ আর শাসানি সত্ত্বেও পালাচ্ছে পল্টন ছেড়ে। একমাত্র লোক যিনি অন্তত কিছু সেপাইকে আটকে রাখতে পারেন তিনি হলেন শেলেস্ত্‌। পল্‌তাভায় তাঁর জন্ম, পল্‌তাভাতেই মানুষ হয়েছেন। সেপাইদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারেন, চাষীদের সঙ্গে চাষীরা যেমন কথা কয় ঠিক তেমনিভাবে—আস্তে-আস্তে, বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, খানিকটা ওদের খোসামোদ করে, খানিকটা নিজের তারিফ করে। উক্রেইনীয়রা দেখে এ-লোক 'ভিন্‌দেশী' তো নয়ই, উপরন্তু তাদেরই ঘরের লোক, প্রবীণ। তাই তাঁকে মেনেও চলে ওরা। দ্‌মিত্রি শেলেস্ত্‌ ওদের লড়াইয়ে টেনে নিয়ে যান, নেভিন্নমিস্কায়ায় ওরা একটা শক্ত অফিসার-ইউনিটকে একদম ছাতু করে ফেলে। আর ঠিক এই সময় থেকেই শেলেস্তের প্রতি বিদ্বেষে যেন জ্বলতে থাকেন সরোকিন।

শেলেস্তের জয়লাভে অভিনন্দন জানিয়ে সরোকিন তাঁকে রণাঙ্গনেরই একটা অংশের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন, আর ঠিক সেইদিনই গোপনে হুকুম দিলেন যেন শেলেস্তের ইউনিটটিকে নিরস্ত্র করে তাঁকে সপারিষদ গুলি করে মারা হয়। আগে থাকতেই গন্ধ পেয়ে শেলেস্ত্‌ তাঁর লৌহ ডিভিশন নিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে সরে পড়লেন। একদল উক্রেইনীয় এসে যোগ দেবার ফলে তাঁর ফৌজের আয়তন এর মধ্যেই বেড়ে গেছে। দশম আর্মির বিপ্লবী সমর পরিষদের হুকুমের মর্যাদা রেখে শেলেস্ত্‌ জারিৎসিনের দিকে এগিয়ে চললেন লবণাকীর্ণ স্তেপভূমি আর চোরাবালির ওপর দিয়ে। এর পরেই সরোকিন করলেন কী, শেলেস্ত্‌কে আইনের আওতা থেকে বিতাড়িত বলে ঘোষণা করে দিলেন, লালফৌজের প্রত্যেকটা সেপাইয়ের ওপর তাঁর ঢালাও হুকুম হল, শেলেস্ত্‌কে গুলি করে মারতেই হবে; আর লৌহ ডিভিশনকে যাতে কেউ ঘোড়ার খাবার ইত্যাদি সরবরাহ না করে সে নিষেধও জারি করলেন তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরও শেলেস্ত এগিয়ে চললেন সমানে, একটি হাতও উঠল না তাঁকে রুখবার জন্য। যদি রাস্তায় কখনো ঘোড়ার খাবারের নেহাৎই দরকার পড়ে, তাহলে পেলেস্ত্‌ সিধে গিয়ে ঢুকে পড়েন কোনো গ্রামে, কসাক-টুপি খুলে

সাশ্রুনয়নে হাত পাতেন গ্রাম-সমিতির দরজায়, তাদের কাছে ভিক্ষে চান খড়, ওট্‌স্‌ আর রুটি; বুঝিয়ে বলেন যে, তিনি নন, সুপ্রীম কম্যাণ্ডার সরোকিনই হলেন আসল বিশ্বাসঘাতক, শ্বেতরক্ষী ডাকাত।

সরোকিনের অহংকারে শিগগীরই একটা নতুন আঘাত পড়ে : কঝুখ সম্পর্কে সবাই নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, আর সেই কঝুখই পাহাড়ের ওধার থেকে এসে দখল করে বসল আরমাভির, কুবান নদীর ওপারে হটিয়ে দিল শ্বেতরক্ষীদের। তামান ফৌজ সরোকিনকে মানতে চায় না, হয় খুব চটা মেজাজে হুকুম তামিল করে, আর নয়তো একেবারেই অগ্রাহ্য করে তাঁকে। কঠিন অভিযানে পোক্ত তামান বাহিনীই এখন সরোকিনের ছত্রভঙ্গ ফৌজের মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আরমাভির-নেভিন্নমিস্কায়া-স্তাভ্‌রোপল লাইন বরাবর তারা শক্ত শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে।

শরৎকাল এল। সুসমৃদ্ধ স্তাভ্‌রোপল শহর দখলের জন্য দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু হল এবার। রণাঙ্গনের সব জায়গায় তামান ফৌজকেই দেখা গেল পুরোবর্তী।

দেনিকিনের বাহিনীতেও নতুন সেপাই এসেছে বিপুল সংখ্যায়—বুনো জানোয়ারের সামিল সমাজের একদঙ্গল নোংরা জীব দিয়ে নেক্‌ড়ের দলের মতো একটা ফৌজীদল গড়েছে শ্বেতরক্ষী গেরিলা শ্‌কুরো; লোকটা নিজেও একটি বদমায়েশ, খুনী আর গুণ্ডা।

সরোকিনের সেনাপতিমণ্ডলী পিয়াতিগর্‌স্কে স্থানান্তরিত হয়েছে। সরোকিন নিজেও আর লড়াইয়ের ময়দানে আসছেন না আজকাল। ককেসাসে এক নতুন হুকুমতের পত্তন হচ্ছে, মস্কোর প্রভাব এখানেও শিকড় গেড়েছে, দিনের পর দিন সে প্রভাব যেন বেশি করে টের পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা প্রথম শুরু হয়েছিল আঞ্চলিক পার্টি কমিটির তরফ থেকে একটা বিপ্লবী সমর পরিষদ আহ্বান করার সময়। মস্কোর বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সাহস না থাকায় সরোকিন ওদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিপ্লবী সমর পরিষদটি গড়া হয়েছিল একেবারে নতুন নতুন লোক দিয়ে। সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের কর্তৃত্বও তুলে দেয়া হয়েছিল পরিষদের কার্যকরী সংসদের হাতে। সরোকিন বুঝলেন, এবার তাঁর ঘাড়ে মাথা থাকে কিনা সন্দেহ, তাই মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলেন তিনি।

পরিষদের অনুষ্ঠানকালে সাধারণত বিমর্ষভাবে চুপ করে বসে থাকতেন সরোকিন, কিন্তু যখন মুখ খুলতেন তখন প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নাছোড়-বান্দা হয়ে লড়তেন। আর জিতও সব সময় তাঁরই হতো, কারণ পিয়াতিগর্‌স্ক্‌-এ মোতায়েন পল্টনরা সবাই ছিল তাঁর অনুগত। ওঁকে সবাই ভয় করতো, এবং তার সঙ্গত কারণও ছিল। নিজের ক্ষমতা জাহির করার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি, সে সুযোগ শিগগীরই মিলে গেল। দু'নম্বর তামান কলামের অধিনায়ক মার্তিনভ আরমাভিরের এক সামরিক সভায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করল যে সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের হুকুম মানতে সে প্রস্তুত নয়। তৎক্ষণাৎ বিপ্লবী সমর পরিষদের কাছে সরোকিন দাবি জানালেন মার্তিনভের মাথা চাই, নয়তো ফৌজের মধ্যে চূড়ান্ত

অরাজকতা হবে সে-কথা জেনে রাখা ভাল। মার্তিনভকে বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না—পিয়াতিগর্স্কে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, ফৌজের সামনেই গুলি করে মারা হল। তামান রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে ঝড়ের মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল, ওরাও শাসিয়ে রাখল এর প্রতিশোধ নেবে।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের জন্য একটা নতুন সেনাপতিমণ্ডলী খাড়া করা হল। বেলিয়াকভ বরখাস্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু সরোকিন তাঁর হয়ে ওকালতি করার কোনো চেষ্টাই দেখালেন না। প্রাক্তন চীফ-অব-স্টাফ তাঁর নথিপত্র টাকাপয়সা ইত্যাদি জমা দিয়ে ভূতপূর্ব বন্ধুর কোয়ার্টারে এলেন জবাবদিহি দাবি করতে। ঘরের ভেতর পায়চারি করছিলেন সরোকিন, হাতজোড়া পেছন দিকে মোড়া। টেবিলের ওপর একটা তেলের বাতি, পাশে রয়েছে খাবার, এখনো হাত পড়েনি তাতে। একটা খোলা ভদ্‌কার বোতলও রয়েছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মাশুক্‌-এর অরণ্য-ঘন ঢালু পাহাড়, সূর্যাস্তের বিষণ্ণ বর্ণপটে কালো রেখার মতো ফুটে আছে তার আকৃতি।

মুহূর্তের জন্য সরোকিন আগন্তুকের দিকে চোখ তুলে চাইলেন; তারপর আবার শুরু করলেন পায়চারি। টেবিলের পাশে মাথা নিচু করে বসলেন বেলিয়াকভ। সরোকিন ততক্ষণে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। একদিকের কাঁধ উঁচু করে বললেন :

"একটু ভদ্‌কা হয়ে যাক্‌! শেষবারের মতো একসঙ্গে দু'জনে।"—একটা কর্কশ অট্টহাসির সঙ্গে বললেন সরোকিন। তাড়াতাড়ি দুটো গেলাস ভর্তি করে আবার শুরু করলেন পায়চারি : "তোমার লীলাখেলা তো এবার সাঙ্গ হল ভাই।... আমার উপদেশ শোনো, যতো তাড়াতাড়ি পারো কেটে পড়ো এখান থেকে।......আমি তোমার হয়ে ওকালতি করতে যাচ্ছি না।......কালই একটা কমিশন নিয়োগ করব তোমার নথিপত্র পরীক্ষা করবার জন্য, বুঝেছ? হয়তো গুলি খেয়ে মরতে হবে তোমাকে......"

বেলিয়াকভ তাঁর পাংশু শুকনো মুখখানা তুলে চাইলেন, কপালের ওপর একবার হাত বুলিয়েই নামিয়ে নিলেন হাতটা।

"তুমি একটি ইতর ছোটলোক, তার চেয়ে বেশি কিছু নও," বললেন বেলিয়াকভ : "আর আমি কিনা তোমার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে খাটলাম!......নোংরা জানোয়ার!......এই লোকটাকেই কিনা তালিম দিচ্ছিলাম নেপোলিয়ন হবেন বলে!... উকুন কোথাকার!......"

সরোকিন মদের গেলাস তুললেন। গলায় ঢালবার সময় গেলাসের কিনারায় লেগে দাঁতগুলো বেজে উঠল। তারপর সিরকাশিয়ান জামার পকেটে হাতদুটো গুঁজে আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

"বেশ তো, নথিপত্র পরীক্ষা করা হবে না।"—হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন সরোকিন : "বেরিয়ে যাও এখান থেকে! আর জেনে রাখ, এখন যে তোমায় গুলি করে মারছি না তার একমাত্র কারণ হল তোমার আগেকার কাজকর্ম। আশা করি এজন্য তুমি আমার তারিফই করবে!"

নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে নাকের ফুটো দুটো কাঁপতে লাগল সরোকিনের, ঠোঁট দুটো যেন নীল হয়ে গেল। রাগ চাপতে গিয়ে সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তাঁর।

বেলিয়াকভ ভালো করেই জানতেন সরোকিনের মেজাজ : ওঁর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে তিনি দরজার দিকে পিছু হটতে লাগলেন, তারপরেই ঝপাং করে দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে পড়লেন খিড়কির দরজা দিয়ে। সেইরাতেই পিয়াতিগরস্ক্ ত্যাগ করলেন বেলিয়াকভ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরোকিন রাত জেগে বসে-বসেই কাটান, গেলাসের পর গেলাস ভদ্‌কা ঢালেন গলায়, আর খালি ভাবেন আর ভাবেন। ওঁর এককালের বন্ধু ওঁর মনটাকে এমনভাবে বিষিয়ে দিয়ে গেছে একবিন্দু বিদ্রূপের হলাহল দিয়ে যে সে-বিষে বেদনা-জর্জর হয়ে উঠেছে ওঁর সারা অন্তর, অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে হচ্ছে তাঁকে।

দুহাতে মুখ ঢাকেন সরোকিন : বেলিয়াকভ ঠিকই বলেছিল, হাজারবার ঠিক। গত জুন মাসে নেপোলিয়ন হবার যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল সে সম্ভাবনা অবশেষে বিপ্লবী সামরিক পরিষদের বৈঠকে বসে মস্কোর কমরেডদের দিকে চোরা চাউনি দেবার মতো ক্ষুদ্রতায় পর্যবসিত হল!......বেলিয়াকভ একাই এ-কথা বলেনি। ফৌজের মধ্যে, পার্টির মধ্যে সবাই তো এই কথাই বলছে। আর এদিকে দেনিকিন! সরোকিনের মনে পড়ে একাতেরিনোদারের খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, মনে পড়লে এখন যেন নতুন করে হুল ফোটানোর জ্বালা অনুভব করেন তিনি—প্রবন্ধটা ছিল দেনিকিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণী।

"আমি আশা করিয়াছিলাম একটি সিংহকে দেখিতে পাইব, কিন্তু পরে দেখিলাম সিংহ নয়, সিংহের চামড়ায় ঢাকা একটি কাপুরুষ কুকুর ছাড়া সে আর কিছুই নহে।...আমি যে খুব বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহাও নহে। সরোকিন আগেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে—নেহাৎই আনাড়ি একটি কসাক কর্নেট*।" উঃ, দেনিকিন! দাঁড়া......সময় আসবে, আসবে......তখন তুই আফশোষ করবি!

হাত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে দাঁতে দাঁত ঘষেন সরোকিন। একবার যদি গোটা ফৌজটাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন লড়াইয়ের ময়দানে! তারপর অফিসারগুলোকে তাড়া করে নিয়ে কচুকাটা করে পায়ের তলায় পিষতেন, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতেন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত! একাতেরিনোদারে ঢুকেই দেনিকিনকে টেনে আনতেন সামনে—সিধে টেনে আনতেন বিছানা থেকে তুলে, অন্তর্বাস-পরা অবস্থায়... "আন্তন্ ইভানোভিচ, তুমিই না আনাড়ি এক কর্নেটকে নিয়ে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দেখিয়েছিলে খবরের কাগজে খুচরো প্রবন্ধ লিখে? এই যে, মহামান্য হুজুর, এই সেই লোক, এখন সামনেই দেখতে পাচ্ছ তাকে।... এখন তাহলে তোমার পিঠ থেকে ফালা ফালা করে চালড়া তুলে নেব? নাকি পনেরশো গাদন-ডান্ডাই যথেষ্ট হবে?"

---

* নিম্নপদস্থ পতাকাবাহী ঘোড়সওয়ার অফিসার।

সরোকিন গোঁ-গোঁ করে ওঠেন, বিকারগ্রস্ত স্বপ্নের ঘোরটা কাটাবার চেষ্টা করেন একবার। কিন্তু বাস্তব হল অন্ধকারাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট; উদ্বেগ আর অবমাননায় পূর্ণ। এবার যা-হোক একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। ওঁর পুরনো বন্ধু আর প্রাক্তন চীফ-অব-স্টাফ আজ শেষবারের মতো একটা কর্তব্য করে গেছে ওঁরই উপকারার্থে। সরোকিন এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে—হাল্‌কা মৃদুমন্দ বাতাসে বয়ে এল সোমরাজ লতায়-ছাওয়া স্তেপ প্রান্তরের শুকনো ঝাঁঝালো গন্ধ। বিষণ্ণ আকাশের পটে জেগে উঠেছে গাঢ় লাল একটা রেখা,—ঊষার আভাস, তবে এখনো ঘোলাটে ভাবটা কাটেনি। মাশুকের অতিকায় লালচে-নীল দেহটা এখনো দেখা যাচ্ছে।...সরোকিন একবার কাষ্ঠহাসি হাসলেন : ধন্যবাদ, বেলিয়াকভ।...... এখন তাহলে—আর গড়িমসি কেন, ইতস্তত কেন?......সেই রাতেই সরোকিন স্থির করে ফেললেন, সবকিছু পণ রেখে এবার কোমর বেঁধে লাগবেন।

অনেক টালবাহানার পর অবশেষে বিপ্লবী সমর পরিষদ ভোটে সাব্যস্ত করলেন, আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হবে। সরবরাহ-ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল স্ভিয়াতয় ক্রেস্ত্-এ। নেভিন্নমিস্‌কায়াতে মোতায়েন করতে হবে ফৌজ, সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা স্তাভ্‌রোপল আর আস্ত্রাখানের দিকে যাবে, অবশেষে যোগ দেবে দশম বাহিনীর সঙ্গে। জারিৎসিনের কাছে এখন লড়াই চালাচ্ছে দশম বাহিনী। দ্‌মিত্রি শেলেস্ত্ জারিৎসিন থেকে ঠিক এই পরিকল্পনাটাই নিয়ে এসেছিলেন।

তামান ফৌজের ওপর ভার দেয়া হল স্তাভ্‌রোপল দখল করার। সবকিছুই গতিচঞ্চল হয়ে উঠেছে—সরবরাহ ঘাঁটি সরে গেল উত্তর-পূবে, রণাঙ্গন-রেখা এগিয়ে গেল উত্তর-পশ্চিম দিকে। জ্বালাময়ী শ্লোগান দিয়ে ইউনিটগুলোর মনোবল চাঙ্গা করে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা আর আন্দোলনকারীরা—চেঁচিয়ে গলাই ভেঙে গেল ওদের। কলামগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রণাঙ্গনের দিকে চলে গেল কম্যান্ডাররা। পিয়াতিগর্‌স্ক্ একেবারে খাঁ খাঁ করছে। শুধু গভর্ণমেণ্ট রয়ে গেছে পেছনে—গভর্ণমেণ্ট বলতে কৃষ্ণসাগর প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি আর পার্শ্বচরসহ সপারিষদ সরোকিন। হৈচৈ-এর মধ্যে কেউ খেয়ালই করল না যে গভর্ণমেণ্ট আসলে এখন গিয়ে পড়েছে সুপ্রীম কম্যান্ডারেরই খপ্পরে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সরোকিন বাড়ির দিকে ফিরে আসছেন দুল্‌কি চালে ঘোড়ায় চেপে, সঙ্গে রয়েছে আরদালি। মিউনিসিপ্যাল পার্কের মোড়ে যেখানে ঢালু রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠেছে সেখানে আসতেই একজন মোটাসোটা লোকের ওপর ঘোড়াটা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার যোগাড়। লোকটির কাঁধদুটো ভারি, পরনে চামড়ার জ্যাকেট। চমকে উঠে পথচারী কোমরের পেছনদিকে হাত রাখল, চামড়ার তৈরি একটা পিস্তলের খাপ ঝুলছিল পাছার ওপর। গিম্‌জাকে চিনতে পেরে সরোকিন সক্রোধে ভুরু কোঁচকালেন, এ-সময় তো গিমজার ফ্রন্টে থাকার কথা। পিস্তলের খাপ থেকে হাত সরিয়ে নিল গিম্‌জা। ওর চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি,

ঝুলে-পড়া ভুরুজোড়ার নিচে সে-দৃষ্টি খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে।...বেলিয়াকভের সঙ্গে যখন শেষবার দেখা হয় তখন তাঁর চোখেও ঠিক এমনি দৃষ্টিই দেখেছিলেন সরোকিন। হঠাৎ যেন গিম্‌জার দাড়ি-কামানো কালশিটে-পড়া মুখটার মধ্যে এক-সারি দাঁত দেখা গেল সাদা একটি রেখার মতো। সরোকিনের বুকটা যেন দমে গেল সঙ্গে সঙ্গে—এই লোকটাও তাহলে ওর দিকে চেয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে!

ঘোড়ার দু' বগলে হাঁটু দিয়ে এমন জোরে গুঁতো মারলেন তিনি যে ফোঁস্ করে জানোয়ারটা লাফ দিয়ে উঠল একবার, তারপর ঊর্ধশ্বাসে ছুটল নুড়িপাথর-গুলোর ওপর খুরের আওয়াজ তুলে। উৎরাইয়ে উঠে ঘোড়াটা সওয়ারকে সিধে এনে ফেলল বিশ্রী বোঁটকা-গন্ধওয়ালা একপাল ভেড়ার মাঝখানে। ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ের দিকে ফিরছিল ল্যাজ তুলে ভ্যা-ভ্যা করতে করতে। সেদিন ছিল বারোই অক্টোবরের সন্ধ্যে। সরোকিন তাঁর প্রধান দেহরক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। দেহরক্ষী জানলার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে সরোকিনের কানে-কানে বলল, গিম্‌জা সবে পিয়াতিগর্‌স্ক্ থেকে এসেছে; আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ফ্রণ্ট থেকে দু' কোম্পানী সেপাই ফেরৎ চেয়ে পাঠাক্ এই হল গিম্‌জার অভিমত, এই অভিমতই সে জানাতে এসেছে।..."বুঝলেন কমরেড সরোকিন, কার বিরুদ্ধে এ-সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধির দরকার করে না!..."

মাশুক পাহাড় আর অন্ধকার তন্দ্রামগ্ন পিয়াতিগর্‌স্ক্ শহরের ওপর শরৎ-আকাশের তারাগুলো যখন ফুটে উঠল তাদের সমস্ত শোভা নিয়ে, সরো-কিনের দেহরক্ষীরা তখন নিঃশব্দে এসে ঢুকল কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি রুবিনের ঘরে। কমিটির দু'জন সদস্য ভ্লাসভ আর দুয়ানেভ্‌স্কি, বিপ্লবী সমর পরিষদের সদস্য ক্রাইনি, আর চেকার সভাপতি রোঝান্‌স্কি—এদের ঘরেও ঢুকল তারা। বিছানা থেকে জোর করে টেনে তুলল ওদের, সঙ্গীনের ফলা দেখিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহরের বাইরে রেল লাইনের কাছে, তারপর কোনোরকম ব্যাখ্যানা না করেই সিধে গুলি চালিয়ে দিল ওদের ওপর।

এ-সব ব্যাপার যখন ঘটছে, সরোকিন তখন লের্‌মন্তোভো স্টেশনে তাঁর রেল-কামরার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। কানে এল গুলির আওয়াজ—রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে পাঁচবার গুড়ুম্-গুড়ুম্ শব্দ। তারপর সরোকিন শুনতে পেলেন কারো ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ—প্রধান দেহরক্ষী এগিয়ে এল ওঁর সামনে, শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে চাটলো একবার। "কি খবর?" জিজ্ঞেস করলেন সরোকিন। "খতম!" জবাব দিল রক্ষী, এক-এক করে দণ্ডিতদের নাম বলে গেল সে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সুপ্রীম কম্যান্ডার এখন পূর্ণবেগে ছুটে চলেছেন রণাঙ্গনের দিকে। কিন্তু তাঁর সাংঘাতিক অপরাধের খবরটা আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। আঞ্চলিক কমিটির কয়েকজন কমিউনিস্টকে গিম্‌জা একদিন আগেই সাবধান করে দিয়েছিল, সরোকিন আসার আগেই তাঁরা গাড়িতে চেপে

পিয়াতিগর্স্ক্ থেকে সরে পড়লেন। ১৩ই অক্টোবর তারিখে নেভিন্নমিস্কায়াতে একটা সামরিক সভা আহ্বান করলেন তাঁরা। সরোকিন যখন প্রাচ্যদেশের রাজ-রাজড়াদের মতো জাঁকজমক করে সুপ্রীম কম্যান্ডারের ব্যক্তিগত পতাকা উড়িয়ে একশো দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে পল্টনদের সামনে এসে দর্শন দিচ্ছিলেন, যখন তাঁর বিউগল-বাদকরা জানিয়ে দিচ্ছিল হুঁশিয়ারী, ঠিক সেই সময় নেভিন্নমিস্কায়ার এই ফৌজী সভায় সরোকিনকে ঘোষণা করা হচ্ছিল আইনের আওতা থেকে বিতাড়িত বলে, হুকুম জারি হচ্ছিল—এখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য নেভিন্ন-মিস্কায়াতে নিয়ে আসা হোক্।

মালগাড়ির খোলা-দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তামান ফৌজের লোকেরা চীৎকার করে সরোকিনকে জানিয়ে দিল খবরটা। সরোকিন ফিরে চললেন স্টেশনে, ডেকে পাঠালেন পল্টনের কম্যান্ডারদের। কিন্তু কেউই এল না। সন্ধ্যে অবধি স্টেশনে অপেক্ষা করলেন সরোকিন। তারপর হুকুম দিলেন ঘোড়া সাজাতে। প্রধান পার্শ্বচরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলেন স্তেপের প্রান্তরে।

পিয়াতিগর্স্কে বিপ্লবী সমর পরিষদের বাকি তিনজন সদস্য পড়লেন মহা ফাঁপরে : সুপ্রীম কম্যান্ডার তো গা ঢাকা দিয়েছেন স্তেপের ময়দানে, আর এদিকে আর্মিও অভিযানে অগ্রসর না হয়ে পাল্টা দাবি তুলেছে সরোকিনের বিচার চাই, প্রাণদণ্ড চাই বলে।...কিন্তু দেড় লক্ষ মানুষের প্রবল একটা মানবিক যন্ত্রশক্তি যখন একবার কাজ শুরু করে দেয় তখন তাকে অতো সহজে রোখা সম্ভব নয়।......তাই অক্টোবরের তেইশ তারিখে তামান ফৌজ আক্রমণ শুরু করল স্তাভ্রোপলের ওপর। একই সময় শ্বেতরক্ষীও আরম্ভ করে দিল পাল্টা অভিযান। আটাশ তারিখে কম্যান্ডাররা সবাই একবাক্যে জানালো,—কামানের গোলা আর কার্তুজে ঘাটতি পড়েছে, আগামী কালই যদি রসদ না আসে তাহলে যেন আর জয়ের আশা না করা হয়। বিপ্লবী সমর পরিষদ জবাব দিল, কামানের গোলা আর কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে—"বেয়নেটের মাথায় দখল করতে হবে স্তাভ্রোপোল!..." ঊনত্রিশ তারিখ রাতে দুটো 'শক্'-কলাম তৈরি করা হল। গোলন্দাজরা তাদের শেষ গোলাগুলো খরচা করে কামান দাগতে লাগল, আর তারই আড়ালে-আড়ালে 'শক্'-বাহিনীদুটো এগিয়ে গেল তাতার্স্কায়া গ্রামে। গ্রামটা স্তাভ্রোপল থেকে মাইল-দশেক দূরে, শ্বেতরক্ষীদের রণাঙ্গন তখন এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। স্তেপের ওপর প্রকাণ্ড একটা তামাটে চাঁদ উঠেছে—হাউইয়ের অভাবে চাঁদের আলোতেই সিগন্যালের কাজ চলছে।...কামানগুলো স্তব্ধ। তামান সৈন্যসারি একটিও গুলি না ছুঁড়ে এগিয়ে গেল শত্রুর ট্রেঞ্চের দিকে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাজনার বিউগলগুলো শব্দমুখর হয়ে উঠল, বেজে উঠল ড্রাম; বুলেট আর হাতবোমার জায়গায় এখন কেবল বাজনা, আর সেই সঙ্গীতের তালে-তালেই 'শক্'-কলাম দুটো ঘনসংবদ্ধ ঢেউয়ের আকারে বাজনদারদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, বিপুল বেগে। শত্রুর মেশিন-গানের সামনে শ'য়ে শ'য়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে, ঝাঁপিয়ে পড়তে

লাগল শত্রুর প্রধান আত্মরক্ষা-ব্যূহের ওপর। শ্বেতরক্ষীরা হটে যেতে লাগল পাহাড়ের দিকে, কিন্তু লাল বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে পাহাড়গুলোও এক-এক করে বে-দখল হতে লাগল। শত্রু ছুটলো শহরের দিকে, ওদের পেছন-পেছন তাড়া করল লাল কসাক ইউনিটগুলো। তিরিশে অক্টোবরের সকালে তামান বাহিনী ঢুকলো স্তাভ্রোপলে।

পরদিন সকালে সুপ্রীম কম্যান্ডার সরোকিনকে দেখা গেল স্তাভ্রোপলের সদর রাস্তার ওপর ঘোড়া হাঁকাতে। তাঁর পাশে ছিল প্রধান দেহরক্ষী। বেশ নিরুদ্বেগই মনে হচ্ছিল তাঁকে, তবে মুখটা শুকনো-শুকনো, আর চোখদুটো মাটির দিকে। সরোকিনকে দেখে লাল ফৌজের লোকেরা তো থ, পিছিয়ে যেতে চায় ওরা : "এ আবার কোন্ শয়তান এল পাতাল থেকে?"

পৌর সোবিয়েতের বাড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন সরোকিন। দরজার ওপর তখনো ঝুলছিল একটা আধ-ছেঁড়া নোটিস, তাতে লেখা : "জেনারেল শ্কুরোর সদর দপ্তর।" কার্যকরী কমিটির যে-সব প্রতিনিধি আর সদস্য তখনো বেঁচে ছিলেন তাঁরা জড়ো হয়েছেন ভেতরে। সরোকিন কিন্তু ঘাবড়ালেন না, সিধে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। ডিউটি-রত হতভম্ব সেপাইটিকে জিজ্ঞেস করলেন কার্যকরী কমিটির সভার কাজ কোথায় চলছে. তারপর হলঘরে ঢুকে একেবারে সভাপতির টেবিলের সামনে গিয়েই দাঁড়ালেন। বিস্মিত, হতবুদ্ধি সদস্যমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে সগর্বে মাথা তুলে বললেন :

"আমিই সুপ্রীম কম্যান্ডার। আমারই পল্টন আজ দেনিকিনের ডাকাত-দলকে উৎখাত করে শহরে আর গ্রামে আবার সোবিয়েত শক্তি কায়েম করেছে। নেভিন্নমিস্কায়াতে একটা বে-এক্তিয়ার সামরিক সভা আমাকে আইনের আওতা থেকে বিতাড়িত বলে ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। কোন্ অধিকারে তারা এ কাজ করল? আমার বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য আমি কমিশন দাবি করছি। এই কমিশন যতক্ষণ না তথ্য হাজির করছেন, ততক্ষণ আমি সুপ্রীম কম্যান্ডারের পদ ছাড়বো না।"

এই বলে তিনি হল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার ঘোড়ায় চাপবেন বলে। কিন্তু তৃতীয় তামান রেজিমেন্টের ছ'জন লালফৌজী সেপাই সিঁড়িতেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সরোকিনের ওপর, ওঁর হাতদুটো পিছমোড়া করে ধরল তারা।

নিঃশব্দে হিংস্রভাবে যুঝতে লাগলেন সরোকিন; রেজিমেন্টের কম্যান্ডার ভিস্লেন্কো তার চাবুকের বাঁটটা দিয়ে ঘা কষাল সরোকিনের মাথায়, চেঁচিয়ে বলল :

"মার্তিনভকে গুলি করে মেরেছিলি, তার শাস্তি এই নে, কুত্তা কোথাকার!"

সরোকিনকে গারদে পোরা হল। সেপাইদের মধ্যে একটু বিচলিত ভাব রয়েছে, ওরা ভয় পাচ্ছে সরোকিন হয়তো কোনোক্রমে কয়েদ ছেড়ে পালাবে, কলা দেখাবে আইনের শাস্তিকে। পরদিন সওয়ালের সময় সরোকিন যখন গিম্জাকে দেখলেন সভাপতির আসনে, তখন বুঝলেন এবার তাঁর হয়ে এসেছে। কিন্তু

বাঁচবার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল তাঁর মনে, শেষবারের মতো টেবিলে ঘুষি মেরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন ক্রুদ্ধ শপথ জানিয়ে :

"ওরে ডাকাতের দল! বিচারের রায় তো দেব আমিই! এ হচ্ছে শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অরাজকতা, গোপন প্রতিবিপ্লব! যে-ভাবে ওই বদমায়েশ মার্তিনভটাকে শাস্তি দিয়েছি, তোদেরও ঠিক সেই হাল করব।......"

বিচারকদের একজন হল ভিস্‌লেঙ্কো, গিম্‌জার পাশেই বসেছিল; ভয়ে একেবারে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠল সে। পিছনে হাতটা গুঁজে সে প্রকাণ্ড একটা অটোমেটিক পিস্তল টেনে বের করল, তারপর এক-এক করে ওর সবগুলো গুলি নিঃশেষ করে দিল সরোকিনের ওপর।

স্তাভ্‌রোপল থেকে ভল্‌গার তটের দিকে আর বেশি দূর এগোনো সম্ভবপর হল না—বাধা দিল শ্‌কুরোর "নেকড়ে" ঘোড়সওয়ার ফৌজ। পিছনদিকের এলাকায় পালিয়ে গিয়ে ওরা নেভিন্নমিস্কায়ার মূল ঘাঁটি থেকে তামান ফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। স্তাভ্‌রোপল অবরোধ করার জন্য সৈন্যবহর মোতায়েন করছিলেন দেনিকিন। এই উদ্দেশ্যে কুবান থেকে কাজানোভিচ্‌, দ্রজ্‌দভ্‌স্কি আর পক্‌রোভস্কির কলামগুলোকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। উলাগাইয়ের অশ্বারোহী ফৌজ এবং কুবান অশ্বারোহী ডিভিশন নামে একটা নতুন সংগঠিত ডিভিশনকেও সরিয়ে নেয়া হয়েছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে। এই নতুন ডিভিশনটার অধিনায়ক হল একজন প্রাক্তন খনি-ইঞ্জিনীয়র, লোকটা যুদ্ধের গোড়ার দিকে ছিল জুনিয়র অফিসার, এখন হয়েছে জেনারেল র‍্যাঙ্গেল্‌।

আটাশদিন ধরে লড়ল তামান ফৌজ। একের পর এক প্রত্যেকটা রেজিমেণ্ট ধ্বংস হয়ে গেল অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান্‌ শত্রুর লোহার মুঠিতে পিষ্ট হয়ে। এর মধ্যে শুরু হল বর্ষা। যথেষ্ট ভারিকোটও নেই ওদের, তার ওপর বুট আর কার্তুজের অভাব। কারো কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করেও লাভ নেই, কারণ ককেসীয় ফৌজের বাকি অংশটুকু স্তাভ্‌রোপল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাগত হটে যাচ্ছে পূবের দিকে।

শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে তামান বাহিনীর লোকেরা যেন প্রচণ্ড বিক্রমে লড়তে লাগল। ওদের কম্যাণ্ডার কঝুখ্‌ টাইফাসে মারা গেছেন। সেরা সেরা কম্যাণ্ডারদের সবাই প্রায় হতাহত। কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তামান ফৌজ বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হল। বীর তামান ফৌজের হতাবশিষ্ট অংশের তখন এক শোচনীয় অবস্থা, পায়ে জুতো নেই কারুর, পরনে ন্যাকড়ার ফালি। স্তাভ্‌রোপল ছেড়ে ওরা উত্তর-পূবে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্লাগোদাৎনয়ের ওপর। ওদের পশ্চাধাবন করার কেউ নেই তখন—বিশ্রী আবহাওয়া আর শরতের বর্ষায় শ্বেতরক্ষীদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

॥ বারো ॥

রাশিয়ার মানুষ এক বছর আগে দাবি তুলেছিল যুদ্ধ বন্ধ করো বলে, আর তারপর এই বারো মাস ঘুরে আবার এল অক্টোবর মাস। কত অসংখ্য আর্তনাদ, বিচিত্রকণ্ঠে কত অসংখ্য মানুষের দাবি উঠেছিল: "যুদ্ধ নিপাত যাক্! যুদ্ধ যারা টিঁকিয়ে রাখতে চায় সেই বুর্জোয়ারা নিপাত যাক! যে-সামরিক চক্রগুলো যুদ্ধ চালায় তারা নিপাত যাক! যে জমিদাররা যুদ্ধের খোরাক জোগায় তারা নিপাত যাক!"—সব আওয়াজ সেদিন মিশে গিয়েছিল একটি মাত্র চূড়ান্ত আঘাতের মধ্যে যেদিন 'অরোরা' ক্রুজারের ডেক থেকে একটা কামানের গোলা এসে ফেটে পড়ল উইন্টার প্রাসাদের ওপর।

সেই ঘৃণ্য প্রাসাদের ছাদে থরে-থরে সাজানো সীসার মূর্তি আর অলংকৃত লোহার পাত্রগুলোর মাঝে সেদিন গোলাটা এসে পড়েছিল, ছাদ বিদীর্ণ করে সেই গোলা গিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল সম্রাটের শয্যাকক্ষে যেখানে উন্মাদের মতো নিদ্রাহীন চোখে সারারাত ছটফট করে সবেমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠেছিলেন কেরেন্‌স্কি। তখন সেই বিস্ফোরণকে মনে হয়েছিল এমন একটা বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায় যার আওয়াজঃ "প্রাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আর গরীবের ঘরে শান্তি।" সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল যে সেই বিস্ফোরণই কাঁপিয়ে তুলবে সীমাহীন দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, প্রতিধ্বনির মতো প্রত্যেকটা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণ হয়ে বেড়ে উঠবে মাত্রা ও দমকে, তারপর অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়ের দুর্নিবার শক্তিতে রূপায়িত হবে?

সবে হাতিয়ার ত্যাগ করেছে যে-দেশ সে-দেশ যে আবার অস্ত্র তুলে নিতে পারে, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর লড়াইয়ে, ধনীর বিরুদ্ধে গরীবের লড়াইয়ে সামিল হতে পারে তা কে বিশ্বাস করতে পেরেছিল সেদিন? কে সেদিন ভাবতে পেরেছিল যে কর্নিলভের মুষ্টিমেয় একদল অফিসার থেকেই জন্ম নেবে দেনিকিনের বাহিনীর মতো অত প্রকাণ্ড একটা বাহিনী? কে ভেবেছিল যে চেকোশ্লোভাক ফৌজী-ট্রেনের দাঙ্গার মধ্যে যার সূত্রপাত তা-ই অবশেষে এমন একটা ব্যাপক যুদ্ধের আকার নেবে—ভল্‌গা অঞ্চলের শত-শত মাইল জায়গা জুড়ে সে-যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে সাইবেরিয়া অবধি, সম্ভব করে তুলবে কল্‌চাকের স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্ব? আর এ-ও কি কেউ আগে থাকতে আন্দাজ করেছিল যে সোবিয়েত ভূমির কন্ঠরোধ করা হবে খাদ্য-অবরোধের মারফত, আর মানচিত্র ও গ্লোবগুলোতে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশকে দেখানো হবে বর্ণহীন, নামহীন, কালো কালির মোটা দাগে চিহ্নিত-করা শূন্য স্থান হিসেবে?

কে সেদিন বিশ্বাস করতে পারত যে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন, ফসল কয়লা আর তেলের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত, দারিদ্র্যজর্জর, টাইফাস্‌-আক্রান্ত রাশিয়া সেদিন এমন ভয়ংকর লড়াই করবে, অনলস অক্লান্তভাবে তার সন্তানদের পাঠাবে কসাইখানায়? আরো এক বছর আগে এই মানুষগুলোই তো পালিয়েছিল রণাঙ্গন ছেড়ে, গোটা দেশটা যেন সেদিন একটা আকৃতিহীন জলাজঙ্গলে পরিণত হয়েছিল;

কিন্তু সে নিতান্তই বাহ্যিক : আসলে তখন গোটা দেশ জুড়েই জেগে উঠছিল সংহতির একটা সুপ্ত শক্তি, অস্তিত্ব রক্ষার মামুলি সংগ্রামে তখন সবে লাগতে শুরু করেছিল ন্যায়াকাঙ্ক্ষার বর্ণপ্রলেপ। এমন সব বিস্ময়কর নর-নারীর আবির্ভাব ঘটছিল যাদের তুলনা অতীতে কখনো দেখা যায়নি; তাদের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের কথা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলতো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে।

সোবিয়েত-ভূমি বিচলিত হয়ে পড়েছিল আভ্যন্তরীন উপদ্রবে। ঠিক যে-সময়টায় বিদ্রোহ ঘটছিল ইয়ারোস্লাভ্ল্-এ (পরবর্তীকালে সে-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মুরোম্, আর্সামাস্, রস্তভ্-ভেলিকি ও রীবিন্স্কে), একই সময় মস্কোতেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল "বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশনারীরা"। ৬ই জুলাই তারিখে তাদেরই দুজন লোক দেখা করতে আসে জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট মিরবাখ্-এর সঙ্গে। ওদের সঙ্গে ছিল জেরঝিন্স্কির* জাল সই-সমেত পরিচয় পত্র। কাউণ্ট মিরবাখের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় ওরা রাষ্ট্রদূতের ওপর গুলিবর্ষণ করে, একটা বোমাও ছোঁড়ে। কামরা থেকে পালিয়ে যাবার সময় শেষ গুলিটা এসে রাষ্ট্রদূতের মাথার পেছনে লাগে, এবং তাতেই তিনি মারা যান। সেইদিন সন্ধ্যায় সশস্ত্র নাবিক আর লালফৌজের লোকেরা ছেয়ে ফেলল 'ক্রিস্তিয়ে প্রুদি' আর 'য়াউজা' বুলভারে। মোটরগাড়ির গতিরোধ করে, পথিকদের থামিয়ে তারা তল্লাশী চালালো, সঙ্গে যে কোনোরকম অস্ত্র বা টাকা থাকলে তা কেড়ে নিয়ে তাদের টেনে নিয়ে চলল বিদ্রোহের সদর দপ্তরে—ত্রেখ্স্ভিয়াতিতেলি স্ট্রীটের মরোজভ্ প্রাসাদে। ফেলিক্স্ জেরঝিন্স্কি স্বয়ং গিয়েছিলেন ওই বাড়িতে মিরবাখের আততায়ীদের খুঁজতে, কিন্তু তিনি সেখানে বন্দী হলেন। সারা সন্ধ্যে এবং রাতেও খানিকক্ষণ অবধি গ্রেপ্তারের হিড়িক চলল। টেলিগ্রাফ চলে গেছে বিদ্রোহীদের হাতে। কিন্তু ক্রেমলিন আক্রমণ করতে কেউ সাহস পায়নি তখনও। প্রায় দু'হাজার বিদ্রোহী তখন য়াউজা নদী থেকে শুরু করে ক্রিস্তিয়ে প্রুদি বুলভার পর্যন্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল।

ক্রেমলিনের হাতে তখন টেলিফোন-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই, আর ভরসা করবার মধ্যে আছে শুধু তার সাবেকী আমলের প্রাকার বেষ্টনী। খদিন্স্কয়ে ময়দানে মোতায়েন ছিল পল্টন, আর বেশির ভাগ সেপাইকেই ইভান কুপালার উৎসব উপলক্ষ্যে ছুটি দেয়া হয়েছিল। ক্রেমলিনের ভেতর তখন দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। সকালের দিকে অবশ্য তাঁরা ধরে-করে প্রায় আটশো সৈনিক জড়ো করলেন, আর জোগাড় করলেন তিনটে কামান, কয়েকটা সাঁজোয়া গাড়ি। সকাল সাতটায় আক্রমণ শুরু করল সেপাইরা, গোলা ছুঁড়ে তারা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিল ত্রেখ্স্ভিয়াতিতেলি স্ট্রীটের মরোজভ্ প্রাসাদটা। ভেতরে হৈচৈ হচ্ছিল

---

* ফেলিক্স্ এদ্মুন্দোভিচ্ জেরঝিন্স্কি (১৮৭৭-১৯২৬)—বলশেভিক পার্টির একজন অগ্রগণ্য নেতা, লেনিন ও স্তালিনের দৃঢ় সমর্থক; 'সারা রুশ বিশেষ কমিশনের' (চেকা) অধিকর্তা ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের একজন প্রতিভাশালী সংগঠক।

প্রচন্ড, কিন্তু মারা গেল খুব কম লোকই, "বামপন্থী সোশালিস্ট-রিভলিউশনারীদের ফৌজ" পালিয়ে গেল আশে পাশের অলিগলি আর খিড়কির উঠোন পেরিয়ে—কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে কে জানে। ওদের অধিনায়ক ছিল পপভ্, পাগলের মতো চোখ আর পুরু-ঠোঁটওয়ালা একটি ছোকরা। মস্কো থেকে অদৃশ্য হল সে। বছর খানেক বাদে মাখনোর গুপ্তচরবিভাগের প্রধান হিসাবে আবার আবির্ভাব ঘটেছিল তার। মার্জিত রুচির নিষ্ঠুরতার জন্য সে তখন রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল।

ভল্‌গা এলাকা আর মস্কো—দু' জায়গাতেই দমন করা হল অভ্যুত্থান। কিন্তু বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল চারদিকে : বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জার্মানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শহরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো গ্রামগুলো, চালালো লুঠতরাজ। শহর থেকে অপসারিত হল সোবিয়েত শাসন শক্তি। স্বাধীন পরস্পরবিচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্রের যুগ শুরু হল—ব্যাঙের ছাতার মতোই একেকটা রিপাবলিক জন্মায়, ধ্বংস হয়। একেকটা রাষ্ট্র আবার এতই ক্ষুদ্রায়তন যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোনো ঘোড়সওয়ার ইচ্ছে করলে তার চারপাশের সীমানা ধরে পুরো এলাকাটা ঘুরে আসতে পারে।

এই অরাজকতা দমন করার জন্য সোবিয়েত গভর্ণমেন্ট তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। আর ঠিক এমনি সময়ই একটা প্রচন্ড আঘাত এল তাঁদের ওপর : তিরিশে আগস্ট তারিখে মিকেলসন্ ওয়ার্ক্‌স্-এ অনুষ্ঠিত একটা সভার পরেই ফ্যানি কাপ্‌লান নামে একজন দক্ষিণপন্থী "সোশালিস্ট-রিভলিউশনারী" (মড়ার-মাথা-আঁকা টাইপিনওয়ালা সেই লোকটি যে-সংগঠনের সদস্য ছিল এ-ও সেই একই সংগঠনের লোক) লেনিনের ওপর গুলিবর্ষণ করে তাঁকে সাংঘাতিকভাবে জখম করল।

মাসের একত্রিশ তারিখে একদল মানুষ মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে গেল, আপাদমস্তক তাদের কালো চামড়ার পোশাকে ঢাকা। দলের আগে-আগে দুটো লাঠিতে বাঁধা একটা ব্যানার, তাতে লেখা একটি মাত্র কথা : "সন্ত্রাস"...। মস্কো আর পেত্রোগ্রাদের প্রত্যেকটা কারখানায় দিনরাত চলল সভা-সমিতি। মজুররা দাবি জানালো, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫ই সেপ্টেম্বর মস্কো আর পেত্রোগ্রাদের কাগজগুলো প্রকাশিত হল অশুভ শিরোনামা দিয়ে :

লাল সন্ত্রাস

> "......সমস্ত সোবিয়েতকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, এই মুহূর্তে রাঘববোয়াল ধনিক ও অফিসারদের প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী 'এস্-আর'দের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের জামিনস্বরূপ আটক রাখিতে হইবে।......পলায়ন অথবা বিদ্রোহের উস্কানি দিবার কোনোরকম চেষ্টা দেখিলে

তৎক্ষণাৎ ব্যাপক গুলিচালনার দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।......শ্বেতরক্ষী কুকুরদের বিরুদ্ধে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় এখনই চূড়ান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।......ব্যাপক আকারে সন্ত্রাস প্রয়োগ করিতে যেন কোনোপ্রকার ইতস্তত করা না হয়।......"

সে-সময়ে শহরগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহারে অত্যন্ত কড়াকড়ি চলছে, মাঝে মাঝে গোটা একেকটা পল্লীতে আলোই জ্বালানো হয় না। যাঁরা দামি-দামি ঘরে থাকেন তাঁরা অবশ্য বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট্ ধীরে ধীরে লাল হয়ে আসছে দেখলেই ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠেন, কে জানে হয়তো এই তাঁদের মরণ-শয্যার শেষ বাতি, হয়তো একটু বাদেই একদল সশস্ত্র মজুর এসে হাজির হবে, তারই নিশানা জানিয়ে দিচ্ছে এখনই।......

সারা রাশিয়ায় ঝড় তুলে উনিশ-শো-আঠারো সালটা চলে গেল। বিষণ্ণ জলগর্ভ মেঘ উঠেছে শরতের আকাশে। যেদিকে তাকাও সেদিকেই এখন রণাঙ্গন—সুদূর উত্তরে, ভল্‌গার তীরে কাজানে, দক্ষিণ ভল্‌গায় জারিৎসিনে, উত্তর ককেসাসে আর জার্মান-অধিকৃত সীমান্ত এলাকায়। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী পরিখা। আসন্ন শরতের আবহাওয়া লালফৌজের লোকদের মনে কিন্তু খুশির ভাব আনতে পারে নি। উত্তর দিক থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে-আসা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে ওদের অনেকেরই মনে পড়ে দেশের কথা, গাঁয়ের কথা—সেখানে এখন কুঁড়ে ঘরের চালা থেকে বাতাসে খসে পড়ছে ছাউনির খড়, কাঁটাগাছে ভরে গেছে জমি, মাঠেই পচে যাচ্ছে আলু; যুদ্ধ যে কোনোদিন থামবে, মনে হয় সে আশ্বাসও নেই; সামনে শুধু গাঢ়-অন্ধকার রাত আর কুটিরের মধ্যে কুপি বাতির ক্ষীণ আলো, বাপ-ছেলে কবে ফিরবে তারই আকুল প্রতীক্ষা, আর কোথায় কী ভয়ংকর ঘটছে তারই গল্প শুনে উনুনের ধারে শুয়ে-থাকা বাচ্চা ছেলের কান্না।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গার বিদ্রোহ দমন করার পর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কো পেত্রোগ্রাদ ও ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক্ শহরের সবচেয়ে পাকাপোক্ত কমিউনিস্টদের আহ্বান করে তাদের পাঠিয়ে দিলেন সেনা-বাহিনীতে। ট্রেনে চেপে তাঁরা এগোতে লাগলেন রণাঙ্গনগুলোর দিকে, পথে যতো ধ্বংসমূলক কাজ তাঁদের গোচরে এল সব তাঁরা দমন করলেন কঠোর হাতে, তা সে ইচ্ছাকৃত অপরাধই হোক্ আর অনিচ্ছাকৃতই হোক্। সন্ত্রাসের কড়া হুকুমত ফৌজের মধ্যেও কায়েম হল। বিশৃংখল কিংবা প্রায় উপে যাবার মতো ফৌজীদল-গুলোকে নতুনভাবে রেজিমেন্টের রূপ দেয়া হল, তাদের আনা হল বিপ্লবী সমর পরিষদের পরিচালনাধীনে। নতুন যুগের আদর্শ হল সাহস ও বীর্যবত্তা। কাপুরুষতা হল রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল। লাল রণাঙ্গনের তরফ থেকে এবার আক্রমণোদ্যোগ শুরু হল। একটি মাত্র প্রচণ্ড আঘাতে পতন হল কাজানের, আর

তার অল্প ক'দিন পরেই গেল সামারা। লাল সন্ত্রাসের সামনে পড়ে আতঙ্কে পালাতে দিশা পেল না শ্বেতরক্ষী ফৌজীদলগুলো। জারিৎসিনে দশম বাহিনীর বিপ্লবী সমর পরিষদে ছিলেন স্তালিন; আতামান ক্রাস্‌নভের শ্বেত কসাক-ফৌজের বিরুদ্ধে তখন সেখানে ব্যাপক আকারে রক্তাক্ত লড়াই চলছিল। আতামানের পেছনে ছিল জার্মান সদর দপ্তরের গোপন ইঙ্গিত ও সাহায্য।......

কিন্তু এ-সমস্তই হল ভাবী যুগের বিরাট সংগ্রামের মুখবন্ধ মাত্র—১৯১৯ সালের মুখ্য ঘটনাবলীর আগে শক্তির মহড়া।

ইভান ইলিয়িচ্ তেলেগিনকে গিম্‌জা যে কাজের ভার দিয়েছিল তা ও করেছে। কাজানের যুদ্ধের সময় ওকে ওর নিজস্ব রেজিমেন্টটার কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল। সামারায় যারা প্রথম ঢোকে তাদের মধ্যে তেলেগিনও ছিল একজন। রেজিমেন্টের আগে-আগে ওর ঝাঁকড়া-লোম-ওয়ালা টাট্টুঘোড়াটায় চেপে দ্‌ভরিয়ান্‌স্কায়া স্ট্রীটের ওপর দিয়ে তেলেগিন যেদিন চলে যায় সেদিনটা ছিল উষ্ণ শরতের দিন। দ্বিতীয় আলেক্‌সান্দারের সেই প্রতিমূর্তিটাকে আবার তাড়াতাড়ি করে তক্তা দিয়ে ঢাকা হচ্ছিল, মূর্তিটা যে-স্কোয়ারে ছিল সেই স্কোয়ারটা ডিঙিয়ে চলে গেল তেলেগিনের রেজিমেন্ট। তারপরেই রাস্তার রোড়ের সেই দ্বিতীয় বাড়িটা,...... ইভান ইলিয়চ্ মাথা হেঁট করল—ও যে কী দেখবে তা ওর ভালো করেই জানা ছিল, কিন্তু তবু ওর মনটা ব্যথায় মুষড়ে পড়ল। দোতলার জানলাগুলো—তার মানে ডাঃ বুলাভিনের নিজের কামরার জানলাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ। ঘোড়ার পিঠ থেকে তেলেগিন সবই পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল : ওই তো সেই আখরোট-কাঠের দরজাটা, ওটারই চৌকাঠে সেদিন দাশা এসে দাঁড়িয়েছিল, স্বপ্নের মতো। আর ওই হল ডাক্তারের পড়ার-ঘর, বইয়ের তাকগুলো উল্টে পড়ে আছে আর মেন্দেলিয়েভের প্রতিকৃতিখানা কুঁকড়ে গিয়ে ঝুলছে দেয়ালে, কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো।......কিন্তু দাশা কোথায়? ওর কপালে কী ঘটল? এ প্রশ্নের জবাব দেবার কেউ নেই।
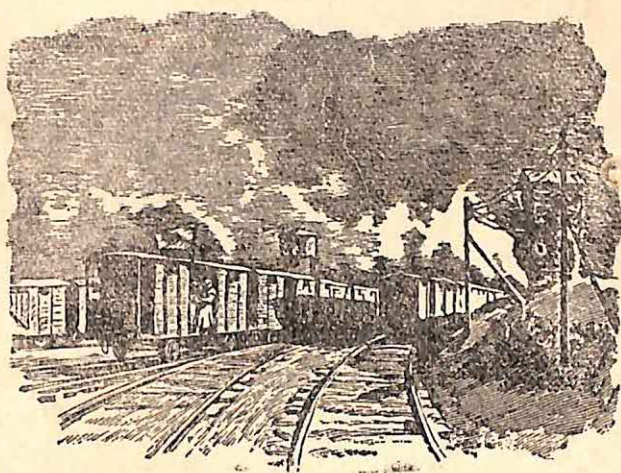
এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড

॥ বিষণ্ণ প্রভাত ॥

আলেক্সি তলস্তয়

১৮৮৩—১৯৪৫

আলেক্সি তলস্তয়ের সাহিত্যকীর্তি বিস্ময়কর। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, রূপকথা— শিল্প-সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বলিষ্ঠ হাতের স্বাক্ষর আছে। জীবনকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই জীবনবোধের ছাপ রয়েছে তাঁর বহুবিস্তীর্ণ রচনাবলীতে। 'ইভান গ্রজনি' নাটক ও 'প্রথম পিটার' উপন্যাস শুধু যে দুই ঐতিহাসিক কালের সার্থক সাহিত্য-রূপায়ণ তাই নয়, রুশজাতির সত্যিকারের বৈশিষ্ট্যও এই রচনায় পরিস্ফুট। ১৯১৭-২০ সালের বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের কালের উপরে রচিত হয়েছে তাঁর দুটি উপন্যাস—'রুটি' ও 'অগ্নিপরীক্ষা'। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে আলেক্সি তলস্তয়কে যুগসন্ধির সাহিত্যিক বলা চলে। অক্টোবর বিপ্লবের আগের ও পরের যুগের ক্রান্তিকালের মানুষ তার আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ সংগ্রাম-দ্বিধাচিত্ততা সমেত পরিপূর্ণরূপে ক্লাসিকধর্মী বর্ণাঢ্যতায় তাঁর উপন্যাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। একযুগের প্রাণশক্তি এবং অন্যযুগের সম্ভাবনা সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে।

তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'অগ্নিপরীক্ষা' আলেক্সি তলস্তয়ের মহাগ্রন্থ, সোবিয়েত-সাহিত্যের ও বিশ্ব-সাহিত্যের এক অতি-বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। নবজাত সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কি-ভাবে এক অসাধারণ সংগ্রাম করতে হয়েছে, কি-ভাবে সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তেলেগিন-দাশা-কাতিয়া-রশচিনের মতো সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষরা যুগ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কি-ভাবে এক দুশ্চর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি বিরাট জাতি আত্মোপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—এই আশ্চর্য কাহিনী আলেক্সি তলস্তয়ের 'অগ্নিপরীক্ষা'। 'উনিশ-শো আঠারো' এই মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। ঘটনাকাল—বিপ্লবোত্তর প্রথম বর্ষ—গৃহযুদ্ধের যুগ। বুদ্ধিজীবীরা তখনো বিভ্রান্ত, যদিও ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত তাদের পারিবারিক বন্ধন থেকে ছিঁড়ে এনেছে যুদ্ধের পরিখায়—দুই বিরোধী শিবিরে। চূড়ান্ত এক সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবীদের সংশয়, জিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি এই খণ্ডের উপজীব্য।

আলেক্সি তলস্তয়ের 'প্রথম পিটার' (১৯৪০), 'অগ্নিপরীক্ষা' (১৯৪৩) ও 'ইভান গ্রজনি' (১৯৪৬) স্তালিন-পুরস্কার পেয়েছে।